বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ,

চতুর্থ বর্ষ।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ২৲ দুই টাকামাত্র।

কার্য্যালয় ১৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

বীরভূমি (নবপর্য্যায়)

৪র্থ খণ্ড

১৩২১ বঙ্গাব্দ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩২১

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ের সময় সাগর-বন্ধন কার্য্যে যখন মহারথী রথী প্রভৃতি বড় বড় বীরগণ ব্যাপৃত, তখন অতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়াল অকিঞ্চিৎকর হইলেও যেমন তাহার সাধ্যানুরূপ চেষ্টায় সে কার্য্যের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিল, অদ্য-ার এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সুমহান কার্য্যে যখন দেশের ও সমাজের অগ্রণী মহাজনেরা বদ্ধপরিকর হইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, এই দীনাতিদীন, নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহার সাধ্যানুরূপ চেষ্টা, ব্যাকুলতা ও ভরসা লইয়া ভক্তমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত। সাগরবন্ধনের সময় বিপুলায়তন গগন-ভেদী গিরিশৃঙ্গ সকল যখন মহা মহাবীরের দ্বারা বাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়াল তাহার অতি ক্ষুদ্রদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বহন করিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করিয়াছিল। এ দীন হীন ও আজ সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া ভক্ত-মণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক কার্য্য নির্দ্ধারণ সমিতির আলোচ্য বিষয়ের ৮ম বিষয়টি এই :—"বৈষ্ণব তীর্থরক্ষা ও রুগ্ন প্রভৃতি নিরাশ্রয় বৈষ্ণব-গণের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপাদি তীর্থ স্থানে সেবাশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হউক।"

সন ১৩১৮ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব মহোদয়ের শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপে "রাধারমণ সেবাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর কাল পীড়িত, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ভক্ত ও নিরাশ্রয়ের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা ; আর্ত্ত, স্থবির ও অক্ষমদিগকে আশ্রমে

রাখিয়া সেবা ; নিরাশ্রয় মৃতের যথাবিধি সৎকার ; অনাথ বালক বালিকা দিগকে আশ্রমে রাখিয়া বর্ণাশ্রমোপযোগী শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সাধ্যানুরূপ করা হইতেছে।

এ দীন দাস "রাধারমণ সেবাশ্রম"এর কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে এক সংশয়াপন্ন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে ইহা অনুভব করিয়া, যে ভাবনা, যে নিস্ফলতার আশঙ্কা হৃদয়ে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার যে আকুলতা প্রাণে উদয় হইয়াছে তাহারি তাড়নায় আজ আপনাদের সম্মুখে অকপটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে উপস্থিত। আমাদের আশঙ্কা যদি মিথ্যা হয় তাহাও সাধারণের নিকট হইতে বুঝিবার সম্পূর্ণ আশা আছে বুঝিবার ও হৃদয় বেদনা বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই আজ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জগন্মঙ্গল প্রেমের ধর্ম্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় ধর্ম্ম। যাঁহার আবির্ভাবে ও যে ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গদেশ এমন একটী গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের—যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়াছিল। যে প্রেমের ধর্ম্ম এক সুমহান ভাবের উচ্ছ্বাসে সমাজের তৎকালীন সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে প্লাবিত করিয়া, সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক সুমহান্ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিস্কৃতিদান করিয়াছিল। সমাজ-শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়া, "মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন", এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, প্রেমের সাধনায় সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনার খেলা ঘরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি প্রেমের স্পর্দ্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন সমাজে যাহারা তৃণাদপি নীচ তাহারাও গৌরব লাভ করিয়াছিল, যাহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি সেও সম্মান লাভ করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইয়াছিল। তৎকালীন বাংলার হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া সকল অবস্থার দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্য্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে

লের সকল বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ ৪২৭ বৎসরের মধ্যেই ভাবোচ্ছ্বাস সে হৃদয়ের উন্মেষ, সে মহানুভবতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় হইতে অন্তর্হিত হইল কেন? ইহাই আজ আমাদের ভাবিবার কথা।

প্রেমের সাধনায় বিকার আশঙ্কা আছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তাহাই ঘটিয়াছে। প্রেমের একটি দিক আছে যেটি প্রধানতঃ সের দিক। তাহারি প্রলোভনে জড়িত হইয়া রসসম্ভোগকেই সাধনার রম সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া আজ আমরা কর্ম্মের কঠোরতা, জ্ঞানের শুদ্ধতাকে ভুলিয়াছি। কর্ম্ম বন্ধন, জ্ঞান শুষ্কতত্ত্ব মাত্র, তাহা প্রেম ভক্তির রায় এই সকল কথা কেবল কথামাত্র নয়, এইরূপ জীবনই আজ কাল ড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। প্রেমের সাধনায় র্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানকে অমান্য করিয়া, কেবল রসসম্ভোগকেই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া জানিয়া ও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের হইয়াছে এই যে গাছকে কাটিয়া ফেলিয়া কেবল ফুলটি লইবার প্রত্যাশা। গাছকে তাচ্ছিল্য করিয়া ফুল লইবার চেষ্টা করিলে কিছু ক্ষণের জন্য ফুলকে পাওয়া যায় বটে কিন্তু নিত্য নব নব ফুল ফুটিবার আর আশা থাকে না। কেবল মাত্র ফুলটীর প্রতি একান্ত লক্ষ্য করিলে তাহার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। যে প্রেমে মঙ্গল্য কর্ম্মের ব্যাকুলতা নাই, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা নাই, সেই প্রেম সংসারজালজড়িত মূঢ় প্রেম, পশুদের সংস্কারগত অন্ধ প্রেম। সত্য প্রেমের দৃষ্টি জাগ্রত, চিত্ত উন্মুক্ত তাহাতে সংযম, সুবিবেচনা ও সৌন্দর্য্যের চিরস্থিতি। প্রেমের সাধনায় কেবল মাত্র রসের দিকটায় ঝুঁকিয়া পড়ায় আমরা কেবল ধ্যানের মধ্যে পরিসমাপ্তির দিক দিয়াই রস-স্বরূপকে দেখিতে পাই। বিশ্বব্যাপারের নিত্য পরিণতির দিক দিয়া দেখিতে পাই না। ধর্ম্মকে আমরা আংশিক করিয়া খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মন্ত্রগত, বিশেষ অনুষ্ঠানগত করিয়া দেখি; তাহাকে পূজার বিষয় বলিয়া জানি, ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। অথচ সংসারে যাহা একমাত্র সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যাহা একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্য তাহার অন্তরভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের

ছোট বড় অন্তর বাহির সর্ব্বাংশের পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুমহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সংসারে যেমন এক একটী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী এক একটী ভোগ্য বিষয় আছে, ধর্ম্মকে আমরা সেইরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির বিলাস পরিতৃপ্তির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন বলিয়া জানি। সেই সময়টা বক্তৃতা, সঙ্গীত, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিলাম বলিয়া একটা আরাম অনুভব করি, এবং পরক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংযম, সেই ভক্তিবৃত্তির ক্ষণিক উপদ্রবে আশপাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকি। এই জন্যই আমাদের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততায় দুর্গতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম যখন সত্য হইতে—জ্ঞান হইতে—ভ্রষ্ট হইয়া, কর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া প্রমত্ত বেড়ায়, তখন তাহার সংযম ও ধৈর্য্য নষ্ট হয়, তাহার কল্পনা-বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে কষ্ট করে; নিজেকে শ্রীহীন বিকৃত করিয়া তুলে। তখন আমাদের বিশ্বাস কোন নিয়মকে মানে না; আমাদের কল্পনায় কিছুই বাধা থাকে না, আমাদের আচারকে কোন প্রকার যুক্তির কাছে কিছু মাত্র জবাবদিহি করিতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ হইতে ভগবানকে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে শুষ্ক প্রস্তর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয় কেবল মাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই শ্রীভগবানকে অবরুদ্ধ করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় না; স্থাণু হইয়া বসিয়া আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করিতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনের ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতে চায়। ইহাতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তাহা পরিমাণ করিবার উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি না। আমরা তখন আমাদের অন্তর বাহিরের সামঞ্জস্য হীন বিবেক দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইতিহাস পুরাণ, সমাজ সভ্যতা সমস্তকে পরিমাপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সত্য নির্ণয় করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। কিন্তু ইহা আমাদের বোঝা উচিত যে আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, অন্যদিকে আনন্দ।

তাহার একদিকে ধ্বনিত হইতেছে "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি", আর একদিকে ধ্বনিত হইতেছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। এক-দিকে বন্ধনকে না মানিলে অন্যদিকে মুক্তিকে পাইবার উপায় নাই। শ্রীভগবান একদিকে নিজের সত্যের দ্বারা বদ্ধ আর একদিকে আপ-নার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধন কর্ম্মকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি, তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি। কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া নয়, আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশঃ বাঁধিয়া তুলিবার সাধ-নাই সত্যের সাধনা—ধর্ম্মের সাধনা—প্রেমের সাধনা। এই সাধনার মন্ত্র "যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—যে যে কর্ম্ম করিবে সমস্তই ব্রহ্মকে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা মানবাত্মা আপনাকে ব্রহ্ম নিবেদন করিবে ইহাই আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পিত। কর্ম্ম যখন আমাদের প্রবৃত্তির কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া না আসে, কর্ম্মে যখন আমাদের আত্মনিবেদন প্রতিদিন একান্ত হইয়া উঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারইত আনন্দ-নিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্ম-নিবেদন, গৃহ কোণে বসিয়া কে ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে? সমস্ত মানব সন্তান জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে যে প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এ বিশ্বসংসারে রৌদ্র, বৃষ্টি; ঝড়, ঝঞ্ঝা; সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া কালে কালে মানব-মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিতেছে যাঁহারা সে সুমহৎ সৃষ্টি ব্যাপ্যার হইতে সুদূরে পলাইয়া নিভৃতে বসিয়া আপনার মনে কোন একটা ভাবরস সম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা, প্রেমের সাধনা, বলিয়া মনে করেন, এই বিকাশমান মানবের সভ্যতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য মানবের চিরদিনের চেষ্টা এই পরম দুঃখের ও পরম সুখের সাধনা, যাঁহারা এ সকলকে মিথ্যা বলেন, কত বড় মিথ্যা তাঁহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিয়াছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে যাঁহারা ফাঁকি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি সত্যস্বরূপ ভগবানকে সত্যই বিশ্বাস করেন? উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ এষাং ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"—পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ এবং যিনি ক্রিয়াবান তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে। অথচ আনন্দের

ক্রীড়া নাই এ কখন হইতেই পারে না—সে ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই কর্ম্ম। ভগবানে যাঁর আনন্দ, তিনি কর্ম্ম না হইলে বাঁচিবেন কি করিয়া ? কারণ তাঁহাকে এমন কর্ম্ম করিতেই হইবে যে কর্ম্মে শ্রীভগবানের আনন্দ আকার ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশমান হইয়া উঠে। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বা-বিষ্কারে, যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে, ভগবদ্‌ভক্তের আনন্দও তেমনি জীবনে ছোট বড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা রসস্বরূপকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। এ বিশ্বসংসারে ভগবানও তাঁহার আনন্দকে তেমনি করিয়া প্রকাশ করিতেছেন—তিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণানকান্নিহিতার্থো দধাতি"। তিনি আপনার বহুধাশক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই; তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করিতেছেন। তিনি কাজ করিতেছেন—নহিলে তিনি আপনাকে দিতে পারিবেন কেমন করিয়া। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করিতেছে সেই ত তাঁর সৃষ্টি। আমাদেরও সার্থকতা ঐ খানে—ঐ খানেই আমাদের ভগবানের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করিতে হইবে। ভগবানের বিশ্বসংসারে আমাদেরও ভগবান প্রদত্ত শক্তি যোগে তাঁর সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে হইবে তাহা হইলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হইবে। যখন আমরা সকলের স্বার্থকে নিজের নিহিতার্থ বলিয়া জানিব, সকলের কর্ম্মে নিজের বহুধা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব, তখনই আমাদের আনন্দ। এই শুভ বুদ্ধিতে যখন আমরা কর্ম্ম করিব তখন আমাদের কর্ম্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম্ম নয়—আত্মার তৃপ্তির কর্ম্ম, কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম্ম নয়—আত্মার তৃপ্তির কর্ম্ম, কিন্তু অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম যেমন শ্রীভগবানেই আরম্ভ ও তাঁহাতেই সমাপ্ত হইতেছে, তেমনি দেখিতে পাইব আমাদেরও সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে তিনি, পরিণামেও তিনি তখনই আমাদের সকল কর্ম্ম শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময় হইবে। আমাদের যদি প্রেমের সাধনা হয় ; প্রেম ত কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের জীবনে কর্ম্ম ব্যতীত আমাদের নিজের বলিতে আর আছে কি ? প্রেমে আমরা প্রেমময়কে দিব

কি ? কি দিয়া ভক্তি তাহার সার্থকতা লাভ করিবে ? সংসারেই আমাদের কর্ম্ম, আমাদের কর্ত্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের সার্থকতা হইবে তখন, যখন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব, আমরা আনন্দের সহিত শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারিব! নতুবা কর্ম্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক, ও কর্ত্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। রসস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্ম্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলময় রসস্বরূপকে কেহ পাইতে পারে না। কর্ম্মহীন নিষ্ক্রিয় উদাসীনে মঙ্গল নাই। কর্ম্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব, দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসার পথের দুরূহ বাধা সকল অতিক্রম করিয়া তবে আমরা সেই মঙ্গলময় রসস্বরূপের দ্বারে পৌছিতে পারি। শুভকর্ম্ম সাধনা দ্বারা সংসারের সমস্ত ক্ষতি, বিপদ, ক্ষোভ, বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে, নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে, যখন আমরা মঙ্গলময় প্রেমময়কে ধারণ করিব, তখনি জগতের সকল কর্ম্মের সকল উত্থান পতনের মধ্যে আমাদের অন্তরতম প্রেমময় রসস্বরূপকে দেখিতে পাইব। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব তিনি রহিয়াছেন।

আমরা আমাদের চারিধারে বিশ্বসংসারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব কেবল সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল, স্থল, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান প্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গল কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে—অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে—কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ভগবানের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই রস-স্বরূপকে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার নানারূপ প্রীতির সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই নিকট-তম রূপে জানিয়া ও পাইয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। "সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা" শ্রীভগবান এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন; এই বিশ্বমানবের শুন্যরস প্রবাহে ভগবান আমাদিগকে চিরকাল সঞ্চিত প্রাণ, বুদ্ধি, প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন; এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ভগবান আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন; এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকাল রচিত কাব্য কাহিনী

শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বসংসারে এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়। কারণ মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে; মানবের বিচিত্র প্রীতি সম্বন্ধের মধ্যে ভগবানের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারা আমাদের চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। এই জন্যই ভগবানের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও ধর্ম্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন শিশুর পক্ষে একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য সম্বন্ধ, শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য, তেমনি শ্রীভগবান মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান। এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্ম করি। এই জন্য মানব-সংসারের মধ্যেই ভগবানের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা; অন্য উপাসনা আংশিক; কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, সে উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। আজ পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেই এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, পূর্ণতম ভাবে আছে। কিন্তু আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। আজ যদি প্রীতির সম্বন্ধে আমরা আবদ্ধ হইতাম তাহা হইলে এই প্রধান নবদ্বীপে, ইহা আমার কল্পনা নয়, অতিরঞ্জিত নয় প্রবাসী সহায়হীন রুগ্নের মুখে কেহ জল দিতে চায় না। পথের ধারে বিসূচিকা রোগী কাতরকণ্ঠে যখন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন আমরা সানন্দে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া তাহারি পার্শ্ব দিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছি। প্রবাসী নিঃসহায় রুগ্নকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

এই শ্রীধাম নবদ্বীপে যে এরূপ ঘটনা প্রতিদিন হইয়া থাকে তাহা আজ আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে প্রস্তুত। যে ধর্ম্মের ভিত্তি "জীবে দয়া নামে রুচি—বৈষ্ণব সেবন" যাঁহার মহাবাক্য "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" যে ধর্ম্মে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গকে অপবর্গ বলিয়া মানবের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই মানব জীবনের প্রয়োজন বলিয়া প্রচার করিয়া জগতে এক অভিনব সত্য প্রচার করিয়াছে। আজি সেই ধর্ম্ম যাজন করিয়া আমরা শ্রীভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কেবল ভাবরসে ও কল্পনায়—জীবে দয়া কেবল নিরামিষ ভোজনে বৈষ্ণব-সেবন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মত ও স্বার্থ রক্ষণে পরিণত করিয়াছি। আজ সমস্ত ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট আমাদের আবেদন এই যে আসুন আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলে মিলিয়া ঘৃণা দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া ধর্ম্মকে কেবল আচারগত অনুষ্ঠানগত না করিয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মহাবাক্য "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব কেবল, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" প্রভৃতি মহাবাক্যগুলি কেবল কথায় নয়, বক্তৃতায় নয়, সঙ্গীতে নয়; মনে প্রাণে জীবনে প্রতিদিনের কর্ম্মে যাজন করি।

আমার বলিবার আর কিছুই নাই, তবে যে মহাত্মার একমাত্র একান্ত চেষ্টায় ও ব্যয়ে আজ ৫ বৎসরাবধি এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতেছে, শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমার কায় মনোবাক্যে আজ সেই বঙ্গকুলতিলক মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর সর্ব্বশেষের একটি কথা এই যে, আজ এক এক করিয়া মহারাজের ব্যয়ে বৈষ্ণব সম্মিলনী ৫ বৎসর হইল। আমরাও অনেকে অনেক ভাবে, অনেক রূপে সম্মিলনীতে যোগ দানও করিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের দিক্‌টায় কি দেখিবার ও ভাবিবার আর কিছুই নাই? কেবল বৎসরান্তে এক একবার কেহ মহারাজের ব্যয়ে, কেহ বা নিজ ব্যয়ে সম্মিলনীতে যোগ দিয়া, দুই পাঁচটা আবেদন, নিবেদন, সমর্থন ও অভিভাষণ শুনিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ ও চরম করিব? মহারাজ অনেক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন, আমরা কি করিয়াছি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর জন্য প্রকৃত পক্ষে কতটুকু ত্যাগ করিয়াছি তাহা ভাবিবার কথা। তাহা যদি আমরা না করিয়া থাকি, না করিতে চেষ্টা করি ও না করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের অভিসম্পাত পতিত হইবে। *

নিত্যানন্দ দাস।

---

* গত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সময়াভাবে সাধু নিত্যানন্দ দাস এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

কর্ম্মত্যাগ

"ঝি! ওঝি! ঝি! শুন্‌তে পাচ্ছ না?"

"যাই গো বাবু, পান কটা সেজে রেখে যাই।"

"আগে শু'নে যাও।"

আজ "রথযাত্রা" উপলক্ষে অনেকে হাফ্ ডে (Half day) অফিস করিয়া বাসায় আসিয়াছে। তাই সকাল সকাল ঝির খোঁজ পড়িয়াছে। পান সাজা অসমাপ্ত রাখিয়াই ঝি উপরে আসিয়া বলিল "কিগো বাবু এত ডাকাডাকি করছ কেন?"

"খাবার আনতে হবে না?"

"তার জন্যে এত ডাকাডাকি, আমি ভাবলাম বুঝি রথের পার্ব্বনি দেবে।"

"রথের পার্ব্বনি?" সে আবার কি?" যত বাজে কথা।"

"ও সব শুনছি না, পার্ব্বনি না পেলে খাবার আসবে না।"

"আচ্ছা যাও খাবার নিয়ে এস। খেয়ে শরীর ধাতস্থ হো'ক তারপর দেখা যাবে।"

"পার্ব্বনি আমার কিন্তু চাই" বলিয়া ঝি, খাবার আনিতে চলিয়া গেল।

চার বৎসরের মেয়েটী কোলে লইয়া ঝির মা বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গ্রামে কাহারও বাড়ী কোন কর্ম্ম হইত না, কারণ তাহাদের "জল চলিত" না। নিরুপায় বিধবা প্রতিবেশী হৃষীকেশ দাদার পরামর্শে তাহার সহিত সহরে কাজ করিতে আসে, কারণ "জল চলা না চলা" লইয়া সহরে বিশেষ আটকায় না। হৃষীকেশ ছাপাখানায় কাজ করিত ও একটা খোলার বাড়ীতে একটী ঘর ভাড়া লইয়া থাকিত; সেই বাড়ীতেই একটী ছোট ঘর ভাড়া করিয়া দিয়াছিল বিধবা সেইখানেই থাকিত ও একটী মেসে কাজ করিত। কিছু দিন কাজ করিতে করিতে বিধবা বুঝিল হৃষীকেশের এই সহৃদয়তা একান্ত নিস্বার্থ নয়। তাহার ভিতরের পঙ্কিলতা যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে লাগিল তখন বিধবা ত্রস্ত হইয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। চতুর্দ্দিকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অভাগিনী একস্থান হইতে অন্যস্থান করিতে করিতে একটী সহৃদয়া বর্ষীয়সী বিধবার আশ্রয় পাইল। বর্ষীয়সীর আর কেহ ছিল না তিনি হতভাগিনীর

দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার মেয়েটীকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন।

মেয়েটী বড় হইলে যখন তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল সেই সময়ে তাহার আশ্রয়দাত্রী ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। বিধবাকে আবার উদরান্নের জন্য বাহির হইতে হইল। এবারে মেয়েটির চিন্তায় তাকে পীড়িত করিতে লাগিল। কন্যার বিবাহ দিতে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তাহার কিছুই নাই। অনেক চেষ্টায় কোন দরিদ্র ভদ্র পরিবারে একটী খোলার ঘর লইল। মেয়েটী তাহাদের কাজ করিত নিজে বাহিরে কাজ করিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত। মেস হইতে যে খাবার লইয়া আসিত তাহাতেই দুজনারই চলিত। রাত্রে "মায়ে ঝিয়ে" যখন একত্র শয়ন করিত তখন কন্যাকে আপন জীবনের সমস্ত দুঃখ কাহিনী ও তাহার চিরস্মরণীয়া আশ্রয়দাত্রীর নিকট যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল সেই সমস্ত বিবৃত করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল। কন্যার বিবাহ চিন্তা যদিও তাঁহার সমস্ত জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তথাপি কন্যার বিবাহ না দিয়াই তাহাকে ইহলীলা সংবরণ করিতে হইল।

মাতার মৃত্যুর পর কন্যাকেও উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল; কিন্তু তাহার যৌবনই তাহার কর্ম্মের প্রধান অন্তরায় হইল। প্রায় সকল স্থান হইতেই তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল যদি কৰ্ম্ম জুটিল ত স্থির হইয়া কাজ করিবার সুবিধা হইল না। গৃহস্থ বাড়ীর আশা ছাড়িয়া মেসে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অনেক মেস্ ঘুরিয়া এই মেসে প্রায় দুই বৎসর কাজ করিতেছে। এখানে লোক কম সুতরাং বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না; এবং মেসের বাবুরা অনেক ভাল। এই দুই বৎসরের মধ্যে সে কোন বাবুর এমন কোন ব্যবহার লক্ষ করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কুণ্ঠিতা হইতে হয় যথা সময়ে ঝি সকলের নিকট হইতে পার্ব্বনি পাইল। নরেন বলিল "ঝি নূতন বাবু কি দিলে?"

"নূতন বাবুর, দেখাই পাওয়া যায় না আজ এলেই ধরব।"

"তা হলে কেবল গাল খেতে হবে। ব্যাচারার বড় খাট্‌তে হয়। বেলা ন'টা আর রাত ন'টা।"

"যাবার সময় বাবুকে যখন চাবি দিতে ডাকব তখনই চাইব।"

নূতন বাবুর নাম বিজয় চন্দ্র ঘোষ, তিনি কোন সওদাগরি অফিসে কাজ করেন। অফিস হইতে আসিতে তাঁহার প্রত্যহ রাত্র হয়। সম্প্রতি মেসে

আসিয়াছেন বলিয়া তখনও "নূতন বাবু" আখ্যা আছে। একলা নীচের ছোট ঘরটীতে থাকেন বলিয়া তাহার কিছু বেশী ভাড়া দিতে হয় এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ রাত্রে ভিতর হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করিতে হয়। ঝি যাইবার সময় বাহির হইতে "বাবু, চাবী দিন" বলিয়া চলিয়া যায়। আজ ঝির সেই ডাকের অপেক্ষায় সে আপন নির্জ্জন ঘরে শয়ন করিয়া আছে এমন সময় ঝি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সাধারণ মেসের বাবুদের ঘর যেরূপ হয় এটী সেরূপ নয়। ঘরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানা ছোট খাটে বেশ পরিষ্কার একটী বিছানা পার্শ্বে ই একখান ছোট টেবিল ও তদুপযুক্ত চেয়ার। কাল অয়েল ক্লথ মোড়া টেবিলের উপর একধারে খান কতক বই আর একধারে দোয়াৎ কলম চিঠির কাগজ খাম রহিয়াছে। ঘরে বিশেষ কোন ছবি নাই। কেবল একটী স্ত্রীলোকের একখান বড় ছবি আর খাটের কাছে একটা লাল কাগজে "ঈশ্বর মঙ্গলময়" লেখা ঝুলিতেছে। ঝিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিজয় বলিল "এ হতভাগ্যের ঘরে কি মনে করে পদার্পণ হয়েছে?" ঝি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল "ঘর কি আপনি রোজ পরিষ্কার করেন?"

"কি করি তুমি ত কর না কাজেই নিজে করি।"

"সকলের ঘরই ত পরিষ্কার করি। আপনার ঘর বন্ধ থাকে নইলে কি করতে পারি না?"

"সে কথা এখন যাক্ কি মনে করে এসেছ বল শুনি।

"কেন আস্‌তে কি নেই?"

"আসতে থাকবে না কেন জন্ম জন্ম এস, তবু একটা কিছু মনে করে ত এসেছ।"

"রথের পার্ব্বনি দেবেন না?"

"আসল কথা বল! আর আর বাবুরা কি দিলে?"

"আপনি যা দেবেন দিন আর বাবুরা কিছু দেন নি। এঃ বৃষ্টি এল যে, আজ "রথ" কি না!"

বিজয় পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ঝির হ'তে দিয়া বলিল যে বৃষ্টি হচ্ছে এখন ত যেতে পারবে না। একটু বসে যাও বৃষ্টি একটু ধরুক। রাত্রি এখনও এগারটা বাজে নি।"

রাত্রি যদিও বেশী হয়নি তথাপি নির্জ্জন গলিটী নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ, মনে একটা নিস্তব্ধ একাগ্রতার সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বড় রাস্তা দিয়া সেই বৃষ্টিতেও এক একখান ভাড়াটীয়া গাড়ী ছড়্ ছড়্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যাইতেছিল। আষাঢ়ের এই বর্ষণ কাতর রাত্রে প্রিয় বিরহ ব্যাকুল কোন অনিদ্র যুবক পার্শ্ববর্ত্তী মেস হইতে গাহিয়া উঠিল "কেমনে কাটাব সারা রাতিরে।" বিজয় টেবিল হইতে মেঘদূত খান লইয়া খুলিল এমন সময় ঝি জিজ্ঞাসা করিল "নূতন বাবু! আপনার বাড়ীতে কে আছে গা"?

"আমার কেউ নেই ঝি!"

"কেউ নেই?"

"ভালবাসবার মত আপনার লোক কেউ নাই।"

"আপনি কি "বে" করেন নি!"

"সব মরে গেছে" বলিয়া বিজয় গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

২২ বৎসর বয়সের সময় বিজয়ের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সংসারে এক বালিকা স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া পিতার যা কিছু বিষয় ছিল তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া দেখিল মাঝে মাঝে মফঃস্বলে না যাইতে পারিলে সুবিধা হয় না। বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূর সম্পর্কের এক দরিদ্রা ভগ্নি ও তাহার এক বিধবা কন্যাকে সংসারে লইয়া আসে। দুই বৎসর পরে যখন তাহার স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়া ইহসংসর ত্যাগ করিল তখন প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে তাঁহার ভগ্নি ও ভগ্নিকন্যার অযত্ন ও অসদ্ব্যবহারই তাহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। আত্মীয়ের অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত হইয়া সেই যে কলিকাতায় আসিয়াছিল আজ চারি বৎসর আর গৃহে ফিরে নাই। পুরাতন গমস্তার উপর সেই হইতে বিষয়ের ভার দিয়া কলিকাতায় কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মের মধ্যেই আপন হৃদয় বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চায়। অহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্বর্গীয়া পত্নীর উপর যে অযথা অত্যাচার হইয়াছিল, নিজেকে সংসারের সুখ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়।

আজ অফিস হইতে ফিরিবার সময় সে চারিদিকেই একটা আনন্দ উৎসব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ভাল কাপড় ও পোষাক পরিধান করিয়া "রথ" দেখিতে যাইতেছে। কেহ বাঁশী কিনিয়া আনন্দে বাজাইতেছে। কেহ পুতুল কিনিয়া তাহাকে সযত্নে পুত্রের ন্যায় কোলে লইয়া চলিয়াছে। এই সব দৃশ্য কেবলই তাহাকে একটী আত্মীয়স্বজন পরি-

বেষ্টিত সুখময় সংসারের প্রলোভন দেখাইতেছিল এবং তাহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছিল যে এ সংসারে তাহাকে ভাল বাসিবার কেহই নাই। আজ সে যখন ঝির প্রশ্নের উত্তর দিল "আমাকে ভালবাসিবার কেহই নাই" তখন তাহার এই কথা কয়টি তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিগূঢ় বেদনা প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য ঝি বলিল "বাবু আপনি কটা পর্য্যন্ত জেগে থাকেন ?"

"রাত্রি এগারটা বারটা যতক্ষণ না ঘুম আসে।"

"এত রাত্র পর্য্যন্ত কি করেন" ?

"পড়ি! চুপ করে বসে থাকি।"

"বৃষ্টি একটু কমেছে বোধ হচ্ছে, আমি যাই। আপনি চাবিটা দিন।

(২)

বাটি যাইতে যাইতে ঝির কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নূতন বাবু বলিয়াছে তাহাকে ভালবাসিবার কেহই নাই। বাটি যাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে তাহার আপন নির্জ্জন ঘরের ছিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। নূতন বাবু বলিয়াছে "আমাকে ভালবাসিবার কেহ নাই" কিন্তু তাই কি ? জগতে কত লোক আছে যাহাদের ভালবাসিবার কেহ নাই তাহাকেও ত ভালবাসিবার কেহ নাই। কিন্তু এই কথা কয়টি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। নববিবাহিত ছাত্রের মনে বালিকা বধুর মধুর স্মৃতির ন্যায় এই কথাটা তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে লাগিল। এ কথাটি ত কেবল মুখের কথা নয়। সমস্ত কাজ কর্ম্মের অন্তরালে তাহার যে অবরুদ্ধ কোমল নারী প্রকৃতি ছিল এই কথা কয়টী একটী করুণ প্রার্থনা লইয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করিতে লাগিল ; নূতন বাবুর জন্য একটি সুমধুর সমবেদনায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে প্রথমেই ঝি বিজয়ের ঘর পরিষ্কার করিল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল "ঝি যে আজ প্রথমেই নূতন বাবুর ঘরে! কত পার্ব্বনি পেলে ?" ঝি সগর্ব্বে উত্তর করিল "এক টাকা"। সেইদিন হইতে যাইবার সময় ঝি কেবল মাত্র বাহির হইতে ডাকিয়া দিয়া চলিয়া যাইত না। ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই চারিটা কথা কহিয়া, দুই চারিটা কাজ করিয়া তবে যাইত। আবার যদি বৃষ্টি আসিত তাহা হইলে বসিয়া বসিয়া গল্প করিত, কোন বই পড়িতে বলিয়া একাগ্রমনে শুনিত। এক একদিন বৃষ্টি আসিল বলিয়া পড়া আরম্ভ হইত কিন্তু কখন

যে বৃষ্টী থামিয়া গিয়া মেঘ কাটিয়া যাইত তাহা সে টের পাইত না। হঠাৎ বিজয় যখন বলিয়া উঠিত "বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে" তখন সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইত। আপনার সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে সে বাহির দিকে প্রায়ই চাহিয়া দেখিত এবং বিজয় আসিলেই সে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ও পান দিয়া আসিত।

বিজয় ত ঝিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, প্রায়ই এক একখানা পুরাতন কাপড় ও বকশিশ্ দিত, এবং অফিস হইতে দুইখানা রঙ্গিল কাপড়ও আনিয়া দিয়াছিল। তাহার এই অনুগ্রহের জন্যই যে ঝি তাহাকে বিশেষ যত্ন করিত সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেকে অনেক তামাসাও করিত এবং সেও তাহা হাস্য মুখে গ্রহণ করিত।

প্রত্যেক বুধবারে অফিস হইতে আসিতে বিজয়ের অনেক রাত্র হইত সেজন্য তাহার রুটি খাবার ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিয়া সকলে চলিয়া যাইত। এক বৃহস্পতিবারে সকালে আসিয়া ঝি দেখিল যে রুটি ঢাকা পড়িয়া আছে তাড়াতাড়ি বিজয়ের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাল রাত্রে যে আপনি খাওনি কোন অসুখ করেছে নাকি?"

"কাল রাতে আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল আর রান্নাঘরে গিয়ে খেতে ইচ্ছা ক'রল না। তুমি ত একটু বসতে পার না?" শেষের কথাটা বিজয় নিতান্ত তামাসা করিয়া বলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে প্রত্যেক বুধবারে বিজয়ের খাওয়া না হওয়া ঝি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত।

আজ বুধবার সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট সমস্ত জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এখনও সমান ভাবে বৃষ্টি হইতেছে। রাত্র এগারটা বাজিয়া গিয়াছে এখনও বিজয় অফিস হইতে আসে নাই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝপ ঝপ শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। রান্নাঘরের বারান্দায় একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ঝি বসিয়া আছে। বর্ষার এই বিদ্যুতময়ী অন্ধকার রজনীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে একটা সুখের কল্পনা উদয় হইতেছিল। যদি সে তাহার আপনার ঘরে এমনি করিয়া একজনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত, সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ফিরিয়া আসিত তখন তাহাকে খাওয়াইয়া যদি তাহার শয্যাপ্রান্তে একটু স্থান অধিকার করিতে পারিত, তাহা হইলে জীবন কত সুখের হইত! কিন্তু হায়! তাহা হইবার নয়। নারী জীবনের চরম স্বার্থকতা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে।

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। এমন সময়ে বিজয় আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি তাড়াতাড়ি আলো লইয়া গেল বৃষ্টিতে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া "আমার জ্বর হয়েছে কিছু খাব না" বলিয়া বিজয় শুইয়া পড়িল ছয় দিবস পরে বিজয় যখন একটু সুস্থ হইল তখন ঝির বাসায় ফিরিবার অবকাশ হইল। ছয় দিবস রাত্র জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহে বাসায় ফিরিয়া যে অভ্যর্থনা পাইল তাহা কোন ক্রমেই সুখকর বলা যাইতে পারে না। গিন্নি বলিলেন "ওমা কেমন মেয়ে গো! আমরা ত ভেবে বাঁচিনি! ছদিন কোন খবর নেই। সোমত্ত মেয়ের এ কেমন ব্যাপার বাপু! কর্ত্তা বলিলেন "আমরা বাছা গেরস্ত, তোমার মা ভাল লোক ছিলেন তাই আমাদের বাড়ীতে থাকতে দিয়াছিলুম, তোমার এখানে সুবিধা হবে না। তুমি অন্য বাসা দেখ। আসছে মাস হতে আমাদের এখানে তোমার থাকা হবে না স্পষ্ট বলে দিলুম!" নিজেকে ইঁহাদের কাছে নির্দোষী প্রমান করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না কেবল যত শীঘ্র সম্ভব যে অন্যত্র যাইবে ইহাই জানাইয়া দিল।

মেসের বাবুরা বাবুরা বলিলেন "দেখুন বিজয়বাবু ঝি কিন্তু আপনার খুব সেবা করেছে। আপনার লোকেও অত করতে পারে কিনা সন্দেহ।"

বিজয় উত্তর করিল "যেখানে কিছু পায় সেইখানেই করে আপনি দিলে আপনাকেও করবে।"

কথাটা শুনিয়া ঝির মনে বড় ব্যথা লাগিল। সে কি কিছু পায় বলিয়াই যত্ন করে। কিছু পাইয়া যে যত্ন ও তাহার যত্নের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? সেই কি তাহাকে একটু ভালবাসিতে বলে নাই? অমন ভাবে "আমাকে ভাল বাসিবার কেহ নাই" একথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঝি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর একটুও যত্ন করিবে না আর তাহার নিকট হইতে কিছু লইবেও না। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মনে হইল বিজয়ের দুধ খাওয়া হয় নাই এবং সে হয়ত তাহারই দুধ লইয়া যাইবার অপেক্ষায় আছে তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল এখন দুধটা দিয়া আসিবে কিন্তু রাত্রে যাইবার সময় বাহির হইতে ডাকিয়া দিয়াই চলিয়া যাইবে। রাত্রে যাইবার সময় দ্বারের নিকট আসিয়া ভাবিল একবার মাত্র "কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া যাইবে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিজয় ঘুমাইতেছে, জানালা খোলা রহিয়াছে। নিঃশব্দে জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া উপর হইতে একজনকে ডাকিয়া সদর বন্ধ করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

বুধবারের দিন বেলা এগারটার মধ্যে বিজয়কে বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরিতে দেখিয়া ঝি উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল এত সকাল করে এলে যে, আবার অসুখ ক'রল নাকি ?

বিজয় সংক্ষেপে উত্তর করিল "না।"

"এত সকাল ক'রে এলেন কেন ?"

"চাকরি ছেড়ে দিয়েছি"। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া ঝিকে বলিল "ঝি আমি আজই বিকালের ট্রেণে পশ্চিমে বেড়াতে যাব আমার ট্রাঙ্কটা একটু গুছিয়ে দাও ত।"

"আবার কবে আসবে" ?

"আর আসব না।"

ঝি কথাটার ঠিক মানে বুঝিতে না পারিয়া বিজয়ের মুখের প্রতি চাহিল, সে বলিল "এখানে ত চাকরি গেল আর আমার শরীরও খারাপ, পশ্চিমে গিয়া সেইখানেই একটা চাকরি জোগাড় করিয়া লইব, এখানে আর আসিব না।" ঝি কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে ট্রাঙ্ক বোঝাই করিতে লাগিল।

একটী সামান্য কারণে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিজয়ের মনটা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। সে আস্তে আস্তে বাসায় আসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ত অভাবের জন্য চাকরি করে না নিজেকে সে কোন রকমে ব্যস্ত করিতে চায়। বেশ, সে ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে ? এত দিন সে যে তাহা না করিয়া এই জঘন্য দাসত্ব করিতেছিল কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ঘরে ঝুলান "ঈশ্বর মঙ্গলময়" লেখাটার প্রতি চাহিয়া বলিল "এই যে আঘাতের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল, আমি আজই পশ্চিমে যাইব। সংকল্প স্থির হইয়া গেল।

বিদায়ের সময় আসিল। আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় বাসার সকলেই আজ ব্যথিত। মাত্র তিনটি মাস বিজয় তাহাদের সহিত আছে তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সকলেরই ব্যথা বাজিতে লাগিল। ঠাকুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। মেসের সমস্ত হিসাব মিটাইয়া দিয়া ঠাকুরকে বক্‌শিশ্‌ দিয়া, বিজয় ঝির উদ্দেশ্যে চারিদিকে চাহিল। রান্নাঘরের বারান্দায় ঝি নিবিষ্ট মনে পান সাজায় ব্যস্ত ছিল, যেন কোনদিকেই তাহার মন নাই। বাহিরের এই ব্যাপারটা যেন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ, ইহার জন্য যেন তাহার দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রমই

ঘটিতে পারে না—এমন ভাবে কাজ করিতেছিল। "ঝি যাবার সময় বেশী করে গোটাকতক পান দাও" বলিয়া বিজয় আপনার ঘরে চলিয়া গেল। এক গ্লাস জল ও পান টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে ঝি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিজয় তাহাকে ডাকিয়া বলিল "ঝি, সময়ে অসময়ে তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তা' আমি ত চল্লুম, এই পাঁচটা টাকা নাও তোমার যা ইচ্ছা কিনো।"

"না না ও সব আমায় কিছু দিতে হবে না, আমার কিছু চাই না।"

সে যে এত যত্ন করিয়াছে তাহারই মূল্য স্বরূপ বিজয় যে আজ তাহাকে পাঁচটা টাকা দিবে, এ কথা তাহাকে আঘাত করিল। বিজয় চলিয়া যাওয়ায় তাহার যে কোন কষ্ট হইবে না বা হইতেছে না, এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য সে এতক্ষণ তাহার হৃদয়ের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। কিন্তু এবার সে আর নিজের দারুণ অভিমান কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। সে সবলে বলিয়া উঠিল "না না আমায় কিছু দিতে হবে না—আমার কিছু চাই না" এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

বিজয়ের মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া পড়িল, যে কথা সে একবার ভুলিয়াও ভাবে নাই সেই কথাটাই চকিতের মত তাহার মনে উদয় হইল সে একবার অস্ফুটস্বরে ডাকিল "ঝি!" বাহির হইতে গাড়োয়ান ডাকিল "কই গো বাবু আসুন গাড়ীর সময় হয়ে গেল।"

(৪)

আজ তিনদিন বিজয় চলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল একটী লোকের কাছে, কেবল একখানি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে এই ঘটনাটি সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মের অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। একটি হৃদয়ের কাছে এই তিনটি বর্ষাম্লান শ্রাবণ প্রভাত একটি প্রকাণ্ড প্রাণহীন অবসাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না। কাল তাহাকে বাসা ছাড়িয়া যাইতে হইবে কিন্তু নূতন বাসা সন্ধানের মত উৎসাহ তাহার ছিল না।

প্রথম যে দিন বিজয় চলিয়া গেল সেই রাত্রে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার শূন্য ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যেও ঐরূপই একটা শূন্যতা অনুভব করিল। অবিরল অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল "একি হইল! তাহারই কার্য্য কালের মধ্যে ত কত বাবু আসিয়াছে, কত বাবু গিয়াছে কিন্তু কাহারও জন্য ত এমন হয় নাই। এবারে তবে মন এমন হইল কেন? সে তাহার কে? সে তাহার কি করিয়াছে সেই যে

একদিন বর্ষণ-কাতর অন্ধকার রজনীতে একটি করুণ প্রার্থনা তাহার করুণ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে বারবার আঘাত করিয়াছিল সে কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। তাহার পরের কতদিনের কত মধুর স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। সকল বাবুরা যখন আফিস হইতে ফিরিত তখনই তাহার মনে হইত আর একজন আসিবে না। রাত্রে যাইবার সময় উপর হইতে বাবুদের সদর বন্ধ করিতে ডাকিবার সময় তাহার কথা মনে হইত আর একজন যে প্রত্যহ বন্ধ করিত সে নাই। এইরূপে অনবরত স্মৃতির একটা অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে তাহার প্রায়ই মনে হইত সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত এই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তু হায় তাহারও সাহস হইত না, শীঘ্র তাহাকে এক নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে এমন সময়ে এই মেসের কার্য্য সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। নূতন যেখানে বাসা করিবে সে স্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়া এই মেসের কর্ম্মত্যাগ করিবে।

আজ ফিরিবার সময় বৃষ্টি আসিয়াছে। উপর হইতে বাবু ডাকিয়া বলিলেন "ঝি একটু বস বৃষ্টি থামিলে চাবী দিব।" বসিয়া বসিয়া ঝির মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও কত দিন এমন বৃষ্টি আসিয়াছে তখন সে ঐ সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র ঘরটীতে সুখে সময় কাটাইয়াছে। ঐ ত সেই ঘর রহিয়াছে! ওখানে যাইয়া আর কিন্তু সে তৃপ্তি নাই। তবু সে আলোটা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল সেই খাট পড়িয়া রহিয়াছে, সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই সব কেবল একটী লোক নাই। একটা প্রকাণ্ড অভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল কিন্তু তখনই মনে হইল যাহার উপর অভিমান, সে নাই। একেরই অভাবে সমস্ত ঘরটা যেন প্রাণহীন। এই অচেতন চেয়ার টেবিলগুলা হইতে পর্য্যন্ত একটা নীরব অব্যক্ত ক্রন্দন তাহার চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা দমকা বাতাস আসিয়া তাহার হৃদয়ের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই বোধ হয় আলোটা নিবাইয়া দিয়া গেল। এই নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে দাঁড়াইয়া সহস্র সুখ-স্মৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা অপ্রকাশ্য নিগূঢ় বেদনা তাহার হৃদপিণ্ডটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। হায়, সে কেন গেল! তাহার হৃদয়ের সমস্ত কুসুমগুলি ফুটাইয়া সে কেন এমন নির্দ্দয় ভাবে চলিয়া গেল! "ওগো, ফিরে এস গো ফিরে এস," বলিয়া সে লুটাইয়া পড়িল। বিদ্যুৎ

হাসিয়া বলিয়া গেল, সে আসিবে না। বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দ আপন অস্পষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিল—"আসিবে না, আসিবে না," ঝি লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

উপর হইতে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া ঝি চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া নরেন দ্বার বন্ধ করিতে নীচে আসিল। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া "কাল হ'তে আমি আর আসব না" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া ঝি ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেল। তাহার গায়ে লাগিয়া নরেনের বাতি নে পড়িয়া নিবিয়া গেল এবং দুয়ারে বাধিয়া যে তাহার কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গেল তাহা সে লক্ষ্যই করিল না।

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়।
রাণাঘাট।

চিন্তা.

নির্জ্জন প্রান্তরে
বসে বসে একা,
যদি, করিতাম খেলা
নদীতটে;
নদী বেলা চয়
দেখিতাম সেথা
আঁকিতাম তাহা
হৃদিপটে।
সুন্দর প্রভাতে
উঠিতাম সুখে
রাঙ্গা মেঘ পানে
চাহিয়ে;
করিতাম গান
তৃণ-শয্যা-পরে
আপনা আপনি
মাতিয়ে।
মম খেলা সাথী
যদি, হ'ত পশু পাখী

নির্জ্জন নীরব
কান্তারে;
তেঁই সনে আমি
নাচিয়ে নাচিয়ে
বেড়াতাম তথা
বিভোরে।
দুখ মোহ শোক
নাহি বয় কভু,
সদা পুণ্য সেথা
রাজিছে।
নাহি সেথা অমা,
সদাই পূর্ণিমা,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু
গাহিছে;
আমি, তা'র মাঝ খানে
বসিয়া বিজনে
কাটা'তাম সদা
ধেয়ানে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মল্লিক।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব (৯)

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতোহ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥

তোমার এ বিশ্বে আবির্ভাবের কারণ।
অন্য লোকে অন্যরূপ করয়ে বর্ণন ॥
মহাসাগরেতে যথা, তরণী বিপদ-যুতা,
সেইরূপ এ পৃথিবী, সুভীষণ ভার,
সহিতে না পারি গেলা নিকটে ব্রহ্মার ॥
নিবেদিলা চতুর্ম্মুখ তোমার চরণে,
আবির্ভাব তাই তব ভূভার হরণে ॥

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥

কেন তুমি আসিয়াছ, তাহার উত্তরে,
এইরূপ নানামত আছয়ে সংসারে।
আমার মনেতে হয়, এ সকল কিছু নয়,
নররূপে তব আবির্ভাবের কারণ,
আমি এইরূপ হেতু করি নির্দ্ধারণ॥
পরম আনন্দময়, জীবের স্বরূপ হয়,
অবিদ্যার দ্বারা তাঁহা সমাবৃত হয়,
দেহাদিতে অভিমান করয়ে উদয়।
এই অভিমান হৈতে, কাম জন্মে অচিরাতে,
কাম হৈতে নানা কর্ম্ম করিয়া সাধন,
জীবের জনমে ক্লেশ, সংসার বন্ধন।
এই ক্লেশ নিবারণ, করিবারে নারায়ণ,
নানারূপ লীলা কর আবির্ভূত হ'য়ে
ফলে, সংসারীর প্রেম ভক্তি উপজয়ে।
শ্রবণ স্মরণ আর অর্চ্চন করিয়া,
তব লীলা, যায় লোক সংসার তরিয়া।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্বুজং॥

তোমার চরিত্র কথা ওহে কৃপাধাম!
যাহারা শ্রবণ করে কিম্বা করে গান।
সদা উচ্চারণ করে, কিম্বা মনে মনে স্মরে,
কিম্বা অপরের মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া
আনন্দে পূর্ণিত হয় যাহাদের হিয়া।
তব পাদপদ্মদ্বয়, অচিরে দর্শন হয়,
ফলে জন্ম-পরম্পরা মধ্যে পর্য্যটন
চির তরে তাহাদের হয় নিবারণ॥

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতে হিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাং॥

আমাদের সুখ দুঃখ তব চরণেতে।
অদর্শনে দুঃখ, সুখ হয় দর্শনেতে॥
হে প্রভো, জগৎ গুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
আত্মীয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ কর অনুক্ষণ,
আমাদের কেন আজি করিছ বর্জ্জন?
রাজগণে বহুক্লেশ, সমরেতে, হৃষীকেশ।
আমরা বিবিধরূপে, দিনু অনিবার,
তুমি ছাড়া আমাদের কেহ নাহি আর।
তুমি যাবে! তবে বুঝি গেল সুসময়,
দুঃসময় আসি ভাগ্যে হইল উদয়॥

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ॥

হে কৃষ্ণ, যাদবগণ বান্ধব আমার।

পাণ্ডবেরা পুত্র মোর জীবনের সার ॥
তাহারা জীবিত সবে, বীরত্বের সুগৌরবে,
কিন্তু যেই হবে হরি, তব অদর্শন,
খ্যাতি বা সমৃদ্ধি নাহি রবে কদাচন।
শরীরের নাম, রূপ, ওহে হরি, বিশ্বভূপ,
যেমন অতীব তুচ্ছ, জীব চলে গেলে,
তব কৃপা বিনা তথা আমরা সকলে।

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎ পদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥

গদাধর! আমাদের এই বাসভূমি!
কি শোভায় সুসজ্জিত করিয়াছ তুমি!
তোমার অসাধারণ, চরণের চিহ্নগণ,
বজ্রাঙ্কুশ আদি করি ইহাতে অঙ্কিত,
তুমি গেলে এই শোভা হবে অন্তর্হিত।

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধা সুপক্কৌষধি বীরুধঃ।
বনাদ্রি নদ্যুদন্বন্তোহ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥

তোমার দর্শনে এই জনপদ-চয়।
হয়েছে সমৃদ্ধিশালী ধান্যৌষধিময় ॥
সময়েতে লতাচয়, ফলযুক্ত পক্ক হয়,
বন গিরি সিন্ধু আর পর্ব্বত নিকর,
সকলেই হইয়াছে অতীব সুন্দর।
তুমি চ'লে গেলে হরি, এ সকল আর,
রহিবে না এই মর্ত্ত শোভার ভাণ্ডার ॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥

হেথা হ'তে গেলে তুমি ওহে দয়াময়,
পাণ্ডবের অকুশল ঘটিবে নিশ্চয়।
না গেলে যাদবগণ, দুঃখ পাবে অগণন।
দুই দিক্ ভাবি আমি ব্যাকুল হৃদয়!

করিতে না পারি কিছু কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বিশ্বেশ্বর তুমি হরি, তব ইচ্ছা সর্ব্বোপরি,
সকলি করিতে তুমি সতত সক্ষম,
তুমিই বিশ্বাত্মা, সবে করহ চেতন,
তুমি বিশ্বমূর্ত্তি-ধারী, আশ্রিতেরে কৃপাকারী,
কৃপাসিন্ধো, বৃথা এই কুশলাকুশল
চিন্তায় কি হেতু মোর হৃদয় চঞ্চল?
যাদবে পাণ্ডবে মোর, আছে দৃঢ় স্নেহডোর,
কৃপা করি সেই পাশ করহ ছেদন,
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়ামতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥

তুমিও তো বৃষ্ণিবংশ্য ওহে দয়াময়!
তোমাতেও হবে নাকি মোর স্নেহক্ষয়!
চাহি না চাহি না তাহা, ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি স্পৃহা,
অনন্য বিষয়া প্রীতি রহুক তোমাতে,
তোমাতে রহিলে রবে তোমার ভক্তেতে ॥
দেহের সম্বন্ধ বলে, এতদিন যে সকলে,
হৃদয়ের ভালবাসা ছিলগো আমার,
এইবার অবসান হউক তাহার।
তোমার ভকত যারা, আত্মীয় বান্ধব তারা,
নব জীবনের এই নব স্নেহ ডোরে,
দৃঢ়রূপে চিরকাল বদ্ধ রাখ মোরে ॥
যেমন গঙ্গার জল, সিন্ধু মাঝে অবিরল,
আপনারে মিশাইয়া দিয়ে কুতূহলে,
মিশে যায় যাবতীয় নদ নদী কুলে।
তেমতি তোমার পায়, মতি রাখি সর্ব্বথায়,
সর্ব্বভক্তাশ্রয়ণীয় তুমি দয়াময়,
আপন করিয়া পাব সর্ব্ব ভক্তচয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনী
ধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজ সুরার্ত্তি হরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে।
হে শ্রীকৃষ্ণ! তব পদে করি নমস্কার
অর্জ্জুনের সখা তুমি, হিতকারী তার।
অবনীর দ্রোহকারী, ক্ষত্রিয়ের হত্যাকারী
অক্ষীণ প্রভাব তব, কামধেনু জাত,
নিখিল ঐশ্বর্য্য তব করতলগত।
গো ব্রাহ্মণ দেবতার, দুঃখ ভয় নাশিবার,
জন্য, আবির্ভূত তুমি ধরণী উপর
চরণে প্রণাম তব ওহে যোগেশ্বর,
ভগবান্ অখিলের গুরু হও তুমি,
বারবার তোমার ও চরণে প্রণমি।

সমাপ্ত।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর

'উপাসনা পটল,' 'কুঞ্জবর্ণন,' 'গুরুশিষ্য সংবাদ,' 'চন্দ্রমণি', 'চমৎকার চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা', 'চিন্তামণি,' 'রসভক্তি চন্দ্রিকা' 'রাগমালা,' 'রসসার,' 'সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা,' 'সদ্ভাব চন্দ্রিকা,' 'স্মরণ মঙ্গল', 'সাধনভক্তি চন্দ্রিকা', 'সাধ্য-প্রেম চন্দ্রিকা,' 'সূর্য্যমণি', প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও পদকর্ত্তা।

জন্ম—বর্ত্তমান রামপুর বোয়ালিয়া নগরের ছয় ক্রোশ ব্যবধানে গড়ের হাট নামক পরগণা মধ্যে পদ্মা নদীর তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে খেতরী নামক গ্রামে, মজুমদার উপাধিধারী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক একজন নৃপতি বাস করিতেন। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে এবং নারায়ণী দাসীর গর্ভে অনুমান ১৫৩১ কি ৩২ খৃঃ মাঘী পূর্ণিমায় গোধূলি লগ্নে (মতান্তরে, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু— খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে পরলোক গমন করেন।

শৈশব—নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও শৈশব হইতে বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে (২০শ বিলাস) লিখিত আছে—

'নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তিঁহো হয়, ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥
সে তিনের অপ্রকটে, এ তিনের আবির্ভাব, সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব॥'

ফলতঃ, নরোত্তম যে শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাঠ্যাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পারিষদগণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও ব্যাকুল হইতেন। ক্রমে তিনি বৃন্দাবন ধামে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; অচিরে তাঁহার সে সুযোগও উপস্থিত হইল। নরোত্তমের পিতা, রাজকার্য্য উপলক্ষে একদিন অকস্মাৎ গৌড়ে গমন করিলে, ইহাই শুভ অবসর বুঝিয়া নরোত্তম বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে গৃহত্যাগ করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তরুণ বয়স্ক (১৮ কি ১৯ বৎসর) রাজকুমার, ভোগ সুখে জলাঞ্জলী দিয়া পদব্রজে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তমকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনবাসী যাবতীয় মহানুভবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। এই সময় লোকনাথ গোস্বামী নামক একজন 'পরম বিরক্ত' গোস্বামী বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরোত্তম, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। তদনন্তর 'যৈছে সেবা করে তাঁহা কহনে না যায়। গোসাঞী প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায়॥' 'একদিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া। মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষামন্ত্র দিয়া॥' ('নরোত্তম বিলাস')। দীক্ষা দানের পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি কহিলেন, 'তাহাই করিমু প্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে পদ দিয়া কহ নরোত্তম মোর'॥ (অনুরাগ বল্লী)।

দীক্ষা গ্রহণের পর নরোত্তম, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অচিরে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গোস্বামী মহোদয় এই নিমিত্ত, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে 'দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়।' তৎপরে লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে নরোত্তম ঠাকুরের সহিত

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিচয় হইলে উভয়ে রাঘব গোস্বামীর সহিত সমগ্র বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়া আসেন। ইহার অত্যল্প কাল পর শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের (দুঃখী কৃষ্ণদাস) মিলন হয়। এখন হইতে এই তিন জন প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

• শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী এই তিন জনকে গৌড়ভূমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রকালে, 'লোকনাথ গোস্বামী স্নেহাবিষ্ট হৈয়া। নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া॥ নরোত্তমে করিতে কহিলা বার বার। শ্রীবিগ্রহ সেবা সঙ্কীর্ত্তন সদাচার॥ * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে। শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে॥" শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার। সর্ব্বমতে তোমারে সে এ দোঁহার ভার॥" (নরোত্তম বিলাস)। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরকে আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং সতত সাত্ত্বিকভাবে অবস্থান করিয়া ভজনানন্দে কালযাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ পঞ্চকোটের দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী মালিয়াড়ার নিকট গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হইলে তথা হইতে রাত্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের অধীন দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনায় তিন জনেই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আপাততঃ এই গাড়ীর কোন সন্ধান হইল না। এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ, নরোত্তম বাটী গিয়া দুই জন লোক সমভিব্যাহারে শ্যামানন্দকে তাঁহার দেশে পাঠাইয়া দিবেন। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, জীব গোস্বামীর আদেশবশতঃ নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বিদায় দিয়া একক গ্রন্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুর অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে শ্রীনিবাসকে পরিত্যাগ করিয়া শ্যামানন্দের সহিত খেতরী প্রত্যাগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের জনক জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন এখন হইতে নরোত্তম সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন। কিন্তু উদাসীন যুবক তাঁহাদের সে আশা পূরণ করিতে অসমর্থ; সুতরাং সুমিষ্ট বচনে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বনের কথা বিবৃত করিলেন, তিনি একবারে দেশত্যাগ না করিয়া তাঁহার দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামীর আদেশমত রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী 'ভজন কুটীর' নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভজনানন্দে

কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র দিনান্তে একবার স্নেহময়ী জননীর চরণ দর্শনার্থ রাজবাটী আগমন করিতেন। ঠাকুর মহাশয় এইরূপে সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বন করিলে তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ ভজন কুটীরে, আচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে অপহৃত গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরে জীব গোস্বামীর আদেশমত ঠাকুর মহাশয় দুইজন লোক সম-ভিব্যাহারে শ্যামানন্দকে তাঁহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরমহাশয় তদবধি কিছুদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইতে বিছিন্ন হইয়া ক্ষুণ্ণমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল নবদ্বীপ, নীলাচল প্রভৃতি তীর্থ-দর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া যথাক্রমে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ ও তৎস্থানের মহানুভব গোস্বামীমহোদয় গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে যাজপুর, গোপীবল্লভপুর এবং নৃসিংহপুরে আগমন করেন; শেষোক্ত স্থানে শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন হয়। এখানে দুই চারি দিন অবস্থানের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীখণ্ডে উপনীত হন। শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাটি যাজীগ্রামে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঠাকুর-মহাশয় ইতি পূর্ব্বে শ্যামানন্দকে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরীতে শুভাগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন; এখন তিনি আচার্য্যপ্রভুকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যাজিগ্রাম হইতে ক্রমে কাটোয়া, একচক্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া খেতরিতে প্রত্যাগমন করেন।

খেতরীতে প্রত্যাগমনের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহগণের উপযোগী মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভুর জন্মতিথি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহামহোৎসবের সহিত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিবার বাসনা করিলেও শ্রীআচার্য্য প্রভুর অপেক্ষায় মহোৎসবের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; এমন সময় ঠাকুর মহাশয় বুধরী গ্রামে আচার্য্য প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপনীত হইলেন। এইস্থানে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত আজীবন "সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। কবিরাজ মহাশয় মহোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র করিলে,' রাঢ়, বঙ্গ, উৎকল ও গৌড়ভূমে 'নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড

প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় গৌরভক্তকে স্বগণসহ মহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত, তাহার অনুলিপি প্রেরিত হইল। তাহার পর আচার্য্য প্রভুর আদেশ-মত ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র কবিরাজ সমভিব্যাহারে অগ্রেই খেতরীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা সময়ে আচার্য্য প্রভু খেতরীতে মহোৎসবের বিপুল আয়োজন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে নানা দেশ হইতে দলে দলে অসংখ্য বৈষ্ণব মোহান্তগণ খেতরীর মহোৎসব দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য শুভাগমন করিতে লাগিলেন—নির্দ্দিষ্টদিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, খেতরী রাজধানী, অভ্যাগত বিপুল জন-সঙ্ঘের আনন্দ-কোলাহলে ততই মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি জানি, কাহারও কোনরূপ ব্যক্তিগত অসুবিধা ঘটে, এই আশঙ্কায় সন্তোষদত্ত স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার, পরিচারক প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইল; রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, ব্যাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ, ইহারা স্বয়ং বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণব মোহান্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী, পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ও জামাতা মাধব আচার্য্য, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপাল মিশ্র, চৈতন্য-ভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস, পদকর্ত্তা বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাস, হৃদয় চৈতন্য, কৃষ্ণদাস, শ্যামানন্দ, রঘুনন্দন সরকার, লোচনানন্দ, যদুনন্দন, মনোহর দাস, পরমেশ্বরী দাস, গোকুল দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা মহানুভববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠকগণ এই অভূতপূর্ব্ব মহামহোৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ "নরোত্তম বিলাস" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমীর দিন হইতে বাদ্যোৎসব আরম্ভ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রভাতে নবনির্ম্মিত মন্দিরষটুকের প্রাঙ্গণ চত্বর বিচিত্র ভূষায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বিচিত্রচন্দ্রাতপতলে যাবতীয় বৈষ্ণব-মোহান্ত যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন পরিগ্রহ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সুসম্পন্ন করিলেন। এইরূপে গৌরাঙ্গ (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ চৈতন্য দেব), বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধারমণ এই ষড়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে ঠাকুর মহাশয়, মোহন্তগণের অনুমতি অনুসারে দেবীদাস, গোকুলদাস

গায়ক ও সুমধুর বাদকগণ সমভিব্যাহারে স্বরচিত সুমধুর পদাবলী গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর মহাশয়, সুসম্বদ্ধ নবপ্রণালীসম্মত এক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গড়ের হাট পরগণায় উদ্ভব বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন প্রণালী 'গড়াণহাটি-কীর্ত্তন' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত সুমধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার এই নূতন সুর তাল সমন্বিত কীর্ত্তন প্রণালীর প্রশংসা সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইয়া গেল। মহোৎসবের পর দুই দিনকাল বৈষ্ণবগণ খেতরীতে অবস্থান করিয়া স্বস্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেবল মাত্র আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি আরও কিছু দিন খেতরীতে অবস্থান করিলেন। জাহ্নবা দেবী পঞ্চমীর দিন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস এবং জামাতা মাধব আচার্য্য সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তদনন্তর একমাস পর আচার্য্য প্রভু ও শ্যামানন্দ, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

'এমন ভক্ত সমাগম জনতা, এমন নৃত্য-কীর্ত্তন সমারোহ বৈষ্ণব সমাজে কোন মহোৎসবে হয় নাই, হইবে কি না জানি না। এই উৎসবে নৃত্য কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। যাহারা প্রথমে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল, তাঁহারাও প্রেমাশ্রুসলিলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। শত শত দুষ্ক্রিয়াসক্ত দস্যু, তস্কর, পাষণ্ড নরোত্তমের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল।' (শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত পৃঃ ২২১)

'এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যে একটী পথপ্রদর্শক আলোক স্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণব মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৫)

মহোৎসবান্তে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত, খেতরী হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার স্বরচিত 'ভজনস্থলী' নামক নির্জ্জন স্থানে নানাবিধ

ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ভজন সাধন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সমভিব্যাহারে আচার্য্য প্রভুর বিষ্ণুপুরের মহোৎসবে গমন করিয়াপ্রত্যাবর্ত্তন কালে পুনরায় নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আসেন।

'ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা-মন্ত্র লইতে আসিত। সৎকুলজাত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার মন্ত্রশিষ্য হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ কুলোদ্ভব ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্য সাধুতা ও মহত্ব দর্শনে তাঁহাকে আর কেহ সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিত না। (শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত)

গেয়াস গ্রাম নিবাসী শিবানন্দ আচার্য্যের পুত্রদ্বয় হরিনাম ও রামকৃষ্ণ, গাম্ভীলা গ্রামবাসী সুপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ও দিগ্বিজয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী এবং রাজা নরসিংহ, চাঁদরায়, হরিশ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি রাজা জমিদারগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অনেক দস্যু তস্করও ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্য প্রভাবে নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য প্রভুর সহিত বৃন্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন; আচার্য্য প্রভুও কিছু দিন পরে অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থার কথা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,

"গৌরাঙ্গ সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর, নরহরি মুকুন্দ মুরারী।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর, এসব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা, তাহা মুঞি না পাই দেখিতে॥
তখন না হল জন্ম, না বুঝিনু সেই ধর্ম্ম, এই শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, কৈলা কি মধুর কেলি; বৃন্দাবন ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন, আঁধল হইল এনা আখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ, আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ, কথা শুনি যুড়াইত প্রাণ।

তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল, দুঃখে জিউ করে আন চান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনে নাহি আশা।
অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই, ধিক, ধিক নরোত্তম দাস।"

অনন্তর তিনি সশিষ্য গাম্ভীলা গ্রামে গিয়া কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে স্বইচ্ছায় গঙ্গালাভ করেন। প্রতি বৎসর খেতুরীতে এতদুপলক্ষে একটি সুবৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময় অসংখ্য বৈষ্ণব সমবেত হইয়া খেতরীতে মহোৎসব করিয়া থাকেন।

দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটী অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

'ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার অতি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন। অধিক কি, মণিপুরের রাজারা তাঁহার পরিবার। (নরোত্তম চরিত)'

সাহিত্য-সেবা—ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত হইলেও জনসাধারণের জন্য তিনি সরল বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং ভজন মার্গের পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত বাণী দ্বারা সংসারাসক্ত মানবহৃদয় সঞ্জীবনী অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইলে এক সুমধুর ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় গ্রন্থই প্রত্যেক নরনারীর আদরের বস্তু। ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র মত মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তদ্রবকারী প্রার্থনা সাহিত্য জগতে অতি বিরল। এই প্রার্থনা গুলি সাধারণতঃ, প্রবর্ত্ত দশা (ক্রিয়ারম্ভ,) সাধক দশা (ক্রিয়া সাধন), ও সিদ্ধদশা (সেবা অভিলাষ) সাধকের এই তিন দশার পর্য্যায় অনুসারে বিরচিত। এই স্থানে কয়েকটি মাত্র প্রদত্ত হইল—

১

"হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী। নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে খাইব করিয়া মাধুকরী॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি। কবে যমুনার জল খাব কর পূরি॥
পরিক্রম করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশী বটে। কবে ব্রজে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম দাস কয় করি পরিহর। কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়। কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়॥ হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥ শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া। বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারী, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥ মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস। তরুমূলে বসি ইহা, শুনি যুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঞাব দিবস॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে। দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এ মতি হইবে কত দিনে॥

৩

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব॥ সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন, সে ধূলি লাগিব কবে গায়। প্রেমে গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকিব হা রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে খাব করপুটে তুলি॥ আর কি এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দেব তায়। বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, পড়িয়া রহিব কবে তায়॥ কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, আশা করে নরোত্তম দাস॥

৪

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবন মরণে আর গতি নাহি মোর॥ কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন॥ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥ গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক একটী পদ উদ্ধৃত হইল—

"কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে, বরবিধু জিনিয়া বয়ান ॥ দুটি আঁখি নিমিখ মুরখবর বিধিয়ে, না দিলে অধিক নয়ান ॥ হরি হরি কেনবা জনম হইল মোর। কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া না কেনে কৈলাম ভোর ॥ ধ্রু ॥ আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী কুসুম সুরঙ্গ। হেরি গোরা মুরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদন তরঙ্গ ॥ অনুক্ষণ প্রেমভরে সে রাঙ্গা নয়ন ঝরে, না জানি কি রূপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নদীয়া নাগরী, সেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় গদাধর বাম পাশ। মোহে নাথ অঙ্গীকরু, বাঞ্ছা কলপ তরু, কহে দীন নরোত্তম দাস।"

'হাট পত্তন' ক্ষুদ্র কবিতা হইলেও বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি ঠাকুর মহাশয়ের পরিণত বয়সের রচনা। তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় শেষবার বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি যখন একাকী অবস্থান করিতেন, কাহারও সহিত বড় বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন না—'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি সেই সময় রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঠাকুর মহাশয় 'নৈষ্ঠিক ভজন' 'রাগের ভজন' প্রভৃতি ভজনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, না হইবে অনুরক্ত, শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। ব্রজ জনের যেই মত, তাহে রবে অনুগত, এই সে পরম তত্ত্বধন ॥ প্রার্থনা করিবে সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ। একান্ত করিবে মন, ভাব রাঙ্গা শ্রীচরণ, গ্রন্থি পাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥ * * জল বিনা যেমন মীন, দুঃখ পাপ আয়ুহীন, প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত। চতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥ মকরন্দ ভ্রমে যেন, চকোর চন্দ্রিমা হেন, পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি। অন্যরে না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এই মত প্রেম ভক্তি রীতি।"

অন্যত্র—

"জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ, নানা মতে হইয়ে অজ্ঞান। তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি, প্রেম ভক্তি পরম কারণ ॥ জগৎব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুর মুরতি সার লীলা। এই তত্ত্ব জ্ঞানে যেই, পরম

সুহৃৎ সেই, তার সঙ্গ করিব একলা॥ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাহে বহু মনতুষ্ট, ভজ তাতে ব্রজ-ভাব হয়ে। রসিক ভকতি সঙ্গে, রহিবা পিরীত রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিবে॥ আর কথা না শুনিব, আর কথা না কহিব, সকলি কহিব পরমার্থ। প্রার্থনা করিব যথা লালসা হে কৃষ্ণকথা, ইহা বিনু সকলি অনর্থ।”

বাহুল্য ভয়ে, ঠাকুর মহাশয় বিরচিত অপরাপর গ্রন্থ হইতে আর উদ্ধৃত হইল না। 'রসসার' গ্রন্থে রাগিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ভাগবত ধর্ম্ম

বর্ত্তমান যুগের যাহা যুগধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র সমূহে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ কথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে তাহার ধ্বংস করা হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাহাদের সার্থকতা ও চরম লক্ষ্যরূপে যে তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সেই তত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই পরম তত্ত্বের নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবানই ইহার বিষয়। এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে।

যতক্ষণ সূর্য্যদেব উদিত না হয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া মানবের যে আলোকের প্রয়োজন তাহা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা পলায়ন করে, তাহা নহে, তবে সূর্য্যের উজ্জ্বল আভায় মলিন হইয়া পড়ে ও সূর্য্যের আলোক যাহার চক্ষুতে লাগিয়াছে সে আর নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, বরং নক্ষত্রগণের দ্বারা এতক্ষণ কোন প্রকারে যে কার্য্য সাধিত হইতেছিল, সূর্য্যালোকে তাহা সুশৃঙ্খলায় ও সুন্দররূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যদ্যপি এমন কেহ থাকেন, যিনি সূর্য্য উদিত হইলেও তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা হইলে নক্ষত্র-কিরণেই তাঁহাকে নিজের কার্য্য চালাইতে হইবে। সেইরূপ প্রেমের কথা জগতে প্রচারিত হওয়ার পর, একমাত্র যিনি প্রেমদাতা তিনি মানবের দ্বারে বিচরণ করিয়া

যাচিয়া যাচিয়া নির্ব্বিচারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও যদি কেহ এই প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপাসনা করিবেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল ও সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত তাঁহাদের নিকট এই প্রেমধর্ম্মের কথা বর্ণনা করা একেবারে নিরর্থক। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপায় এই প্রেমের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, তাঁহারা এক-শ্রেণীর নূতন জীব। তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চাহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহেন না, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একমাত্র প্রেমাস্পদ প্রেমদাতা শ্রীভগবান যেমন তাঁহার এই বিশ্বলীলায় নিজের অচিন্ত্য ও অননুমেয় মাধুর্য্য রাশি বিতরণ করিয়া নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণুটি পর্য্যন্ত অমৃতায়মান করিবার জন্য নিত্য ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতায় তাঁহার অধরে যেন আর সুধারাশি ধরিতেছে না, সর্ব্বদা উথলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে, আর তিনি সেই উচ্ছ্বলিত অধর-সুধা বংশীরবের সাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, তাহার ধর্ম্ম যে শব্দ, সেই শব্দকে আশ্রয় করিয়া নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় করিতেছেন, এই জন্যই সেই বংশীবাদনকারী হরি ভূতভাবন।

কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্রীভগবান বা তাঁহার ভক্ত ছাড়া আর কেহ কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন না। আত্মবিসর্জ্জনেই সুখ, আত্মরক্ষায় নহে, সুখবাঞ্ছা না থাকাই, কোটিগুণ বা অমিত সুখলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা কেহ কাহাকেও তর্ক দ্বারা বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে মুখ্যরূপে এই প্রেমের কথাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে শৌণকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত কর্ত্তৃক কথিত শ্লোক কয়েকটি আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকে পূর্ব্বের কথাই দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥”

ধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানের লীলা-কথায় যদ্যপি রুচি না হয় তাহা হইলে সেই ধর্ম্মবিষয়ক শ্রম বিফল শ্রম মাত্র। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে, যে ধর্ম্মের লক্ষ্য মোক্ষ তাহাও বিফল-শ্রম। 'কেবল' পদের দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা ক্ষয়শীল

'এব' পদের দ্বারা তাহার নিরাকরণ হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করেন তাঁহাদের এই সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে। (অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি) বস্তুতঃ তাহা হয় না, ইহাই প্রতিপাদন করার জন্য "হি" এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আসল কথা এই, যে ইহলোকে যেমন কর্ম্মের দ্বারা অধিকৃত লোকের (সম্পদের) ক্ষয় হইয়া থাকে, পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভক্তির অনন্যতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বশ্লোকে ও বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই প্রতিপাদিত হইল। বর্ত্তমান শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় উপসংহারে বলিলেন "শ্লোকদ্বয়েন ভক্তির্নিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে!" অর্থাৎ জীবের যাহা একমাত্র কল্যাণ তাহা ভক্তিদেবীই অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া সাধন করিয়া থাকেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে আমাদের কল্যাণ করেন তাহাতে তাঁহারা ভক্তিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাৎ রাজরাজেশ্বরী শ্রীভক্তিদেবী তাঁহাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্ভব করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন, যে শাস্ত্রকার "এব" শব্দের দ্বারায় প্রবৃত্তি লক্ষণ যে কর্ম্ম তাঁহার ফলে যে স্বর্গাদি লোক তাহার ক্ষয়িষ্ণুত্ব প্রতিপাদন করিলেন। "হি" শব্দের দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্ম্মজিত লোকসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। আর "কেবল" এই অব্যয় শব্দটির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে কেবলমাত্র নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ যে ধর্ম্ম তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান হয় তাহা নশ্বর। "হি" শব্দের দ্বারা বেদের একটি প্রমাণের কথা সূচিত হইয়াছে, তাহা এই—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এইবার আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা অনুসারে এই শ্লোকটির মর্ম্ম আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যে যুগধর্ম্ম তাহার তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিব।

রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত পরধর্ম্ম কি তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া

বলিলেন, যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি জন্মায় তাহাই পর ধর্ম্ম। এ প্রকারের উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইত না। পূর্ব্বে বলা হইত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই পর ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে কিছুই নহে এমন কথা বলেন নাই, তবে অবশ্য এ কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উদ্দেশ্য নহে, উপায়। উদ্দেশ্য এই প্রেম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধি নিষেধ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম" যাহা মানবের প্রকৃতির গূঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যদ্যপি উপলব্ধি হয় এবং যদি এই উপলব্ধি হরি কথায় যে আত্যন্তিক অনুরাগ, সেই অনুরাগের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাঁহা হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সার্থক, নতুবা কতকগুলি নিয়ম কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন করিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাটা আরও স্পষ্টরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাঁজি পুঁথিতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই আমি পালন করিতেছি, কিন্তু আমার বড় অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা দুখানি সর্ব্বদা বাড়াইয়াই আছি, অন্য সকলে আমাকে প্রণাম না করিলে ক্রোধ হয়। যত দিন যাইতেছে বিষয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে একেবারে কামড়াইয়া ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার তেমনি ভোগলালসা, অন্য বর্ণের লোক যদ্যপি কোন ভাল কথা বলে বা ভাল কাজ করে তাহা সহ্য করিতে পারি না, মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথা ও ভাল কথা বলার অধিকার আমাদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ আমাদের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পুঁথির বচন আবৃত্তি করিয়া তাহা আদায় করিয়া আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকট বড় হইব, কিন্তু ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়ীত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপস্বী হইয়া পরার্থে জীবন যাপন করা তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের অবস্থা হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঐ যে স্বধর্ম্মপরায়ণতা উহা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম। অন্ধভাবে উহা পালন করিলে লোক ঠকাইয়া দুপয়সা রোজগার হইতে পারে কিন্তু উহাতে অহঙ্কার বাড়িয়া অমঙ্গলই হইতেছে।

আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার আলোচনা করিতে গিয়া এতগুলি কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় এমন একটি কথা আছে, যাঁহা প্রথমটা পড়িয়া স্থূলদর্শীর মনে হয় যে তিনি

বুঝি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমস্তটুকু আলোচনা করিলে বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, তবে পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে অপব্যবহারের কথা বলা হইল, যাহা নামে ধর্ম্ম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় তিনি বিশেষভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি সেরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন।

আসল কথা এই যে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রকাশিত হইবে। তখন কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া মানব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাত্বিকগণের অনুষ্ঠেয় যে ভাগবত ধর্ম্ম তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিতেছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম (শাস্ত্রে উপদিষ্ট কর্ত্তব্য) তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরি কথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিস্ফল পরিশ্রম মাত্র। এই স্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরোধর্ম্মঃ এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ" তাহা হইলে তিনি বলিতেছেন 'যদি রতি না জন্মায়'—তাহা হইলে।

যাঁহারা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করেন, তাঁহারা যগুপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে আর্দ্র করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, প্রেমময়, করুণাময়, তাঁহার নামগুণ লীলা প্রভৃতি কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে মানবচিত্তে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্টা করুন। যদি প্রেমের উন্মাদনা আসে এবং সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়া তাহার অধীন বা পরিপোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা তাঁহারা বিফল চেষ্টা করিয়া নিজের ও অপরের ক্ষতি করিবেন।

প্রেম হৃদয়ে না জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোককে ঘৃণা করিবে। ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। উচ্চ বর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের সম্বন্ধ কি ? উচ্চ বর্ণের লোকেরা পরার্থপর হইয়া নিম্নবর্ণের লোকের যাহাতে

কল্যাণ হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন, পিতা যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া পুত্রের পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ। উচ্চ বর্ণের লোকেরা, আমরা উচ্চবর্ণ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া (তথা কথিত) নিম্নবর্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন, আর জীবনে 'পয়সা পয়সা' করিয়া স্বার্থান্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কাজের মধ্যে একবার কোশাকুশি লইয়া ঠক্ঠক্ করিয়া লোক ঠকাইয়া ছানা মাখন জোগাড় করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও সর্ব্বনাশ, সমাজেরও সর্ব্বনাশ, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি ছাড়া মানুষ পরার্থপর হয় না, হইতে পারে না, প্রেমছাড়া পরের জন্য খাটিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির আদর্শ দেশে সর্ব্বাগ্রে ও মুখ্যরূপে প্রচার হওয়া দরকার।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় তিনি বলিতেছেন যে মূলেই ভক্তি থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম বিফল। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন যে কেন, এই প্রকারের শাস্ত্র-বাক্য আছে যে

"অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং্বা যদৃচ্ছয়া॥"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিষ্পাপ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অহেতুকী বলা যায় কিরূপে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, এই শ্লোকে বলা হইল নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তিরও যে জনক তাহা বলা হয় নাই। কারণ "যদৃচ্ছয়া" এই পদটি যে রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধা-ভক্তির প্রবেশ হয় তাহা হইলেই নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা পাইবেন, নতুবা নহে। এই-বার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সকল কথার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন "পরম ধর্ম্মাদন্যো যো বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বনুষ্ঠিতো নিষ্কামোঽপি ধর্ম্মো বিশ্বক্সেন-কথাসু রতিং প্রীতিং নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদি ইতি" অর্থাৎ 'যদি' এই পদটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ যে পরধর্ম্ম তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা কখনই বিফল হইবে না। এই যে শ্লোক ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মনে করুন আমি হরিকথা

শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ যথারীতি করিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে এই শ্লোকের দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমার বিফল পরিশ্রম হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহা বিফল পরিশ্রম নহে, বোধ হয় যথারীতি শ্রবণ কীর্ত্তন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপরাধ দূর কর, শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি পরিত্যাগ করিও না, ইহাকে পণ্ডশ্রম মনে করিও না, ইহা হইতে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। এই যে পণ্ডশ্রমের কথা বলা হইল ইহা ঐ পরধর্ম্মের ব্যতিরিক্ত যে বর্ণাশ্রমাচার তাহারই সম্বন্ধে জানিতে হইবে, সে ধর্ম্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ও নিষ্কাম হয় তাহা হইলেও হরিকথায় রতি না হইলে বিফল জানিতে হইবে'।

পূর্ব্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। যাঁহারা কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের আচার গুলিকেই মুখ্য বলিয়া ধরিয়া আছেন, তাঁহারা হয় ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অন্যান্য কথার সহিত মিল করিয়া দেখা দরকার। নিম্নের লিখিত কথাগুলি সকলে বেশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে বড়ই ভাল হয়।

আমরা ধর্ম্ম করিতেছি। কি করিতেছি ? না, মালা লইয়াছি; তিলক করি, তিনবার স্নান করি, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব বিচার, খুব আঁটাআঁটি, মন্ত্র জপ করি, স্তব পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু কার্য্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া যাইতেছি, মনের বা হৃদয়ের কোনরূপ অনুশীলন হয় না। দোকান করিয়াছি, কি করিয়া দোকান চলিবে, এ জন্য তন্ময় হইয়া ভাবি, ছেলেটির অসুখ হইয়াছে হৃদয় উদ্বেগে কাতর হইয়াছে, এ সকল ব্যাপারে মানসবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন আছে কিন্তু ধর্ম্ম ব্যাপারটা একটা শারীরিক ব্যাপার মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার দুই পক্ষের প্রমাণাদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কত চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সত্যাসত্য বা হিতাহিত বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করি, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহস করিয়া সত্যান্বেষণ করিতে পারি না। তখন মনে করি এ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণা করার দরকার নাই। এ জায়গায় মানসবৃত্তির অনুশীলন করিতে ভয় পাই। একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করা যাউক সে ধীর ভাবে তাহা শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, ও চিন্তা করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে, সে জায়গায় সে অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত

একটা মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের কথা মানিয়া লইতে পারে না। তাহার মানসিক বৃত্তির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে, তাহার ষোল আনা খরচ করিয়া সে প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অন্যরূপ, এখানে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। একজন লোক তাহাকে একটা কথা শিখাইয়া দিয়াছে, গোটাকতক কার্য্য বলিয়া দিয়াছে সে তাহা করিয়া যায়, কেন করে, ইহা করিয়া কি হইবে তাহা সে ভাবেও না, ভাবিতে চায়ও না। কেন এরূপ হয়। সাংসারিক ব্যাপারে বিনা বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে না, পরমার্থ বিষয়ে সে বিচার করে না কেন? ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর এই যে সে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থে বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। তবে যে ধর্ম্ম করে, ইহা কতকটা সংস্কারের বশে, কতকটা জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য, আর কতকটা 'কি জানি কিসে কি হয়?' এই প্রকারের সন্দেহ নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়া জানে, ইহলোকে তাহার স্বার্থ আছে, পরমার্থকে সে জানে না, মানেনা, কাজেই তাহাতে তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্যই ধর্ম্ম একটা শারীর ব্যাপার।

কর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক স্থানেই তাহা দেখান হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায়, ও বিপ্র পত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষায় এই তত্ত্ব অতীব বিশদভাবে বলা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ইহার প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞানমার্গে বলা হয়, "গঙ্গাসাগরেই গমন কর, আর ব্রত পরিপালন বা দানই কর, জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না।" অর্থাৎ মানুষ তোঁ কেবল শরীর নয়, যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতি লাভ করিবে।

ভক্তি ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ। কেবলমাত্র জানিয়া কর্ম্ম করিলেই হইবে না। মানবের সত্তা ভাবময়, ভাবুক হইতে হইবে, যিনি পরমার্থ সত্য তিনি রসময়, ভাব না থাকিলে রসের আস্বাদন হয় না। • • •

পূর্ব্বে আমরা নবধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহা বর্ণনা করিয়াছি। সেখানে দেখান হইয়াছে যে তিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে স্মরণকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্ত্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূজার সময় যেমন মন্ত্র পড়ি, আর মন বাজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়, ভক্তি সাধনায় তাহা হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদির যে শ্রেষ্ঠতা বলা হইল, তাহা কেবল

কাণে একটা আওয়াজ বাজানো, বা জিহ্বায় একটা শব্দ করা মাত্র নহে, তাহার মূলে স্মরণের দ্বারা একাগ্র হইয়া ভক্ত তাঁহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতিতে এই প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মত্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে, বিশেষতঃ যদি ভক্ত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সাধনার এমন সুগম ও সুন্দর পথ আর নাই। তাহার পর এই সাধনায় আগে ভগবানকে জানিয়া লইয়া শ্রবণাদি সাধনভক্তির কার্য্য আরম্ভ হইল। ভগবানকে মানিয়া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত হইল, বিশ্বকল্যাণের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, সিদ্ধি, ভুক্তি বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিল না, একমাত্র বাসুদেব পরিতোষণই লক্ষ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত। ভক্ত সাধুগণ আমাদের দুর্ব্বল ও সমাজ বিপ্লবে জর্জ্জরীভূত অথচ তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য জীববৃন্দের জন্য এই যে অহেতুকী ভক্তির সাধন পথ, এই যে প্রেমের ধর্ম্ম দিয়াছেন, ইহাই আমাদের একমাত্র কল্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে যদি দুই তাল রাখিতে কেহ না পারে তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া আজকালকারদিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাধনা করাই নিরাপদ, ইহাই যেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোক অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক যগুপি রাজভক্ত হয় তাহা হইলে ভূমিকর্ষণ করিয়া লাভবান হইতে পারে, নতুবা সে পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল সিঞ্চন করিল, শস্যও হয়ত হইল, কিন্তু রাজা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ক্ষেত্র অপরকে প্রদান করিলেন ; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজপ্রীতি উৎপাদন করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন,—"তথৈব হরৌ ভক্তিং বিনা প্রবৃত্তনিবৃত্তধর্ম্মফলয়োঃ স্বর্গাদিজ্ঞানযোরলাভাৎ শ্রমঃ।" "যথা চ কৃষৌ প্রীত্যনুরোধাদেব নৃপে প্রীতিঃ নতু বস্তুত স্তথৈব ধর্ম্মে প্রীত্যনুরোধাদেব তৎকথাসু প্রীতির্নতু বস্তুত ইতি বিবেচনীয়ং।" এই উক্তির দ্বারা বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরাভক্তির যে সাধন তাহার সমন্বয় করা হইয়াছে। ধর্ম্মে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্ম্মের দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় হয়। কৃষিতে কৃষকের প্রীতি আছে কারণ কৃষির দ্বারাই তাহার জীবিকার্জ্জন হয়। হরি কথায় যে রতি তাহা প্রথমাবস্থায় এই ধর্ম্মে প্রীতির অনুরোধে হয়। এই প্রকারে শ্লোকটির ব্যাখ্যা

করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন তাহা ঔপাধিকী, তাত্ত্বিকী নহে। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা জানেন যে হরি কথায় রতি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বিফল, এই জন্য হরি কথায় রতি করেন। যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারা ইহা না জানায় তাঁহাদের স্বধর্ম্মাচরণ ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র হয়।

পূর্ব্বের তত্ত্বটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। "স্বধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়? জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ স্বীকার না করিলে স্বধর্ম্ম বলিয়া একটা কথাই থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মের বিধান ক্রমে জীবমাত্রেই ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অস্ফুট সচ্চিদানন্দ জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রস্ফুট হইতেছে। আমাদের অতীত ইতিহাস বা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমষ্টি আমাদিগকে ক্রমবিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট সোপানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে সোপানে আছি ঠিক তাহার পরের সোপানে যাইতে পারিব, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। সুতরাং 'স্বধর্ম্ম' পালন মানবের ক্রমবিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে ইহাই আমার স্বধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সকলেই একরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সমাজ যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে তাহার মধ্যেও অনেক শূদ্র আছে, আবার সমাজ যাহাকে শূদ্র বলে তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাড়া বর্ণসঙ্করের তো কথা নাই। সুতরাং পূর্ব্বে যে বিভাগ শিশু মানবাত্মার পক্ষে অশেষ রূপে হিতকর ছিল, এখন অনেক স্থলেই তাহা সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণই বা করা যায় কিরূপে? ইহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল হইবে এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্গিতে গিয়া অনেক সময়ে দেখা যাইতেছে, ভাল তো হইল না বরং আরও খারাপ হইয়া গেল। বর্ণবিভাগ ভাঙ্গিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখা গেল জন্মগত আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে ধনগত আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যাহা ছিল তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই তো অবস্থা।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের মত সকলে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম, ধর্ম্ম এই দুইভাগে বিভক্ত। আমি ক্রমবিকাশের যে সোপানে দাঁড়াইয়াছি সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে

হইলে আমাকে যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাই আমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম অহংনিষ্ঠ। এই স্বধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পৃথক। যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক, যিনি যে শ্রেণীতে পড়েন তিনি সেই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর পরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন ইহাই স্বধর্ম্ম। শ্রেণী বিভাগ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরধর্ম্ম শব্দের অর্থ ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র সত্য জানিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই চরণ-পদ্ম পাইবার জন্য যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম পরধর্ম্ম। পরধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম যেন যাবতীয় স্বধর্ম্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, (Lowest Common multiple) পরধর্ম্মই ধর্ম্ম সাধনার চরম অবস্থা, সকল অধ্যাত্ম সাধনার পরিণতি। স্বধর্ম্মের গম্য স্থান পরধর্ম্ম। সমুদ্র মধ্যে রাত্রিকালে নাবিক যদ্যপি পথ হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে সে ধ্রুব-তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমরা যখন স্বধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্ম্মকে আদর্শরূপে পুরোদেশে রক্ষা না করিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি-যুগ আরম্ভ হইলে পর এই স্বধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হয়, অবশ্য তাহার পূর্ব্ব হইতে এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা যেন অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, এই সময়ে ভাগবত শাস্ত্র অন্ধকার রাত্রির অবসানে সূর্য্যদেবের মত সমুদিত হইলেন। এই ভাগবত ধর্ম্ম ঠিক সূর্য্যের মত, কিন্তু আমাদের যেন চক্ষু ছিল না, তাই এই সূর্য্যকিরণেও নিজের কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া আমাদিগকে চক্ষু দিলেন, ভাগবত ধর্ম্ম কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিতেছেন।

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎ কার॥
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগে আমরা এই ভাগবত ধর্ম্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরও প্রকৃত মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার এই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে, এই পুনরুত্থানের মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত

আছে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিলেই ভাগবত ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুঝি তাঁহারা যে ঠিক সেভাবে বুঝিতেন না ইহা নিশ্চয়; আবার ইহাও নিশ্চয় যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ কর্ত্তৃকই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝিলেই আমরা শ্রীভাগবত বুঝিব, শ্রীভাগবত বুঝিলেই আমরা যুগ ধর্ম্মের পরিচয় পাইব এই যুগ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই যে পরধর্ম্ম ইহা অত্যন্ত দুরূহ, ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অন্ধ। আমাদের যোগ্যতার দ্বারা অবশ্য আমরা এ অধিকার পাই নাই তবে স্বয়ং ভগবান অশেষ করুণা করিয়া নিজগুণে আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের পিতা ও মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা, সেই ভাগবত ধর্ম্মের, সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে। প্রেম-ভক্তিকল্পতরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রই আমাদের এই বিরাট হিন্দু সমাজের ত্রাণ-কর্ত্তা, তিনিই আমাদের সকলের আশ্রয়। কবি শ্রীপ্রেমানন্দ সত্যই বলিয়াছেন—

"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি;
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে
বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে,   করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে,   খোল করতালে
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন,   তরাস পাইয়ে
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন,   আনন্দে ভরিল
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দে,   এমন গৌরাঙ্গে
রতি না জন্মিল তোর ॥"

উৎকণ্ঠিতা রাধা

পথে আজি চাহ ক্ষণে ক্ষণে,
ব্যাকুল করুণ নয়নে,
হে সজনি তার লাগি,   সারা রাতি আছ জাগি
সে কি ফিরে আসিবে ভবনে,
দূর পথে চাহ ক্ষণে ক্ষণে।

নীরব হয়েছে চারিধার,
কোথাও দেখি না লোক আর,
শয়নে গিয়াছে সুখে   তরুণীরা হাসি মুখে
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দেখি দ্বার,
গ্রাম পথে লোক নাহি আর।

এখনো তোমারি গৃহ-কোণে,
দীপ জ্বলে অয়ি সুলোচনে,
বাতাস বহিছে মন্দ   মৃদু অগুরুর গন্ধ
মগ্ন তুমি সুখের স্বপনে,
প্রদীপ জ্বলিছে গৃহ-কোণে।

তুমি আজি প'রেছ সুন্দরী,
কতনা গরবে নীলাম্বরী,
দেখ তব মনো ভুলে অবগুণ্ঠ গেছে খুলে
অঞ্চল লুঠিছে পদ'পরি,
একমনা হে মুগ্ধ সুন্দরি।

মুখে তব চন্দ্রকর মাখা,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু আঁকা,
কাঁপে এলায়িত চুল দুটী কানে জোড়া দুল
কঙ্কনে বাজিছে আজি শাঁখা,
চোখে তব সুখস্বপ্ন আঁকা।

মালা যে গেঁথেছ নানা ফুলে,
তারি তরে রাখিছ কি তুলে,
থাক তবে বসে থাক ভুলে যেন শুয়ো নাক
তন্দ্রায় প'ড়না যেন ঢুলে
মালা খানি যত্নে রাখ তুলে।

যমুনা বহিছে কলগানে,
হে সজনি শুনেছ কি কানে,
শুধুই বাঁশিটি তার আজিকে বাজেনা আর
রাধা নামে সুমধুর তানে,
হে সজনি শুনেছ কি কানে।

মাঠ পারে ডুবে যায় শশী,
এখনো সে এলনা রূপসি,
তুমি কতক্ষণ আর আশা পথে চেয়ে তার
শূন্য মনে একা রবে বসি,
মাঠ পারে ডুবে গেল শশী।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

শব্দব্রহ্ম

পূর্ব্বানুবৃত্ত

এইরূপে বেদতরু প্রকাশিত হইয়া তিনটী মহাশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, পুনঃপুনঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াও ভারতে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়া ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গের দ্বারা সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর সেই বৈদিকযুগে অজ্ঞ অশিক্ষিত সমাজ বৈদিক ভাষার অনুকরণে স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করিত, এই কারণ বশতঃই হউক বা সম্প্রদায় বিচ্ছেদ বশতঃই হউক, যে কোনও কারণে সেই বৈদিক ভাষায় ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া প্রাকৃতাদি নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়াছিল, আর মূলভাষা ব্যাকরণাদি দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও সেই বৈদিক ছন্দে, বৈদিক ভাবে, বৈদিক রীতিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইতে দীর্ঘকালের পর আবার সে তরু আরও একটুকু বিকাশ প্রাপ্ত হইল। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক বৈদিক ভাষা সহসা রসাত্মক বাক্যে পরিণত হইয়া আর এক নূতন ভাব ধারণ করিল। আদি বীর করুণ প্রভৃতি রসে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্জীব ভাষা যেন সজীব হইয়া উঠিল। শ্লেষাদি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া মানব মণ্ডলীর মনোহরণ করিতে লাগিল। ভাষাতরুর পুষ্পের বিকাশ হইল।

একদা মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্নানার্থ তমসা-নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চটীকে বাণ বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। তদ্দর্শনে মুনিহৃদয় শোক অভিভূত হইলে সহসা তিনি করুণ রসাকুলিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্।"

বাক্যটী সহসা উচ্চারিত হইবামাত্র মহর্ষি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ভাষা যে এইরূপ ছন্দে সুবদ্ধ ও সরস হইয়া ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। "অকস্মাৎ শব্দব্রহ্মের ঈদৃশ বিবর্ত্তের কারণ কি ?" ইহাই তখন তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া পড়িল। এমন সময়ে লোক পিতা-মহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহর্ষে! তুমি শব্দাত্মকব্রহ্মে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমার মুখ হইতে শব্দব্রহ্মের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়া এরূপ গাথার আবির্ভাব, আমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হই-

য়াছে। তুমি প্রথম কবি হইলে। আজ অঙ্কুর স্বরূপ যে শ্লোকটী তোমার মুখ হইতে আবির্ভূত হইলে; ইহাই অবলম্বন করিয়া এইরূপ সুললিত ছন্দে তুমি আদর্শ পুরুষ ভগবান রামচন্দ্রের চরিত্র বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিয়া রামায়ণ প্রকাশ কর। আমার বরে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই প্রত্যক্ষের ন্যায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে; আর যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিবে। এই গাথাটী যখন শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন এরূপ গাথা অদ্যাবধি শ্লোক নামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন, বাল্মীকিও তদনুসারে রামায়ণ রচনা করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভাষার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, দেশকাল ও পাত্রের সমবায়ে উহার স্বতঃ প্রকাশ হয় মাত্র; তৎসম্বন্ধে এ উপাখ্যানটীও একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। তবে বৃক্ষের যেমন শাখাপ্রশাখা পত্র পল্লব প্রভৃতি যথাকালে স্বয়ং আবির্ভূত হয়। মানব শিশুর দন্ত গুফ শ্মশ্রু প্রভৃতি যেমন যথাকালে উদ্ভূত হইয়া তাহার অবয়বের পূর্ণতা সম্পাদন করে, ইহাতে যেমন কাহারও কোনও চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ বৈদিক ভাষারূপ শরীরির এতকাল পরে "মানিষাদ" শ্লোকাকারে আর একটী নূতন অবয়বের আবির্ভাব হইল। কারণ শব্দে ও অর্থে বৈদিক ভাষার সহিত সাম্য থাকিলেও এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নূতনত্ব আছে, যাহা দেখিয়া ঋষি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছন্দের নূতনত্ব, বৈদিক ভাষায় অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি সমস্ত ছন্দ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে লঘু গুরু ও অক্ষর সংখ্যাদির কোনও সুশৃঙ্খলা না থাকায় তাহা এরূপ সুখশ্রাব্য নহে। ২য়তঃ শোক ক্রোধ স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার মনোবৃত্তিগুলিকে ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের প্রতিমা গঠন করিতে পারা যায়, এবং তদ্দ্বারা অন্যের অন্তঃকরণে সেই সেই মনোবৃত্তিগুলিকে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহা ইতি পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। ৩য়তঃ একটী শব্দের দ্বারা অনেক অর্থ ধ্বনিত হইতে পারে, বৈদিক ভাষাতে এরূপ অর্থান্তর ধ্বনি ছিল না। এই শ্লোকটী একটি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্দ্বারা অন্য একটি অর্থের বোধ জন্মাইতেছে, যেমন—

"হে মানিষাদ" অর্থাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত নারায়ণ, তুমি অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, কেন না কামমোহিত অর্থাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্যেও যাহার বাসনার তৃপ্তি নাই, সেই ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কুটিলাচারী রাক্ষস দম্পতীর মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ, এই অর্থটি ধ্বনিত হইতেছে। এইজন্যই এই শ্লোকটিকে রামায়ণের বীজ স্বরূপ বলা হইয়াছে। তাই মহর্ষি এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া

ভাষার দ্বারা মনোভাবের এমন সব মূর্ত্তি গঠন করিতে বসিলেন, বোধ হয় মানব সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিতে আর সে মুর্ত্তির বিলয়ের সম্ভাবনা নাই। তিনি তাঁহারই মহাকাব্যে অমৃতস্রাবিনী ভাষায় পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, সতীত্ব ও রাজধর্ম্মের আদর্শ চিত্রগুলি অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া কাব্য জগতে প্রথম পথ প্রদর্শক হইলেন, এইজন্যই তাঁহাকে কবি গুরু বা আদি কবি বলে।

তৎপরে যে সকল সুক্ষ্ম তত্ত্ব বেদের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, যে তত্ত্ব ধ্যাননিষ্ঠ ঋষি ব্যতীত অপর সাধারণের দুরধিগম্য, সেই বেদার্থতত্ত্ব সাধারণের সুগমের জন্য, আর অতি প্রাচীন কালের আর্য্যজাতির ইতিহাস প্রকাশের জন্য, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আদি কবি বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ আর যাহাতে একাধারে কাব্য পুরাণ ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান, সেই ভারতের সর্ব্বস্ব মহাভারত রচনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাণিনীয়াষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিকার মহর্ষি কাত্যায়ন সপ্তলক্ষ শ্লোকাত্মক "বৃহৎ কথা, নামক এক আখ্যায়িকা প্রণয়ণ করেন; যে বৃহৎ কথাগ্রন্থের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ সংগ্রহ করিয়া অধস্তন কবি সোমদেব ভট্ট কথা, সরিৎসাগর ও বাণ ভট্ট কাদম্বরী রচনা করিয়া কাব্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মহর্ষি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎকালে সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন।

আবার কিছুকাল পরে ভাষাশিল্পের আরও একটু বৈচিত্র সম্পাদিত হয়। ব্যাস বাল্মীকির পথ অনুসরণ রামায়ণ মহাভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবলম্বন করিয়া মাঘ ভারবি কালিদাস প্রভৃতি শত শত কবি অসংখ্য কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করায় রীতি প্রচলিত ছিল না, অধস্তন কবিগণ তাহা সংস্কৃতের সহিত একত্র ব্যবহার করিয়া কিম্বা কেবল প্রাকৃত ভাষায় কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ করিলেন। সেই প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ হইতে হইতে আজ ভারতে দেশ-ভেদে অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, আজ যে বঙ্গভাষার উশৃঙ্খল ঈদৃশ পরিণতি, ইহার পূর্ব্ব পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমরা সেই প্রাকৃত ভাষাতে গিয়া উপনীত হইব, তথায় থাকিয়া ক্রমপরিবর্ত্তন না দেখিয়া যদি হঠাৎ বঙ্গভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বোধ হয় ইহাকে সেই বংশীয় নয় বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। যদি সুক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় তবে বোধ হয় প্রমাণিত হইতে পারে যে পৃথিবীর যাবৎ ভাষারই মূল সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষা,

আবার তাহার ও মূল সেই সূক্ষ্ম ওঁকার। সেই ওঁকারই আজ বিস্তৃত হইয়া এই বিরাট শব্দরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার পরেও যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

সম্পূর্ণ

শ্রীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীমহাপ্রভু ও রামানন্দ রায় সম্বাদ।

প্রভু পূর্ব্ব রীতিতে অর্থাৎ এক হস্তে কৃষ্ণনাম গণন এবং কোটি ডোরে সংখ্যা রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিয়ড় নামক বণিক তাঁহার স্ত্রীর সহিত এই ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র বলে। প্রভু এই শ্লোকটির দ্বারা নৃসিংহ দেবের স্তব করিলেন। "যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায় প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।"
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্র বিক্রমঃ॥২॥

অয়ম্ নৃকেশরী (শ্রীনৃসিংহদেবঃ) স্বপোতানাং (নিজ শাবকানাং সম্বন্ধে) কেশরী (সিংহ) ইব, স্বভক্তানাং সম্বন্ধে (উগ্রোঽপি দুরাধর্ষোঽপি) অনুগ্রঃ (মৃদুতম) এব। অন্যেষাং সম্বন্ধে (উগ্রবিক্রম) ইব প্রতীয়তো অন্যেষাং কিং ভক্তদ্বেষিণাং। অস্য বঙ্গার্থঃ লিখ্যতে।

সিংহ যেমন আপনার পুত্রের প্রতি শান্ত বলিয়া এবং হস্তীশাবকের প্রতি অশান্ত বলিয়া অনুভূত হন, শ্রীনৃসিংহ দেবও সেইরূপ আপন ভক্তের নিকট কমনীয়, মনমোহন মূর্ত্তিতে এবং অভক্তদিগের নিকটে অতি কঠিনরূপে প্রতীত হন। সিংহের যেমন আপনার শাবক ও পরের শাবকের নিকট রূপের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে ভাবের কাঠিন্য ও সারল্য অঙ্গে উদয় হয় এবং তদ্রূপে কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ ভাবময় শ্রীনৃসিংহ দেব ভাবগ্রাহী প্রযুক্ত, ভক্ত ও অভক্তের হৃদয়ে পৃথকরূপে প্রতীত হন।

পিত্ত-দূষিত জিহ্বাতে মিছরি দানা তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, তজ্জন্য মিছরি দানার দোষ নহে, জিহ্বারই দোষ যেমন সেইরূপ স্বতঃ প্রতীত হয়।

পরম সুকোমল বপুঃ শ্রীনৃসিংহ দেব বজ্র হইতে কঠিন অভক্তের হৃদয় দোষে কঠিন বলিয়া অনুভূত হন। যেমন মিছরি দানা আস্বাদ করিতে করিতে জিহ্বার পিত্তদোষ শোধিত হইয়া রসাস্বাদ সমর্থতা জন্মায়, সেইরূপ ভগবানকে ভজন করিতে করিতে কঠিন হৃদয় প্রেমরূপ উষ্মাতে গলিয়া যায়।

আরও সিংহ যে নখর ও দন্ত দ্বারা হস্তীর মজ্জা বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হস্তীর মজ্জা বিদারণ সময়ে সেই নখর ও দন্ত বজ্রের সদৃশ হয় এবং বিপক্ষ সিংহাদির হস্ত হইতে যখন নিজ শাবককে একটি গুহা হইতে অপর গুহায় লইয়া যান, তখন সেই নখর ও দশন সুকোমল হইয়া থাকে। একই নখ দন্ত, পৃথক্ স্থানে যেমন পৃথক্ ক্রিয়া করিতেছে। সেইরূপ শ্রীনৃসিংহ দেবকে অভক্ত সকল আপনাদের হৃদয় দোষে কঠিন হইতে কঠিন বলিয়া অনুভব করেন।

কলিযুগ-পাবন মহাপ্রভু, শ্রীনৃসিংহ দেবকে দণ্ডবৎ করিলেন, যদিও নৃসিংহ দেব তাঁহার অংশ বিশেষ তাহা হইলেও ভক্ত মর্য্যাদা বজায় রাখিলেন। "মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে" এই পয়ার শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজগদানন্দ শিক্ষায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন। কারণ—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই কথাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু ভক্তের ভাব দেখাইলেন। শ্রীনৃসিংহ দেবের সেবক তৎপরে মাল্য ও প্রসাদ দিয়া প্রভুকে সম্মানিত করিলেন। কোন বিপ্র ভিক্ষা দান করিলেন, প্রভুও প্রসাদ আস্বাদ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিতে করিতে এবং তত্রস্থ লোক সকলকে বৈষ্ণব করিয়া শ্রীগোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী নদীর জল দেখিয়া প্রভুর যমুনা স্মৃতি হইল এবং তত্তীরে বনকে শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া অনুভব করিলেন। "মহা-ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্ট স্ফূরণ" কারণ—মহাভাগবতের সর্ব্বত্র ইষ্ট সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এখানে ভাগবত ও মহাভাগবত সম্বন্ধে আমরা বিচার করিব, শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়। তাহা এই। শ্রীহরি যোগেন্দ্র মহাশয় প্রথমতঃ ভাগবত সকলকে ৩টি আখ্যা দিলেন, উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ প্রতিমাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক

পূজাদি করিয়া থাকেন কিন্তু ভক্ত ও অভক্তকে, সম্বন্ধ হইতে দূরে দর্শন করেন, তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত কহা যায়, আর—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।"
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যমঃ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রেম, বৈষ্ণবে বন্ধুত্ব, মূর্খের প্রতি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষীকে ঘৃণা করেন তাঁহারা মধ্যম বলিয়া কথিত হন। প্রাকৃত ও মধ্যম ভক্ত ভক্তিদেবীর ক্রমবিস্তারে উত্তমত্ব লাভ করিয়া থাকেন। জগৎই ভগবানের নিত্যদাস ইহা অনুভব না হইলে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং আত্মতত্ত্ব, না জানিলে, শ্রীভগবৎতত্ত্বে প্রবেশাধিকার হয় না। এইটি প্রাকৃত ও মধ্যম ভক্তের না থাকায় তাঁহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

অতঃপর উত্তম ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন যথা,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব মাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

এস্থলে আমরা স্বামীর ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচনা করিব। যিনি আপনার প্রেমের উৎকণ্ঠতা দ্বারা জগতের জীব সকলে এবং স্থাবরে সেই শ্যাম নটবর স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, আপনাতে কৃষ্ণদাসরূপে এবং ভগবানের তত্ত্বের মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের তত্ত্বাভ্যন্তরে ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম, বৈষয়িক জ্ঞান যেমন বিষয়কে চক্ষুদ্বারা দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করান, প্রেমও সেইরূপ ভক্তি চক্ষুদ্বারা ভক্তকে আপনার লীলা মাধুর্য্য অনুভব করান, ভক্ত কখন দেখিতেছেন মা যশোদা, গোপালকে বন্ধন করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া কাঁন্দিতেছেন। আবার মহারাস মণ্ডলে গোপী গোবিন্দের নৃত্য দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছেন তখন অক্রূরের রথে, কৃষ্ণ দর্শন করিয়া উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হইতেছেন। যেমন প্রহ্লাদের হৃদিগত প্রেম হিরণ্যকশিপুকে স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া "সর্ব্ব বিষ্ণুময় জগৎ" এই বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং মা, যশোদা গোপালের বদন মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজরাখাল সকল বনভোজন কালে গোপালকে বেষ্টন করিয়া মধ্যে বসাইয়া সকলে গোপাল আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহা-ভাগবতগণ স্থাবর জঙ্গম কৃষ্ণময় দর্শন করেন। শ্রীধর স্বামী টীকায় পরব্রহ্ম বাদ

করায় এস্থলে নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহারই স্বরূপ দর্শন হয় ইহা নির্ণীত হইল, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ একটি পয়ার বলিতেছেন, যে,—

স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

অন্য দেবতার উপাসক ও অন্য দেবতাময় দর্শন করেন এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণেই সকল দেবতার মূল পরতত্ত্ব স্বরূপ।

এ স্থলে শ্রীমহাপ্রভুও আজ মহাভাগবতগণের অন্তঃতত্ত্ব জগতে প্রকট করিলেন, কারণ নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেম আস্বাদ করিয়া বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া স্নান করিলেন এবং ঘাট ছাড়া হইয়া জল সন্নিধানে বসিয়া "শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া স্নান করিতে আসিলেন, বাদ্য সকলও সেই সময় বাদিত হইতেছিল, প্রভু চিনিলেন এই'ই' রাম রায় সার্ব্বভৌম ইঁহার সহিত মিলিবার জন্য বলিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি তাঁহারই অধীনে বিদ্যানগর শাসন করিতেন, এই জন্যই তাঁহাকে মহারাজা বলা হইয়াছে। তিনি নির্ব্বিকারচিত্ত রাগানুগাভক্তিমার্গে গোবিন্দ ভজন করিতেন। শ্রীরামানন্দ রায় স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক তর্পণাদি করিলেন। এস্থলে সংশয় হইতে পারে রামানন্দ 'ত' দেব পিতৃকের ঋণী নহেন তবে বৈধিভক্ত্যঙ্গ যাজনা করিলেন কেন? শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা"
মৎকথা শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে"

অর্থাৎ যাবৎ আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায় এবং সংসারে বিরাগ না জন্মায় তাবৎ কর্ম্মাদি করিবে—এস্থলে পাণিনি সূত্রে বলিতেছেন "বত্তদোঃ নিত্যসম্বন্ধঃ" এইজন্য কথা শ্রবণরূপা রতির সহিত বিরাগের সম্বন্ধ আছে, যেখানে কৃষ্ণকথা সেই খানেই বিষয় বার্ত্তা লোপ, এইজন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

"কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার
যাহা কৃষ্ণে তাহা নাই মায়ার অধিকার"

কারণ—আরও বলিয়াছেন "শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে"
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ।

বেদ পুরাণ প্রভৃতি আমার বাক্য যিনি তাহার বিপরীত আচরণ করেন তিনি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় এবং আমাতে অবিশ্বাস করায় বৈষ্ণব নহেন। আবার বলিতেছেন—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্"

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ।

যিনি কর্ম্ম সকলের গুণ দোষ জ্ঞাত হইয়া সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন তিনিই সাধু-শিরোমণি, যেমন কৃষকেরা বীজ বপন করিলেও বৃষ্টি অভাবে শস্য হয় না, সেইরূপ কর্ম্ম সকলও হীনবলতা প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে ফল দিতে পারে না কারণ —"তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ" যাহাতে গোবিন্দ তুষ্ট না হন সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়ী হন না, কারণ প্রেম নিজ বল প্রকাশ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করান। এইটা প্রেমের বল, কৃষ্ণও প্রেমাধীন, প্রেমভক্তি গোবিন্দের প্রতি প্রীতি বিস্তার জন্য গোবিন্দের এই আজ্ঞাটি ভক্তের হৃদয় হইতে লইয়া শ্রীগোবিন্দে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এইটী পূর্ব্বপক্ষ ইহার আমরা উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিব। অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ কেনই বা তর্পণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ।

দেখা দিয়ো দয়া ক'রে

যবে ফুরাইবে বেলা, সাঙ্গ হ'বে খেলা
রবি যাবে অস্তাচলে,
নীরব হইবে কর্ম্ম-কোলাহল
শ্যাম-ছায়া সন্ধ্যাতলে।
যবে নিস্পন্দ হইবে কর্ম্মক্লান্ত দেহ
শুইব নিদ্রার ক্রোড়ে,
হে দয়িতপতি, তখন আমায়
দেখা দিয়ো দয়া ক'রে।
যবে এ বিশ্ব-সংগীতে মিশিবে না সুর
ছিন্ন হ'বে হৃদি-তার,
নীরবে কাঁদিয়া নীরবে মিশাবে
বাজিবে না কভু আর।
যবে আঁধার-জড়িত নয়নেতে আমি
শুইব শান্তির ক্রোড়ে,—
হে চিরবাঞ্ছিত, তখন আমায়
দেখা দিয়ো দয়া ক'রে।

শ্রীপ্রমদাপ্রসাদ মল্লিক।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলডিহি গ্রাম নিবাসী দুইশত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীল শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি—রসকদম্ব (৮)

গুরুপাদপদ্মে ভক্তি নামে সে করায়।
তত্ত্বৎ জ্ঞান শ্রীবিষ্ণুর পদে সে জন্মায়।
জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ বিমোচন।
দুর্ব্বাসনা ভ্রান্তি বীজ করয়ে খণ্ডন॥
এইরূপ করে নাম গ্রহণ করিলে।
অন্তে কৃষ্ণপদ গতি নাহি চলাচলে॥
যথা॥
বিষ্ণোর্নামৈব পুংসঃ শমনমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ ব্রহ্মাদিস্থান ভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদ দ্বন্দ ভক্তিং। তত্ত্বাৎজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতি জননং ভ্রান্তি বীজঞ্চ দগ্ধা সম্পূর্ণানন্দ বোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তং॥ শ্রীধরস্বামিপাদানাং॥ আকৃষ্টিঃ কৃত চেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চংহসামাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষঃ শ্রিয়ঃ। নোদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যা মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ ০॥
বর্ণমাত্র কৃষ্ণনাম করিলে গ্রহণ।
পাপ তাপ বিমোচন ভক্তি বিবর্দ্ধন॥
প্রথমান্ত দ্বিতীয়ান্ত কিম্বা সম্বোধন।
লইলে কৃষ্ণের নাম অভীষ্ট পূরণ॥
প্রথমান্ত নাম ফল শুন ভাগবতে
শুকদেব গোসাঞি কন রাজা পরীক্ষিতে॥
ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানে॥

হরিরিত্যবশো জল্পন্ পুমান্নার্হতি যাতনা ইতি।
অত্রচ
হরির্হরতি পাপানি দুষ্ট চিত্তৈরপিস্মৃতঃ॥
দ্বিতীয়ান্ত নাম যথা॥ ব্রহ্মপুরাণে॥
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং ইত্যাদিঃ॥
বিষ্ণু রহস্যে॥
হে জিহ্বে মম নিস্নেহে হরিং কিং তন্নাভাষসে ইত্যাদিঃ॥
তৃতীয়ান্ত নাম যথা।
বঞ্চিতোহহং মহারাজন্ হরিনাবন্ধুরূপিনা ইত্যাদিঃ॥
চতুর্থ্যন্ত নাম যথা।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পদ্মনাভয়ে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
পঞ্চম্যন্ত নাম যথা।
কৃষ্ণাদন্যং কোবা দয়ালুং শরণং ব্রজামি ইতি॥
ষষ্ঠ্যন্ত নাম যথা।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ইত্যাদিঃ॥
সপ্তম্যন্ত নাম যথা॥
যস্তভক্তির্ভগবতি হরৌ নিশ্রেয়সেশ্বরে। ইত্যাদিঃ॥

যথা বা।

মতির্ভবতু গোবিন্দে ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি ইতি॥

সম্বোধনং নাম যথা॥

হরেমুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

হে কৃষ্ণ হে বিষ্ণো হে হরে হে রাম ইত্যাদি সম্বোধন পদং॥

বর্ণ মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হৈলে।
কৃতার্থ সকল লোক সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥
প্রথমান্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয়।
সাক্ষাৎকারে হয় সম্বোধনের বিষয়॥

যথা॥

বোদ্ধাস্যাভিমুখীকরণ. সাক্ষাৎকারণো-পাদানং সম্বোধনমিতি॥

সাকাঙ্ক্ষে সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ।
আহ্বান করিয়ে সম্বোধন অন্যযোগ॥
তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেব প্রতি।
কৃষ্ণলীলা নাম গাই হৈঞা নিষ্টমতি॥
গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন।
সাক্ষাত আহূতপ্রায় চিত্তগত হন॥

যথা শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ॥

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যানি তীর্থপাদ প্রিয়-শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ ইতি॥

সম্বোধন নাম গান কৃব নারদ মুনি।
আনন্দ অন্তরে জানি দিবস রজনী॥

যথা॥

রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

সর্ব্ব অবতার নাম মহাফল কন।
তথাপি বিশেষ ফল করহ শ্রবণ॥
হরি কৃষ্ণ রাম এই একত্রে স্মরণ।
সহস্র অশ্বমেধ নহে তাহার সম॥

যথা বৃহদ্বশিষ্ঠ সংহিতায়াং॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রামেতি হরীত্যুক্তা ততঃ-পরং।
রাজসূয় সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

রাজসূয়াদিক ফল প্রবর্ত্ত কারণ।
মুখ্য ফল কৃষ্ণে রতি পুরুষার্থ সাধন॥
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তিন নাম প্রকাশিঞা জগৎ কৈল ধন্য॥
নন্দসুত শ্রীচৈতন্য হৈলা অবতার।
বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার॥
পূর্ব্বদাস সখা গুরু বর্গ প্রিয়াগণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে কলিযুগে অবতার হন॥
পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গেত লইঞা।
হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা॥
সম্বোধন হরিনাম করিলা প্রচার।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অগ্নি পুরাণ শ্লোক আর॥

যথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
ইতি জপ্ত্বা প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র সংশয়ঃ॥

অগ্নি পুরাণে যথা॥

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

শ্বপচোপি জপন্নিত্যং মুচ্যতে শৃণু ভার্গব॥
পুরাণ দুইয়ের শ্লোক একত্রে গাঁথিঞা॥
হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা॥
হরি কৃষ্ণ রাম এই নামের অর্থ শুন।
সদাশিব সম্বাদ তায় করহ শ্রবণ॥
শিব কহে শুন প্রভু অহে সনাতন।
তব নাম কীর্ত্তনে কৃতার্থ সর্ব্বজন॥
তব নাম গানে আমি জগতে প্রধান।
সগন সহিতে পূত কহি বিদ্যমান॥
সর্ব্ব জীবের পাপ তোমার নামে হরে।
অতএব ত্রিজগতে তব নাম করে॥
সর্ব্ব জীবের পাপ তাপ দুঃখ দূরে করি।
জগতে তোমার নাম হৈল শ্রীহরি॥
সকলের মন কিবা করহ হরণ।
এই হেতু হরি বলি ত্রিজগতে কন॥
যথা পাদ্মে॥
তন্নাম কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণো পূতঃ পূজ্যোজনৈরহং
ত্বং হংসি সর্ব্বজন্তুনাং মনঃ তেন হরিঃ স্মৃতঃ॥
অন্যত্রচ॥
সর্ব্বেষাং জঙ্গমাদীনাং দেবাদীনাং
বিশেষতঃ হরত্যসৌ মনোনিত্যং স্ততো
হরিরিতি স্মৃতঃ॥
পঞ্চ শ্লোকে হরিনাম করহ শ্রবণ।
ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত যাহাতে সে হন॥
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ অবিদ্যা হরণ।
অজ্ঞান মায়া কর্ম্ম যাহাতে খণ্ডন॥
অবিদ্যা অবিদ্যার কর্ম্ম যাইতে সে হরে।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান হরি বলি তারে॥
যথা॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
রাম নামের অর্থ শুন কহে তন্ত্রসারে।
রাম নামে পূর্ণ ব্রহ্ম কহেন বিচারে॥
রমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে।
সত্যানন্দ চিন্ময়াত্মা সেই অনন্ততে॥
এই হেতু রামনাম পরংব্রহ্ম হন।
তারকব্রহ্ম বলি রামনামে কন॥
যথা তন্ত্রে॥
রমন্তে যোগিনোনন্তে সত্যানন্দে পরাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভি ধীয়তে।
চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষ্ণু স্মরণে।
তাদৃক সহস্র নাম ফল হয় রাম নামে॥
যথা পাদ্মে॥
বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃঙ্ নাম সহস্রেন শ্রীরাম নাম সম্মতং॥
তত্রচ॥
রাম রামেতি রামেতি রামরামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥
ফলং যথা অন্যত্র॥
রাকারোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশ কালে তু মকারস্তু কবাটকং॥

পুনরপি কহি শুন ব্যাখ্যান্তর করি।
রমুক্রীড়ায়াং ঘনন্ত সাধন তাহারি॥
গোপ গোপী লঞা কৃষ্ণ করয়ে রমণ।
রাম শব্দে কহি কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
কোন ভক্ত কহে রাম রোহিণী তনয়।
রামেতি লোকরমণাৎ ভাগবতে কয়॥
যথা দশমে॥
রামেতি লোক রমনাদ্বলভদ্রং
বলোচ্ছ্রয়াৎ ইতি॥
পুন কহি মর্ম্ম-ব্যাখ্যা অর্থান্তর করি।
ঐছে ব্যাখ্যা তন্ত্র মতে কহিল বিচারি॥
রাকারে কহি যে রাধা মকারে কৃষ্ণ
রাম।
তিনরূপে পূর্ণ করে ব্রজ মনস্কাম॥
অতএব হরিনাম ব্রজ উপাসনা।
পুনঃকৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা শুন সর্ব্বজনা॥
কৃবাচক কৃষি শব্দ নির্বৃতি ণকার।
নির্বৃতি কহিয়ে নিত্যানন্দ সুখ যার॥
দুই ঐক্য পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান।
সাকার পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান॥
সেই কৃষ্ণনাম সর্ব্বনামের মুখ্যতর।
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান জিহোঁ সর্ব্বেশ্বর॥
যথা॥
কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণস্ত নির্বৃতি
বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
বৃহদ্গৌতমীয়ে॥
কৃষি শব্দোহি সত্বার্থোণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ।
সত্বাত্মানন্দয়োর্যোগাৎ, চিৎপরং ব্রহ্ম-
চোচ্যতে॥

অস্যার্থঃ॥
ভবত্যস্মাৎ সর্ব্বেহর্থা ইতি কৃঃধাত্বর্থ
সত্তে বোচ্যতে নির্বৃতিরানন্দ
স্তয়োরৈক্যং—
সামান্যাভি করণ্যেণ ব্যক্তং। যৎপরমং
ব্রহ্ম সর্ব্বতোহি বৃহত্তমং সর্ব্বস্যাপি
বৃংহনং বস্তু তৎকৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে।
কিন্তু কৃষেরাকর্ষ প্রাচুর্য্যার্থঃ॥
ব্রহ্ম শব্দস্ত তত্তদর্থঞ্চ বিষ্ণু পুরাণে।
বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ অতঃ
সর্ব্বাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ
ইত্যর্থঃ।
যস্মাদেবং সর্ব্বাকর্ষক সুখ রূপো হসৌ-
তস্মাদাত্মজীবশ্চ তত্র সুখরূপো ভবেৎ
তত্র হেতুঃ ভাব প্রেমাতন্ময়া নন্দত্বাদিতি
শ্রীমদ্গোস্বামিনা ব্যাখ্যাতং॥
আনন্দ সুখের কর্ত্তা গোকুল মণ্ডলে।
গোকুলানন্দ কৃষ্ণানন্দ সুতে বলে॥
পঞ্চশ্লোকী যথা
আনন্দৈকসুখস্বামীশ্যামঃকমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
সর্ব্বনাম মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ জানি।
প্রভাস পুরাণে দেখ ভক্তি গ্রন্থে শুনি॥
বিষ্ণুর সহস্র নাম ত্রিবার পঠনে।
সেই ফল কৃষ্ণ নাম একদা স্মরণে॥
যথা॥
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ
ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ
প্রযচ্ছতি॥ ইতি।

হরিকৃষ্ণ রাম এই নাম যজ্ঞ সার।
কলিযুগে মহাপ্রভু করিলা প্রচার॥
কালাকাল নিয়ম নাঞি এ নাম জপিতে।
আইথে থাকিতে পথে ভক্ষণ কালেতে॥
সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশে করিবে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম লইতে নাঞি কালাকাল নিয়ম॥
বৃহন্নারদীয়ে।
ব্রজন্, তিষ্ঠন্ স্বপন্ অশ্নন্ স্বপন্ বাক্য প্রপূরণে।
নাম সংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলি-বর্দ্ধনং॥
উক্তা স্বরে শতাং যান্তি ভক্তি যুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তগণ।
মধুরাশ্রিত ভক্তাদি সভার স্বাধীন॥
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বভক্তে হরিনাম কৈলা বিতরণ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি আপে অবনিতে।
জপি জপাইল নাম এই ত জগতে॥
সর্ব্বভক্তের অধিকার এই হরিনামে।
নিষ্ঠা হৈলে প্রাপ্তি হয় সাধনানুক্রমে॥
দাস্য বশ ভক্ত যত জপি হরিনাম।
রসাণাদি দাস সঙ্গে প্রাপ্তি ব্রজধাম॥
সখ্য ভক্ত জপি নাম সখা অনুগতে।
রামকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে॥
বৎসল রসের ভক্ত সাধনানুসারে।
নন্দ সুত প্রাপ্তি তার হয় নন্দী শ্বরে॥
মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিঞা।
রাধাকৃষ্ণ পদ প্রাপ্তি গোপী সঙ্গ পাঞা॥
বাসুদেব ভক্তগণও নাম জপিতে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ প্রাপ্তি মহিষী সহিতে।
বাসনানুসারে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণ নামে।
রাগানুগাগণের হয় প্রাপ্তি বৃন্দাবনে॥
সকাম ভক্তের হয় বাঞ্ছিত কামনা।
ধর্ম্ম অর্থ স্বর্গ ভোগ যে করে বাসনা॥
কৃষ্ণ নামে সর্ব্ব সিদ্ধি নাম চিন্তামণি।
নাম নামী অভেদ পুরাণে এই শুনি॥
কৃষ্ণ হন পরং ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম নাম।
অতএব নাম নামি দুইত প্রধান॥
পাদ্মে॥
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে হন।
কারু পুত্র কারু মিত্র পতি প্রিয়জন॥
তাহা দেখ ভাগবতে মল্ল যুদ্ধ কালে।
যার যেন মতি তৈছে দেখে রঙ্গস্থলে॥
মল্লগণ দেখে কৃষ্ণের বজ্রসম জানি।
নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মানি॥
স্ত্রীগণ দেখয়ে যেন কন্দর্প মূর্ত্তিমান।
সভার রমণিগণ দেখি মূর্চ্ছাপান॥
গোপগণ দেখে কৃষ্ণ সেই সখাবর।
দুষ্টগণ দেখি ভয় ভাবিত অন্তর॥
রাজাগণ দেখে যেন সভারি শাসন।
আমা সভার দণ্ডকর্ত্তা গোপবেশ হন॥
বসুদেব দৈবকি মানে শিশু দুইজন।
না করিল হেনপুত্র লালন পালন॥
মৃত্যুতুল্য দেখে কংস রঙ্গ স্থল হরি।
যমরাজ হেন দেখে যেন দণ্ডধারী।
তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত দেখে পর তত্ত্বজ্ঞান।

বৃষ্ণিগণ দেখে পরম দেবতা সমান ॥
যার যেন মতি তার কাছে তৈছে হন।
ভক্তে বাৎসল্য ভাব অভক্তে দমন ॥
অতএব হরি নাম চিন্তামণি সম।
যে যে রূপে ভজে তারে তেমন হন ॥
শ্রীদশমে শ্রীকৃষ্ণস্যনানারূপত্বদর্শনং যথা।
মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগীনাং।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
ধ্যান যজ্ঞ অর্চ্চন বিধি ছিল যুগান্তরে।
কলিযুগে নাম বিনু নাহিক নিস্তারে ॥
প্রসঙ্গ পাইঞা ইথে করিল বর্ণন।
নাম অপরাধ মধ্যে হরি নাম কথন ॥
সাধন ভক্তির মধ্যে বৈধীর সাধনে।
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীরূপের চরণ।
অভিরাম সুন্দরানন্দ করিঞা স্মরণ ॥
শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলাষ।
এ দাস নয়নানন্দ করিলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব যে করে শ্রবণ।
সে জন অচলা ভক্তি প্রায় প্রেমধন ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তি রস কদম্বে
ষষ্ঠ প্রকরণং ॥

সপ্তম প্রকরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপগোপাল
গণাবৃতং।
রামেণ জলদশ্যামং শ্রীসুদামসখং ভজে ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণস্বগণ সহিতে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় জয়াদ্বৈতে ॥
স্বগণ সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর।
গোপাল মহান্ত জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ॥
শুন শুন বন্ধুগণ করিয়ে বিনয়।
রাগানুগা সাধনের শুনহ নির্ণয় ॥
যাহার সাধনে ব্রজলোক হয় গতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেত প্রস্তুতি।
সাধন ভক্তি দুইরূপ বৈধী রাগ ভেদে।
বৈধীভক্তির সূত্র কহিলাম আগে ॥
এবে কহি রাগাঙ্গ ভক্তি সাধনের ক্রম।
বৈধী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥
রাগ বস্তু থাকে যাথে সেই রাগাত্মিকা ॥
রাগাত্মিকা নিষ্ঠা ব্রজে গোপ গোপিকা ॥
দাস দাসী সখাগুরু প্রেয়সীর গণে
বিরাজমান রাগাত্মিকা ব্রজবাসী জনে।
ব্রজবাসী অনুগত যে করে সাধন।
রাগানুগা বলিঞা তাঁহার নাম হন ॥
যথা শ্রীমতঃ
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিষু।
রাগাত্মিকা মনুস্তা যা সা রাগানু-
গোচ্যতে ॥
অনুস্তা অনুগতা ইত্যর্থঃ।
রাগানুগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ।
আগে কহি শুন রাগাত্মিকার লক্ষণ ॥

স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে স্বাভাবিকী আবেশ।
পরম আবিষ্ট তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ ॥
স্নেহ ক্রমে স্ব স্বভাবে প্রেমতৃষ্ণা যেই।
রাগ বস্তু কহিলাম কৃষ্ণ বিষয় সেই।
রাগপ্রেরিতা ভক্তি সদা আছে যাতে।
রাগাত্মিকা শব্দে কহিলাম তাথে॥
যথা তত্র।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তি সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

অস্য ব্যাখ্যা। ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা। তদ্ধেতু প্রেমময়ী তৃষ্ণা সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুত্বয়া তদভেদোক্তিঃ মধুঘৃতমিতিবৎ তন্ময়ীতদেক প্রেরিতা ইতি ॥

সেই রাগাত্মিকা ভেদ পুন দুই হন।
কামরূপা সম্বন্ধরূপা এই বিবরণ ॥
কৃষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বহু মত।
কামদ্বেষ ভয় স্নেহ আদি হেতু কত ॥
কোনরূপে কৃষ্ণ মতি যার সদা রয়।
তাহার অবশ্য অন্তে বিষ্ণুগতি হয় ॥
শ্রীভাগবত সপ্তমে।

কামদ্বেষাদ্ভয়াদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথাভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বারহবস্তদ্গতিং গতা।

কামরূপ তৃষ্ণায় পাইলা গোপীগণ।
ভয় হেতু মতি কৃষ্ণে সদা কংসের হন ॥
শিশুপাল আদি দ্বেষ সদা কৃষ্ণে করি।
তাহারা হইল মুক্ত দেখহ বিচারি ॥
সম্বন্ধে বৃষ্ণি বংশ যদুগণ যত।
স্নেহে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত ॥
নারদাদি মুনিগণ বিধিভক্তি করি।
এইরূপে বিষ্ণুগতি বহুবিধ বলি ॥
কোনরূপে কৃষ্ণে মতি আবেশ হইলে।
তার বিষ্ণুগতি হয় শুন অন্তকালে ॥
শ্রীভাগবতে

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ো যূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যাবয়ং বিভো ॥

সাধারণে কহিলাম সভার বিষ্ণুগতি।
তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে যেবা যুক্তি॥
পরমাবিষ্ট স্নেহ ক্রমে কৃষ্ণে তৃষ্ণা যার।
রাগাত্মিকা নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার॥
ঈশ্বর বলিয়া ভয় কৃষ্ণে নাহি হয়।
প্রীতে করয়ে সেবা তাকে রাগ কয় ॥
কৃষ্ণে তু ঈশ্বর ভাব যাহার সাধনে;
সেই বৈধী ভক্তি আপনার হীনজ্ঞানে ॥
আনুকূল্যস্নেহহীন দ্বেষ ভয় জানি।
কংস শিশুপালাদির ভক্তি নাহি মানি ॥
যুধিষ্ঠিরাদির স্নেহ সম্বন্ধজ্ঞাত হন।
নারদাদির ভক্তি ঈশ্বরে হন।
অতএব ইহা সভার বৈধিতে প্রবেশ।
কাম সম্বন্ধ প্রেম রাগাত্মিকা দেশ ॥
যথা আনুকূল্যবিপর্য্যাসাদ্ভীতি দ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ণিতা ॥
অপিচ।

ভক্ত্যা বয়মিতিব্যক্তং বেধীভক্তিরুদী-
রিতা ইতি ॥
কৃষ্ণে মতি আবেশ হইলে কৃষ্ণেগতি।
তাহাতে আবেশ ভেদ শুনহ যুগতি ॥
কৃষ্ণে আবিষ্টতা তার তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণা স্বরূপ কথন ॥
ভয়ে কৃষ্ণে সদা মতি কারু অরি জ্ঞানে।
বিষ্ণুময় কংস দেখে শয়ন স্বপনে ॥
কংস শিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ।
অতএব তাহা সভার ব্রহ্ম পরবেশ ॥
সামান্য শ্রীবিষ্ণুগতি সভার কহিল।
কাম দ্বেষ ভয় স্নেহ আগে যে বর্ণিল ॥
তাহে বিবরণ পুন শুন গ্রন্থ মতে।
যে যেরূপ পায় কৃষ্ণ যে সব স্থানেতে।
সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী আর রিপুগণ।
তাহা সভার ব্রহ্মপদ হয়েত গমন ॥
যথা ব্রহ্মাণ্ডে
সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি।
সিদ্ধাঃ ব্রহ্ম সুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা
হতাঃ ॥ ইতি ॥
প্রিয়গণ অরিগণ যদি তারে পায়।
প্রিয় অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তায় ॥
হরি হত অরিগণ হয় ব্রহ্মে লয়।
প্রিয়গণ অনুকূলে পারিষদ হয় ॥
এই হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তি সভার কহিল।
সূর্য্য সূর্য্যকান্ত্যে যেন অবিশেষ মানিল।
শ্রীকৃষ্ণে অঙ্গের কান্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥
এই হেতু কৃষ্ণগতি সভাকার কয় ॥
যথা যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক
মিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-
জুষোঃ ইতি ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ জ্যোতি হয় ব্রহ্মনিরূপণ।
ব্রহ্ম সংহিতাদি গ্রন্থে তাহা বিবরণ ॥
যথা সংহিতায়াং
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দ আদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥
অপিচ।
যস্য পাদনখজ্যোৎস্নাপরং ব্রহ্মেতি
শব্দিতং ইত্যাদি।
বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ।
যে সম্পদ পান তাহা পায় অরিগণ ॥
রাগমার্গে সেবি হরি প্রেমরূপ পাঞা।
কৃষ্ণ সেবা পায় সেই সহচর হৈঞা ॥
গোসাঞীর কারিকা সূত্র করহ শ্রবণ।
যাহাতে গোপীকা উক্তি দশমে বর্ণন।
যথা
রাগবন্ধেন কেনাপিতং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়াজনাঃ ॥
ইতি তথাহি দশমে শ্রুতয় উচুঃ।
নিভৃত মরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো
হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ
স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষাক্ত
ধিয়ো বয়মপিতে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি
কৃষ্ণোপনিষদি। [সরোজ সুধাঃ ॥
অহো মূঢ়ো ন জানন্তি কৃষ্ণস্য নিত্য
বৈভবং। ইত্যাদি।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস্,
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা, শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস।

জীবন কথা।

সন ১৩০৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার, ঠিক তারিখ আমার স্মরণ নাই বৃহস্পতিবারের কথা স্মরণ থাকার কারণ,—প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। সে দিন পাঠক শ্রীমৎ নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ নীচের বৈঠক খানায়, যথায় পাঠ হয় সেখানে উপস্থিত, আর জন কয়েক শ্রোতা, যাঁহারা পাঠ শুনিতে আসেন তাঁহারাও উপস্থিত। একটী সংকীর্ত্তনের দল আমাদের বাটীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে ঘর হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম—সেই সময় কলিকাতায় প্রথম প্লেগের হাঙ্গামা। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, আমাদের পাড়াতেও চার পাঁচটী সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিদিন পাড়ায় সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন, আমরা সকলেই সেইরূপ কোন একটী সংকীর্ত্তনের দল আসিয়াছে ভাবিয়াছিলাম কিন্তু প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি বাবাজী সংকীর্ত্তন করিতেছেন। সে সময় আমার বাবাজী মহাশয়দের উপর বড়,—বড় কেন একেবারেই, কোন আস্থা ছিল না; আমার তখনকার ধারণা, যে বাহারা সংসারের অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তব্যবিমুখ লক্ষ্যহীন, চরিত্র সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাশূন্য এইরূপ কতকগুলি লোকে এই বাবাজীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের অনর্থক ভারস্বরূপ হইয়া লোক বঞ্চনা করিয়া আপনাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের আশা চরিতার্থ করিয়া বেড়ান। আমার তখন এই অবস্থা. আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর কিন্তু ঠিক আমার বিপরীত। তাঁহার সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রগাঢ় ভক্তি; আমরা জাতিতে সুবর্ণ বণিক অতএব বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্ নিত্যানন্দ পরিবার। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্ত্তব্যাদি পালনপরায়ণ ও অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সেবায় অনুরক্ত, আমার কিন্তু তাহা বড় ভাল লাগে না। আমি মনে করি দাদা মহাশয়ের এটী একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীদের পিছনে টাকা খরচ করাটার ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহা অপেক্ষা যাহাদের প্রকৃত অভাব, পতিপুত্রহীনা অসহায়া বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের উপায় না করিয়া যাঁহারা বেশ সবল, সুস্থকায়, আত্মসুখরত বাবাজীদের সাহায্য করেন তাঁহারা যে তাঁহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর সন্দেহ নাই, অপিচ তাঁহারা মানব সমাজের একটী মহানর্থের সহায়তা করেন। আমার ত তখন এইরূপ অবস্থা ; ইহা যে কতকটা ইংরাজি শিক্ষার বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্ব্ব, তাহাতে ইংরাজির গরম মসলা, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণা গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভিখারীর দল, সে দিন আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিল, সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিল। তাঁহারা নাম করিতেছিলেন "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামের কোন অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট হইল না। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব বা বাবাজী মহাশয়দের গানে আমার গায়ে যেন শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কেন জানি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী বাবাজীগুলির ঐ "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামে প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা অস্পষ্ট সুখ বোধ হইতে লাগিল ; আর তাহাদের নৃত্য জানিনা—সে কি নৃত্য—আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী মহাশয়দের নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য দেখিয়া থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা বোধ হয় না, যাহা দেখিয়াছি তাহাও অপরিহার্য্য অবস্থায়। কিন্তু আজি ইহাঁদের নৃত্য আমায় যেন কেমন একটা মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মণ্ডলাকারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

মধ্যের যিনি, দেখিয়া বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্ত্তনদলের নায়ক—কারণ তিনি গাহিতেছেন আর সকলে তাঁহার দোহারকি করিতেছেন—এই মধ্যের যিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদটী যখন গাহিতে-ছেন, তখন মধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী। বিশেষতঃ যিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা মহানগরীতে এমন কোন নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নাই, (অবশ্য খ্যাতনামাদের মধ্যে) যাঁহার নৃত্য আমি দেখি নাই। ইহা ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিখ্যাত নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর নৃত্য আমি দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়া যদি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসেন তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুণই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন ও ইহা একটী লাফালাফি মাত্র বলিবেন, কিন্তু আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে কেহ এই মহাত্মার নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন তাহা ভুলিবেন না: সে নৃত্য যেন কথা কয়, যেন একটা কি অব্যক্ত—যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে বুঝান যায় না, যে ভাব শব্দে উচ্চারিত হয় না এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই ভাব ব্যক্ত করে। সে ভাবটী, সে কথাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহা এ রাজ্য ভুলাইয়া আমাদের যেন এক সুদূর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন আমাদের এ ত্রিতাপজড়িত প্রবাসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল এই আগন্তুক সংকীর্ত্তনকারীগণ সংকীর্ত্তন করিলেন। আমরা কেহই তাঁহাদের জানি না; সংকীর্ত্তন সমাধার পর আমরা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা সকলে আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, আগন্তুক দিগের মধ্যে যিনি নায়কস্বরূপ হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ প্রথমেই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া আর সংকীর্ত্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন * * * * "তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটী প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সযত্নে ইহার সেবা কর।" আর তাঁহাকে বলিলেন

শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্ নিত্যানন্দ পরিবার। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্ত্তব্যাদি পালনপরায়ণ ও অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সেবায় অনুরক্ত, আমার কিন্তু তাহা বড় ভাল লাগে না। আমি মনে করি দাদা মহাশয়ের এটী একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীদের পিছনে টাকা খরচ করাটার ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহা অপেক্ষা যাহাদের প্রকৃত অভাব, পতিপুত্রহীনা অসহায়া বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের উপায় না করিয়া যাঁহারা বেশ সবল, সুস্থকায়, আত্মসুখরত বাবাজীদের সাহায্য করেন তাঁহারা যে তাঁহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর সন্দেহ নাই, অপিচ তাঁহারা মানব সমাজের একটী মহানর্থের সহায়তা করেন। আমার ত তখন এইরূপ অবস্থা ; ইহা যে কতকটা ইংরাজি শিক্ষার বিষময় ফল; তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্ব্ব, তাহাতে ইংরাজির গরম মসলা, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণা গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভিখারীর দল, সে দিন আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিল, সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিল। তাঁহারা নাম করিতেছিলেন "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামের কোন অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট হইল না। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব বা বাবাজী মহাশয়দের গানে আমার গায়ে যেন শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কেন জানি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী বাবাজীগুলির ঐ "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামে প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা অস্পষ্ট সুখ বোধ হইতে লাগিল ; আর তাহাদের নৃত্য জানিনা—সে কি নৃত্য—আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী মহাশয়দের নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য দেখিয়া থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা বোধ হয় না, যাহা দেখিয়াছি তাহাও অপরিহার্য্য অবস্থায়। কিন্তু আজি ইহাঁদের নৃত্য আমায় যেন কেমন একটা মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মণ্ডলাকারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

মধ্যের যিনি, দেখিয়া বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্ত্তনদলের নায়ক—কারণ তিনি গাহিতেছেন আর সকলে তাঁহার দোহারকি করিতেছেন—এই মধ্যের যিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদটী যখন গাহিতেছেন, তখন মধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী। বিশেষতঃ যিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা মহানগরীতে এমন কোন নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নাই, (অবশ্য খ্যাতনামাদের মধ্যে) যাঁহার নৃত্য আমি দেখি নাই। ইহা ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিখ্যাত নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর নৃত্য আমি দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়া যদি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসেন তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুণই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন ও ইহা একটী লাফালাফি মাত্র বলিবেন, কিন্তু আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে কেহ এই মহাত্মার নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন তাহা ভুলিবেন না; সে নৃত্য যেন কথা কয়, যেন একটা কি অব্যক্ত—যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে বুঝান যায় না, যে ভাব শব্দে উচ্চারিত হয় না এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই ভাব ব্যক্ত করে। সে ভাবটী, সে কথাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহা এ রাজ্য ভুলাইয়া আমাদের যেন এক সুদূর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন আমাদের এ ত্রিতাপজড়িত প্রবাসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল এই আগন্তুক সংকীর্ত্তনকারীগণ সংকীর্ত্তন করিলেন। আমরা কেহই তাঁহাদের জানি না; সংকীর্ত্তন সমাধার পর আমরা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা সকলে আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, আগন্তুক দিগের মধ্যে যিনি নায়কস্বরূপ হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ প্রথমেই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া আর সংকীর্ত্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন * * * * "তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটী প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সযত্নে ইহার সেবা কর।" আর তাঁহাকে বলিলেন

"আপনি + + + + কে কৃপা করিবেন ও বড় ভাল ছেলে"। তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোথায় থাকা হয়"। তিনি উত্তর করিলেন "আমাদের থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। আমরা ভিখারী। তবে অধিক সময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি।"

প্রভুপাদ। আপনার নাম?

আগন্তুক। এ দাসকে লোকে রাধারমণ চরণ দাস বলিয়া ডাকে।

প্রভুপাদ। (তাঁহার সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইহারা কি আপনার সঙ্গেই থাকেন?

রাধা। আপাততঃ আছেন।

প্রভু। শ্রীধাম পুরীতে কোথায় থাকা হয়।

রাধা। আমরা ভিখারী, থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

তাহার পর প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামীর পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের পর সেদিন শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন।

তিনি যে কোন কথা কহিতে লাগিলেন আমার তাহা বড় ভাল লাগিতে লাগিল। তাঁহার কথা গুলিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ছায়া বা সংকীর্ণতার সংস্পর্শ নাই, সকল কথা গুলি সরল সুযুক্তিপূর্ণ আর প্রত্যেক কথাটীতে, প্রত্যেক যুক্তিতে, প্রতি তত্ত্বনির্ণয়ে যেন একটা কি মধুর ভাব, সেটা বোধ হয় প্রেমের কষায়, ভক্তির মাধুরী। সে দিন অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে শ্রীধাম পুরীর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের কথা উঠিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কেহ পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণা অনুসারে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তিটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিপন্ন করিলেন, কেহ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আনীত বলিয়া শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাস বিবৃত করিলেন, কেহ বা আবার অন্য অনেক কথা বলিলেন। সকলের কথার পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনার কি মত বলুন।" তিনি "বলিলেন আপনারা যে যাহা বলিলেন এ সকলগুলি সত্য মত।"

এই কথা শুনিয়া এক জন বলিয়া উঠিলেন "সে কি মহাশয়, সকলগুলি কখন সত্য হইতে পারে। ইহা যে অসম্ভব।"

বাবাজী। আজ্ঞে, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাও সত্য; আমাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একে অসম্ভব কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে সকলি সম্ভবপর।

আপনারা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেব সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিলেন সে গুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও তাঁহাতে সকলি সম্ভব।

একজন বলিলেন "আচ্ছা মহাশয়, জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিটী ওরূপ হস্তপদ-বিহীন, বিস্তারিত নেত্র একটী হত-গজ রকম হইবার কারণ কি। এ ভগবানের কোন্ রূপ?"

বাবাজী। শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের বিস্তারিত বিবরণ আছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে রূপে নীলমাধব মূর্ত্তি ব্যাধের নিকট হইতে আনয়ন করেন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আর ইতিপূর্ব্বে তাহা একজন ভক্ত কর্ত্তৃক বিবৃতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তিটী হস্তপদহীন হইবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি একজন মহাপুরুষের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে যদি আপনাদের কথঞ্চিৎ কৌতূহল নিবৃত্তি হয়, বলি শুনুন—শ্রীবৃন্দাবন লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া দ্বারকালীলা করিতেছেন, সেই সময় দ্বারকার মহিষীরা সকলে এক দিবস একত্র হইয়া কথোপকথন করিতে করিতে একজন বলিলেন "ভাই, ঠাকুর বৃন্দাবনলীলায় না জানি কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন; কারণ তাহা না হইলে এখন পর্য্যন্ত এই দ্বারকাধামের সুখসম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কেন সেই দীন হীন গ্রাম্য গোপ গোপীর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান যে ঠাকুর প্রায় নিশীথে নিদ্রা যাইতে যাইতে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন।" এই কথা শুনিয়া মহিষীরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ ভাই! তুমি অতি সত্য কথা বলিয়াছ। ঠাকুর সত্য সত্যই প্রায় প্রতি নিশীথেই নিদ্রাবস্থায় রাধা রাধা বলিয়া কাঁদেন।" এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে হইতে মহিষীরা সকলে স্থির করিলেন যে "ঠাকুরের বৃন্দাবন লীলার কাহিনীটী আমাদের আমূল শ্রবণকরা উচিত, তাহা না হইলে আমরা ঠাকুরের বৃন্দাবনের সেই দীন হীন গোপ গোপীর প্রতি তাঁহার আকৃষ্টতার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিব না।" ইহা স্থির হইলে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীবৃন্দাবন লীলার সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত আছেন এরূপ কেহ আছেন কি না। ক্রমে স্থির হইল একমাত্র রোহিণী মাতা ভিন্ন সমস্ত বৃন্দাবন লীলা পরিদর্শন করিয়াছেন শ্রীদ্বারকাধামে এরূপ আর কেহ নাই। তখন মহিষীরা সকলে রোহিণী মাতার নিকট গিয়া শ্রীবৃন্দাবন লীলার

কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রোহিণী মাতা বলিলেন "আমি মা হইয়া কিরূপে বলিব।" কিন্তু মহিষীরা কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তখন মাতা বলিলেন "তোমাদের আমি সে লীলা শ্রবণ করাইতে পারি, যদি তোমরা এমন কোন নিভৃত স্থান স্থির করিতে পার যেখানে তোমরা ছাড়া আর কেহ আসিতে পারিবে না।" মহিষীরা বলিলেন "আমাদের অন্তঃপুরে ত কাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই।" রোহিণী মাতা বলিলেন "কৃষ্ণ বলরাম ত আসিতে পারে, আর এক কথা যেখানে শ্রীবৃন্দাবন, লীলাকীর্ত্তন হইবে সেখানে কৃষ্ণ বলরাম সে মধুর লীলার আকর্ষণীতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার কি উপায় করিবে।" মহিষীরা এ বিষয় মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে দেবী সুভদ্রা দ্বারী হইয়া, যতক্ষণ রোহিণী মাতা শ্রীবৃন্দাবন লীলা পরিকীর্ত্তন করিবেন ততক্ষণ দ্বার রক্ষা করিবেন, কাহাকেও আসিতে দিবেন না।" এই সমস্ত স্থির হইলে দেবী সুভদ্রা দ্বারী হইয়া দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর মহিষীরা রোহিণী মাতার নিকট শ্রীবৃন্দাবন লীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রোহিণী মাতা প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে বর্ণনে ও শ্রবণে রোহিণী মাতা ও মহিষীবৃন্দ সকলেই আত্মহারা ও তন্ময়, তখন রোহিণী মাতার কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম গ্রামে উঠিয়া গৃহ প্লাবিত করিয়া বহির্দ্দেশে আসিয়া সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, দেবী সুভদ্রা তাহাতে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আসিয়া উপস্থিত। সুভদ্রা দেবী তখন আনন্দবিহ্বলা, ভাববিভোরা আত্মবিস্মৃতা। দেবী যে কার্য্যে নিয়োজিত তাহাও যেন বিস্মৃতা। ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া সানন্দে গিয়া উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। সুভদ্রা দেবীর সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় স্তম্ভিত। কিন্তু অধিক্ষণ আর স্তম্ভিত থাকিতে হইল না, রোহিণী মাতার শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর অমৃতময়ী কলকণ্ঠ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহারা তিনজনে—মধ্যে দেবী সুভদ্রা, বামে শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে শ্রীবলরাম—সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সে মধুর লীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, শ্রবণে ক্রমে আনন্দের লহরী উথলিতে লাগিল, প্রেমের কথায় প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল, ক্রমে তিনজনে আত্মহারা, ভাবে ভরা, আনন্দে বিগলিত, হস্ত পদ সঙ্কুচিত, নয়ন বিস্তারিত, যেন আনন্দে গলিয়া যাইতে লাগিলেন এই প্রেমে, গলা আনন্দপোরা

ভগবানের মূর্ত্তিই শ্রীধাম পুরীর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবীর মূর্ত্তি।"

এ কাহিনীটী কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নয় কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল। সে দিন আহারাদির পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ বিশ্রাম করিলেন, আমি তাঁহাদের নিকটেই রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া নাম সংকীর্ত্তন হইল, পরে আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য আমি ব্যস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন একটু অবসর পাই আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসি। অনেক লোক আসিতে লাগিলেন, তিনি সকলের সঙ্গেই আনন্দ চিত্তে সহাস্য বদনে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। কেহ কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে অতি সরল কথায় তাহার সদুত্তর দেন; কাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া তর্ক করা যেন তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ; যে যাহা বলেন কিছুতেই বিরক্তি নাই যেন সন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আমরা ভগবান পাইব কিরূপে।" শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় বলিলেন "তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়।"

প্রশ্ন। ভগবানকে চাহিলেই পাওয়া যায় ?

বাবাজী। নিশ্চয়, দেখুন ভগবান আপনাকে দিবার জন্য সতত ব্যস্ত কিন্তু আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে চাহিনা, চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন আমরা ভগবান চাই না।

বাবাজী। না, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে চাই না। দেখুন, আমার কথায় বিরক্ত হইবেন না। আচ্ছা বলুন দেখি, আমরা সামান্য অর্থের জন্য এ সংসারে যত কষ্ট স্বীকার করি, একটি পুত্র কন্যা বা আত্মীয়ের রোগ হইলে যত ব্যস্ত হই, আমাদের এক একটী বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির জন্য এ সংসারে যত একাগ্রতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কি আমাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্য আছে ? আমরা সকলেই এ সংসারে নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত। ভগবানও যে আমরা চাই তাহাও নিজের সুখের জন্য।

প্রশ্ন। মানব জীবনে প্রাপ্তির বস্তু সুখ ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

বাবাজী। আনন্দ, সুখ নয়।

প্রশ্ন। আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি ?

বাবাজী: সুখ মায়া কল্পনা; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্তু। সুখ নিজের জন্য ব্যস্ত, এ সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র; আনন্দ অপরের জন্য লালায়িত, সংসারের হইবার জন্য কাতর। সুখ প্রভু হইতে চায়; আনন্দ দাসানুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্ব্বদাই ভয় পাছে কিছু হারায়; আনন্দ আপনার যথাসর্ব্বস্ব অকুণ্ঠিত ভাবে বিতরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। সুখ সংসারের ধূলামাটি হইতে সতত সসঙ্কোচ, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সশঙ্কিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সংসারের সকল বাধা, সকল বিপত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এক হইয়া যায়। সুখ সুধার জন্য লালায়িত; আনন্দ দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধরিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া সদাশিব, সদানন্দে বসিয়া থাকে। সুখ স্বার্থ; আনন্দ নিঃস্বার্থ।

প্রশ্ন। এ আনন্দ পাইবার উপায়?

বাবাজী। ভগবৎ নাম সংকীর্ত্তনই আনন্দ ও ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন। নামসংকীর্ত্তনই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়?

বাবাজী। নিশ্চয়, ইহা আমার নিজের কথা নয়, আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্র এই কথাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন—সত্যে ধ্যান—ত্রেতায় যজ্ঞ—দ্বাপরে অর্চ্চন—কলিতে নাম সংকীর্ত্তন।

প্রশ্ন। হিন্দু শাস্ত্রে এ কথা আছে সত্য কিন্তু আমাদের অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মত, নাম সংকীর্ত্তন তারি মধ্যে একটী মাত্র পথ হইতে পারে।

বাবাজী। না শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতির্নন্যথা।"

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন এক্ষণে কলিকালে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা প্রভৃতিতে কোনরূপ ফল হয় না?

বাবাজী। আমি, এ কথা বলি না তবে আমাদের সনাতন শাস্ত্র এই কথা বলেন বটে। দেখুন, প্রকৃত কথা সকল পথই পথ; যিনি যে কোন পথ সরল অন্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন করিবেন তিনি তাহাতেই সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবেন। প্রকৃত ও প্রধান আবশ্যক সরলতা ও ব্যাকুলতা। তবে আবার ব্যবস্থাটী অবস্থানুরূপ হইল কি না, তাহা দেখাও একান্ত কর্ত্তব্য। যোগাদির জন্য যেরূপ দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন এক্ষণে কলির জীব আমাদের তাহা নাই। তাহার পর এখনকার মানব সমাজ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে,

প্রকৃতি যেরূপ সংস্কার-সম্ভূত হইলে যোগাদির কঠোর নিয়ম সংযম প্রতিপালনে মানবপ্রকৃতি সক্ষম হয় একালের অন্নগতপ্রাণ আমাদের প্রকৃতিতে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাগ যজ্ঞাদিরও কাল ও অবস্থা অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাগ যজ্ঞাদির আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদির অভাব। কালের প্রাদুর্ভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরও অভাব। আমরা এক্ষণে সন্ত্যতোন্মুখ কলির জীব, নিরন্তর বাসনা কামনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমে স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া কাল কলির প্রাদুর্ভাবে কামাসক্ত ও পাপোন্মুখ হইয়া মায়াকূপে অধোমুখে নিপতিত। এখনকার উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম প্রকাশ নাস্তিকতা হইয়া পড়িয়াছে; এ অবস্থার ব্যবস্থা, এ রোগের ঔষধি, ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন হইতে পারে না। তাই আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ পরহিতব্রত মহর্ষিবৃন্দ আমাদের জন্য আমাদের যোগের একমাত্র ঔষধি ভগবৎ নামসংকীর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই আবার আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি যাজন করিয়া জীবের মুক্তির উপায় মানবের পূর্ণ পরিণতির পথ দর্শাইয়া গিয়াছেন। দেখুন আমরা যদি একবার আমাদের নিজের অবস্থা নয়ন মেলিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি আমাদের জীব আখ্যাও নয়, নিত্য কৃষ্ণদাস এই অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে জীব আখ্যা হয়, আমাদের কি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইয়াছে? আমাদের প্রকৃত অবস্থা কলিতে কামাসক্ত পাপোন্মুখ, মায়াকূপে অধোমুখে নিপতিত, এই কাল ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আমার পরম দয়াল নিতাই (বলিতে বলিতে চক্ষু আরক্তিম, সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল) এই কলিহত জীবের জন্য হরিনাম মহৌষধি বিধান করিয়া, সাধিয়া কাঁদিয়া মার খাইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে পায়ে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাই, নামসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়।

প্রশ্ন। আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। আজ্ঞা করুন, আমি কেন বিরক্ত হইব। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার সহিত সদালাপ করিতেছেন।

প্রশ্ন। নাম সংকীর্ত্তনই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রের অগণ্য পথ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন উপাসনা ত কিছুই থাকে না, সে সমস্তই অলীক অপ্রকৃত; কার্য্যকরী নয় বলিতে হয়।

বাবাজী। কেন, কিসে তাহা আপনি অনুমান করিতেছেন?

প্রশ্ন। আপনি বলিলেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" কলিতে হরি নামই একমাত্র পথ অন্য পথ নাই, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি? কালী, তারা, শিব প্রভৃতি দেবতারই বা আবশ্যক কি? একথায় যেন বুঝায় আর সকল পথ ভ্রান্ত একমাত্র বক্তব্য পথটীই পথ। আপনি কি সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের তাহাই অভিপ্রায় বলেন?

বাবাজী! 'না, না, আমি তাহা বলি না বা সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেরও তাহা অভিপ্রায় নয়। দেখুন, এই বিশ্বরচনার চতুর্দ্দিক বৈচিত্র্যময়। একটী বৃক্ষে কত লক্ষ পত্র, কিন্তু দুইটী পত্র একরূপ হয় না, আমরা কত কোটি কোটি মানব, আমাদের মধ্যে দুইটী মানব আকৃতি ও প্রকৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়া যায় না। এই যেমন বিশ্বসংসারের একদিকে বৈচিত্র্যময় আবার তাহার আর একদিকে একটী অপূর্ব্ব মিলন বা সামঞ্জস্য। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে একটী পত্র খসিয়া মাটীতে পড়ে,সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত সৌরজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক দিকে পৃথিবীর সমস্ত মানবমণ্ডলী প্রত্যেকেই আপনাপন স্বরূপ স্বভাব লইয়া এ সংসারে কতই বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে আবার আর একদিকে প্রত্যেকেই এক স্থানে; এক সকলেই, প্রত্যেকেই আনন্দের জন্য প্রয়াসী, যে যাহা করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব এ জগৎসংসারে দুইটি পৃথক শক্তির খেলা নিরন্তর দেখা যায়, একটী আকর্ষণ, একটি বিকর্ষণ, একটী কেন্দ্রানুগ, একটি কেন্দ্রাতীগ, একটি টান রাখা, একটী ছাড় দেওয়া, এই নিত্য লীলাতেই সমস্ত প্রকাশ প্রকাশিত। ইহার একটীর স্বধর্ম্ম—অনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ, অপরটীর স্বধর্ম্ম—অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম উল্লাসকে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। অতএব যদি বিশ্বসংসারের সমস্তটা ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য, দ্বৈত্যের মধ্যে একেকে দেখা যায় ও বুঝা যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই বহুর মধ্যে একের লীলা, বহু হইয়া লীলা করাই লীলাময়ের লীলা। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের যথায় ব্যতিক্রম তাহা কখন প্রকৃত বা সত্য হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্র, আর্য্য ধর্ম্মও

যদি সত্য ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে তাহাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম, ইহা যে একমাত্র মানবের পূর্ণ পরিণতির ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ, তাহার একমাত্র কারণই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এককে উপলব্ধি করান, বহুর মধ্যে একের সামঞ্জস্য। তাই আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্তু এই সমস্তেরই উদ্দেশ্য, সেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করান। শাস্ত্র যেখানে বলিয়াছেন, কলিতে নামসংকীর্ত্তনই পাইবার একমাত্র উপায়, সেখানে বুঝা উচিত যে কোন সাম্প্রদায়িক নাম নহে। সত্যে ধ্যান, একথায় ইহা বুঝায় না বা আমাদের শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় না যে একটী মাত্র রূপের ধ্যান, বরং দেখা যায় যে, সে সময় কত শত শত বিভিন্ন দেবতার ধ্যানে মহর্ষিবৃন্দ তন্ময় হইতেন। ত্রেতায় যজ্ঞ, একথায় একটী মাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞের কথা বুঝায় না, সে সময় কত শত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞাদির কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কলিতেও নামসংকীর্ত্তন বলিলে শুদ্ধ কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট নামসংকীর্ত্তন বুঝায় না বা তাহাও তাৎপর্য্য নয়। তবে এক্ষণের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা নামসংকীর্ত্তন, ধ্যান যোগ যজ্ঞাদি নয়, ইহাই বুঝায়। সেই অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অনন্ত রসেশ্বরের অনন্ত রূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত রসকে, তাঁহারই প্রকাশ যে আমরা, সেই আমাদিগকে অনন্ত রূপে অনন্ত পথে জানিতে, পাইতে, অনুভব করিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে, ইহাই ত প্রকৃত, তাহা না হইয়া যদি সে অনন্তকে একটী মাত্র বাঁধা পথেই পাওয়া যায় বা অনুভব করা যায়, বা বলা যায় তাহা হইলে তাহা কখনই প্রকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। আপনি যে বলিলেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং ;" হরি নামই একমাত্র উপায়।

বাবাজী। তাহাতে দোষ কি ?

প্রশ্ন। উহাত কেবল মাত্র আমাদের হিন্দুধর্ম্মের একটী সাম্প্রদায়িক নাম। বৈষ্ণবেরাই হরিবোল দেয়, হরি নাম করে, হরি সংকীর্ত্তন করে, অন্য সম্প্রদায় করে না।

বাবাজী। দেখুন, যে বৈষ্ণব তাঁহার হরিকে কেবল মাত্র আপন সম্প্রদায় ভুক্ত করেন বা ভাবেন, তিনি বৈষ্ণব বা মহাজন হইতে পারেন কিন্তু আমার নিতাইএর দাস নন। আর যে সৌর, শাক্ত বা শৈব প্রভৃতি অন্য সাম্প্রদায়িক-

গণ হরি নাম আপনাদের সম্প্রদায় ভুক্ত বা তাঁহাদের উপাস্য নাম নয় বলেন, তাঁহারাও হরি শব্দের তাৎপর্য্য বা বুৎপত্তি যাহা আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় বুঝিয়াছি, তাঁহারা বোধ হয় সেরূপ ভাবে বুঝেন না।

প্রশ্ন। হরি শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

বাবাজী। আমরা মানব, বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত যোনির মধ্যে মানব যোনিই শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যোনিতে জীবের আহার বিহার মৈথুন ব্যতীত আর কতকগুলি বিষয়ের বিকাশ দেখা যায়। ভাব ও উপলব্ধিই সেই বিকাশ। আমরা অনাদি বহির্মুখ জীব, আমাদের এই মানব জীবন অবিদ্যা ও অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। অজ্ঞান ও অবিদ্যা পরাজয় না হইলে এ জীবনে ভাব ও উপলব্ধির বিকাশ হয় না, অতএব এ মানবের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয়। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয় করিতে হইলে বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক, এই বিদ্যা অর্থে প্রথম ভাষা। ভাষাই মানবের প্রকাশ। আজ যদি মানবের ভাষা না থাকিত, তাহা হইলে মানবকে মূক ও জড় সদৃশ হইতে হইত, মানবের মানবত্ব, আমাদের পরস্পরের হৃদয়ের আদান, প্রদান, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভক্তি কিছুই থাকিত না, ভাবিয়া দেখ আজ আমরা যে সকল পূর্ব্ব মহাজন ভারতের মহর্ষিবৃন্দের হৃদয়ের ভাব, প্রাণের উপলব্ধি, বেদ উপনিষদে প্রাপ্ত হই, ভাষাই তাহার মূল। আজ যে শাস্ত্রের কথিত অবতার সকল নিত্য বলিয়া বুঝি বা বিশ্বাস করি তাহারও মূল ভাষা; ভাষাতেই সেই সচ্চিদানন্দের নিত্যত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আবার আর এক দিকে দেখ, ভাষা শব্দ মাত্র। শব্দই ভগবৎ প্রকাশের সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ। প্রথম তন্মাত্র আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, শব্দে কম্পন, কম্পনে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ুর পরস্পর ঘর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত অগ্নি, ক্রমে তিন ভূতের সংমিশ্রণে জল, পরে চারি ভূতের ঘাত প্রতিঘাতে মৃত্তিকা।

ভদ্র। আপনি যদি কোন অপরাধ না লন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। সে কি—আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার মত অকিঞ্চিৎকরের সঙ্গে সদালাপ করিবেন। আপনি অকপটে যা বলবেন বলুন।

ভদ্র। নামের বিষয় আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই শাস্ত্রসম্মত কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নামের অর্থ বুঝিতে চাইনা। তবে শুদ্ধমাত্র মুখে নাম করিলেই অর্থাৎ একটী শব্দ উচ্চারণ

করিলেই কি নাম করা হয়, আর তাহাতেই পরমপদ লাভ হয়? আমার মনের কথা আপনাকে বলি। আজ কাল শ্রীমান মহাপ্রভুর পথাবলম্বীরা এই নামের মহিমা খুব উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তাঁহাদের কথার ভাব, নাম করিলেই পরমপদ লাভ হয়! কিন্তু তাই যদি হয় তাহা হইলে আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদের মধ্যে এত আবর্জ্জনা কেন? শ্রীমান মহাপ্রভু আজ চারিশত কয়েক বৎসর অপ্রকট হইয়াছেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ যেরূপ আবর্জ্জনা-ময় হইয়াছে বোধ হয় পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম এত শীঘ্র এরূপ হয়নি। প্রত্যক্ষ চারি ধারে দেখি যে যাঁহাদের জীবিকার উপায় হরিনাম সংকীর্ত্তন, যাঁহারা প্রতি দিন দুবেলা অহরহ নাম করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে তাঁহারা অনেকেই সামান্য নীতিরও বহির্ভূত, এর কারণ কি? আমি নামে কটাক্ষ করৃচি না। বড় ব্যথায় আপনাকে আজ একথা জিজ্ঞাসা করৃচি।

বাবাজী। আপনার প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা তাই এই প্রাণে ব্যথা। আমার বোধ হয় আপনার মনের ভাব, যে শাস্ত্র যখন বলিতেছেন যে ভগবৎ নামই পরম পদ লাভের উপায় তখন এই নাম বলিলে আমরা কি বুঝি? একটা পাখী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, একটা জড় যন্ত্র হরি নাম বলে, এইরূপ মানুষ যদি পাখীর মত বা যন্ত্রের মত নাম করে তাহাতে তাহার পরমপদ লাভ হইবে কি না অর্থাৎ বস্তু লক্ষ্য নাই, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই মনে ধারণা নাই অর্থাৎ প্রাণহীন মনহীন হৃদয় হীনের জ্ঞানহীনের শব্দ মাত্র উচ্চারণ কি নাম সাধন?

নিত্যানন্দ দাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সূচনা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ভারতবাসী আর্য্যগণ খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়া সভ্যসমাজোচিত আচার অনুষ্ঠান করিতেন। দিন দিন ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজগতের বিবিধ অনুষ্ঠান অতি পুরাকালে ভারতে অনুষ্ঠিত হইত; ফলতঃ বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক

পরিচালনা করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে যে যে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন, ভারতনিবাসী আর্য্যগণ সুদূর অতীত যুগে তাহার অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শক্তির বশে ভগবচ্চিন্তা এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ। পুরাকালে ইঁহাদিগের জীবনে এমন কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত না, যাহা ধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। এইজন্য মহামতি Monier Williams বলিয়াছিলেন Religion received no special name from the Hindus; they eat religiously; they sit religiously &c. ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণতা ভারতবাসীর চরিত্রবৈশিষ্য।

প্রাচীন ভারতবাসিগণ আর্য্যনামে অভিহিত এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আর্য্য-ধর্ম্ম। কালে সেই আর্য্যধর্ম্ম কোনও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কারণ হইতে হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছে এবং তৎকাল হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুস্থান নামান্তর ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য্য হিন্দুদিগের বংশধর এবং ইঁহাদিগের অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম পুরাতন আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের ছায়া। কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বশতঃ হিন্দুস্থানে পুরাতন শিক্ষার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং পরবর্ত্তী হিন্দুসন্তানগণ অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত হওয়ায় পূর্ব্বপিতামহগণের সভ্যতালোক নিরস্ত-প্রায় হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সমাজ শিল্প বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজনোচিত যাবতীয় বিষয় বিলুপ্ত, বিস্মৃত ও ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, কেবল সংস্কারের বীজমাত্র পশ্চাৎপুরুষগণের হৃদয়ে নিমীলিত ভাবে রহিয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই এই অধঃপতন সংঘটন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় রাজন্যগণ ঘোর অত্যাচারী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রজাদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া দেশ মধ্যে অতি ঘৃণ্য পাপাচারের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। দ্বেষ হিংসা চৌর্য্য প্রতারণাদি বর্ব্বরোচিত বৃত্তিগুলি এতই প্রবল হইয়া পড়িল যে, তৎকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধু চরিত্রের উপাদানগুলি অতি বিরল হইয়া উঠিল; ফলতঃ তখন হিন্দুস্থানে হিন্দু আর্য্য-বংশধরগণ যে, আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইতর অন্ত্যজ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে ছিলেন এবং পাপস্রোত অপ্রতিহত বেগে হিমাচল প্রদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যখন একছত্রী সম্রাট সভামধ্যে

কুলকামিনীকে উলঙ্গ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং সহস্র সহস্র সভ্য, রাজমন্ত্রী, রাজন্য স্বচক্ষে সেই পৈশাচিক অত্যাচারের অবতারণা দেখিয়াও নীরবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখন যে, দেশ কিরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা অসাধ্য, মানসচক্ষে তচ্চিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ভারতের অধঃপতন ও ধর্ম্মহীনতার সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মই জগতের জীবন*, ধর্ম্ম-মূল ছিন্ন হইলে নিমেষ মধ্যেই জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনুকণায় পরিণত হইয়া যায়। সেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইতেই ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইল, ভারতে পুনরায় ধর্ম্মবল সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তখন ভগবানের সেই ধর্ম্মসংস্থাপিকা শক্তি যে দিব্য দেহ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, তাহা জগতে যদুবংশাবতংশ শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণ-চন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতেজে ভারত-রাজন্যদিগকে অভিভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন।

হিন্দু আর্য্যগণ ধর্ম্ম-সাধনই মোক্ষলাভের এক মাত্র উপায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ধর্ম্মসাধনের তিনটী পন্থা। বেদ কর্ম্মপক্ষপাতী এবং মহর্ষি জৈমিনী বেদের পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিয়া যে মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; বেদান্ত বলিতেছেন, আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রধান সুহায়, এবং মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত শাস্ত্র অবলম্বনে যে শারীরক মীমাংসা রচনা করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা উক্ত মতাবলম্বী। অনেকের বিশ্বাস ধর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গই প্রাচীন-মত-সিদ্ধ পদ্ধতি, ভক্তি-পথ পৌরাণিক যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বৈদিক সময়ে ভক্তি-পথের প্রচার ছিল না; কিন্তু এ অভিমত সমীচীন নহে। যাঁহারা ভক্তিমার্গের বৈদিকতায় সন্দিহান তাঁহা-দিগের মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন জন্যই দুই একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।—

* "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তত্রৈকোজগতঃ স্থিতি-কারণং———" শাঙ্করভাষ্যে।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম দুই ভাবে প্রকাশমান, তন্মধ্যে প্রথম ভাব দ্বারা জগতের স্থিতি সংসাধিত হইতেছে।

নিরুক্ত ষড়ঙ্গ বেদের একটী অঙ্গ, মহর্ষি যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তের নির্ব্বাচন টীকায় দেবতার সংজ্ঞা স্থলে লেখা হইয়াছে—

"দেবাঃ দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ"

যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করেন তাঁহারাই দৈবতা। এস্থলে স্পষ্টতঃ ভক্তি শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আরণ্যকের উপাসনা কাণ্ডেও ভক্তিমার্গের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের শ্রুতি বচনেও স্পষ্টতঃ ও গৌণতঃ ভক্তিবিষয়ী তত্ত্ব শ্রুত হইয়া থাকে ;—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুশ্রুতেন যমেবৈষ বৃনুতে স তেন
লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবিবৃনুতে তনুং স্বাং"। (কঠ)।

এই (উপদিষ্ট) আত্মা (পুরুষ) বেদপাঠে লাভ করা যায় না (আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না), তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা স্মৃতিতে তাঁহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, যথেষ্ট শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলেও তাঁহাতে অধিকার না জন্মাইতেও পারে, তিনি দয়া করিয়া যাঁহাকে জানিবার অধিকার দেন, তিনিই সেই পরম পুরুষের তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন; অর্থাৎ যে সাধক ভক্তিবলে পরম পুরুষের অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, পরমপুরুষ দয়া করিয়া সেই সেবকের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর আরও স্পষ্ট করিয়া ভক্তিপথের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত দর্শনে যোগই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থেও তদুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেকে ধর্ম্মসাধনায় যোগ একটী স্বতন্ত্র পন্থা বলিয়া চারিটী পন্থার উল্লেখ করেন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যোগ কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত। ফলতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মোক্ষলাভের জন্য উক্ত তিনটী পথই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাভারত-কালের, অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের অভ্যুদয় কালের, কিছু পূর্ব্বে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-সাধনা চারিটি স্বতন্ত্র পন্থারূপে সাধকগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত হইত; অর্থাৎ কর্ম্মাশ্রয়ীর বিশ্বাস—

একমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়; ভক্তি-পথের পথিক ভক্তিই পরমানন্দ লাভের অদ্বিতীয় শরণি ভাবিয়া অন্য সাধনগুলি উপেক্ষা করিতেন; জ্ঞানী ভাবিতেন আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্ম-সঙ্গতি অসম্ভব, সুতরাং একমাত্র আত্মজ্ঞানই আশ্রয়ণীয়; যোগ মার্গ অবলম্বন ও তদঙ্গসাধন ব্যতীত কৈবল্য প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই বলিয়া যোগী মুক্তকণ্ঠে উপদেশ দিতেন। তৎকালে উক্ত চতুর্বিধ পথাবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পরের মত-ভেদজনিত বাদ-প্রতিবাদে দেশে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে লাগিল। যিনি কর্ম্ম-পথাবলম্বী তিনি বেদের দোহাই দিয়া নামে মাত্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পশু-হত্যা ইত্যাদি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণায় দয়া স্নেহাদি কোমল বৃত্তিগুলি বিনষ্ট করায় ভারতবাসিগণ ভীষণ নরপিশাচ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পথাবলম্বীদিগের মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীনতা বশতঃ ভারতে প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানীর অসদ্ভাব হইয়া উঠিল; যোগী যোগের নিগূঢ় রহস্য বিস্মৃত হইয়া কয়েকটি আসনমাত্র সাধন করিয়া আপনাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং যোগী কালে ঐন্দ্রজালিক হইয়া দাঁড়াইলেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তৎকালে ভারত-বাসিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রায় বাহ্য আচারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহাভারত-বর্ণিত দুরন্ত রাজগণের আচরণ তাৎকালিক ধর্ম্ম-গ্লানির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবান যদুনন্দন ভারতের বিলুপ্ত ধর্ম্মভাব পুনরুজ্জীবিত করিতেই বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হয়েন।*

---

* "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োহর্থিভি-রনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মে-নাভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণা-খ্যোবিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্"।

শাঙ্করভাষ্য।

বেদে ধর্ম্মের দুই ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যথা প্রবৃত্তিলক্ষণ, নিবৃত্তিলক্ষণ, তন্মধ্যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ভাব হইতেই জগত সংস্থিত রহিয়াছে; ধর্ম্ম প্রাণিগণের সমুন্নতি ও কৈবল্যের প্রত্যক্ষ উপায়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমিগণ উক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কালক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের কামনার প্রাবল্য বশতঃ বিবেক-বিজ্ঞান মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং তজ্জনিত অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত করিয়া দেন, তখন সেই সর্ব্ব-

তিনি জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ও যোগ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ সাধন-পদ্ধতি মিলাইয়া এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সেই অভিনব তত্ত্বের উপদেশ সংগ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে অহৈতুকী ভক্তিই পরমার্থ লাভের ফল; শ্রীভগবান কৈশোরে শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রজগোপী ও ব্রজ রাখালগণকে ঐ অহৈতুকী ভক্তি সাধনে ব্যাপৃত রাখিয়া সেই সময় হইতেই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্যোগ করিতে ছিলেন। সেই অহৈতুকী ভক্তিতে অধিকার জন্মিবার জন্য ভক্তিকে প্রধান রাখিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভক্ত সাধকের মহাভাবের অবস্থা যোগোক্ত সমাধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে বিষয়-বিশেষের প্রাধান্য থাকিলেও জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ও যোগের শিক্ষা অল্পবিস্তর সকল অধ্যায়েই বর্ণিত আছে। অধ্যায়গুলি ছয় ছয়টী করিয়া তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাধকের আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া কর্ম্ম সাধনার উপদেশ নিবদ্ধ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় পরম ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়া ভক্তি সাধনার শিক্ষায় পূর্ণ, এবং তৃতীয়ে জীব ব্রহ্মের অভেদ আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (১)।

নিয়ন্তা নারায়ণ নামে পরিচিত বিষ্ণু জগতের স্থিতি ও পরিপালনেচ্ছু হইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষাজন্য বাসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবদংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষা হইলেই বৈদিকধর্ম্ম রক্ষিত হয় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহার অন্তর্গত থাকায় তাহা ও রক্ষা পায়।

(১) "ষট্‌ত্রিকেস্মিন্‌ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট্‌কেন ঈশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বর-ভক্ত্যুপযোগি স্বরূপ-দর্শনম্‌। তচ্চান্তর্গতজ্ঞানং নিষ্কামকর্ম্ম-সাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরম প্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তি স্তন্মহিমাপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরাদীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে।" শ্রীবলদেবঃ।

ত্রিষট্‌ক গীতাগ্রন্থের প্রথম ষট্‌কে (ছয় অধ্যায়ে) ঈশ্বরাংশস্বরূপ জীবের অংশিরূপ ঈশ্বরে ভক্তির উপযোগিতা এবং তাহার উপায় স্বরূপ নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে ভক্তির সাধনস্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়া পরম আশ্রয় অংশী ঈশ্বরের সঙ্গতি-সাধিকা ভক্তি এবং তদীয় মহিমা বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয়ে পূর্ব্বোক্ত অংশ অংশী ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান এই পঞ্চ তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে।

"তত্র অধ্যায়ানাং প্রথমেন ষট্‌কেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ তৃতীয়েন জ্ঞানযোগঃ দর্শিতঃ।" বিশ্বনাথঃ।

অধ্যায় গুলির মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ, এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

গীতা একখানি বেদান্ত গ্রন্থ বলিয়া বেদান্তবাদিগণের বিশ্বাস, এবং বৈদান্তিকচূড়ামণি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তৎপ্রতিপাদন জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অতি বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যোপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে——

"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং
...........অর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি।"

[এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বৈদিক তত্ত্বের সারসংগ্রহ; ইহার অর্থ অতি গম্ভীর, সহজে ইহার ভাব গ্রহণ করা যায় না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ জন্য সংক্ষেপে গীতার গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিব।]

"তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপেতঃ প্রয়োজনং পরং
নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র মোক্ষই এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্দেশ্য বস্তু।

যে শাস্ত্রে সর্ব্ববেদতত্ত্ব সংক্ষেপেতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে যে, পরমতত্ত্ব (নিত্য-পদার্থ-তত্ত্ব) আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচ্য পদার্থ যে, গীতাগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উপক্রমণিকা হইতেই তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইতেছে; পরন্তু শ্রীশঙ্কর স্বীয় মনোগত ভাব স্ফুটিকরণ জন্য পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, মোক্ষই গীতার প্রয়োজন। মোক্ষ শব্দের অর্থ মায়াপনোদন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দভাব-স্ফুরণ (বিবিধ-কার্য্য-কারণ-ভাবসমন্বিত সংসারের একান্ত নিবৃত্তি)। জীবের মায়াবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার জীবত্ববন্ধন মুক্ত হয়, তখন জীব আর স্বতন্ত্র নহে, শিব হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক। এই গভীরতম তত্ত্ব যে শাস্ত্রের লক্ষ্য তাহা যে বেদান্তশাস্ত্র তাহাতে সন্দিহান হইবার আর কোনও কারণ থাকে না।

বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য মহাবাক্য গীতায় অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদ্য ছয় অধ্যায়ে মহাবাক্য-ধৃত "ত্বং" পদের বাচ্য জীবাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে "তৎ" পদের লক্ষ্য পরম তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং অন্ত ছয় অধ্যায়ে জীবব্রহ্মের ঐক্য বিচার দ্বারা "অসি" পদের অর্থ নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ জীব-শিব

অভেদ জ্ঞানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।* ফলতঃ গীতা গ্রন্থের আলোচ্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা মধ্যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের নিগূঢ় রহস্য বিবৃত রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গীতা বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, মহর্ষি-বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের অংশ বিশেষ। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-কুমার শুদ্ধ-সত্ত্ব সব্যসাচীকে স্বীয় অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তদীয় অলীক সংশয় অপসারিত করিবার জন্য যে শিক্ষা প্রদান করেন তাহাই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া গীতারূপে সংগ্রথিত হইয়াছে। গীতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা হইলেও উহা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই উপদেশ-বাক্য† অনেকে বলেন মহর্ষি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবিনিঃসৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শ্লোক রচনা করিয়া গ্রন্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।‡

গীতা গ্রন্থের ভাষা সরল হইলেও ভাব অতি গভীর। গীতার যথার্থ গ্রহণ করিতে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার প্রয়োজন। গীতার অধিকাংশ শ্লোকই শ্রুতিমূলক। শ্রুতিবাক্য সংক্ষেপে যে তত্ত্বপ্রকাশ করেন, গীতার শ্লোক মধ্যে সেই নিগূঢ় ভাব সম্বদ্ধ রহিয়াছে; ভাষার স্তর হইতে ভাব স্তরে নিমগ্ন হইলে তবে তাহা অনুভূত হয়। গীতার শ্রুতিমূলকতা প্রকাশ জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন——

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

* "তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্মত্যাগবর্ত্মনা। ত্বম্পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠাবর্ণন-বর্ত্মনা। ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে॥
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম। এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্॥

† "তৎ ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টঃ বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈরূপনিবন্ধন।"

‡ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তিনি স্বীয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ, যথোক্তং গীতিমাহাত্ম্যে—

'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥' ইত্যাদি।"

গোপালগণ যেমন বৎসের সাহায্যে পিপাসুদিগের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য গাভী দোহন করিয়া অমৃতাধার দুগ্ধ প্রদান করে, নন্দগোপনন্দন শ্রীমৎ-কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের ন্যায় অমৃতধারা প্রস্রাবিণী গাভীরূপা উপনিষন্নিচয় বৎস-রূপ পার্থকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব-পিপাসু সুধীগণের তত্ত্বতৃষ্ণা নিবারণ জন্য দোহন করিয়া গীতা-দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন।

গীতা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট নহে। গীতা-প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বে আস্তিক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে না। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এক গীতা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গীতা একাধারে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব (*Theology*)। ঈশ্বর-পরতা গীতার প্রধান শিক্ষা।

গীতা-প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে এই বলা যাইতে পারে যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি সাধন জন্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনু-মোদিত আচার-সমূহ আসক্তিহীন-চিত্তে সাধন করিয়া, সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বেশ্বরের সেবায় সেই সমুদায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিলে, ভক্তিলতায় পরজ্ঞাননিষ্ঠা-ফল ফলিতে থাকে। সেই অমৃত-রসাস্বাদে আপ্যায়িত হইলে জীব-শিব অভেদ বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং তৎকালে পরাভক্তি প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, সুতরাং মায়াবন্ধনমুক্ত হইয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমে তখন তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, তিনি জগৎ ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে আত্মরতি উপভোগ করেন। ইহাই গীতার চরম শিক্ষা।*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। অন্ধমহারাজ গৃহে বসিয়া ভারতসমরের ব্যাপারপরম্পরা জিজ্ঞাসু হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং তাঁহার মুখে উত্তর শ্রবণ করিতেছেন। সর্ব্বসমেত ৭৪৫টী শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ১টী, সঞ্জয়ের ৬৭টী, অর্জ্জুনের ৫৭টী এবং শ্রীকৃষ্ণের ৬২০টী শ্লোকে গীতা-গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে ; ফলতঃ গীতার প্রধান অংশ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও শিক্ষা। অর্জ্জুনের বাক্যগুলি সংশয়পূর্ণ প্রশ্নমাত্র ; কেবল প্রথম

*...........তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি তমর্থমেব গীতার্থ মুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং......" শাঙ্করভাষ্যে

অধ্যায়ে ২১—২৩ শ্লোকে তিনি সমরায়োজন পরিদর্শন মানসে শ্রীভগবানকে উভয় পক্ষীয় সেনাব্যূহ মধ্যে রথস্থাপন জন্য অনুনয় করিয়াছেন, এবং ২৮ হইতে ৪৫ শ্লোকে যুদ্ধ-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কৌরবগণ মদান্ধ, অহংকারের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্রদিগকে সূচ্যগ্রপরিমাণ* স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রচার করিলে অজ্ঞাতবাস-প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণসহায় মহারাজ ধর্ম্মনন্দন অগত্যা ধর্ম্মযুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। মহাভারত পাঠ করিলে মহারাজ ধর্ম্মরাজের ভারত-সমর-সমুদ্যম যে প্রকৃতি প্রেরিত ও তৎকালীন অবস্থায় একান্ত অপরিহার্য্য তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্বে উপস্থাপিত যুদ্ধ যে ধর্ম্মযুদ্ধ তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধার্থী জানিয়া কৌরবগণও স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের অশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থী হইয়া কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সৈন্যসমাবেশ ও শিবির স্থাপন করিলেন। ক্ষত্রিয়তনয়গণ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, উভয়পক্ষের সেনা নানাপ্রকার বীর্য্যাস্ফালন করিতেছে, তূর্য্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় অন্ধরাজ চিন্তা করিলেন— কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র তীর্থ, তথায় পদার্পণ করিলে সর্ব্বপাপ দূর হইয়া যায়, তদীয় পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপনীত হইয়া তীর্থ-মহাত্ম্যে স্বীয় কোপনভাব ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত মৈত্রবন্ধনে সম্বন্ধ হইল কিনা। মহারাজ সন্দিহান হইয়া তৎকালে তদীয় পুত্রগণ কি করিতেছেন সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক।

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকটী ব্যতীত গীতার অন্য সমস্ত শ্লোকগুলি সঞ্জয়ের মুখে অন্ধরাজ শ্রবণ করিতেছেন, এই ভাবে রচনা করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ বর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাক্যগুলির সূচনার জন্য সঞ্জয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ব সমেত ৬৭টী শ্লোকে নিবদ্ধ, তদ্ব্যতীত অন্য যাবতীয় কথোপকথন তিনি প্রজ্ঞা-বলে অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করাইতেছেন।

গীতার প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্য-সমাবেশ, অর্জ্জুনের সমরায়োজন নিরীক্ষণ, আত্মীয়-

* "সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ বিদ্যতে যাচ মেদিনী
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব ॥"

প্রিয়জন-বধোদ্যমের চিন্তায় হৃদয় দৌর্ব্বল্য, ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ও যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ; এই কয়টী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ অনিত্য সংসারে লোকের আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি হইতেই শোক-তাপাদি বিবিধ সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? সম্বন্ধময় জগতে আমার সহিত কাহারও কোনও প্রকৃত সম্বন্ধ আছে কি না? এই নিগূঢ় রহস্য কয়েকটির মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলেই জীবের সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হয়, তখন আত্ম-তত্ত্ব পাইয়া জীব আত্মারাম হইয়া উঠে এবং জীবত্ব ত্যাগ করিয়া শিবত্বে অধিকার লাভ করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের ভাগ্যে শান্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই আত্মতত্ত্ব অতি বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন; আত্মবিজ্ঞানই গীতার মর্ম্ম-কথা। এই আত্মজ্ঞান শোক-মোহ-ব্যাধির অমোঘ ঔষধি; এই ঔষধির পরিচয় দিবার জন্যই বিজিতেন্দ্রিয় শুদ্ধসত্ত্ব যোগসিদ্ধ সাধক ধনঞ্জয়ের জ্ঞাতিবধ-চিন্তায় শোক-জ্বর সূচনা করা হইয়াছে। ঈদৃশ রসাত্মক সূচনা হইতেই গীতা-গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইতে পারে। পরম পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র যাহার স্থান, দ্বাপর ও কলির সন্ধি যাহার কাল, সর্ব্বশক্তিমানের ধর্ম্মসংস্থাপিকা শক্তির প্রকটবিগ্রহ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রধান নায়ক, ভারত রাজন্য-কুল-গৌরব পশুপতিবিজয়ী ধনুর্দ্ধর বিজয় যাহার উপনায়ক, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগ-সমন্বয় যাহার অন্তর্তত্ত্ব, সেই গীতা-গ্রন্থ যে কাব্যজগতে গৌরবান্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ গীতা একাধারে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য পুরাণ ইতিহাস ও উপাখ্যান। গীতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতীয় পণ্ডিতগণ গীতা হৃদয়ের ধন বলিয়া গীতার আদর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। প্রকৃতই গীতা হৃদয়ের ধন;—টীকা টিপ্পনী ভাষ্য ব্যাখ্যায় গীতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, একান্ত-চিত্তে অনুধ্যান করিলে গীতার ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। গীতার প্রসর মধ্যে ভাষার অধিকার সম্ভব নহে, হৃদয়ই তথায় প্রবেশ-লাভ করিতে পারে।

শোকবিক্ষুব্ধচিত্ত মহামনা অর্জ্জুন প্রাকৃত সাংসারিক বুদ্ধিতে যুদ্ধের অনর্থত্ব বিচার এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় বাদ-প্রতিবাদে যুদ্ধ পরিহারই ন্যায়ানুমোদিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণও

অর্জ্জুনের এই দ্বিধির তর্কের মীমাংসা জন্য আত্মজ্ঞান ও নৈষ্কর্ম্ম্য-তত্ত্ব উপদেশ দিয়া ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গীতায় সাংখ্য ও বেদান্তমতের বিচার স্থান পাইয়াছে, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শনের বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন "তস্যাং খল্বীশ্বর জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পদার্থা বর্ণ্যন্তে"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চ পদার্থের আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ গীতা অতি অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ। প্রত্যেক তত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তিরই গীতা-শাস্ত্র অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিয়া কার্য্য-জীবনে তদুপদেশ অনুশীলনের অধিকার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ নহে, * সুতরাং অগ্রে অধিকার লাভের চেষ্টা আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুলোচনা।

(গল্প)

পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে সুলোচনা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাটী সন্নিহিত আম্রকাননে সমবয়স্কা বালিকাগণের সঙ্গে বাল্যসুলভ ক্রীড়া-নিরতা থাকিত; তখন কোন অপরিচিতের দৃষ্টি-গোচর হইলে তাহাকে অপ্সরা কন্যা, দেববালা, বা সেই নিবিড় অরণ্য সঙ্কুল প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বলিয়া তাহার মনে ভ্রম হইত। সুন্দর টানা টানা ভাসা ভাসা চোখ দুটি, নীল অম্বুধির বারিরাশির উপর অস্তাচল চূড়াবলম্বী তপন কিরণের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া যেন সেই সুশ্রী মুখখানির আরও সরলতা প্রকাশ করিতেছে। বালিকার মুখশ্রী এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব নয়ন-গোচর হইলেই মনে হয় যেন বিধাতা বিরলে বসিয়া এই অপরূপ প্রতিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমবয়স্কাগণের সহিত ক্রীড়া কালীন বালিকার সেই ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম ইতঃস্ততঃ বিন্যস্ত হইয়া আরও সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিত।

---

* "অস্য শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী। স চ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-নিরপেক্ষভেদাৎ ত্রিবিধঃ। তেষু স্বর্গাদি-লোকানপিদিদৃক্ষুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ (সনিষ্ঠঃ)। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতঃ দ্বিতীয়ঃ (পরিনিষ্ঠিতঃ) স চ সাশ্রমঃ। সত্যতপোজপাদিবিশুদ্ধচিত্তেন হর্য্যেকনিরতস্তৃতীয়ঃ (নিরপেক্ষঃ নিরাশ্রমঃ।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা সুলোচনা ক্রমে ক্রমে বয়স্থা হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমল যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ যেরূপ বিকশিত হয়, যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাহার সৌন্দর্য্য-রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য অলৌকিক, অতুলনীয়!!

অলৌকিক রূপরাশির শুধুই আদর করা যায় না, মানসিক ভগবচ্চিন্তা জনিত যে এক অন্যতর অসীম সৌন্দর্য্যের নৈসর্গিক বিকাশ হয়, সে সৌন্দর্য্য প্রত্যুত পবিত্র হইতে পবিত্রতর।

তবে এই উভয় সৌন্দর্য্যই যাহাতে বর্ত্তমান তিনিই বাস্তবিক পূজ্য, আদরণীয়, এবং বরেণ্য। লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে করুণাবর্ষণ করিলে যেরূপ কমনীয়তা, স্নিগ্ধভাব, পবিত্রতা, এবং বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণে সে ব্যক্তি ভূষিত হইয়া থাকে; সেইরূপ এ ভূষাও অপরূপ সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। বালিকা সুলোচনার বয়সের সহিত, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয় তাহার অন্তঃকরণের অধিকারী হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বলিত "মেয়ে হইতে হইলে যেন বিশ্বনাথের মেয়ের মত হয়, আহা, কেমন মেয়ে, দেখিলেই শরীর ও মন পবিত্র হয়, চক্ষুও শীতল হয়। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। এরূপ মেয়ে লাভ বহু ভাগ্যের ফল।"

(২)

কন্যা বয়স্থা হইলে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থাভাবে এবং দুশ্চিন্তায় পিতা মাতাকে অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সুলোচনার পিতা মাতার এখন সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অল্প বয়স্কা কন্যাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ হয়; অন্যথাচরণে পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়। বরানুসন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই প্রচুর অর্থ চাহিল। সুলোচনার পিতার অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নহে, তাঁহার আয় অতি অল্প, সুতরাং কন্যাকর্ত্তা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানে একটি সুপাত্র মিলিল। শুভদিনে এবং শুভলগ্নে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, কিন্তু কন্যাকর্ত্তা বিশ্বনাথ বাবু এই কন্যা-দানে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এতাদৃশ সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কন্যাদানেও কন্যাকর্ত্তা বিশ্বনাথ বাবু মানসিক শান্তি পাইলেন না। দরিদ্র বিশ্বনাথ তাঁহার বাস্তবাটী পৈতৃক ভদ্রাসন অলঙ্কারাদি সমস্ত দ্রব্যের বিনিময়ে এই

বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি গরবিণী বৈবাহিকার মনস্তুষ্টি সাধনে সমর্থ হ'ন নাই। বৈবাহিক-বাটী হইতে ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া যে ব্যক্তি আগমন করিল গর্ব্বিতা গৃহিণী তাহাকে নানা কটু তিরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন। বাক্যযন্ত্রণায় বালিকা সুলোচনার আর দুঃখের ও কষ্টের অবধি রহিল না। সে দিবস ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বামী যদি দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন কোমলপ্রাণা কাতরা বালিকার সুন্দর বদন মণ্ডলে মুক্তাবিন্দুনিভ কয়েক ফোঁটা অশ্রু, কপোল দেশ বহিয়া পতিত হইতেছে।

অষ্টমঙ্গলায় বিশ্বনাথ কন্যা আনয়ন জন্য বৈবাহিক ভবনে গমন করিলেন। আহা, পিতৃমাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য সততই ব্যাকুল! বৈবাহিকা বলিয়া পাঠাইলেন "বেয়াই কোন্ লজ্জায় মেয়ে নিতে এসেছে? চোখখেঁকো মিন্সের কি কোন আক্কেল নাই? তাঁর মেয়ে কি জলে পড়ে আছে। বৌ পাঠাব না, আমার খুসী। যদি কখন অনন্ত দিতে পারেন বা অনন্তর মূল্য আড়াইটিশ টাকা দিতে পারেন, যেন একটি পয়সা কম না হয়, তবে মেয়ে নিয়ে যাবেন। নইলে আমি এমন মেয়েই নই, কই বাপের বাড়ীর নাম করুক দেখি, মা বাপ মরে গেলেও পাঠবনা।"

রোষপরায়ণা গর্ব্বিতা গৃহিণী, বধুর সাক্ষাতেই বৈবাহিকপ্রদত্ত মিষ্টান্নের হাঁড়ি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, বালিকা সুলোচনার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দরিদ্র পিতার ইহা কত কষ্টসঞ্চিত ধন! এই সামান্য টুকু সঞ্চয় জন্যই যে তাহার কত তপ্তশ্বাস পতিত হইয়াছে। হায়, তাহার স্নেহময় পিতা আজি তাহারই জন্য পথের ভিখারী!

(৩)

বুদ্ধিমতী বালিকা সুলোচনা অল্পদিন মধ্যেই শ্বাশুড়ীকে চিনিতে পারিয়াছিল, বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন জল মার্জ্জনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তাহার পর ছয় মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুলোচনা শ্বশুরালয়েই আছে; কিন্তু বাল্যে যে স্থানটিতে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে করুণাধারায় ক্ষুদ্র লতিকাটির ন্যায় শৈশব হইতে যৌবনাবধি, কত স্নেহে, কত যত্নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই স্থানটির কথা অদ্যাপিও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও অপসৃত হইত না। দিবা দ্বিপ্রহরে স্নেহময়ী মাতার সেই শান্তিময়

মুখচ্ছবি, পিতার সেই স্নেহময় মূর্ত্তি, তাহার অন্তরে উদিত হইয়া প্রাণে আরও ব্যাকুলতা হইত; বালিকার নয়ন দুটি জলে টস্ টস্ করিত। অপরাহ্নে যখন নদীতে জল আনিবার জন্য গমন করিত, তখন যে পথে সে পিত্রালয় হইতে আগমন করিয়াছে, সেই পথে গোশকট শ্রেণী দৃষ্ট হইলে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া যেন ক্রন্দন করিয়া বলিত, "মা গো, কবে বাড়ী যাব?" উপরে নানাবিধ পক্ষীকুল কলরব করিতে করিতে উড়িয়া যাইত, বালিকা সুলোচনা একাগ্র চিত্তে তাহাই দেখিত ও তাহার মনে হইত "আহা, এই সকল পাখীগুলি তো আমাদের ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, আমি যদি পাখী হইতে পারিতাম!" যদি প্রত্যহ রাত্রিতে কেহ দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন সকলেই ঘোর নিদ্রাভিভূত কিন্তু বালিকা সুলোচনা বিনিদ্র অবস্থায় উপাধান সিক্ত করিয়া কৃত রাত্রি অতিবাহিত করিত।

সুলোচনার স্বামী বিমলচন্দ্র কলিকাতা কলেজে অধ্যয়ন করেন, মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া থাকেন; কিন্তু এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি, কি জানি কেন বিধাতা বিমলচন্দ্রকে কিরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মাতার স্বভাব হইতে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা বলিতে পারেন না। বাটিতে যখন আগমন করেন, সকলই শ্রবণ করেন এবং নীরব থাকেন; বিশেষ জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন তাঁহাকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে, যেহেতু তিনি বালবিধবা, আজন্ম ভ্রাতৃগৃহবাসিনী এবং মাতার মন্ত্রিস্বরূপিণী।

সুলোচনার নেত্রে অশ্রুবিন্দু দেখিলে, বিমলচন্দ্রের চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া আসিত। একদিন নিভৃতে বিমল তাহার দিদিকে বলিল, "দিদি, বৌএর রোজই রাত্রে একটু একটু জ্বর হয়, যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করে এইবার একবার পাঠিয়ে দিও, ছেলে মানুষ বোধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য ভাবনা হয়।"

বিমলচন্দ্রকে আর অধিক বলিতে হইলনা দিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "বা, বা, বিমে, তোর এখন বেশ টন্‌টনে জ্ঞান হয়েছে, দেখ্‌ছি; মার মত গেল, আমার মত গেল, গুরুজনের মত গেল এখন ছেলেদের মতে কাজ হবে। বেশ, বেশ, ভাল তাই করিস, পাল্কী বেহারা ডাক্‌তে কোথা দেরী হয়ে যাবে, যা কাঁধে করে দিয়ে আয়। আহা, কচি খুকী, ননীর পুতুল

আতপে গলে গেল।" বিমলচন্দ্র আর বলিতে সাহস করিলেন না, অবনত বদনে নীরবে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমল একটি গণ্ডমূর্খ, স্ত্রীবশ, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিরোধী, তাহা চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সকলেই একটা কথা পাইয়া পরম আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। রমণীগণও ঘাটে জল আনিবার কালীন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চারিদণ্ড গল্প করিবার একটা ছুতা পাইলেন। পরদিনই বিমলচন্দ্র কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পর বিমল আর একবৎসর বাটী আসিল না।

একদিবস সুলোচনার পিত্রালয় হইতে তাহার পিতার প্রেরিত একজন লোক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল "সুলোচনার মাতা সংশয়াপন্ন কাহিল, তিনি মৃত্যুকালে একটিবার কন্যাকে দেখিতে চাহেন, তাহার পিতা বড়ই বিব্রত, নহিলে তিনিই আসিতেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার এই অন্তিমের অনুরোধটী রক্ষা করিতেই হইবে। সুলোচনাকে একটী বার পাঠাইয়া দিয়া দয়া প্রকাশে অন্যথা না হয়। বৈবাহিকের প্রেরিত লোক গৃহিণীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও তিরস্কারের চোটেই পলায়ন করিল।

দুইদিন পর সংবাদ আসিল সুলোচনার মাতা মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া সংসারের সকল মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কন্যাবৎসলা জননীর তনয়াবিরহরূপ যে জলন্ত বহ্নি দিবানিশি হৃদয়াভ্যন্তরে প্রজ্জলিত ছিল, হায়! তাহা চির দিনের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। মায়ের মৃত্যুতে বালিকার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আহা, সুলোচনা মাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিল। শ্বশ্রূর গঞ্জনা, নিষ্ঠুরা ননন্দিনীর বিষসদৃশ বাক্যবাণ, বিদ্রূপ পূর্ণ হাস্য, কিছুই তাহার নিদারুণ ক্রন্দন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। তদবধি সুলোচনা আরও রুগ্না হইল। ক্রমে সে শয্যা লইল। সুলোচনা আর সে কোমল সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলমালাটির ন্যায় নাই। এখন আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চননিভবর্ণ কালিমাময়, সে সুন্দর বদন মণ্ডল শুষ্ক ও বিবর্ণ। কেহ কখন বধুর সংবাদ চাহিলে করুণাময়ী শ্বশ্রু ও ননদিনী তাচ্ছিল্যের হাস্য হাসিয়া উত্তর প্রদান করেন, "তেমনই আছে, আর কি, কইমাছের পরাণ, ও কি মরবার ?'

বিমল চন্দ্র আজি একবৎসর বাটী যান নাই, বাটী হইতে আর নিয়মিত

পত্রাদিও আসেনা। বিমল অদ্য প্রাতঃকাল হইতে নানাকাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কি জানি কি কারণ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া থাকিয়া কোনও একটা বিপদাশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্যমনস্ক হইবার নিমিত্ত টেবিলটির নিকট গমন পূর্ব্বক ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বই খুলিতে যাইবেন, এরূপ সময় কে একজন তাঁহাকে আহ্বান করিল, সত্বর বাহিরে আসিলেন, তারবাহী পিয়ন বলিল "বাবু তার আছে"।

বিমলচন্দ্র সহি করিয়া, টেলিগ্রামটি হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলটির নিকট, আগমন করিলেন। আবরণ উন্মোচন করিতে যেন সাহসই হয়না; অদ্য পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে এইরূপে এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ এই নিষ্ঠুর টেলীগ্রাম তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। অদ্য বিমলের মনে সেই দিন উদয় হইল। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন, তাঁহাকে সত্বর বাটী যাইবার জন্য লিখিয়াছে। টেলীগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিমল আরও ব্যগ্র হইলেন, কি জানি তাঁহার মনে আরও নানা দুশ্চিন্তা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। তথাকার বন্দোবস্ত করিয়া বিমল সেই দিবসই বাটী যাত্রা করিলেন।

ট্রেন ঝটিকা বেগে ছুটিতেছে। চিন্তাক্লিষ্ট বিমল অবসন্ন ভাবে একটি বেঞ্চে উপবেশন করিয়া আছেন। শুভ অশুভ কত চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে; ক্রমে দ্বিপ্রহরের খরতর রৌদ্র সত্বরই তাহাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিল, সহসা একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ, নিদ্রাবস্থায় বিমল স্বপ্ন দেখিল সে একটী রমণীয় পর্ব্বতের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াছে, অতি সুন্দর পর্ব্বত, তাহার নিম্নে চতুর্দ্দিকে বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত ফেনিল তটিনীর অপূর্ব্ব শোভা, এবং সুদূরে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় না। উপরে নীলাকাশ; সহসা উর্দ্ধ হইতে কে যেন তাহাকে আহ্বান করিল সে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উপরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য—স্বর্গে যেন এক অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সেই ধবল কৌমুদী স্নাত নিশীথে একটি মনোরম পুষ্পোদ্যানে অতি পরম লাবণ্যময়ী স্বর্গের পারিজাত মালায় সুশোভিতা, স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় একজন দেববালা দণ্ডায়মানা; তিনিই মৃদুস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। মরি! মরি! কি সুন্দর রূপ! দেব কন্যার মুখখানি যেন ঠিক সুলোচনার মুখের ন্যায়।

বিমল চন্দ্র বিস্মিত হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ প্রতিমারূপিনী তাহাকে বলিলেন "এস, এখানে আস্‌বে এখানে কোন কষ্ট নাই, এস" ?

মরি, মরি, কোমল সুমধুর বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুললিত স্বর! বিমল চন্দ্র সম্মতি জানাইল। চমকিত ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

(৫)

বিমল চন্দ্র আরও ব্যগ্র হইল, কখন গিয়া সকলকে দেখিব এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বসার হইল। যথা সময় স্বস্থানে পৌছিল। ষ্টেসন হইতে বাটী ততদুর নহে, বিমল চন্দ্র পদব্রজেই সত্বর যাইতেছেন, কিন্তু পা যেন আর চলেনা। উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে সহসা মনে আশঙ্কা হইল "কেন ওরূপ টেলীগ্রাম পাইলাম, সুলোচনা ভাল আছে তো ? কই টেলী-গ্রামেত্তো বিশেষ কিছু লেখা নাই, না সুলোচনা ভাল আছে—আমাকে না জানি বালিকা হয়ত কতই তিরস্কার করিবে, কত দিন বাটী আসি নাই! আহা, তাহার সেই সরলতামাখা মলিন মুখ খানি আমাকে দেখিলেই প্রফুল্ল হয়। না সুলোচনা ভাল আছে," কিন্তু যদি শুনি সুলোচনা নাই ? দয়াময় হরি তুমিই ভরসা, বাটী অতি নিকট, পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল সে জিজ্ঞাসা করিল "কি বিমল, বাড়ী এলে ?" বিমল তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইল, বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, টেলীগ্রাম পেয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আসিতে হয়েছে ; বাড়ীতে সব ভাল আছে জানেন ?" শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেল, কেবল বলিয়া গেল "গেলেই দেখিতে পাবে"।

বিমলচন্দ্রের মুখে সহসা আরও যেন কে বিষাদরাশি ঢালিয়া দিল। ধীরে ধীরে বাটীতে উপস্থিত হইল, কই বাহিরে তো কেহই নাই, কান্নার শব্দ ও তো পাইনা ভাল আছে বৈকি সব !

এমন সময়ে যাহা দেখিল তাহাতে ভীতিবিহ্বল হইয়া থমকিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিল তাহাদেরই চারিজন প্রতিবাসী ব্যক্তি সিক্তবস্ত্রে তাহা-দেরই বহির্ব্বাটীতে আসিয়া, উচ্চৈস্বরে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিল ; সে শব্দে যেন সেই হতভাগ্যের হৃদয় ভাঙিয়া গেল। দেখিল গৃহাঙ্গনে তাহার মাতা ও ভগিনী দাঁড়াইয়া। তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না।

সেই চারি ব্যক্তির মধ্যে বিমলের বয়স্য একজন ছিল, সে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "বিমল তুমি এতক্ষণে এলে ? এই আমরা তোমারই প্রাণের পুতলী

সুলোচনাকে রেখে আস্‌ছি।" বিমল আর থাকিতে পারিল না, হতভাগ্য যুবক মাথায় হস্ত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে রজনী অধিক হইল, কিন্তু বিমলকে কেহ উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। দিদি আসিয়া সান্তনা দিলেন "বিমু'নে, ওঠ, আর অত ভাবেনা।"

মাতা আসিয়া বলিলেন, "ভাবনা কি বাবা, আমি বেঁচে রয়েছি ভাবনা কি? বৌ কত মরে, আবার বিয়ে দিয়ে রাঙ্গা টুক্‌টুকে বউ আনবো। ও কোথাকার রোগাপুঁয়ে আমাদের কপালে দুঃখ দিতে এসেছিল। নে, ওঠ ঘরে চল আবার বিয়ে দেব, এবার আর যে সে ঘরে নয়, টাকা গহনা সব দেখে নেব, দয়াকরে আর ছেড়ে দেব না" মাতার নয়ন কোণে হাস্য রেখা দেখা যাইতে লাগিল। বিমল মাতার বাক্যের উত্তর দিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহার মন সে দিকে ছিল না, গৃহিণী ভাবিলেন ছেলে একটু বিমনা হয়েছে আবার বিয়ে দিলেই সব ভুলে যাবে।

তিনি তখনই মনে মনে কল্পনা আঁকিয়া প্রস্তুত রাখিলেন, এবার আর ওরূপ যেখানে সেখানে পুত্রের বিবাহ দিবেন না। এবার অগ্রেই অলঙ্কারাদির ভালরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ দিবেন না।

এবার যেন আর তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া কৃপা পূর্ব্বক ছাড়িয়া না দিতে হয়, কড়া গণ্ডা সকলই উত্তমরূপ বুঝিয়া লইবেন। গতবারকার দানের তৈজস গুলি যেন একটু কেমন কেমন হইয়াছিল, এবার আর তাহা হতে দিবেন না, উত্তমরূপে দেখিয়া গ্রহণ করিবেন নচেৎ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন।

জননীর আকাশ কুসুম বিধিবিড়ম্বনায় বিফলতা লাভ করিল। পরদিন বিমল চন্দ্রকে আর কেহ গৃহে দেখিতে পাইলনা; বাটী সন্নিহিত পুষ্করিণী-সলিলে বিমলের প্রাণহীন দেহ ভাসিতে দেখা গেল।

শ্রীমতী চম্পক বরণী দাসী।

বৈষ্ণব মহাসম্মিলন।

(১)

ভারতে বা বঙ্গে হিন্দুজাতি এমনভাবে আপনার সমাজ গঠিত করিয়াছিল, যে একদিনও তাঁহারা মনে করেন নাই পৃথিবীতে অপর মানবসমাজ আছে। কালে সেই সমাজের লোকের সহিত তাঁহাদের প্রতিযোগীতা বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যাইত, প্রতিপদে হিন্দুকে পতিত হইতে হইত। নানা বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই ভাবে হিন্দুর জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া জন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ছত্রিশ জাতির লোক লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত। এই জাতির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শেও যাইতে পারিত না। সমাজ তাহাদিগকে একবারে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম্মাচরণেও সকলের অধিকার ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডই কেবল ধর্ম্মাচরণ হইয়া সমগ্র জাতিকে কুসংস্কারের ক্রিয়াপুতুল করিয়াছিল। যতই দিনের পর দিন যাইতেছিল ততই হিন্দুর ধ্যান ধারণাশক্তিহীনতা বশতঃ নানাপ্রকার বৈষম্যের অধীন হইতেছিল। আত্মহারা হিন্দুজাতি আপনার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে না পারিয়া কেবল ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়াছিল। হিন্দুর বিশ্বাস সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য, কুক্রিয়া ও পাপতাপের মূল ছেদনের জন্য, ভগবান যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই আশায় হৃদয় বাঁধিয়া সেই সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে হিন্দু বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং নারায়ণ; যাহার নাম "সনাতন ধর্ম্ম" তাহার রক্ষা ভগবানই করিবেন। এই ধ্যানে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মন্ত্রপুত চক্ষে সেই যুগাবতারের আগমন প্রতীক্ষায় কাল অতিক্রম করিতেছিল। পঞ্চাদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে সেই প্রকার চিন্তা-বিপ্লবে মানব-মনপ্রাণ বিমোহিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূচনা করিতেছিল। স্বেচ্ছায় হউক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক দলে দলে লোক ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। বেদান্তের গভীর সূত্রবাদ, তান্ত্রিকের জটীল ক্রিয়াকাণ্ড সরল বিশ্বাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিতে অপারগ হইয়াছিল। লোকে ভক্তিযোগের সহিত প্রেমবন্যায় ভাসিয়া মুক্তি কামনায় অলক্ষ্যে অধীর হইতেছিল। লোকহৃদয়ের এই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তির জন্য সাধারণের বোধগম্য সাধনার সরল পথপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের

আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাসাগরের অন্য পারে পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টশিষ্যগণের মধ্যে মার্টিন লুথার খৃষ্টধর্ম্মের এক নূতন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া লোককে বিচলিত করিয়াছিলেন। জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নব ধর্ম্মোন্মাদ আপনা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সময় স্রোতের গতি ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া দিতেছিল। এই প্রকারে মহাকালের শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া প্রেম ও ভক্তি মানবহৃদয়ে আপনার সিংহাসন পাতিতেছিল।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাঙ্গালার সহিত আসামের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। আসাম নাম "আহম" রাজ্য হইতে হইয়াছে। এই দেশের পৌরাণিক নাম প্রাগ জ্যোতিষ্পুর। রামায়ণে ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কোন সময় হইতে এইদেশে হিন্দুধর্ম্মের শাসন প্রচলন হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন! অল্প দিন হইল রাজশাসনে বঙ্গভাষা আসাম হইতে বিতাড়িত হইয়া অসমীয়া নামে বঙ্গাক্ষরে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইতেছে। আসামের সহিত বাঙ্গলার আর ভাষাগত মিলের সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশের কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, বঙ্গদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসামে যাইয়া বসবাস করেন এবং আসামে হিন্দুধর্ম্মের বা ব্রাহ্মণশাসনের প্রবর্ত্তনা করেন। ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৫১ ত্রিপুরাব্দে রাজা শ্রীধর্ম্মপা স্বীয় রাজ্যে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসবাস করান। এই ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া খ্যাত। ইহাঁদের প্রভাব আজও বঙ্গদেশের ধর্ম্মজীবনের উপর দিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত আছে। যে সকল কায়স্থ আসামে যাইয়া বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে আসামের চণ্ডীদাস দ্বাদশ ভৌমিকের পদলাভ করিয়া প্রাধান্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই চণ্ডীদাসের চারিপুরুষ অন্তর আমরা আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবকে দেখিতে পাই। ইহাঁর পিতার নাম কুসুমবর, জননী সত্যসন্ধ্যা। "রুদ্র যামল" নামক গ্রন্থে জানা যায় শঙ্করদেব কলি-যুগের ৪৫৫০ বৎসর অতীত হইলে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আসামের 'চরিত-সংহিতা' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শঙ্করদেব :—

শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জলন
শশীমিতৌ যোঽবতীর্ণো ধরিত্র্যাম্।
স শ্রীশঙ্কর শ্রীহরিপদ
মগমরৎ রোম—ন্ধ্রা—ব্ধি চন্দ্র

১৩৬১ শকাব্দে ভূমিষ্ঠ হন অর্থাৎ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল। আসাম ইতিহাস লেখক গেইট সাহেবের মতে শঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেম ভক্তিতে মাখিয়া প্রচার করিতে থাকায় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে রাজাদেশে প্রাণের ভয়ে কুচবিহার-রাজ নরনারায়ণের আশ্রয় লইয়া আপনার ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। শঙ্করদেব যে সময়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া "চরিত" লেখকগণ বলেন। আসামে যে প্রেমভক্তির প্রবাহ ছুটিয়া অনন্ত সাগরে মিলিত হইয়াছিল, তাহাই নবদ্বীপে আসিয়া সুরধনীর জলে মিলাইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যুগাবতারে লীন হইয়াছিল।

এই সময়ে আসামের শ্রীহট্ট প্রদেশ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। একটী সামাজিক গোলযোগ যেন ভগবৎ প্রেরণায় সংঘটিত হইয়া বঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রীহট্ট প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম "লাহুড়" (Lahour)। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন সুবিদনারায়ণ। রাজা বৈদিক ব্রাহ্মণ কিন্তু একজন বল্লালী বীর। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বল্লালী কুলমর্য্যাদা গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার কৌলিন্যপ্রথা চলিত ছিল। রাজা শ্রীধর্ম্ম-পা আনীত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধর একজন। এই শ্রীধর হইতে ২৭ পুরুষান্তরে আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাই। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। এই রঘুনাথের সহিত কৌশলে রাজা সুবিদনারায়ণ আপনার খঞ্জা কন্যা, রত্নবতীর বিবাহ দেন। রঘুনাথ তখন শিশু। আপনার কুলমর্য্যাদা হানি হওয়ায় জননী জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতিকে পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। এই রঘুনাথই বঙ্গের শিরোমণি হইয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব পরিগ্রহণে সমগ্র ন্যায় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গে এই সময় হইতেই ন্যায়ের শাসন প্রচলিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পুরুষগণের বসবাস উৎকলের জাজপুরে ছিল। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক। রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আপনার স্বজাতিগণের নিকট পলাইয়া শ্রীহট্টে আসিয়া বসবাস করেন। এই

বংশের জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া আইসেন। পাঠ সমাপনান্তে আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। নবদ্বীপেই টোল খুলিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। এই জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ যৌবনে বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ প্রেমভক্তির অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্য্যও লাহুড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোনও অজ্ঞাত কারণে শান্তিপুরে আসিয়া আপন বাস স্থাপন করেন। শ্যামদাস প্রণীত "অদ্বৈত মঙ্গল", ঈশাননাগর প্রণীত "অদ্বৈত প্রকাশ", লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত অদ্বৈতের "বাল্যলীলাসূত্র" প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে অদ্বৈতজীবনী সবিস্তারে বর্ণনা আছে। ঈশান নাগরের মতে।—

"নৃসিংহ সন্ততি লোকে যারে গায় ॥
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদস্বাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা ॥"

আমরা ইতিহাসে পাই রাজা কংশ দ্বিতীয় সামসুদ্দিনকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন। লেথব্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে রাজা গনেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। কংশের পতনের পর নৃসিংহ প্রাণভয়ে লাউড়ে পলাইয়া যান। এই নৃসিংহকে লইয়া বারেন্দ্র সমাজে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার চিহ্ন "কাপ" নামে এখনও বারেন্দ্রসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। নৃসিংহ কোনও এক সামাজিক ভোজে পরিত্যক্ত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ মানসে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কুলিন মধুমৈত্রেয়ের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহে মধু মৈত্রেয়ের সহিত তাঁহার পুত্রগণের বিরোধ হওয়ায় পিতৃদ্বেষী পুত্রগণ কৌলিন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ধন্য বল্লালী মোহ!!!

আমরা ঈশান নাগরের লেখা হইতে একটি ঐতিহাসিক তারিখ পাইয়াছি। অদ্বৈত মহাপ্রভু বয়সে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবাপেক্ষা ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কবি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে দর্শন করার পর অদ্বৈতাচার্য্যের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"ওহে বিভূ আজ দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তুয়া লাগি ধরা ধামে এ দাস আইল॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন—

"সয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরা ধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥" (অদ্বৈত প্রকাশ)

কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে অদ্বৈতাচার্য্য শঙ্করদেব অপেক্ষা ১৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি পরিপক্ক বয়সে তিনি শান্তিপুর আসিয়া বসবাস করেন। শ্রীহট্টে নবগ্রাম নামক স্থানে তাঁহাদের আদিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত ও জননীর নাম, নাভাদেবী। তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নাম ছিল সীতাদেবী। কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আত্মজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্য্য প্রেম সাগরে মিশিবার আকাঙ্ক্ষায় শান্তিপুরে আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আসামে শঙ্করদেব প্রেম ভক্তির যে অক্ষয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই এই সকল মহাপুরুষের সাধনায় বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া বাঙ্গালায় মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র দেশবাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রেম ভক্তির সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বাস ছিল রাঢ় দেশে একচক্রা গ্রামে। এই গ্রাম আধুনিক বীরভূম জেলার অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম হারাই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দরা মল্লবাড়ুরী, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু শালিগ্রামের সূর্য্যদাস সারকেলের দুই কন্যা জাহ্নবী ও বসুধাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবীর নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। এই মহাদেবীর গর্ভে গঙ্গা নামে এক কন্যা ও বীরভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভগীরথাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাচার্য্যই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ "কৃষ্ণভক্তিতরঙ্গিনী" নাম দিয়া করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর ছিলেন। "গৌর নিতাই" অভেদাত্মভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যুগল মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই কয়েকজন বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রভাবে

প্রজ্বলিত দীপ শলাকায় তৈল প্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিভার কৈশিক আকর্ষণে বিভাষিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী পাইয়া বাঙ্গালী যতি কুলের শিরোমণি হইয়া ভবিষ্য ইতিহাসের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব অধ্যায় খুলিয়া রাখিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। পৃথিবীর কবিগণ ও চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভার জ্বালাময়ী তুলিকায় প্রেমকে সজীব করিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে কত কৌশল, কত সূক্ষ্ম চিত্রকলার, কত ললিত পদের, কত কল্পনার রেখা টানিয়াছেন, মানবের ভাষা সে ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রেম বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিমান সজীব প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কেবল বঙ্গেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সংসারের ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে মত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেহই এই বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ তনয়ের সাম্যবাদের মহত্ব স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। লেখাপড়ার চর্চ্চা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সাম্যবাদ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দর্শন কাব্যাদি আলোচনায় সর্ব্বসাধারণকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছে। তাই আজ আমরা শুনিতেছি "চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণোচিত সম্মানে পূজা করিয়া জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

সাধনা না হইলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমরা সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমাদের মন্ত্র নির্জ্জীব, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্ম-বিপ্লব না হইলে ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কর্ম্মবিপ্লব হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতার হইয়াছিলেন। এই গুরুতর যুগধর্ম্মের সূত্র প্রচারার্থে নবদ্বীপে এক সময়ে কয়েকজন মহা বৈষ্ণবের সম্মিলন হইয়াছিল। নদী যেমন নানা দেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে সাগরে যাইয়া আপনার জলধারা মিশাইয়া আত্মবেগ সম্বরণ করতঃ সাগরময় হইয়া যায়, তদ্রূপ এই সকল প্রেম প্রস্রবণগুলি একে একে সাগর-সঙ্গম লাভ করিবার আশায় নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম ভক্তিসাগরে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য মন্ত্রপূত চক্ষে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে জ্ঞানালোকিত নবদ্বীপভূমি প্রেমভক্তির ক্ষীণরশ্মিকে সাদরে আলিঙ্গন

করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশের নয়ন ঝলসিত করিয়া আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই মহাশক্তির নাম "জীবে প্রেম, ভক্তি নারায়ণে" বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ইহারাই লৌকিক নাম "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"। কবি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেম-ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব কুলের এই নবদ্বীপসম্মিলনকে প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে অতীত ইতিহাসের একখানা উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া, সে সময়ের বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের লুপ্ত বীজ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন কেন যুগাবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা কবি বৃন্দাবন দাস প্রথম প্রচার করেন। বৃন্দাবন দাস স্বরচিত চৈতন্য ভাগবতে অবতারের সূত্র সঙ্কলনে ব্যস্ত। তিনি গীতার সেই মহতী প্রতিশ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবতারের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, সে সময়ের বঙ্গের যে সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র সে সময়ে দেব ভাষায় লিখিত ও পঠিত হইত। মাতৃভাষা কেবল মনের ভাব প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক অতি-সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতির বর্ণনাতীত দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি অজ্ঞান তিমিরে জীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিল। সেই জন্য ভক্তিযোগের প্রেমমার্গের প্রচারের আবশ্যক হইয়াছিল। বাঙ্গালী তখন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" এই ধোকায় সন্তুষ্ট না হইয়া মন্ত্রপুত চক্ষে মহাজন খুঁজিতেছিল। সেই মহাজন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে বঙ্গ সমাজে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম ভক্তির লীলা খেলা বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম জীবনের মূল সূত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীর অননুশীলনে বৈদেশিক সংমিশ্রণে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে আমরা জানি, "পূজ্যেষু অনুরাগো ভক্তিঃ" আর জানি "ভক্তিরাস্তিক্যবুদ্ধিঃ" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের প্রচারিত সমগ্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে যে ভক্তির উদয় হয়, আমরা তাহা ভুলিয়া তাহার অসার ছায়া অন্ধ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলাম বলিয়াই ভক্তি যোগ চ্যুত হইয়াছিল। হিন্দুর আত্মোন্নতি ধর্ম্মে, কর্ম্মে নহে। ধর্ম্ম সাধনে যে কর্ম্মের উৎপত্তি তাহাই হিন্দুর করণীয়। এখন

কর্ম্মই ধর্ম্মের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই কর্ম্মাচরণ ধর্ম্মাচরণ হইয়াছে। এই কারণেই সমাজে নানাবিধ উপধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতেছে।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম্মীরই সম্মান। কর্ম্মসূত্রে মানুষ সংসারে আসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে বেলা থাকিতে আপন কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে থাকেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় সেই কার্য্য জন্মার্জ্জিত সংস্কার বিরোধী বলিয়া সমাজ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে। যাহা ভগবানের প্রেরণা, যাহাতে জগতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সে কার্য্যে মানবের বাধা বিঘ্ন কিছুই করিতে পারে না। কবি বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গের হিন্দু সমাজের নিম্ন লিখিত চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের মানস চক্ষের সাম্‌নে আনিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন;—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥
কৃষ্ণ শূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথায়ও না শুনে ভক্তি যোগের কথন॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥
অন্ন ভাল মতে কার না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি যায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবতরিবার প্রভু করিলা উদ্যোগ॥

তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম সে সময়ে হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের রীতি নীতি লোকহৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম

বুঝিবার শক্তি লোকের বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে লোক প্রবৃত্তির সেবা পূজায় ডুবিয়াছিল। যাঁহারা লোক শিক্ষক তাঁহারাই তান্ত্রিক, তাঁহারাই তন্ত্রের প্রচারক সুতরাং ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল। কর্ম্ম-সূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে নবাগত ভাগবতগণ হতাশ হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। ভক্তের সাধনার আহ্বান এরূপ অবস্থায় অরণ্যে রোদন হইতে পারে না, কাজেই প্রভু অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত কবি বৃন্দাবনদাস অবতারবাদের অতি সূক্ষ্মতম সূত্র সংকলন করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন সাধকের মত ভক্তিপূর্ণ প্রাণে আমরা ডাকিতে পারিলে প্রভু থাকিতে পারিবেন না, আবার অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রভু উদ্যোগ করিবেন। ইহাই বিশ্বাসী হিন্দুর অবতারবাদ। ভক্ত হৃদয়ে এই ভাবে ভগবান প্রতিদিন প্রতি মূহুর্ত্তে অবতীর্ণ হইতেছেন, পরম ভাগবতগণ আত্মরতিতে তাহা সন্দর্শন করিয়া হরি! হরি! হরি! বলিয়া ভবসিন্ধু পারে যাইতেছেন, আমরা বধির তাই শুনিতে পাইতেছি না।

এই সময়ে বঙ্গের নানাস্থানে ভাগবতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণধ্যানে নিয়োজিত ছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে আকাশে নক্ষত্র বিশেষের উদয় দেখিয়া খৃষ্টের পূর্ব্বগামী ভক্তগণ যেমন তাঁহার জন্মের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শনাশায় বহু দূর দেশ দেশান্তর হইতে "বেথেলহেমে" খৃষ্ট-কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে সে সময়ের হরিভক্তগণ যেন ধ্যানে যুগাবতারের নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইবার কথা জানিতে পারিয়া সকলে আসিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে একত্র হইয়াছিলেন। কবি বৃন্দাবনদাস এই ভাগবতগণের নবদ্বীপে আগমন ব্যাপার গঙ্গা-যমুনার সম্মিলনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর ব্যবধান হইলেও আজ আমরা তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য কবির কৃপায় উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিতেছি :—

"কোন মহা প্রিয় বৈসে জন্ম অন্য স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥

ভবরোগ বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ।
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথাবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥

[চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস]

এই ভাবে জ্ঞানের লীলাভূমি নবদ্বীপে ভক্তবীরগণ একত্রিত হইয়া জ্ঞান ভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন—সংসারের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের বীজ নবদ্বীপের উর্ব্বরভূমিতে রোপণ করিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে সে বীজ গ্রথিত হইয়াছিল, অলক্ষ্যে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। লোক-চক্ষুর বাহিরে সে বীজ বহু শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া হিন্দু জাতির ও হিন্দু সমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়ন্তীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন—আজও মানব প্রতিভা তাঁহাদের যশঃসৌরভের কণিকা মাত্রও কালের হিল্লোলে প্রবাহিত করিতে পারে নাই। হীন-শক্তি বাঙ্গালী হিন্দু, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়া সে সৌরভ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। এই কারণে মন্ত্রশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়া সাধককে পশুধর্ম্মী করিয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়াই লোকে বৈষম্যের বন্ধন চিহ্ন করিয়া নামশক্তিতে মোক্ষের উদ্ধার উদঘাটিত থাকিলেও প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না।

এইরূপে আদিতে নবদ্বীপধামে মহাবৈষ্ণব সম্মিলন হইলে ফাল্গুন পূর্ণিমা

গগনের পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া লোককে বলিয়া দিয়াছিল সংসারের পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে জগতের অমঙ্গলান্ধকার গ্রাস করিয়া ত্রিভুবন আলোকিত করিয়াছে। মানব জ্ঞান চক্ষুতে পৃথিবী সন্দর্শন করিতেছে বাহিরের আলোকের আর প্রয়োজন নাই। সেই চন্দ্রগ্রহণের দিনে লক্ষ লক্ষ নর নারী পবিত্র জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিতে করিতে "মুরজ মন্দ্রে" শ্মশান ভূমি পবিত্র করিয়া "পাপীকে পরিত্রাণ করিতে মধুর তানে যে হরিবোলধ্বনি করিয়াছিল। তাহাই মানব হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর তারকব্রহ্ম নামে অনন্ত পথগামীর পথের সম্বল হইয়াছে। কবি কৃত্তিবাস যথার্থই বলিয়াছেন, স্বর্গের বৈষ্ণবগণ যে দিন জাহ্নবীর জলে স্নান করিবেন সেই দিন পাপতাপ হারিণী ভাগীরথী উদ্ধার হইবেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর যুগবতারের আবির্ভাবের সহিত মিলিয়া বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া কিশোরীর প্রেম সংগীতে নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন সেই গঙ্গার মাহাত্ম্য লোক নয়নগোচর হইয়াছে। লোকে বুঝিতে পারিয়াছে গঙ্গা প্রেম-বারিধারা, ঐরাবতকেও প্রেম বন্যায় ভাসাইয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। জড় প্রাণে এই ভাবে প্রেমবারিধারা সিঞ্চন করিয়া বৈষ্ণবগণ মোক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। সাধনা মার্গে সাধক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া প্রতিদিন এই নব-সায়ত্রীয় প্রচার করিতেছেন বলিয়া আজও হিন্দুধর্ম্ম আপন গৌরবে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

আমরা কবি বৃন্দাবন দাসের মহা-কাব্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি, সে সময়ে যুগাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কবি বৃন্দাবন দাস বিধবার সন্তান। নির্ভীক সাধক কবি, আপন জন্মবৃত্তান্ত গোপন না করিয়া দেখাইয়াছেন "জাবালী" একজন হিন্দুসমাজে নাই। আমরা কবির ভাষায় কবির অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত এখানে প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছি যে হিন্দুর সত্য প্রীতি কতদূর প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কবিগণ বৃন্দাবন দাসকে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ২২ বৎসর পর তাঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণ প্রেমের ঘোর তুফান উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব তখনও গৃহাশ্রমী। তখন ও তিনি গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণ-

গণের সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সেই মহাসভায় আপন "গণ" বা পার্শ্বচরগণ সহ বিরাজ করিতে করিতে—

আপন গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে ॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈঞা।
কোটী চন্দ্র শরদ মুখের দ্রব্য পাঞা ॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান ॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্ব্বাদ ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ ॥
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥
খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী ॥
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি ॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকাস্বভাব ॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি ॥
চৈতন্যের অবশেষ পাত্রী নারায়ণী ॥

[চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড]

নিত্যানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত পানের অবশিষ্টাংশ খাইয়া বিধবা নারায়ণী গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রই বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তিনি চৈতন্যভাগবত লিখিতে আরম্ভ করেন। আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনখণ্ডে ভাগবত সমাধান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস খেতুরের বৈষ্ণবমহাসম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাস যোগ্য পূজাও পাইয়াছিলেন। এই ভাগবতে মহাপ্রভুর অন্তর্লীলা পরিস্ফুট রূপে বর্ণনা না থাকায় ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিয়া সে অভাব পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখানে একটি কথা বলা-

আবশ্যক। হিন্দুর জন্মার্জ্জিত সংস্কারে বলিয়া দেয় মানবের বুদ্ধি, মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানব জ্ঞানাতীত অলৌকিক জ্ঞান আছে, যাহা দর্শন বিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞেয় ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা করি এবং সেই নিষ্ফল চেষ্টাকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসারের প্রতি কার্য্যের; প্রতি দৃশ্যের বিচার করিয়া জ্ঞানগৌরবে স্ফীত বক্ষ হইয়া আপনার প্রধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। এইজন্য বৃন্দাবন দাসের এই জন্ম বৃত্তান্ত আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য! গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রাম আছে। এই গ্রামে পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন বাস করিতেন। এই দুই মহা পুরুষ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই গৌড়ের বাদশাহ সরকারে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। রামকেলী সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাস্থান না হইলেও বিদ্বজ্জন সমাগমে ভারতে বিখ্যাত ছিল। রূপ সনাতন পণ্ডিতগণের সম্মান করিতেন এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর। এই বংশের পদ্মনাভ নৈহাটীতে গঙ্গাতীরে আপন বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। কুমার দেবের পুত্র—সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী। ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ ও ১৪৬৯—১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রূপসনাতন জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। তাঁহার অপ্রকটের তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশমত গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কবিবর নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার নরোত্তম-বিলাসে রূপ সনাতন ও রামকেলীর নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে প্রেম বিলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি রূপ সনাতনের আহ্বানে একবার রামকেলীতে পদার্পণ করিয়া এতদ্দেশ পবিত্র করিয়া ছিলেন।

"গৌড়ে রামকেলিগ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি॥
মহারাজ মন্ত্রী সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্র চর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।

উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥
কাশী কাশ্মীর আদি স্থিত মহাবিদ্যাস্থান।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥
সনাতন রূপ গৌড রাজ প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সবরীতি ॥

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোকধায়!
ঐছে রামকেলি আইলা গৌড়.রায ॥

একদিন প্রভু নিত্য প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া।
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়নে ॥
"নরোত্তম" বলিয়া ডাকে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥ নরোত্তম বিলাস

এইরূপে কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রায় শত বৎসর পর যে "মহা বৈষ্ণব সম্মিলন" রাজসাহী জেলায পদ্মানদীর তীরে হইবে, তাহার সূত্র রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর তাঁহার প্রেম শক্তি মূর্ত্তিমান হইয়া ভক্ত-মন্দিরে যে মহা পীঠস্থান স্থাপন করিযাছিলেন, আজও খেতুরের মেলা-রূপে তাহা দেশে দেশে ঘোষিত হইযা প্রেম বিজয়ের পতাকা উড়াইয়া বঙ্গ বাসীকে হরি! হরি! হরি! বলিয়া ভবসিন্ধু পারে লইবার জন্য সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আপনার বক্ষে সেই সকল লুপ্ত স্মৃতি ধারণ করিয়া হীনধর্ম্ম হিন্দুকে বলিয়া দিতেছে "উঠ, জাগ একবার প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জগতে আপনার প্রেম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস লেখক কবিবর নরহরি চক্রবর্ত্তী। তাঁহার সময়ে যদি গদ্যে লিখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আর পযায়ের আশ্রয় লইয়া পদ্যে তাঁহার ইতিহাস গুলি সঙ্কলন করিতেন না। নরহরি সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণ আধুনিক বৃন্দাবনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহারাই আধুনিক বর্ত্তমান লুপ্ততীর্থ গুলির আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার ব্রজ পরিক্রমা ও নবদ্বীপ পরিক্রমা খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। কবিবর ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ঃ—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে ;
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘন শ্যাম॥
গ্রহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহা পাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রদিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই॥

বোড়াকুলীর মহোৎসবে প্রেমোন্মত্ত সাধক ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নরহরি ব্রজধামে গমন করেন। ব্রজবাস কালে তিনি "ব্রজ পরিক্রমা" গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তি রত্নাকরই নরহরির সর্ব্বস্ব।

এখানে আর ও কয়েক জন বৈষ্ণব করিব পরিচয়ের প্রয়োজন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর পার্শ্বচর গোবিন্দদাসকে সর্ব্ব প্রধান বলা যাইতে পারে। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পদ্যে পয়ার ছন্দে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া চৈতন্য দেবের জীবনের "Auto Biograhhy" রাখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ দাস মহা প্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা চৈনিক ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও উজ্জ্বল। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসাদি যেভাবে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় কর্চায় মাত্র দুই বৎসরের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। ১৫১০ খৃঃ ৭ই বৈশাখ বা ২১ শে এপ্রেল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃঃ ৩রা মাঘ বা ২০ শে জানুয়ারী পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। সুতরাং এই ভ্রমণ ব্যাপার এক বৎসর আটমাস

২৬ দিনে সমাধা হইয়াছিল। মুরারী গুপ্ত সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য লীলা লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস স্বাধীন ভাবে আপনার করচা খানি লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পিতার নাম শ্যাম দাস কর্ম্মকার। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আপন বাসস্থান কাঞ্চন গড়িয়া (বর্দ্ধমান জেলায়) গ্রাম হইতে আপনার স্ত্রীর নিকট "মূর্খ" "নিগু'ণ" আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া মনের খেদে বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহা প্রভুর সহিত মিশিয়া যান।

গোবিন্দ দাসের পর জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়া ভাষায় মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" খানি খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন এই বংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ। জয়ানন্দের বাল্য নাম ছিল "গুইয়া"। মহাপ্রভু পুরী হইতে বর্দ্ধমান আসিবার কালে সুবুদ্ধির বাটীতে শুভাগমন করেন এবং সেই সময়ে সুবুদ্ধির পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "জয়ানন্দ"। জয়ানন্দের আর কোনও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নাই। জয়ানন্দের মাতার নাম ছিল রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্বীপে মোছলমান দৌরাত্ম্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন' তাহা আর কোন ও সম সাময়িক কবির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের একটী তালিকা তাঁহরে গ্রন্থমধ্যে দিয়া সুদূর অতীতের ঘোর অন্ধকারতটে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন :—

শ্রীভাগবত কৈলাব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত আগে করিল প্রচার ॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥
শ্রী পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপ করিল তেঁহি গোবিন্দ বিজয়ে ॥

আদ্যখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥
সংক্ষেপ করিলেন তেঁহি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে ॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ সংগীত মঙ্গল গায় শেষে ॥ জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, বটতলার ছাপাখানার মুখ এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থরাশি দেখিতে পায় নাই। কালের প্রভাবে অগ্নি ও কেতাবকীটের মুখে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যচর্চার ফলে হজম পাইয়াছে। উত্তরকালের লোকের নিকট আর অন্য পরিচয় দিবার উপায় নাই।

এই সমস্ত সমসাময়িক কবিগণ আপনাদের চক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া এবং স্বয়ং সেই সকল ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া আপন আপন গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কল্পনার লীলাখেলা তাহাতে স্থান পায় নাই, ভাষার ওজস্বীতা তাহাতে রঙ ফলাইতে পারে নাই। সরল বর্ণনায় ভক্তিরস উছলিয়া উঠিয়া লেখক ও পাঠককে পবিত্র করিয়াছে। সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, কর্ম্মীর কর্ম্ম এখানে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া মানসচক্ষে তৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির যে চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইতেছে, ভাষায় আর কোনও শ্রেণীর কবি তাহা দেখাইতে সমর্থ কি না আমরা জানি না। এই সকল মহাপুরুষের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান বলিয়া আজও মানবজাতি সুখে পাঠ করিতেছে। যদি বঙ্গের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস কখনও লেখা হয় তাহা হইলে এই সকল কবির দর্শনচক্ষুর পরিদৃষ্ট দৃশ্যগুলি ভাষার পরিচ্ছদ হইতে বাছিয়া লইয়া লিখিত হইবে।

বাঙ্গালায় যে প্রেমপ্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করিয়াছিল তাহার ঢেউ যাইয়া উৎকলে প্রেমসাগরে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাঙ্গালা ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথধামে বিচরণ করেন। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে দেখাইয়াছেন একদিন মহামহোৎসবে সংকীর্ত্তন করিতে

করিতে মহাপ্রভুর পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত লাগে, তাহাই বিষম হইয়াছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তেরা সে দৃশ্য আঁকিতে অক্ষম। ভাষায় তাঁহারা সে কথা প্রকাশ করিতে পারেন না। বাঙ্গালার [illegible] গ্রাস করিয়া অমানিশার ঘোর অন্ধকারে সমগ্রদেশ গ্রাস করিয়াছে, আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও ঘুচিল না। আত্মহারা বাঙ্গালী সাধনায় সিদ্ধি আছে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন ঘোর কর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়া আপন আপন কর্ম্ম ভুলিয়া বিজাতীয় কর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া সকলেই শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আজ পৃথিবীর মনস্বীগণ ধরাতলে মানবজাতির এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কত যত্ন, কত চেষ্টা করিতেছেন— আর আমরা আমাদের মূলসূত্র তারকব্রহ্ম নাম থাকিতে বিরাট বৈষম্যের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ধর্ম্মপথ সংকীর্ণ হইতেও সূক্ষ্মতর, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করিতেছি। ভেদজ্ঞান এক অসীম সাগর-আকারে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অতি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকাররূপে আমাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বা ভ্রষ্ট হইয়াও আমরা সে পরিখা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নহি। ইহা হইতে আর আত্মপ্রবঞ্চনা কি হইতে পারে? জাতীয় অধঃপতন আর কাহাকে বলে।

যে মহাপুরুষ বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে উদ্ধার করিয়া ইতিহাসে সে বিপ্লবকাহিনী মধুররূপে কীর্ত্তন করাইয়া উজ্জ্বলতরভাবে চিত্রিত করাইয়াছেন, যিনি পশুমুণ্ড, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদি আমাদিগকে ত্যাগ করাইয়া প্রেমভক্তি ও নয়নাশ্রু দ্বারায় দেবপূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহার মুখরিত তারকব্রহ্মনাম মাত্র আমরা আমাদের অন্তিমের সম্বল করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপায় সকল জাতি সমভাবে বিদ্যার্জ্জন করিয়া বঙ্গভাষাকে কবির "মুকতা যৌবনে" দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দেবরূপী মনুষ্যের নির্ম্মল প্রেমাশ্রু বারিতে আমরা আমাদের হৃদয়ের আবিলতা বিধৌত করিয়া, সেই অন্তিমের মহামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের পবিত্রদিনের ন্যায়, কবির সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শিখিয়াছি "এক জাতি এক ধর্ম্ম এক সিংহাসন" (রৈবতক)। ইহাই বিংশ শতাব্দীর নবগায়ত্রী, ইহাই এ যুগধর্ম্মে প্রেমভক্তি। ক্রমশঃ

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

ভাগবত ধর্ম্ম ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে শ্লোকটি আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সার মর্ম্ম এই যে আমরা যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যদ্যপি হরিকথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে সকলেই বিফল। এই কথাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই দেখা দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে কি বুঝায়? মানব চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্ব্বাগ্রে এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। কথার দ্বারাই বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, কথা চিন্তার [illegible] প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান, কথার দ্বারাই আমরা এই বস্তু ও সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি। এই যে বস্তু ও সম্বন্ধময় বিশ্ব, ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত নহে, ইহার মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে শ্রীভগবান রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি লালী বা খেলা; বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। তাঁহাকে পাইতে হইবে বা তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা জড় বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া স্থূল বস্তু সমূহের ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ লইয়াই আলোচনা করি, আর মনস্তত্ব লইয়া চিন্তার সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম রহস্যেরই আলোচনা করি, আর সমাজতত্ত্ববিৎ, বা ঐতিহাসিক হই, আমাদের আলোচনা যতক্ষণ সেই এক আনন্দময় পরম পুরুষের স্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারিবে, ততক্ষণ জানিতে হইবে আমরা আমাদের আলোচনার যাহা প্রকৃত উপসংহার তাহা জানিতে পারি নাই।

শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে মানবের কেবল সেই অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থায় তিনি সকল বস্তুর, সকল কার্য্যের ও সকল সম্বন্ধের মূলে শ্রীভগবান রহিয়াছেন, এই টুকু বুঝিতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে 'প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, অন্য কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়া যে আমরা মনে করি এবং কোন কোন শাস্ত্রকার আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দেন তাহা ভুল। শ্রীভগবান এই প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, এই দুইটি তত্ত্বের সহিত পরিচয় না হইলে "হরি কথায় রতি" যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

গতবারে যে শ্লোকটি আলোচনা করা গিয়াছে তাহার পরের তিনটি শ্লোকে এই দুইটি তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা সেই শ্লোক তিনটির আলোচনা করিতেছি—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হিস্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।

শ্লোক কয়েকটির অর্থ এই। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম্ম করিয়া থাকে। ধর্ম্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব. অনেক ভোগের বস্তু পাওয়া যাইবে, ভোগের শক্তিও বাড়িয়া যাইবে, বেশ নিরাপদে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করা যাইবে।

ধর্ম্ম সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও রহিয়াছে! শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে একটী উপাখ্যান আছে যে একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ললিতপুর নামক স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য দেবকে (এই ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতকে বলাই ঠিক।) আশীর্ব্বাদ করিলেন ধন হোক্ পুত্র হোক্, সংসারে সুখ হোক্।' গৌরাঙ্গদেব বলিলেন "ঠাকুর একি আশীর্ব্বাদ করিলে, এত আশীর্ব্বাদ নয়, এতো অভিশাপ।' সন্ন্যাসী অবাক হইয়া বলিলেন 'বেশ লোকতো তুমি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি বলিতেছ এ আশীর্ব্বাদ নয়।'

গৌরাঙ্গদেব বলিলেন 'আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানে ভক্তি হউক, আর কিছু প্রয়োজন নাই।

সন্ন্যাসী এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন 'ভগবানে না হয় ভক্তি হইল, কিন্তু খাইবে কি ?'

এই সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই জাগিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন যে মার্কিণ

মুলুকের লোকেরা জীবন ভোগ করিতে চায় ঐশ্বর্য্য ও বিলাস চায়, তাহাদিগকে যদি সেই সব ধর্ম্ম সাধনার কথা বলা যায় যাহাদ্বারা ভোগের বস্তু ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আগ্রহ করিয়া শুনিবে। এই যে কথাটা কেবল কিছু পাইতে চাওয়া'র অবস্থা ইহা ভাগবত ধর্ম্মের নিম্নের অবস্থা। অবশ্য ইহার অর্থ এ নয় যে যিনি ভাগবত ধর্ম্মের উপাসক, ইহজীবনে যাহাকে সুখ ও ভোগ বলে, তাঁহার তাহার কিছুই থাকিবে না, ইহার অর্থ এই যে তিনি এ সকল কিছু চাহেন না; আসিয়া উপস্থিত হইলে ভগবানের কৃপার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু পার্থিব ভোগ সুখের বাঞ্ছা তাঁহার নাই।

সম্প্রতি দেখিলাম একজন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি ভালরূপ চাকুরী বাকুরী জোগাড় করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগ করিবে অথচ স্বাস্থ্যহানি হইবে না, ইহার সহজ উপায় ও সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা যায় না, যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া এই সাধন লইতে পারেন। এই কথা প্রচার হওয়ার পর সন্ন্যাসীর অসংখ্য শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে নিজের ভোগবাসনা, যাহা অন্য উপায়ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, তাহা চরিতার্থ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের নামে এই সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, শুদ্ধাভক্তির আদর্শ প্রচার ব্যতিরেকে, এই ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যে মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহা আশ্রয় করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।

প্রেম ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। নিজকে বিলাইয়া দেওয়াতেই আনন্দ। এই তত্ত্বটুকু যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী নহেন, তিনি যুগধর্ম্মের তত্ত্বও অবগত নহেন, অর্থাৎ তিনি অপধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিনাশের দিকে চলিয়াছেন। মস্তকে দীর্ঘ জটা, কোপীন পরিধান, কাঁটার উপর শুইয়া অথবা উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করিতেছে, তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বাপু সরল চিত্তে বল দেখি, তোমার এই সাধনা করার লক্ষ্য কি' প্রথমটা বলিতে চাহিল না শেষে তাহার কেমন সুমতি হইল, সে সত্য কথা বলিল। সে বলিল 'মহাশয়, আমি অতিশয় দরিদ্র, সংসারে থাকিতে পারিতে

পাইলাম না। অন্যান্য সকলে কেমন পরম সুখে আছে। গুরুদেব বলিলেন 'এই তপস্যা কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা পর জন্মে তুমি রাজা হইবে।' আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল 'একজন লোককে সে জব্দ করিতে চায় এই জন্যই তাহার এই তপস্যা।' এই গেল সাধু সন্ন্যাসীর কথা।

এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঐ একজন দেশ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভারি নাম, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দেশের কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম করিবেন চণ্ডীপাঠ করিবেন, দক্ষিণা একশত টাকা লইবেন! এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? আমি আমার প্রতিবাসীর নাম এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছি, এই মোকদ্দমায় যদি জয়লাভ করিতে পারি তাহা হইলে প্রতিবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইবে আর, আমার যে এত কালের জাতক্রোধ তাহারও তৃপ্তি হইবে। ইহাই ধর্ম্ম!!! দেশের অধোগতির জন্য, আমাদের এই সর্ব্বনাশের জন্য কেহই দায়ী নহে, এই অপধর্ম্মই ইহার কারণ।

মাথায় জটা বাঁধিয়া বনে বসিয়া কাঁটায় শুইয়া তপস্যা করিয়া রাজা হইতে চেষ্টা না করিয়া, মুটেগিরি করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া, সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিকথা শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল, প্রেম দাতা প্রেম দাও, এই ভোগলালসা এই দুষ্পূরণীয় কাম ও তাহার জননী অবিদ্যা পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষা কর; সাধ্যমত পরের হিত চেষ্টা কর প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম, ইহাই যুগধর্ম্ম। আমাদের প্রকৃত হিত এই সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্য উপায় নাই। এইবার মূল শ্লোক কয়টির অর্থ বিচার করা যাউক।

ধর্ম্ম, অর্থ; কাম, মোক্ষ, এই চারিটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়। আদিতে ধর্ম্ম ও শেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর একটা নাম অপবর্গ সুতরাং ধর্ম্মের সহিত অপবর্গের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও কাম ইহারা লক্ষ্য নহে, একটা বিশেষে কিছু করিবার উপায় মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি অতএব ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাউক, তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ইন্দ্রিয়প্রীতিই কি কামের ফল? আমাদের মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য একটা ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। আমাদের মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাও আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়

প্রীতিতে কি কামের নিবৃত্তি হইবে? যাঁহারা বিজ্ঞ, সত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে তাঁহারা বলিবেন, না ইন্দ্রিয়প্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন নহে। এই যে কাম যাহা আমাদের মধ্যে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে অভাব পূরণের জন্য চেষ্টান্বিত করিতেছে, এই কাম ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারা তৃপ্তও হয় না, বরং কেবল ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টান্বিত থাকিলে অভাব আরও বাড়িয়া যায়। অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের যাহাতে প্রীতি হয় তাহার প্রচুর আয়োজন করি, কিন্তু অভাব মেটেনা, মনু বলিয়াছেন—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না, জ্বলন্ত আগুন নিভাইবার জন্য তাহাতে ঘৃত ঢালিলে যেমন নিভাইবার পরিবর্ত্তে ঐ আগুণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারায় কাম আরও বাড়িয়া যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই এককথা।

যেমন ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহারাদির অভাবে নিরাহার হয়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলি শিথিল হইয়া বিলীনপ্রায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের বা কামপীড়ার অনুমাত্রও ক্ষয় হয় না।

তাহা হইলে কামের তাৎপর্য্য কি? ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। ভাগবত বলিতেছেন 'লাভো জীবেত যাবতা' শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিলেন 'জীবন পর্য্যাপ্ত পর্য্যন্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ' সংক্ষেপে ইহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে। আমরা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাই, মনের দুঃখে সময়ে সময়ে বলি বটে, 'যম হে আমাকে লইয়া যাও" 'আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধ'রে খাই হলাহল'। কিন্তু যম যদি ডাক শুনিয়া হঠাৎ একদিন মহিষের উপর চড়িয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কথামালা'র কাঠুরিয়ার মত যমকে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিব। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই' কেহই মরিতে চায় না। তবে যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করে সে একটা উন্মাদের অবস্থা। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহার কারণ এই, জীবনে যতই দুঃখ পাইনা কেন, জীবনের মূলে আনন্দ সর্ব্ব

দাই আছে, গভীর দুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"। আমরা অমৃতির পুত্র, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই। এখন বাঁচি কি করিয়া? তত্ত্বদর্শী বলিবেন 'কেন, আমি তো আত্মা, আমার তো মরণ নাই।' তত্ত্বদর্শীর কথা সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি যে আমি আত্মা তখন কথাটা সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ আমার তো প্রতীতি নাই যে আমি আত্মা। তাহা হইলে আমাকে এখন বাঁচিতে হইলে, এই দেহ খানি রাখিতে হইলে কাম চাই। কামনা (Desire) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বস্তুর কোনই প্রভেদ থাকিত না, কামের দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা চেষ্টান্বিত, 'আমি আমার, আমাকে বাঁচিতে হইবে' এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, এই চেষ্টার দ্বারাতেই আমরা নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিকাশের পথে যাইতেছি। সুতরাং কাম একটা নিরর্থক ব্যাপার নহে, এই বিশ্ব লীলায় কামদেবের কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। মদনকে দহন করিলে চলিবেনা। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন করা যায় কিরূপে তাহারই চেষ্টা করা যাইবে। সাধনার সনাতন আদর্শ মদন দহন নহে, মদন মোহন, একথা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু কামের সার্থকতা এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কিনা তাহা আলোচনা করিয়া কামদেবের পূজা করিতে হয়। সহজ কথা এই যে যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দরকার সেইটুকু খাইবে, কেবল কামের বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অমিতভোজন করিবে না, কারণ তাহা হইলে জীবনী শক্তির বিকাশ না হইয়া ফল তাহার বিপরীত হইবে। এই প্রকারে সকল জায়গাতেই কামের সেবা করিতে হইবে।

এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন-ধারণ, এখন জীবন ধারণের ফল কি? একদল লোক সেই আগের কথা বলিলেন। ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদিলোক পাওয়া যায় সেই লোক পাওয়া কামের ফল। ভাগবত বলিতেছেন, না, তাহা নহে! জীবন ধারণের ফল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা কি, তাহা আমরা পরে দেখিব। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যস্থানে এই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকের যাহা প্রতিপাদ্য তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥
শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২স্ক ৩র্থ।

এই শ্লোকগুলির অর্থ এই। আমরা যে এই জগতে আছি, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেহ বলিবেন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন শুধু বাঁচিয়া থাকা, সে তো গাছেরাও থাকে। কিন্তু আমরা যে নিশ্বাস ফেলি? শাস্ত্র বলিতেছেন ভস্ত্রার মধ্যেও তো নিশ্বাসের মত বায়ু যাতায়াত করে। কেহ বলিবেন আমরা আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি করি। শাস্ত্র বলিতেছেন পশুগণও তাহা করে। তাঁহা হইলে আমরা যে মানুষ হইয়াছি আমাদের বিশিষ্টতা কি? অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ ও পশু হইতে আমরা পৃথক কিসে?

শাস্ত্র বলিতেছেন—কৃষ্ণনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, সে মানব একাই চারিটি গর্হণীয় পশুর কার্য্য সাধন করে। এই চারিটী পশু কি কি? কুক্কুর গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ। একা মানুষ চারিটি পশুর ধর্ম্মপালন করে বলিয়া পশুগণ সেই মানুষপশুর স্তব করে। পশুগণ এই কথা বলে যে আমরা পশু, কিন্তু একজন অপরের ধর্ম্ম লইতে পারি না। আর আমরা স্বধর্ম্মে অবস্থিত। কিন্তু এই যে মানুষ, এ ব্যক্তি ইহারা স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া নরক হইবে তাহা জানিয়া আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অনুরাগের

পরন্তু অনুরাগের দ্বারা আমাদের চারি জনের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে। কুকুরের ধর্ম্ম অকারণ রুষ্ট হওয়া, শূকরের ধর্ম্ম অমেধ্য ভোজন, উষ্ট্রের ধর্ম্ম কণ্টকের ন্যায় দুঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দ্দভের ধর্ম্ম ভারবহন। তাঁহা হইলে শাস্ত্রকার বলিতেছেন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণে যদ্যপি রতি না হয়, তাহা হইলে মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন। ভগবত কথায় রতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের মূলে আনন্দময় পরম পুরুষ তাঁহার স্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই লীলাময়কে একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বলা হইল।

এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, স্বভাবের প্রেরণায়, ঐকান্তিক অনুরাগে যে আশ্রয় করা, তাহা যে কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা কল্পনা তাহা নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্ত্বা দিয়া আপনার করিতে হইবে। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাঁহার; আলোচ্য শ্লোকে তাঁহার নাম শ্রবণই কর্ণের সার্থকতা, এইটুকু উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

'যে মানব শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্ট জিহ্বা ভেকজিহ্বার তুল্য।' কর্ণেরন্ধ্র দুইটীকে গর্ত্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে গ্রাম্যবার্ত্তারূপ যে সর্প তাহা তথায় বসতি করে।

'যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয়; তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে তাহা কঞ্চন কঙ্কনে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃত ব্যক্তির হস্ত তুল্য।' কিরীট ও উষ্ণীষ শোভিত মস্তককে ভার বলার তাৎপর্য্য এই যে জলে ডুবিয়া যাইবার সময় যদ্যপি মস্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে তাহা হইলে আর নিস্তারের উপায় থাকে না, সেইরূপ উষ্ণীষ ও কিরীটে মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যদি বিশেষ ভাবে ভগবদুপাসনা না করা যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত দুইটীকে মৃতব্যক্তির হস্ত বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে হস্ত দুইটী অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কার্য্য তাহার দ্বারা হয় না।

'যাহাদের চক্ষু দুইটি ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন না করে, তাহা ময়ূর পুচ্ছের সদৃশ, বস্তুতঃ তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সেই দুই পদ বৃক্ষের মত।' চক্ষুকে ময়ূর পিঞ্ছের তুল্য বলার প্রয়োজন এই যে ইহা আত্মার উদ্ধার সাধন করেনা, কেবলমাত্র সংসার কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ দুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূতগণ কুঠারের দ্বারা তাহা ছেদন করিবে।

'হে সূত যে মনুষ্য কখন ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু ধারণ না করে, সে ব্যক্তি জীবচ্ছব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত, আর যে শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে নিশ্বাস সত্বেও মৃত শরীর সদৃশ।'

মানব এই প্রকারে ভগবানকে অনুভব ও আস্বাদন করিয়া বাহ্য অঙ্গ সমূহের সার্থকতা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহা হইলেই হইবে না, অন্তর অঙ্গ সমুহের ও ভগবদুপাসনাদ্বারা সার্থকতা সাধন করিতে হইবে। হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণ-তুল্য কঠিন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এই এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে যে কোন স্থানের উপদেশ আলোচনা করিলেই ভাগবত ধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। জীবনে ধর্ম্ম যখন প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাভ করে, সেই সময়ে জীবন কিরূপ হয় তাহা পূর্ব্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ বুঝা যাইতেছে। ধর্ম্মজীবনের একটা আদর্শ আছে তাহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে আমাদের এই দেহ ও ইন্দ্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহারা আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিঘ্ন স্বরূপ। ভাগবত ধর্ম্ম তাহা বলেন না। ভাগবত ধর্ম্মে অবশ্য দেহ সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ উদ্দেশ্যরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, ভাগবত ধর্ম্মে এই কথা বলা হয় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি তখনই দুঃখ পাই, কিন্তু এই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানকেও আশ্রয় করা যায়। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বারা ভগবানের উপাসনা বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথা।

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্ত্তি।

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধামে সাধু শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিঞ্চিদধিক একবৎসর পরে ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইতে নিদাঘ বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়াছে। নিদাঘ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে। শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের শ্রীধাম নবদ্বীপে এই তিনটী কীর্ত্তি।

এই তিনটী সদনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সাধিত হইতেছে।

(১) অন্ধ, আতুর, অসহায় ও স্থবির ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান ও প্রতিপালন।

(২) দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অসহায় অবস্থায় আশ্রয়দান করিয়া চিকিৎসা করা ও অন্যস্থানে থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্য দান ও ঔষধ পথ্য প্রদান।

(৩) অসহায় মৃত ব্যক্তির সৎকারাদি করা।

(৪) বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় রোগীগণকে বিশেষরূপে সেবা ও সাহায্য করা।

(৫) বিদেশী যাত্রীগণের সর্ব্ব প্রকার অভাব ও অভিযোগ দূরীকরণ।

(৬) ক্ষুধিত বিপন্ন ব্যক্তিগণকে অন্নদান।

(৭) অনাথ বালকগণকে রক্ষা ও তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(৮) বিদেশ হইতে আগত অসহায় প্রসূতিগণকে সাহায্য করা ও ভ্রূণহত্যা নিবারণ।

(৯) শিক্ষিত যুবকগণকে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মের সহিত পরিচিত করা।

(১০) বিবিধ উপায়ে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করা।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার নামে নবদ্বীপ ধামে যে সম্পত্তি ছিল তাহার তত্ত্বাবধান ও তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল সলিসিটার কলিকতা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র সিংহ জমীদার, রাইপুর, বীরভূম।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, বীরভূমি সম্পাদক ও ধর্ম্ম প্রচারক।

(৪) শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী ধর্ম্মপ্রচারক।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু মানিকলাল মল্লিক ব্যবসায়ী কলিকাতা।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন বাক্‌চি জমিদার নবদ্বীপ।

(৭) শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নবদ্বীপ।

ট্রাষ্টিগণের অভিমত অনুসারে অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত বাবু কুলদা প্রসাদ মল্লিক পূর্ব্বোক্ত তিনটী অনুষ্ঠানের সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু সুধাময় চট্টোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক হইয়াছেন। এই তিন জন এক্ষণে আশ্রমের সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে যে সৎকার্য্যগুলি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে স্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা এখন প্রায়ই এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধাম হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্য দেব ও তাঁহার পার্ষদগণ কর্ত্তৃক যে প্রেম ধর্ম্মের উজ্জ্বল ও মধুর আদর্শ জনসমাজে প্রচারিত হয়, সেই প্রেমধর্ম্মে বাঙ্গালীর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও একমাত্র কল্যাণ-সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই প্রেমধর্ম্মকে এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম বলিয়া সুধীগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালার জাতীয়ধর্ম্ম। আজ সমগ্র জগত যে বিশ্বজনীন মহা ধর্ম্মের আশার স্বপ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে শ্রীমন্ মহাপ্রভুই সর্ব্ব প্রথমে এই বঙ্গদেশে সেই প্রেমধর্ম্মের আনন্দ-বার্ত্তা প্রচার করেন এবং স্বয়ং আস্বাদন করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে আস্বাদন করাইয়া যান। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সেই অপূর্ব্ব সংবাদ এতদিন ভুলিয়া বসিয়াছিলাম আজ আবার তাহা ভগবানের বিশেষ কৃপায় মনে পড়িয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আমাদের জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই; সিদ্ধ মহাত্মা চরণ দাস বাবাজী মহাশয় কি করিয়া এই প্রেমধর্ম্ম আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সে সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। তাঁহারই উপদেশক্রমে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সৎকার্য্যগুলি আরম্ভ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপই এই প্রেমধর্ম্মের কেন্দ্র ও সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধামের গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী নবদ্বীপে আসিয়া

থাকেন। এই প্রেমধর্ম্ম যে জীবে দয়া বা জনসেবার মধ্য দিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সফল করিয়া থাকে, এই তত্ত্বটুকু কার্য্যের দ্বারা জনসমাজে প্রচার করিয়া, ধর্ম্মের নামে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূর করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই ভাবের প্রেরণাতেই পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি আরম্ভ করেন। এ প্রকারের কার্য্য নবদ্বীপে এই প্রথম, আশা করি এই কার্য্যগুলি সম্বন্ধে সকলে ধীর ভাবে চিন্তা করিবেন।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির।

(১৩২১ সালের ১১ই আষাঢ় "সঞ্জীবনী" হইতে পুনর্মুদ্রিত)

গত বৎসর মে মাসে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক স্থানীয় রাধারমণ সেবাশ্রমের শাখা-রূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপে এই প্রকারের ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিই বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু কার্য্যটি দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পূর্ব্বে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে নদীয়ার সর্ব্বজনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, সি, মুখার্জি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগর টাউনহলে এই মাতৃমন্দির সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ করিবার জন্য যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বলেন যে নবদ্বীপে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে প্রায় ৬০০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোক আসিয়া থাকেন।

এই সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা, তাহারা গর্ভবতী হইয়া সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে নবদ্বীপে আসিয়া থাকে ও গোপনে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সন্তান প্রসূত হওয়ার পর মৃদু বিষ প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অযত্ন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। কন্যা সন্তান হইলে বেশ্যাগণ তাহাদিগকে কিনিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত বালিকা জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। এই ঘটনা, যাহা নিত্য নিত্য গোপনে ঘটিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গর্ভবতী বিধবাগণকে সহায়তা করা এক সম্প্রদায় লোকের অর্থ উপার্জ্জনের একটি বিশিষ্ট উপায়। এই সম্প্রদায়ের লোকও সমাজে আদর ও সম্মানের সহিত,

হয়ত গুরু বা ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া বাস করেন। ইহা ছাড়া অসৎ লোকের হস্তে পড়িয়া গর্ভবতাগণের আরও অনেকরূপ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, কিন্তু ইহার প্রতিকার সাধনে মনোযোগী হইতে আমাদের সাহস হয় নাই"। অনেক সময়ে এমনও হইয়া থাকে যে একজন গর্ভবতী আসিয়া কোন সরাইবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, সরাই বাড়ীর অধ্যক্ষ গর্ভবতীর টাকা কড়ি সমুদয় আত্মসাৎ করিয়া প্রসবের পূর্ব্বে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সমুদয় জানিতেন এবং বিপদ হইতে আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক ও সদ্যপ্রসূত শিশুগণকে রক্ষা করার জন্য তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিয়া স্থানীয় হেল্‌থ অফিসার ও পুলিশ সাব্‌ইন্‌স্পেক্টারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ করেন।

সারাইবাড়া হইতে বিতাড়িতা ও আশ্রয়হীনা একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক একদিন রাত্রিকালে নবদ্বীপের এক জঙ্গলে সন্তান প্রসব করিয়া রোদন করিতেছিল, নিত্যানন্দ দাস মহাশয় সেই সময়ে ট্রেণ হইতে নামিয়া সেবাশ্রমে আসিতেছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া এই স্ত্রীলোকটিকে সদ্যপ্রসূত শিশু সহ রাধারমণ সেবাশ্রমে আশ্রয় প্রদান করেন ও সেই দিন হইতেই এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই গর্ভবতী ও শিশুগণকে রাখা হইত, শেষে নানা কারণে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে ও নবদ্বীপ ধর্ম্মশালার বৃহৎ বাড়ী এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লওয়া হয়। এখনও সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিখে মাঘী মেলায় অক্লান্তভাবে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উইল করিয়া নবদ্বীপধামে তাঁহার নামে যে সম্পত্তি ছিল সেই সমুদয় সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ ঐ শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক ঐ শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক ঐ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী

ঐ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী (নবদ্বীপ) শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র (ঐ)। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের সম্পাদক হইয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

মহাত্মা নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মাতৃমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ মাত্র করিয়া গিয়াছিলেন। পরিচালনার আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিরক্ষা, বিশেষ করিয়া মাতৃমন্দির রক্ষা করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কয়েকদিন বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণনগরের যাবতীয় সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। স্থানীয় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী, কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্রলোকগণের বিশেষ চেষ্টায় মাতৃমন্দিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে একটি কমিটি গঠিত হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ইহার সহযোগী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক। নবদ্বীপে কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে সেই কমিটিতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচি মহাশয় সভাপতি, ও শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক। ইঁহারা উভয়েই রাধারমণ সেবাশ্রমের ট্রাষ্টি। রাধারমণ সেবাশ্রম কর্ত্তৃকই এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, কৃষ্ণনগর কমিটি মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া মে মাস হইতে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, ৩টি প্রসূতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিগণকে তিন মাস রাখা হয়। গত মে মাসে এই মন্দিরে সর্ব্বসমেত ১৩২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কমিটি ৫০ টাকা দিয়াছেন, আর অবশিষ্ট ব্যয় রাধারমণ সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করিয়াছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডিবিসনাল অফিসার এই মন্দির, মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা ছাড়া গত এক মাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার, মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবদ্বীপস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, মিষ্টার উইটেন্ বেকার, ডাক্তার কাইমুরা

(জাপান) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত (অধ্যাপক পাবনা) ডাক্তার গয়ানাথ পাল (জগতী) প্রভৃতি এই মন্দির পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১ লা এপ্রিল তারিখে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে আবেদন করেন সেই আবেদন পত্রের এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে আশ্রমের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

People from all parts of the province, especially from Dacca, Mymensing. Tippera and other districts of East Bengal, throng into this city (Nabadvip) seek shelter just to hide their shame under the shade of the multitudious population and the pecuniary greediness of the Sarai-keepers of Navadvip, deliver these off-shoots from illicit connections, bide their time and they depart again to avoid calumny and disgrace to their respective homes, leaving the unfortunate infants to their fate.

These children often die for sheer neglect and wilful carelessness on the part of the mothers and the inn-keepers, as it is generally against their interest and intention to preserve the lives of these babies. And even if they survive, the babies, if girls, are frequently handed over to the ignominous women— destined by the so.called parents themselves to life-long prostitution and wretched debase-ment. The boys likewise recommended to beggarism aed vagabondism all the days of their lives to move about in low circles and and in low company, without education and without breeding, so that they have no other alternative but to grow up into a race of ruffians and rascals.

With a view to prevent, as far as possible this lamentable state of affairs—to keep these poor, helpless, fateless children out of the imminent wreck and ruin of so many human lives—to provide them with food, lodging, and suitable education, so that they may push up their heads and stand out as men in the strife aad sruggle of life in the world, this institution craves the permission of the official staff and the active co-operation of the local police in the working and management of Delivery Home, where secrecy and care of the babies delivered will be guaranteed.

মাতৃমন্দির ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে একটি কথা বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নহে। এই আশ্রমে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। এই আশ্রমে যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহা সার্ব্বজনীন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভক্তিপথের সাধক ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অভাবের গুরুত্ব প্রায় সকলেই অনুভব করেন, কিন্তু কেবল মাত্র অনুভব করিলেই চলিবে না। সকলেই এই আশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য করুন। যাবতীয় সাহায্য শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদক সেবাশ্রম, নবদ্বীপ পোঃ নদীয়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,
আষাঢ়, ১৩২১।

রেণেটীর পদকর্ত্তা। *

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভ হইতে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমেখলা রত্ন-প্রসূ বঙ্গজননী যে কতশত রত্ন প্রসব করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অনুসন্ধান যতই চলিতেছে, ততই ক্রমশঃ দুই একটি করিয়া মহাপুরুষগণের অবিনশ্বর কীর্ত্তিকলাপ লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছে। অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতেছি না যে বৌদ্ধযুগ আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না, বা বঙ্গদেশ বনবনাবৃত ছিল, সুহ্ম পৌণ্ড্র অঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ, অষ্টাবক্র ঋষির যোগপীঠ বক্রেশ্বর, বশিষ্ঠাশ্রম তারাপুরাদি দর্শনে মনে হয় যে সত্য যুগাবধিই বঙ্গদেশ পুণ্যপূত, ৫১টি মহাপীঠের ১৫।১৬টি এই বঙ্গদেশে অবস্থিত; সে হিসাবে বোধ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় বঙ্গদেশই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে ৭ম পটলে অঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে।

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনে শান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥

চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চজন ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করেন তাহার নাম বঙ্গদেশ। গরুড় পুরাণে

* কলিকাতা টাউনহলে সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

"বলিস্বতপঞ্চো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্ম পৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ॥"

মৎস্যপুরাণে ও বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে

"অঙ্গ বঙ্গা মদ গুরুকা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ।
শল্বা মাগধ গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ যে অঙ্গ বঙ্গ গৌড় পৌণ্ড্র সুহ্মপ্রভৃতি দেশের সংমিশ্রণে সংগঠিত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

এই বঙ্গদেশের মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষা পূত-সলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাঢ়ভূমিই অধিকতর গৌরবান্বিতা। অবশ্য আমার এরূপ উক্তিতে বরেন্দ্র, পূর্ব্ববঙ্গ বা অন্যান্য স্থানের সুধী ভ্রাতৃবৃন্দ ক্ষুন্ন না হন, ইহাই আমার প্রার্থনা। মহাকবি কালীদাস, জয়দেব, বঙ্গসাহিত্যের জনক চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, রমাই পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায়, হেমচন্দ্র, রামরসায়ন প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, নরেশচন্দ্র, দাওয়ান মশাই (আকিঞ্চন) নীলাম্বর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক অমর কবি-বৃন্দ এবং অন্যান্য অনেক কবি এই রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার ও সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি যে স্বর্গগত কবিদ্বয়ের জীবনী লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারা নিতান্ত আধুনিক ও ক্ষুদ্র কবি নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা বঙ্গজননীর প্রাণাধিক প্রিয়তম সুসন্তান হইলেও আজ পর্য্যন্ত বঙ্গজননীর বিরাট জঠরের নিভৃতপ্রদেশে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন নাই। তবে সম্প্রদায়বিশেষ, যাঁহারা প্রায় পরলোক প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, তাঁহারাই এখনও অর্থাৎ কীর্ত্তনিয়া সম্প্রদায়, রেণিটীর পদকে সুষমামণ্ডিত স্বর্গের পারিজাত ভাবিয়া ও সদ্গোপ বংশজ পদকর্ত্তাদ্বয়কে দেববৎ পূজা করিয়া তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া ধন্য হন। রেণিটীর ন্যায় উচ্চ তাললয়ের পদ আর নাই, যে কীর্ত্তন-গায়ক দুইখানি রেণিটীর পদ সম্পূর্ণ সুরলয়ের সহিত গান করিতে পারেন তাঁহার ধারণা ও অহঙ্কার যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক। রেণিটীর পদকর্ত্তাদ্বয়ের নাম বিপ্রদাস বিশ্বাস ও তৎপুত্র বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস। বিপ্রদাসের পিতার নাম দেবীদাস বিশ্বাস, জাতি সদ্গোপ। দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের জন্য যেমন সুবর্ণ-বণিক সমাজ

গৌরবান্বিত, সাধক রামপ্রসাদের জন্য যেমন বৈদ্যসমাজ কৃতার্থ, ভগবদ্ভক্ত বিপ্রদাস ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিজয়কৃষ্ণের জন্যও সদ্গোপজাতি যে ধন্য, পবিত্র ও গৌরবান্বিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিপ্রদাসের পিতা দেবীদাস হইতে অধস্তন এগার পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বলেন রামমোহনের পূর্ব্বে বোধ হয় আরো দুই চারি পুরুষের নাম অপ্রাপ্ত।

বংশাবলী

দেবীদাস
|
বিপ্রদাস
|
বিজয়কৃষ্ণ
|
বাসুদেব দাস
|
শ্রীকৃষ্ণদাস
|
বৈষ্ণবচরণ
|
রামমোহন
|
বংশীবদন
|
বিশ্বনাথ
|
কালিদাস
|
কানাইলাল

কানাইলাল এখন ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক সুন্দর সুপুরুষ, নম্র ধীর শান্ত শিষ্ট যুবক, বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুঃখের দাবদাহে অতিশয় কষ্টভোগ করিয়া এক্ষণে হুগলির অদূরবর্ত্তী ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের খন্নেন ষ্টেসনের সন্নিকটে ইটে-চোনা গ্রামে এক অবস্থাপন্ন অপুত্রকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিয়াছে। বিশ্বাস-বংশের সেই পবিত্র সাধন-পীঠে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ নামক জনৈক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বসবাস করিয়া এখন সন্ধ্যা দান করিতেছেন। বিপ্রদাসের সময় হইতে বিশ্বাস-বংশে গীতবাদ্যের সমধিক সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামমোহন ও বংশীবদন, পিতাপুত্রে ঢোল ও খোল উভয়যন্ত্র বাদনেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎকালীন হাঁসখালির বিখ্যাত জগাঢুলি রামমোহনের এবং দীনু ও ঈশ্বর ঢুলি বংশীবদনের নিকট ঢোল

বাজনা শিক্ষা করিয়া যান। বংশীবদন পিতার নিকট খোল ও জগার নিকট ঢোল বাজাইতে শিখিয়াছিল। প্রবন্ধলেখক কালিদাসকে দেখিয়াছেন; তিনিও বেশ সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তবে তিনি কীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ইংরাজী শিখিয়া ছোটলাট দপ্তরের ছাপাখানার কম্পোজীটারদের ওভারসেয়ার ছিলেন, বিপ্রদাস ও তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণ চৌদ্দ বা পনর শত শকের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিলেও কোন্ বৎসরে কোন্ মাসে কোন্ দিনে কোন্ সময়ে কোন্ তিথিতে বা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বয়োবৃদ্ধগণকে বলিতে শুনিয়াছি, এখনও গ্রামে প্রচলিত প্রবাদবচনে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কালনার স্বর্গগত মহাপুরুষ, শ্রীল ভগবান দাস বাবাজী দেবীপুরের নাম শুনিলে গ্রামের ও বিশ্বাস বংশের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতেন, বিশ্বাসবংশ বহু প্রাচীন পরম ভাগবত বংশ, রেণিটীর পদকর্ত্তারা পিতাপুত্রে শ্রীভগবানের প্রিয়তম সেবক ছিলেন। দেবীপুর মর্ত্ত্যে ধ্রুবলোক। অনেকে বলেন এই রেণেটীর পদ শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে রচিত। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব না; কারণ সেদিন সাহিত্য-পরিষদের ১৩২০ সালের নবম মাসিক অধিবেশনে, পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ; সি আই, ই মহোদয়, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের "কীর্ত্তিবাসের জন্মশক" প্রবন্ধের মন্তব্যে বলিয়াছিলেন "বার ও তেরশ শক এই দুই শত বৎসরের মধ্যে কোন গ্রন্থাদি প্রণয়ণের প্রমাণ পাওয়া যায় না।" রেণেটীর পদাবলীর ভাষাও বার তেরশত শকের পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ রেণেটী পদে গৌরচন্দ্রিকা আছে; গৌরাঙ্গদের আবির্ভাবের পর যে কোন বৈষ্ণবকবি যে কোন পদ বা সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছেন, তিনিই প্রথমে মঙ্গলাচরণ গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া পদ আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং রেণেটীর পদ যে গৌরাঙ্গদেবের পরেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেবীপুরের আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নবগ্রামের গোস্বামী প্রভুপাদেরা বিশ্বাস বংশের কুলগুরু। উক্ত গোস্বামী বংশের আদি পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের পার্শ্বচর শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য শ্যামা দাস (শ্যামানন্দ) গোস্বামী। তিনি বিপ্রদাসের ও শ্যামাদাস প্রভুর পুত্র ৺নৃসিংহ দেব প্রভু বিপ্রদাসসুত বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রদাতা ছিলেন। সুতরাং

পদগুলি যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময় বা কিছু পরে (১০।১৫ বৎসরের মধ্যে) রচিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে এই পদ সম্বন্ধে আর একটি রহস্যজনক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বাৎসল্য ভাবের ভক্ত, ভাবুক বিপ্রদাস, কুলীন গ্রামে (কুলীন গ্রাম দেবীপুর হইতে দক্ষিণে পাঁচ মাইলের অধিক হইবে না) মহাপ্রভু দর্শনে গমন করিয়া রাধাভাবে মাতুয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ লাভে অসমর্থ হওয়ায়, কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর বাৎসল্য ভাবের ভক্ত ভাবুক বিপ্রদাসকে বালগোপাল মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ না করায় অভিমানভরে তিনি মঙ্গলাচরণ গৌর-চন্দ্রিকা রচনা করেন নাই। ভগবানের নিকট ভক্তের রাগ অভিমান আব্দার সকলই শোভা পায়। বিপ্রদাসের দেহত্যাগের পর পুত্র বিজয়কৃষ্ণ গৌর-চন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। আরও প্রবাদ শ্রীপাঠ কুলীন গ্রামে হরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত "গোপাল" বিগ্রহ প্রতি রাত্রে কুলীনগ্রাম হইতে আসিয়া বিপ্রদাসকে দর্শন দান ও বিপ্রদাসের নিবেদিত "দহি মাখন" ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ করিতেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অধুনা সদর সবজিবিজান থানা সাতগেছিয়ার অধীন রাণিহাটী (রেনিটী) পরগণায় দেবীপুর গ্রামে সদ্গোপ বংশে বিপ্রদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমকুল, পূর্ব্বকুল ও মধ্যকুল, সদ্গোপ জাতির মধ্যে প্রধানতঃ এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিপ্রদাস কোন্ কুল ধন্য করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যদিও ৩।৪ পুরুষ তাঁহাদের করণাদি পশ্চিমকুলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাস উপাধি পূর্ব্বকুলেই সংবদ্ধ; তবে যদি তখন কুল বন্ধন হইয়া থাকে তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র। আশা করি সদ্গোপ সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

রেণেটী—রাণিহাঠ বা রাণিহাটীর অপভ্রংশ শব্দ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেবীপুরের সবডিবিজান ও থানা ছিল ছলিমাবাদ। আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায় সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সরকার সপ্তগ্রামের অধীন এই রাণিহাটি পরগণা। ছলিমাবাদ তখন স্বতন্ত্র সরকার ছিল। পরগণার নাম রাণিহাটী কেন হইয়াছে তাহা প্রথমে নির্ণয় করিতে পারি নাই। তৎকালীন দেবীপুরে বা দেবীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে সকল বয়োবৃদ্ধগণ ছিলেন তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে রাণিহাটী কোথায়, কিরূপ প্রসিদ্ধ

স্থান ছিল। অবশ্য সরকার সপ্তগ্রামের অধীন রাণিহাটী বা রাণিহাট যে একটি নগর, সহর বা বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম ছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সকলেই বলিতেন "তেহি নো দিবসা গতাঃ" হয়ত করাল কালের বিরাট জঠরে তাহা লীন হইয়া গিয়াছে। রেণিটী বৃহৎ পরগণা।

দেবীপুরের ১০ মাইল উত্তমপশ্চিম কোণে সাতগেছিয়া থানার অধীন কাষ্ঠকুরুম্বা গ্রামে মাতুলালয়ে সন ১৩৮১ সালের, ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রবন্ধ লেখকের জন্ম হয়। লেখক এখনও মধ্যে মধ্যে সেই জন্মস্থান দর্শন জন্য গমন করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ প্রণয়নে লেখককে দুই একটি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত দেবীপুর ও কাষ্ঠকুরুম্বার মধ্যপথে দামোদরের অন্যতম শাখানদ বাঁকা নদীর তীরে পারহাটী নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই পারহাটী গ্রামে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে "পেতাব ঘোষ" (প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ) ও ক্ষুদি-বিমলি (ক্ষুদ্রমণি ও বিমলাসুন্দরী) নাম্নী বাগ্‌দী জাতীয়া মহোদয়াদ্বয় কবির গানে সর্ব্বাধিক প্রাসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রবন্ধ লেখা শেষ হইল অথচ স্থানটির কোন সন্ধান করিতে না পারায় যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন জানি না আমার সর্ব্বদাই মনে হইত যে, এই পারহাটী গ্রামখানির নিকটেই বোধ হয় কোনস্থানে রাণিহাটী সহর বিদ্যমান ছিল, এই গ্রামের নিকট বাঁকা-নদী পার হইয়া রাণিহাটী যাইতে হইত বলিয়া এই গ্রামখানির নাম পারহাটী হইয়াছে। সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে কলিকাতা টাউনহলের অধিবেশনে সাহিত্যশাখায় আমার এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হইবার পরে জানিতে পারি যে, বাস্তবিকই পারহাটীর অনতিদূরে ৩।৪ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে বাঁকা নদীর তীরেই রেণিটী নামক একখানি অতিক্ষুদ্র গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। তিনিই এক সময়ে সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। কালের কুটীল ভ্রুভঙ্গিতে এখন কিন্তু সেখানে ঘরকয়েক মাত্র হিন্দু ও মুসলমানের বাস! তবে শুনিলাম বিবিধ ভগ্নাবশেষের অভাব নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুসন্ধান করিলে হয়ত অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন হইতে পারে।

দেবীপুর বহুপ্রাচীন গণ্ডগ্রাম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে যাঁহারা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাঁহারা দেবীপুরের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত। বিপ্রদাসের জন্মগ্রহণের সময় গ্রামের অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। প্রচলিত কিংবদন্তীর সাহায্যে যতদূর অবগত হইয়াছি এবং বয়োবৃদ্ধগণ কালনার ভগবানদাস বাবাজীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে গল্পচ্ছলে শুনাইয়াছেন, তাহারই সারমর্ম্ম আপনাদের নিকট বিবৃত করিতেছি। বঙ্গের অন্যতম কর্ম্মনাশা জনপদধ্বংসী দামোদর নদের এক শাখা নদীর তীরে, এখন যেখানে দেবীপুর গ্রাম অবস্থিত তথায় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দেবীদাস বিশ্বাস জ্ঞাতিবিরোধ অথবা তৎকালীন জমীদার বা আয়মাদারগণের অত্যাচারে, নিকটবর্ত্তী, অদূরবর্ত্তী অথবা সুদূরবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া এক বৃক্ষতলে কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অল্প অল্প বন কাটিয়া আবাদি জমি প্রস্তুত করতঃ চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে একদিন হলচালনা করিবার কালীন দেখিতে পান যে, নদীর খরতর স্রোতে এক জীবিত তিন্তিরি বৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া হঠাৎ সেই স্থানে আটক হইয়া যায়। সেইদিন আবার মধ্যরাত্রে প্রত্যাদেশে জানিতে পারেন যে, সেই তিন্তিরি বৃক্ষের পাদদেশে অনাদিলিঙ্গ মহাদেব ভূগর্ভে প্রোথিত আছেন, তিনি তাঁহার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক সেবাদির বন্দোবস্ত করুন। সৌভাগ্যবান ভগবদানুগৃহীত দেবীদাস মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক মহাদেবের উদ্ধারসাধন পূর্ব্বক সেবাপূজাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন; অদ্যাপি সেই শিবলিঙ্গ সেই তিন্তিরি বৃক্ষতলে এক জীর্ণ মন্দির অভ্যন্তরে বিরাজমান। দেবীপুরের অন্যতম চারআনির জমিদার দয়াদাক্ষিণ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বর্গগত ৺কালীদাস সিংহ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটির কোন কোন অংশ সংস্কার না করিলে এতদিন হয়ত মন্দিরটি ভূলুণ্ঠিত হইত। দেবীপুরের ঐ তেঁতুল গাছের ন্যায় বৃহৎ তেঁতুলগাছ বাঙ্গলাদেশে আর কোন স্থানে আছে বলিয়া শুনি নাই। বৃক্ষমূলের পরিধি সাড়েপঁয়ত্রিশ ফুটেরও উপর। উহার একএকটি শাখাপ্রশাখা একএকটি বৃহৎ বৃক্ষ। শিবলিঙ্গকে বুড়শিব বা বুড়রাজ বলা হইয়া থাকে। তেঁতুলগাছটিকে বুড়রাজের তেঁতুলগাছ বলা হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময় মহা ধুমধামে গাজন হয়। তবে নদীটি স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও আবাদি জমিতে

পরিণত হইয়াছে, স্থান বিশেষে এখনও ক্ষুদ্র নালার আকারে বিরাজমান। দেবীদাস বুড়োরাজকে মৃত্তিকাপাশ হইতে মুক্ত করিবার কালীন যথেষ্ঠ ধনসম্পত্তি মোহর, মণি, মুক্তা মাণিক্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবদ্ভক্ত দেবীদাস কৃষক হইতে ক্রমে একজন নিষ্ঠাবান ক্রিয়াবান ধনবান ব্যক্তি হইয়া উঠেন ; তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী শ্রবণ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে উৎপীড়িত প্রজাবর্গ একএকটি করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক বসবাস করিতে আরম্ভ করায় ক্রমে তথায় একখানি গ্রাম হইয়া পড়ে। দেবীদাসের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম ও বিষ্ণুমন্দির আমরাও দেখিয়াছি। বর্ত্তমান বংশধর কানাইলালের পিতা কালিদাস নিতান্ত দুঃস্থ অবস্থায় পতিত হইলে শালগ্রামটিকে তাঁহাদের ইষ্টদেবতার গৃহে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া শালগ্রামস্তূপে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। গুরু পুরোহিত ব্যবসায়ী প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহ আজকাল শালগ্রাম শিলার সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শিষ্য যজমানেরা সেবায় অসমর্থ হইয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দান করিয়া শিলা বা বিগ্রহ গুরুপুরোহিতের গৃহে রাখিয়া আসেন। তথায় তাঁহাদের প্রতিপালিত বা বেতনভুক্ত অসচ্চরিত্র যুবকগণই এখন দেবসেবা করিয়া থাকেন। বাটীর কর্ত্তাদের দেবসেবারূপ ছোট কাজ করিবার সময়ে কুলায় না, শরীরও ভাল থাকে না। এবং বাড়ীর ছেলেরা সকলেই বাবু অথবা চাকুরে বাবু! অথবা বাবুসাব্‌!

দেবীবিশ্বাস অরণ্য কাটাইয়া নগর বসাইয়াছিলেন। সেইজন্য গ্রাম খানির নাম হইয়াছে দেবীপুর। কাহারও কাহারও ধারণা দেবীবিশ্বাসের পূর্ব্বেও দেবীপুর গ্রাম ছিল, অধুনা গঙ্গোপাধ্যায় বংশের সিদ্ধেশ্বরী অথবা গ্রামের মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত তিন্তিরি বৃক্ষতলে অবস্থিত গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী ৺রক্ষাকালীদেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম দেবীপুর হইয়াছে। এসিয়াটীক সোসাইটীর স্বর্গগত সুযোগ্য সভ্য বাবু ভোলানাথচন্দ্র মহাশয় স্বপ্রণীত ও বিলাতের ট্রাবনার্স এণ্ড কোংর দ্বারা ২খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত Travels of a Hindoo. নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দেবীপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The Goddess Kali to whom the village owes its name is a fierce Amazonian statue seven feet high and quite terror-striking to the beholders. The wealthy family of the Singhees ha ador-

ned their native Village with a temple which does much credit to the rural masons &c &c. বাস্তবিকই স্থানীয় জমিদার সিংহ বাবুদের লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিষ্ণুমন্দিরের গঠন অতিব সুন্দর। বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন মেজর ভনসাহেব বলিয়াছিলেন "ইহা অপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর মন্দির বাংলাদেশে আর কোথাও দেখি নাই" তিনি ঐ সিংহবাবুদের মন্দির, তিন্তিরি বৃক্ষসহ বুড়োরাজের মন্দির ও বুড়োরাজের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ৺রত্নমণি সিংহের প্রতিষ্ঠিত একটি জোড়া শিবমন্দিরের ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কালক্রমে দেবীপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম হইয়া উঠে। ৮০।৮৫ খানি দুর্গোৎসব হইতে দেখিয়াছেন, এমন লোক এখনও দেবীপুরে জীবিত আছেন। হাড়ী বাড়ী, চাঁড়াল বাড়ী পর্য্যন্ত দুর্গোৎসব হইত। তাম্বুলী সদ্গোপ প্রভৃতি জাতি সকলেই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। কলিকাতা হাটখোলার বিখ্যাত মহাজন ৺শ্রীকান্ত সিংহ ও তৎপুত্র কুমোর পারার "চণ্ডী" "যাঁর গণ্ডীর ভিতর সিংহ বল ;" সাবাস আটাশের "চণ্ডী চলে সিংহ বলে তারই পাশে পাশ" সেই "চণ্ডী" মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব কমিসনার স্বর্গগত চণ্ডীলাল সিংহ মহাশয় দেবীপুরের অধিবাসী জমিদার ছিলেন। এখনও উঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য বর্ত্তমান, জমিদার ত বটেনই। ৺চণ্ডীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল সিংহ ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতার অন্যতম সুবিখ্যাত সওদাগর মশার্স জার্ডিন স্কিনারের বাড়ীর ও বোম্বে কোংর বর্ত্তমান মুৎসুদ্দি প্রসিদ্ধ ঘৃত ব্যবসায়ী সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় এখন দেবীপুরের অন্যতম প্রজারঞ্জক, দাতা ও দয়ালু জমিদার।

দেবীপুর এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। অধিক দিনের কথা নয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী প্রমুখ বঙ্গীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের শিক্ষাগুরু কাশী সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের বিশ্ববিশ্রুত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় দেবীপুরে হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহোদয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হরচন্দ্র এগারটি পুত্র ও চার কন্যার জনক। পুত্রগণ স্মৃতি, সাংখ্য ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি এক এক জন এক এক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এগার পুত্রের পিতা ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের (কর্ত্তা ভট্টাচার্জ্জি—লোকে তাঁহাকে কর্ত্তা ভট্টাচার্জ্জি বলিত) একমাত্র পৌত্র হইয়া-

ছিল। মধ্যম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতীত সকলেই অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র বরদাকান্ত ন্যায়রত্ন ন্যায়দর্শনে বঙ্গের শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি সৃষ্টির সময় পর্য্যন্ত বরদাকান্ত জীবিত থাকিলে তাঁহার অগ্রে অন্য কোন টোলের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। শুনাযায় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার নিকট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদগ্রহণের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা মৃদু হাস্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেব দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রাতঃস্মরণীয় বংশের দৌহিত্র—বরদাকান্তের ভাগিনেয়। এমন পবিত্র বংশের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রবন্ধ লেখক নিজের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত, রায়, সরকার, দত্ত, নন্দী, মজুমদার, নাগ, বাঁড়ুজ্যে, মুকুজ্যে, চাটুজ্যে, পাঞ্জা, কোঁঙার, সিংহ প্রভৃতি বংশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

দেবীবিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বিপ্রদাস ও পৌত্র বিজয়কৃষ্ণ, তবে দেবীদাসের বা বিপ্রদাসের আর পুত্রকন্যা ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজয়কৃষ্ণ বাৎসল্য রস ব্যতীত আর সকল রকম রসেই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মধুর রসের পদগুলি প্রাচীন পদাবলীর শীর্ষস্থানে আসন লাভের যোগ্য। প্রাচীন পদাবলীতে "দেবনৃসিংহ ভণে" ভণিতা-যুক্ত যে সকল পদ আছে তাহার সকলগুলিরই রচয়িতা বিজয়কৃষ্ণ, নৃসিংহ দেব গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। এখনকার ন্যায় প্রাচীন কবিরা নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের গুরুকে অদেয়ও কিছু ছিল না। এমন যে চিরস্থায়ী অবিনশ্বর কীর্ত্তি, সুমধুর পদাবলী তাহাও গুরুর নামে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বলাবাহুল্য তখনকার গুরু-দেবেরাও সহজে প্রতিগ্রহ করিতে রাজী হইতেন না। এখনকার ন্যায় হাট-বারে হাঠবারে শিষ্যবাড়ী গমন করিতেন না। বিজয়কৃষ্ণের একটি সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিতেছি।

শ্রীগান্ধার

"ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি।
হরিচন্দন তিলক ভালে বনি॥

শিখিপুচ্ছ বন্ধ শিরে মত্ত টলি।
ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলি ॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বী চলি।
মুখ নীল সরোরুহ বেড়ি অলি ॥
শ্রুতে শোভিত মকরাকৃতি কুণ্ডলং।
তাহে অধিক ঝলমল গণ্ডস্থলং ॥
উড়ে কৌস্তভ বিরাজিত হার যুগং।
মণি অম্বরে মণ্ডিত ভানুসুতম্ ॥
ভুজে দণ্ড বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব বারিদ বিদ্যুৎ স্থিরজনি ॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীতধটী।
কল কিঙ্কিনী সংযুত ক্ষীণকোটী ॥
পদে নুপুর বাজত পঞ্চ স্বরং।
কর বাদন নর্ত্তন গীত বরং ॥
পদে নুপুর বাজত পঞ্চ রসে।
বেণুধ্বনি ব্যাপিত দিকদশে ॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে।
ধায়ে কাননে কামিনী ত্যজি কুলে ॥
সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে গমনা।
একুলে ওকুলে দুকুলে যমুনা ॥
গজ সর্পসোঁয়ে গিরিরাজ চলে।
সুখ রূপ সুবীরুধ পুষ্প ফলে ॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভনে ॥

সুহিনী

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
মুখ মণ্ডল ঝল মল চন্দ ভানু ॥
শিরে কুঞ্চিত কুণ্ডল বন্ধ ঝুঁটা।
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা ॥

অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিশ্ব জনি।
গলে শোভিত মোতিম হার মণি ॥
ভুজ অন্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ চন্দ্রক সর্ব্ব বিখণ্ডনয়া ॥
হিয়ে হার করু নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিনী ঘাঁঘর তাহে মোড়া ॥
শ্রীপদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
স্থল-পঙ্কজ বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে ॥
ব্রজ বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম করে ॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥

ভৈরবী

আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি ॥
জন্ম তিথি পূজা কৃষ্ণ চন্দ্র অভিষেক।
সুর নর মুনিগণ দেখে পরতেক ॥
পঞ্চ গব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
জয় জয় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শিরে ঢালে ॥
নানা যন্ত্র বাদ্য গীত দুন্দুভির রোল।
এ তিন ভুবনের লোক বলে হরি বোল ॥
কলরব মহোৎসব জগত বেড়িয়া।
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমেতে পড়িয়া ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ নন্দের নন্দন।
নৃসিংহ-সেবক মাগে চরণে শরণ ॥

বিপ্রদাস ও বিজয়কৃষ্ণ, পিতাপুত্রেই সমগ্র রেণিটী পদের পদকর্ত্তা। রেণিটীর প্রথম পদকর্ত্তা বিপ্রদাস, বাৎসল্য ভাবের ভাবুক কবি ছিলেন। প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণের অনেকেই মধুর রসে বিভোর ছিলেন। এরূপ বাৎসল্যভাবের একনিষ্ঠ সাধক বিরল; রেণিটীর গোষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। যেগুলি বিপ্রদাসের

রচিত পদ, তাহাতে হয় যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের, নচেৎ নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর কথোপকথন ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাখালবালকগণের সহিত বা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ প্রেমালাপ বা উত্তর প্রতিউত্তর যুক্ত দাস্য বা মধুর রসের কোন পদ বিপ্রদাস রচনা করেন নাই, অন্যান্য রসের রেণিটীর সমস্তপদই বিজয়কৃষ্ণের রচিত। শুনা যায় পিতা বিপ্রদাস ও পুত্র বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে সাধনা ও সঙ্গীতে বেশ একটু আড়াআড়ি ভাব ছিল। বিপ্রদাস বলিতেন যে মুখে 'বাছা' বলিয়াছি, সে মুখে আর 'হে' বলিব না। বিজয় কৃষ্ণ উত্তরে বলিতেন যে মুখে 'হে' বলিয়াছি সে মুখে আর 'বাছা' বলিব না। আমাদের গুরুপ্রতিম শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় হিতবাদী পত্রে একবার বঙ্কিমপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"যে পদাবলীতে আঁখর নাই তাহাই রেণিটীর পদ—'" কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কারণ রেণিটীর পদে যে একবারে আঁখর নাই তাহা নহে, তবে অন্যান্য পদের ন্যায় অত্যধিক (কথায় কথায়) আঁখর নাই। রেণিটীর পদে বাঁধা অক্ষর আছে, রেণিটীর পদকর্ত্তারা পিতা পুত্রে যে কিরূপ উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন তাহা তাঁহাদের পদগুলি হইতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। রেণিটীর গোষ্ঠ যদিও প্রভাতি গান, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে ভাঁইরো ও ভৈরবী ছাড়া আর কোন রাগ রাগিণী নাই। সমস্ত দিবসের সকল রকম রাগিণীই আছে, সন্ধ্যার ফেরত গোষ্ঠ গোধূলি সময় পুরবী গানের পর গোষ্ঠ শেষ হয়। পদের উৎপত্তি স্থান দেবীপুর। জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল ভক্ত বৈষ্ণব অতিথি বেশে দেবীপুরে আসিয়া রজনীযোগে দেবীপুরের শেষ রেণেটী গায়ক বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া ৺ কৃষ্ণধন সিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বহির্বাটী হইতেই রেণোটির পদের খাতাখানি চুরি করিয়া লইয়া যায়।

রেণিটী পদের সংখ্যা ৫ শতের কম নহে। বিপ্রদাস প্রায় ২০০ শত ও বিজয়কৃষ্ণ অন্যূন ৩০০ শত পদ রচনা করিয়াছিলেন। উপস্থিত গ্রামের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সিদ্ধান্ত শিরোমণি "ভারতভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন" গ্রন্থের গ্রন্থকার, "ছিন্নলতা" গীতি কাব্যের সুকবি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ লেখকের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট হইতে যে পদগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে দুই চারিটা নমুনার স্বরূপ উপহার প্রদান করিতেছি। আমাদের

দুর্ভাগ্য নচেৎ দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় পিতামহ সুকবি নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ পাড়ার শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ব্বপাড়ার স্বর্গীয় ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট অনেক পদ এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা যাইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রেণিটী পদ, দাশুরায় ও লোকনাথের গান না গাহিতে পারিলে তাহাকে দেবীপুরের অধিবাসী বলা হইত না। আমরা প্রোক্ত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত নবমীর রাত্রে আগমনী ও কাশীখণ্ড এবং বিজয়ার দিন বিজয়ার গান "গিরিবর হে যায় হে প্রাণ কন্যা গিরিজা" গাহিয়াছি ; ৺রক্ষাকালী পূজায় লোকনাথের মশানের গান ও গোষ্ঠ যাত্রার দিন তাঁহাদিগকে রেণিটীর গান গাহিতে শুনিয়াছি। এখন আর তাহা নাই, উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া আমরা বৎসরের গড় এগার মাস গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিয়া থাকি, সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই—সে গ্রামবাসী নাই সে গ্রামও নাই, সে আনন্দও নাই, বৃদ্ধাগণের সেই উচ্চ হাস্যে এখন পল্লীগ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে না, প্রতি পল্লী গ্রামে এখন শ্মশানের বিকট চিত্র বিরাজমান! এখন দেবীপুর ক্রমে জঙ্গলাবৃত হইতেছে।

বাৎসল্যভাবে মাতুয়ারা ভক্ত ভাবুক কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ ও রচনাশক্তি দেখিলে স্বতঃই মুগ্ধ হইতে হয়; অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। প্রভাত হইয়াছে, গোপাল নিদ্রিত—নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই সাধক পদকর্ত্তা— যশোদা ভাবে বিভোর, পদকর্ত্তা অধীর হইয়া গাহিতেছেন—

"হের গোপাল প্রাতঃকাল মুখ দেখি তোর—
ঘণর ঘণর ঘণ্টা বাজে বাজে ত মধুর॥"

গোপাল উঠিয়াছেন অমনি পদকর্ত্তা বলিতেছেন "মা যশোদা—

অখিলের পতি নাচায় করে দিয়ে ননী
শুনে গোপী ধায় যত—বলে নাচাও গো নাচাও
গো নইলে কোলে দেগো মোদের—"

গোপালের মাখন খাওয়া শেষ হইয়াছে—তারপর স্নেহময়ী জননী বলিতেছেন—

"তেমনি তেমনি করে করে নাচরে চান্দের কোণা,
মুরলী গড়া'য়ে দেবে যত লাগে সোণা—

গোপীগণ সকলে বলিতেছে—

"তেমনি করে বাঁকা হয়ে,
চরণে চরণ দিয়ে,
অধরে মুরলী লয়ে
একবার নাচরে চাঁদের কোণা ॥"

প্রভাতে বলরাম শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম সুবল মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখাল বালকগণ গোপালকে গোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য বেণুরব করিতে করিতে আসিতেছেন, গোপাল গোষ্ঠে প্রত্যহ যান আজিও যাইবেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ, যশোদা অধীরা হইয়াছেন। পদকর্ত্তা বলিতেছেন।—

"রাখালের কলরব আঙ্গিনাতে শুনি ঃ
ভয় পেয়ে নন্দরাণী কহিছে অমনি ॥
নারিব পাঠাতে রাম—আজ না হয় তোরাইযা।
বাপ, আমার দুধের গোপাল রামরে রামরে রামরে
রাখালে রাখালে খেলে ঘর আসতে পথ ভুলে
দুটী হাত মুখে দিয়ে কাঁদে।

বলে আমার নিসে মা নিসে মা নিসে মা বলে কাঁদে—আমি পথ হারা হইয়াছি গো—

তাই নারবো পাঠাইতে রাম, আজ না চয় তোমরাই যাও বাপ।"

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত, যশোমতী নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই, রাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার জন্য গোপালকে ডাকিতে আসিয়া বলিতেছেন (ইহা বোধ হয় বিজয়কৃষ্ণের পদ)

"জাগিতে ঘুমাতে রে হেরিরে তোর কাল বরণ।
আমরা মায়ের কোলে শুয়ে থাকি ; কিজানি তোর
কেমন মায়ারে—কানাই কানাই বলে ডাকি
শুনে মা বলেন—বলেন ঘুমো শ্রীদাম
তোর ভাই কানাই তোকে ডাকে নাইরে
অনেক পুণ্যের ফলে জনমিলাম গোপকুলে
তোর সঙ্গে হয়ে গেল মেলা
চরণে ধরিয়ে কই, দয়া না ছাড়িও ভাই
জনমে জনমে করি যেন খেলা ॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, আপনার লীলায় আপনি বিভোর, রাখালগণের সহিত

খেলায় উন্মত্ত, গাভী বৎসগণ ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ দেখিয়া কোন রাখাল বালক বলিতেছেন

সারং রাগ

"যাবে কেরে প্রতিবার ধেনু ফিরাতে।
যদি বার বার ফিরোবো ধেনু তবে ত তোর নফরহনু
ওরে ও নীল তনু॥"

মায়াময়ের মায়া, লীলাময়ের লীলা, রহস্য ভেদ করে কাহার সাধ্য, যিনি জগতের পালন কর্ত্তা, সেই ভক্তবাঞ্ছাতল্পতরু যশোদার মাতৃত্বের সাধ পূরণ করিবার জন্য বলিতেছেন

"দে দেহি মাখন বড় ক্ষুধা হামারি।
শুন যশোমতী মাই—আমি যে চরণ চালাতে চাই
আমার ক্ষুধায় চরণ চলে না মা
রাণি বলে প্রভাতে মথিলাম দই—
উপরের সর বাই
আপনি সকল খেয়ে মিছে করে বলসিয়ে
হামারি বড় ক্ষুধা"

যশোদার তিরস্কারে গোপাল রাগ করিয়া বলিতেছেন—

"গোপাল বলে শুন যশোমতী মাই
তোম্ হামারে না নবনী দেই
হাম নগরকো যাই॥
এ ব্রজ মাইকো মা বলি হাম তথু উদর পুরাই।"
যদি কিছু ননী খেতে পাই
কত রঙ্গে ভঙ্গে নেচে যাই।"

গোপাল রাগ করিয়াছেন পদকর্ত্তা যশোমতী ভাবে বিভোর; অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; তাই বলিতেছেন—

"দৌড়ে মোরে আওও রে নলিন হামারি
লে দহি মাখন সব দেখি মেরি".

গোষ্ঠে পাঠাইবেন, বেশ বিন্যাশ করিতেছেন কিন্তু দুষ্ট ছেলে গোপাল নানা ভঙ্গি করিতেছেন, মায়ের প্রাণ, বিরক্ত হন নাই বলিতেছেন;

"কত ভঙ্গি জানরে সোনার গোপাল,

নাচিতে নাচিতে অরুণ কিরণ দিছে রাঙ্গা চরণ তুলিতে।
কিবা চিত্র বিচিত্র নাট
চরণে চাঁদের হাট
নাচে যেন খঞ্জনিয়া পাখী
বড় সাধ করি মায় সোণার নূপূর দিচ্চে রাঙ্গাপায়
পা দুখানি নাচিয়ে এস দেখি (আরে গোঁপাল গোপাল রে)
অনেক পুণ্যের ফলে তোমা ধন পাইলাম কোলে,
মনে হয় সদা হারাই হারাই॥"

গোপাল বড় দুষ্ট ছেলে, বাড়ীর বাহির হইলেই কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিয়া আসেন, বিপক্ষবাদিনী গোপীগণের নালিশ শুনিতে শুনিতে যশোমতী উত্যক্ত হইয়া গোপালকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছেন; কিন্তু পোষ মানিবার নন, তিনি কাহারও নিজস্ব নন্। যশোমতী পরাস্ত হইয়া গোপালকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতেছেন

"পরাণ যাদবরে তুইরে আমার পরাণ।
যেন কোথাও যেওনা এসেছে রে ছাওয়াল-ধরা॥
এঘর আঙ্গণে খেলা, ঘরে বসে কর খেলা।
যেন কোথাও যেওনা রে তুই রে আমার পরাণ॥"

গোপাল ত শুন্‌বার ছেলে নয়। যিনি জগৎব্রহ্মাণ্ডকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন তিনি কি যশোদার কথায় ভুলিবেন? তিনি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া যশোদা অন্য রকমে ভুলাইতেছেন, বলিতেছেন—

"কেমন শিখেছ রে মোহন বেণু
একবার মায়েরে শোনাও রে।
গোপাল রে গোপাল রে একবার বেণু বাজা রে॥
আমি শুনেছি শ্রীদাম মুখে
তোর বেণু রবে নাকি ধেনু ঘোরে
যমুনা উজান বহেরে॥

এইরূপ বহু সংখ্যক সুমধুর পদের একত্র সমাবেশে রেণিটীর পদ। ইহার যেমন রচনা, তেমনই ভাব, তেমনি উচ্চশ্রেণীর রাগ রাগিনী ইহাতে আছে। ৺কৃষ্ণধন সিদ্ধান্ত মহাশয়ই শেষ রেণিটীর গায়ক, শুনিয়াছি মনোহর সাই পদের বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়ক কাটোয়ার রসিক দাস ও প্রেমদাস বাবাজীদের

দুই চারিখানি রেণিটীর পদ সংগ্রহ আছে। বিপ্রদাসের গুরু বংশের বংশধর নবগ্রামের শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় এখন একমাত্র রেণিটীর গায়ক বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, আমরাও তাঁহার গান শুনিয়াছি। তিনি অধিকাংশই বিজয়কৃষ্ণের পদ গাহিয়া থাকেন, চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট পদ সংগৃহীত হইলেও হইতে পারে। সন্দেহের কারণ কীর্ত্তনগায়কগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল (Conservative) তাঁহারা পদাদি লিখিয়া দিতে সহজে স্বীকৃত হয়েন না। তবে চেষ্টা করিতে হইবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ", দেবীপুরে পদের সৃষ্টি হইতে অনেক বিখ্যাত গায়কই "রেণিটী গায়ক" উপাধিলাভে সম্মানিত হইয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বপারের ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তস্য পুত্র ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত কবিরাজ মাধবচন্দ্র রায় তস্য পুত্র নবকিশোর রায় সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ঐ মাধব রায় মহাশয়ের বংশেই দেশ বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা মতিলালরায়ের যাত্রা দলের খ্যাতনামা সুকণ্ঠ গায়ক লোকনাথের সাকরেদ রামবাবু (রামগোপাল রায়) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে জানিতেন রামরায় মতিরায় মহাশয়েরই জ্ঞাতি, আত্মীয় বা সহোদর, তাহা নহে। মতিলাল রায় মহাশয় বারেন্দ্র ও রামরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ক্ষেত্রমোহনের মুখে রেণিটী শুনিয়া দিল্লীর বিখ্যাত গায়ক ছোট মিয়া, বড় মিয়া দুই ভ্রাতায় একবাক্যে বলিয়াছিলেম "বাংলা মে এহি একঠো চিজ হ্যায়"। তাঁহারা রেণিটী শিখিয়া তবে স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেব সুকবি ৺দ্বারকানাথ ইংরাজী শিখিয়া তখনকার "ইঙ্গবঙ্গ" সমাজভুক্ত থাকিয়া মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইলেও তখনকার রুচি (Test) অনুসারে বাল্যকাল হইতে তিনি রেণিটীর গানে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার রচিত অনেকগুলি সরস টপ্পা এখনও কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত দেখা যায়। অদ্য বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ন্যায় বিরাট বিদ্বজ্জনসঙ্ঘ সাহিত্যসভায় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের এ অযোগ্য প্রবন্ধ লইয়া উপস্থিত হওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহবা ও করতালি গ্রহণ আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য নহে। আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য অদ্য এখানে বঙ্গ দেশের সকল স্থান হইতে খ্যাতনামা অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যিকগণ শুভাগমন করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষৎ, তাঁহার বহু স্থানের শাখা পরিষৎ এবং অন্যান্য বহু সাহিত্য সভার

প্রতিনিধিবর্গ শুভাগমন করিয়াছেন, যদি এই প্রবন্ধ পাঠের পর কোন সহৃদয় মহাত্মা কর্তৃক রেণিটীর সমগ্র পদ গুলি বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক দুই চারিটী করিয়া ক্রমে পদগুলি সমস্ত সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী অমূল্য রত্নের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠকের যোগ্যতা নাই, সময়েরও অভাব বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেইজন্য বিনীত নিবেদন তাঁহার অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া সুধীবৃন্দ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন এবং পদ গুলির উদ্ধার সাধনে সকলে যথাযোগ্য চেষ্টা করিবেন। ইতি—

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন-কথা।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র ৩৫।৩৬ বয়স্ক সুন্দর গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ, গঠন সুঠাম, নধর, চক্ষু দুইটী তীক্ষ্ণ প্রতিভাব্যঞ্জক। কটকের কাঁটগড়া সাহিয়ে ইঁহাদের বাড়ি, ইঁহারা কটকের বেশ প্রতিষ্ঠাবান লোক। জাতি কায়স্থ—বনিয়াদি ঘর। আনন্দচন্দ্র বি, এল পাশ করিয়া কটকের জজ আদালতে ওকালতি করেন। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যে ওকালতিতে বেশ পসার করিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ইংরাজীনবিশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল গুণের প্রকাশ দেখা যায় তাহার প্রায় সমস্তই আনন্দচন্দ্রে অভিব্যক্ত। আনন্দচন্দ্র নামে হিন্দু, কিন্তু ধর্ম্ম বা পরমার্থ সম্বন্ধে কোনই মতামত রাখেন না।

আহার সম্বন্ধে চরমপন্থি, কিছুতেই বিমুখ নন। জাতিভেদটা কুসংস্কার—প্রতিমা-পূজা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—সনাতন আর্য্যধর্ম্মে কোন সারবস্তু আছে কিনা তাহার বড় খোঁজখবর রাখেন না। মিল, স্পেনসার, কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অজ্ঞেয়তাবাদের কষায়ে কষায়িত হৃদয়। তবে আনন্দচন্দ্রের হৃদয়ে স্বাভাবিক একটা কোমলতা আছে, পরের দুঃখ দেখিলে অনেক সময় আনন্দচন্দ্র কাতর হইয়া পড়েন; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার সুসভ্যতার প্রকোপে, আর ব্যবহারজীবির ব্যবসায়ের মর্ম্মহীনতার প্রভাবে আনন্দচন্দ্রকে অনেক সময়ে তাহার হৃদয়ের সেই কমনীয় ভাবগুলিকে শুষ্ক ও কঠোর তর্ক-যুক্তির তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা মনের দুর্ব্বলতা বলিয়া ছেদন করিতে শিক্ষা

দিয়াছে। আনন্দচন্দ্র খুব বাবু, নিজের সুখ-সচ্ছন্দতা আহার-বিহার ও নিজের স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তিসাধনই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সন ইংরাজী ১৮৯৭ সালে একদিন বেলা প্রায় দশটা, আনন্দচন্দ্র কাছারী যাইবেন, কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময় একটী কৃষ্ণ-কায় আলু থালু মলিন বেশ, সহাস্য বদন, বিভোর নয়ন, পাগল পারা এক-জন করতাল বাজাইয়া "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম গাহিতে গাহিতে আনন্দচন্দ্রের বাড়িতে প্রবেশ করিল। আনন্দচন্দ্রের ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি আসিয়া ভিক্ষুককে তাহাদের প্রভুর ওরূপ রুচি-বিগ-হি'ত কার্য্য করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে পাগলের সে কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনেই সানন্দচিত্তে গান গাহিতে লাগিল। আনন্দচন্দ্র বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে বলিলেন "এখানে কি চাস্?" সে পাগলের ভ্রূক্ষেপ নাই, আপন ভাবেই বিভোর হইয়া গাহিতেছে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম" আনন্দচন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া উচ্চ-কণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিলেন "এই—কথা শুনচিস্ না, এখানে কি চাস্?" গায়ক কথা শুনিলেন একটু মধুর হাসিয়া বলিলেন "কিছুই না।" আনন্দ-চন্দ্র বলিলেন "তবে কি করিতে আসিয়াছিস্?" পাগল বলিল "জানি না!"

একজন ভৃত্যকে আনন্দচন্দ্র চারিটী পয়সা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়া দিতে বলিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য চারিটী পয়সা ভিক্ষুককে দিতে গেলে সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার গান ধরিল "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম"। আনন্দচন্দ্র বৈঠকখানা হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আরে, উহাকে পয়সা দিয়া বিদায় করনা" আনন্দচন্দ্রের ভৃত্য ত্রস্তে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল "বাবু ও পয়সা নেয় না, আর যেতেও চায় না।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "বেটা বদ-মায়েস, আমি যাচ্চি. দাঁড়া"। ভৃত্য আসিয়া ভিক্ষুককে বলিল "আরে বাবু আসছে পালা, না হলে মার খাবি।" ভিক্ষুক তাঁহার কথায় একটু হাসিল মাত্র। এমন সময় আনন্দচন্দ্র কাছারী যাইবার বেশে আসিয়া বলিলেন "এই, তুই কি চাস্?" পাগল আনন্দচন্দ্রের দিকে মাধুর্য্য-প্রেমময় দৃষ্টিতে কেবল দেখিতে লাগিল, কোন কথা কয় না। আনন্দচন্দ্র বলিলেন "পয়সা নে, যা" পাগলের কোন কথা নাই কেবল সে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর মধুর হাস্য"। আনন্দচন্দ্র ক্রমে রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "বেটা বদমায়েস্

এখানে বদমায়েসী জুড়েছ, তোমার বদমায়েসী ভাঙ্গছি। এই চাবুক লে-আও ?" পাগল সে কথায় একটুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত না হইয়া যেন আরো আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। বদনমণ্ডল যেন মধুর পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; ওষ্ঠাধর প্রীতিপূর্ণ হাস্যে নৃত্য করিতে লাগিল। আনন্দচন্দ্রকে তাঁহার ভৃত্যেরা জানে, হুকুম তামিল না হইলেই সর্ব্বনাশ।" "চাবুক লে-আও" বলিবামাত্র একজন দৌড়াইয়া বাটীর সম্মুখে কাছারী যাইবার জন্য আনন্দচন্দ্রের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, কোচম্যানের নিকট হইতে ঘোড়ার চাবুক চাহিয়া আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু আনন্দচন্দ্র এই ভিক্ষুকের ভাবে বড় গোলে পড়িলেন। আনন্দচন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাকে একটা "Street begger" নিকৃষ্ট ভিক্ষুক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ক্রমে যেন আনন্দচন্দ্রের বিচারবুদ্ধি, বিবেক, তাহাকে তাহা বলিতে চায় না। তাহার নিঃসঙ্কোচভাব, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, আনন্দময় হাস্য আনন্দচন্দ্রকে গোলে ফেলিয়া দিল। আনন্দচন্দ্র নম্রস্বরে একটু কোমলভাবে বলিলেন "তুই কি চাস্ ?" পাগল ভিক্ষুক এবার হাসিতে হাসিতে বলিল "আমায় কিছু খেতে দাও, আমি খাব।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "কি খাবি ?" পাগল বলিল "মুড়ি খাব" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "এই পয়সা নে-যাও খাওগে।" পাগল বলিল "পয়সা নিয়ে কি করব, পয়সা কি খাওয়া যায় ? আনন্দচন্দ্রের সংশয় আরো বৃদ্ধি হইল, আনন্দচন্দ্র একটা সিকি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নাও মুড়ি কিনে খাওগে।"

পাগল সে রজতখণ্ড মৃত্তিকা খণ্ডের ন্যায় দূরে সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আনন্দচন্দ্র কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া কাছারী যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী কাছারী অভিমুখে চলিল। এই সময়টুকু সেই পাগলের মূর্ত্তি, হাবভাব, কথা, আনন্দচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে খেলিতে লাগিল, তারপর কার্য্যের ব্যস্ততার জন্য তাহা বিলীন হইয়া গেল। এই ঘটনার দুইদিন পরে বেলা আটটার সময় সেই পাগল করতাল বাজাইয়া—"নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম" গাহিতে গাহিতে আবার আনন্দচন্দ্রের বাটী উপস্থিত। আনন্দচন্দ্র আপিস ঘরে বসিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছেন; পাগলের নাম গান তাঁহাকে আকর্ষণ করিল।

তিনি গান ও স্বর শুনিয়াই বুঝিলেন যে সেই দিনের সেই পাগলা। একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "উহাকে এইখানে ডাকিয়া আন।" চাকর, বাবুর কথামত পাগল ভিক্ষুককে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিল।

আজ পাগলের বেশের একটু পরিবর্ত্তন। আজ নাসিকা ও ললাটে এক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গোপীচন্দনের তিলক; চাদরখানা প্রথম দিবস জড়সড় করা বগলে ছিল, আজ সেখানি একটু সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে। আনন্দচন্দ্র পাগলকে দেখিয়া বলিলেন "কি, আজ আবার কি মনে করে?" পাগল কোন কথা বলিল না কেবল সেই সারল্যপুর্ণ মৃদু মৃদু হাস্য। আনন্দ-চন্দ্র আবার বলিলেন "আজ যে আবার তিলক দেখ্‌চি, এই দিকে এস, তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি?" পাগল ভিক্ষুক আনন্দচন্দ্রের টেবিলের নিকট হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দচন্দ্র বলিলেন "বোস ঐ চৌকিতে বোস।" পাগল বসিল। আনন্দচন্দ্র বলিলেন "গলায় মালা নাকে তিলক দেখে ত বোধ হয় বৈষ্ণব, তা এখানে কি মনে করে এসেছ বল দেখি বাবাজী।"

পাগলের কোন উত্তর নাই কেবল মৃদু মধুর হাস্য, আর সরল প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে। আবার আনন্দচন্দ্র বলি-লেন "কি বাবা কি মনে করে এসেছ বলনা।" আমায় কিছু খেতে দাও, আমি খাব। আনন্দচন্দ্র বলিলেন "কি খাবে?" পাগল বলিল "মুড়ি খাব।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা তা হচ্ছে, তুমি এখানে কোথায় থাক?" পাগল বলিল "আমি কাঙ্গাল আমার থাকার কি কোন ঠিক আছে? যে দিন যেখানে আশ্রয় পাই সেইখানেই থাকি।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "খাও দাও কোথায়?" পাগল বলিল "যে দিন যেখানে জোটে।" আনন্দচন্দ্র বলি-লেন "তোমার নাম কি?" পাগল বলিল "অনেকে নবদ্বীপদাস বলে ডাকে।" আনন্দচন্দ্র একটী টাকা লইয়া নবদ্বীপদাসের নিকট দিয়া বলি লেন "এই নাও, মুড়ি খেতে চাচ্ছিলে খাও-গে।" পাগল—"তা-ত খাব, তুমি ত দিতে পাল্লে না; আমি চাচ্ছি মুড়ি খেতে তুমি দিচ্ছ টাকা," বলিয়া নবদ্বীপদাস একটু উচ্চহাস্য করিয়া "হা, হা, হা, সংসারটা এমনিই বটে, এক চাই আর পাই" বলিয়াই চৌকি হইতে উঠিয়া আপন করতাল ঝঙ্কার দিয়া "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম" নাম ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। আনন্দচন্দ্র একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "আরে

শোন শোন আমি মুড়ি আনিয়ে দিচ্ছি বসো।" নবদ্বীপদা'স—"আচ্ছা আর একদিন হবে, আজ না" বলিয়া ত্রস্তপদে আপন মনে গাহিতে গাহিতে আনন্দচন্দ্রের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল! আনন্দচন্দ্রের প্রদত্ত টাকাটী যেখানের সেই খানেই পড়িয়া রহিল।

নবদ্বীপদাস চলিয়া গেলে আনন্দচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন "এ-লোকটা কিরূপ, অবস্থা ভিক্ষুকের, কিন্তু টাকা পয়সা নেয় না ;—প্রথম ভেবেছিলাম পাগল, কথায় বার্ত্তায়, মস্তিষ্কের কোন বিকার দেখা যায় না। বেশ বৈষ্ণবের ; বৈষ্ণবগুলা প্রথমেই অশিক্ষিত গণ্ডমুর্খ হয়, কিন্তু ইহার হাবভাব কথা বার্ত্তায় যেন তাহা বোধ হয় না। আমার কাছে আসে কেন? আমি ত ধর্ম্মের কোন ধার ধারিনা। আমার কাছে কি-প্রত্যাশায় আসে? জিজ্ঞাসা করিলে কেবল বলে কিছু খেতে দাও, তাও মুড়ি ভিন্ন আর কিছু খেতে চায় না, আজ দুদিন খেলে না, আমিও দিলাম না। এইরূপ অনেক কথা আনন্দ চন্দ্র আপন মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় টং টং করিয়া ঘড়ি আনন্দকে সেই চিন্তা ঘোর হইতে জাগ্রত করিয়া দিল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া স্নান আহার করিয়া কাছারী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

এই ঘটনার পাঁচ দিবস পরে বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা; আনন্দচন্দ্র কছারী হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাড়ির উঠানে একখানি চৌকিতে বসিয়া সট্‌কায় তামাক খাইতেছেন। একটী অল্প বয়স্ক শিশু সন্তান ও একটী অল্পবয়স্ক বালিকা নিকটে খেলা করিতেছে, এমন সময় নবদ্বীপদাস করতাল বাজাইয়া "নিতাই গৌর রাধাশ্যাম হরে-কৃষ্ণ হরেরাম" নাম করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। আনন্দচন্দ্র আজ নবদ্বীপদাসকে দেখিয়াই যেমন কেহ কোন বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহা হঠাৎ পাইলে অপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার সহিত, প্রাণের ব্যগ্রতার সহিত প্রাপ্তির হর্ষ-বিমিশ্রিত হইয়া একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠে—আনন্দ-চন্দ্রও সেই ভাবে "এই যে এস এস" বলিয়া নবদ্বীপদাসকে প্রথম অভ্য-র্থনা করিলেন। "আর একখানা চৌকি নিয়ে আয়" বলিতেই একজন ভৃত্য একখানি চৌকী আনিয়া দিল। আনন্দচন্দ্র নবদ্বীপদাসকে তাহাতে বসিতে বলিলেন। নবদ্বীপদাস বসিলে আনন্দচন্দ্র বলিলেন "তবে ঠাকুর আজ কি মনে করে বল" নবদ্বীপদাস আজ একেবারেই বলিলেন "সে দিন বুলে

গিয়েছিলাম, আজ মুড়ি খেতে এসেছি।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "মুড়ি কেন অন্য কিছু খাবার খাও আনাই।"।

নবদ্বীপদাস বলিলেন "না মুড়ি খাব, দিতে পার ত বল, নইলে যাই।" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা তাই আনাচ্ছি বোস" বলিয়া একজন ভৃত্যকে মুড়ি আনিতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে আনন্দচন্দ্র নবদ্বীপদাসকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আমার কাছে রোজ রোজ আস কেন?" নবদ্বীপ বলিলেন, "তুমি বল্‌তে পার রোজ রোজ কাছারী যাও কেন?" নবদ্বীপদাসের এই কথায় আনন্দচন্দ্র একটু স্তম্ভিত, একটু আশ্চর্য্যান্বিত এবং ঈষৎ বিরক্তও হইলেন। স্তম্ভিত হইবার কারণ নবদ্বীপের নির্ভীক সরল বীর্য্যবন্তভাব, একটা সামান্য পথের কাঙ্গাল তাঁহার মত একজন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ধনীকে যে ভাবে প্রশ্ন করিল তাহাই আশ্চর্য্য হইবার কারণ। আনন্দচন্দ্রের ধারণা তিনি একজন বক্তা, সুমীমাংসক ও সুশিক্ষিত, আজ পর্য্যন্ত সংসারে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার এই ধারণাকে পুষ্ট করিয়াছে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন যে কেহ তাঁহার সহিত কোন বিষয় বিচার করিতে আসে সকলেই আনন্দচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট প্রায়ই পরাভূত হন। ওকালতিতে অল্পবয়সে তিনি অনেক প্রবীণ পক্ককেশ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবিকে নাস্তানাবুদ করিয়া আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। অনেক চতুরাগ্রগণ্য মক্কেল তাঁহার তীক্ষ্ণ চাতুর্য্যের সহায়তার জন্য অর্থ ও তোষামোদে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। আজ সেই তিনি একটা ভিক্ষুকের প্রশ্নের উত্তর দিতে থতমত খাইলেন। আর বিরক্তির কারণ নিজের অহঙ্কারে আঘাত; আনন্দচন্দ্র নবদ্বীপদাসের কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি কাছারিতে যে জন্য যাই তুমিও কি আমার নিকট সেই জন্য আস।" নবদ্বীপদাস বলিলেন "আমি মূর্খ, তুমি লেখাপড়া জান, আমি শুনেছি তোমাদের বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে সকলি এক নিয়মের অধীন, তা, সেটা যদি সত্য হয় ত এটা না হবে কেন?" আনন্দচন্দ্র বলিলেন "তুমি কি বল্‌ছ আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" নবদ্বীদাস বলিলেন "তোমারা হয়ত ঈশ্বর মাননা, কিন্তু নিয়ম মান, বিজ্ঞান মান; তোমাদের বিজ্ঞান না বলে যে, যে নিয়মে এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আপনাপন স্থানে ঘুরচে সেই নিয়মেই একটা গাছের পাতা মাটিতে খসে' পড়ে?

আনন্দচন্দ্র বলিলেন "হাঁ তা'ত সত্যই, যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।"

নবদ্বীপদাস বলিলেন "তা যাই বলুক তা আমি জানিনে, কিন্তু ওকথাটা যদি সত্য হয় তবে তুমি মনে কর যে তুমি, একটা চন্দ্র, সূর্য্য বা পৃথিবী কেন না তোমার অনেক ঐশ্বর্য্য আছে। তুমি নিজে উকিল, তোমার এই এত বড় বাড়ী, এত চাকর গাড়ী ঘোড়া, তুমি কত টাকা রোজগার কর, ধর তুমি একটা এই রকম কিছু মস্ত বড়, আর আমি অতি সামান্য ভিক্ষুক; আমার কিছুই নেই, পেটের দায়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই, আমি একটা ছোট গাছের পাতা, কিন্তু আমরা যে দুজনেই এই সংসারে ঘুরচি তার কারণ কি এক নয়? আনন্দচন্দ্রের চক্ষু যেন একটু বিস্তারিত, মুখমণ্ডল একটু আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিছুক্ষণ নবদ্বীপদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "আমি ত কাছারীতে যাই টাকা রোজগার কর্ত্তে, তুমিও কি আমার কাছে সেইজন্য আস?"

নবদ্বীপ। হয় তুমি আমাকে ঠকাবার তরে একথাটা বলছ—না হয় তুমি তোমার নিজের মনের ভাব সত্য করে বুঝে দেখনি।

আনন্দ। কেন?

নবদ্বীপ। তুমি কাছারীতে সত্যই টাকার জন্য যাও? তা যদি যেতে তা হলে টাকা পেয়েই সেই টাকা নিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে,—তা কি থাক?

আনন্দ। টাকা রোজগার করি আমার অভাব পূরণের জন্য।

নবদ্বীপ। তা হলেই দেখ টাকার জন্য কাছারীতে যাও না, অভাব পূরণের জন্য যাও।

আনন্দ। বেশ তাই হ'ল।

নবদ্বীপ। এই অভাবটা কি?

আনন্দ। খাওয়া পরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ!

নবদ্বীপ। আচ্ছা বেশ, খাওয়া পরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ—এখন বল দেখি এই নিজে খেয়ে প'রে আর স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে খাইয়েই কি আমরা পরিতৃপ্ত, আর এই খাওয়া পরা খাওয়ান পরানই কি শেষ, না আর কিছু আছে?

আনন্দ। আর কি থাক্‌বে?

নবদ্বীপ। বেশ করে ভেবে দেখ, আমরা খাই পরি আর খাওয়াই পরাই কেন?

আনন্দ। তাতে আমার সুখ হবে, আমি সুখ পাব এইমাত্র, আর কি?

নবদ্বীপ। তা হলে ভাই এখন বল দেখি তুমি টাকার জন্য না সুখের জন্য ?

আনন্দ। সুখের জন্যই বটে।

নবদ্বীপ। আমিও আমার সুখের জন্য তোমার কাছে আসি। তোমার নাম আনন্দচন্দ্র, শুনে একটু আনন্দের কিরণ পাবার জন্য আসি। এমন সময় ভৃত্য মুড়ি লইয়া আসিল। আনন্দচন্দ্র বলিলেন "এই তোমার মুড়ি এসেছে।" নবদ্বীপ আনন্দোৎফুল্লভাবে ব্যগ্রতার সহিত ভৃত্যের হাত হইতে মুড়ির পাত্রটী লইয়া বলিল "বা, বেশ হয়েছে, দেখ আমার একটা গোঁড়ামি আছে, এগুলো তোমাদের ভাল লাগ্‌বে না, কিন্তু কি করব ? সংস্কার বা স্বভাব ছাড়া বড় মুস্কিল, একটা তুলসিপাতা চাই, এ মুড়িগুলো ভোগ দিতে হবে, তাও না হলে সংস্কার দোষে এ খেয়ে আমার সুখ হবে না, তা এখানে পাওয়া যাবে না।"

আনন্দ। তা' যাবে না কেন ? আরে যা তুলসীপাতা নিয়ে আয়"।

ভৃত্য তুলসীপাতা আনিতে গেল।

বাবাজী বলিলেন, "আনন্দচন্দ্র তুমি কি ভাবছ ? আমাদের এই ভগবানকে নিবেদন একটা কুসংস্কার মাত্র না ?"

আনন্দ। ঠিক ঐ কথাটা নয়, তবে অনেকটা এই রকম বটে, আমি ভাবছি "যার অস্তিত্ব আমরা স্থির করতে পারি না, যার তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাকে আবার আবেদন, নিবেদন করা কেন ?

নবদ্বীপ! অতি সত্য কথা, প্রকৃতই আমরা তাঁর অস্তিত্ব স্থির করিতে পারি না।

আনন্দ। তাই যদি হয় তবে নিবেদন তাঁকে করা কেন ?

নবদ্বীপ। আচ্ছা ভাই তোমার পিতা কি বর্ত্তমান ?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। তাঁকে তোমার বেশ মনে আছে ?

আনন্দ। তা, আছে বৈ-কি।

নবদ্বীপ। তোমার পিতামহকে তুমি দেখেছ ?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। প্রপিতামহকে বোধহয় দেখনি ?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। এঁদের বিষয় বিশ্বাস কর ?

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাস।

নবদ্বীপ। এই এঁরা এক সময় জীবিত ছিলেন ও এক সময়ে তোমার মত সংসার করতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমার পিতামহ, পিতামহের পুত্র তোমার পিতা, পিতার পুত্র তুমি।

আনন্দ। হাঁ তা করি বই কি !

নবদ্বীপ। কেন ? কেন যুক্তি বা প্রমাণে তুমি তোমার পিতামহ বা প্রপিতামহের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর ?

আনন্দ। (একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন) আমি নিজেও আমার এই চার দিকের এই প্রত্যক্ষ মানবসমাজ তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার যুক্তি ও প্রমাণ।

নবদ্বীপ। তা হলে কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয় অন্য প্রত্যক্ষ বিষয় দেখে বিশ্বাস করা যায় এটা স্বীকার বা বিশ্বাস কর ?

আনন্দ। হাঁ—তা করি বৈকি।

নবদ্বীপ। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল ঐটে কর না, বা ঐ না করাটা আজকালের শিক্ষার অভিমান, তাই কর না ?

আনন্দ। কেন, কিসে ?

নবদ্বীপ। নয়ত কি ? তোমার নিজের অপ্রত্যক্ষ প্রপিতামহ ও পিতামহের বিষয়, তোমার আর পরের প্রত্যক্ষ মানবসমাজকে দেখে, আর নিজেকে দেখে বিশ্বাস কর, আর তোমার চারধারে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঊর্দ্ধ ও অধঃ যে দিকে দেখ্‌বে সেই দিকে প্রত্যক্ষ, সচ্চিদানন্দময়ের আনন্দময় প্রকাশ দেখে তাঁকে বিশ্বাস করনা ? প্রত্যক্ষবাদই যদি যথার্থ স্বীকার কর, তবে এক বিষয়ে কর আর এক বিষয়ে করতে পারনা কেন ? সংসারে কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হয় না ; স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি নাই, এত প্রত্যক্ষ, তবে এই জগৎসৃষ্টি, এই স্থাবর জঙ্গম নদ নদী, গিরি, মরু, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তরু, লতা, ফল পুষ্প, পশু, পক্ষী, পরিবেষ্টিত এই অপূর্ব্ব মহিমান্বিত আনন্দময় সৃষ্টির স্রষ্টাকে বিশ্বাস কর না কেন ভাই ?

ক্রমশঃ

নিত্যানন্দ দাস।

খেয়ার মাঝি।

জগাই পাট্‌নি তাহার ক্ষুদ্র চালাঘরের ভিতর বসিয়া "তামাকু' খাইতে খাইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল "বাপরে আজ কি দুয্যুগ, পানি হবি হ এত ঝড় আবার কেন ?" হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে ত' ঘাটে তাহার নৌকা খানা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া আসে নাই। ভাবিল এ রকম ঝড়ে যদি কোন রকমে একবার বাঁধন খুলিয়া যায় তাহা হইলে নৌকার কোন সন্ধানই আর পাওয়া যাইবে না। অগত্যা জগাই উঠিয়া একটী ছোট কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়া লণ্ঠনের ভিতর রাখিল, লণ্ঠনটির একদিকের কাচের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেস্থানটুকুতে জগাই কাগজ দিয়া লইয়া কাজ চালাইতেছে। ছাতা ও আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া দুয়ারে শিকল তুলিয়া দিতে দিতেই আলো নিভিয়া গেল। ঝড়ের সহিত একটা বিশিষ্ট অত্মীয়তাসূচক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে দুয়ার খুলিয়া লণ্ঠন রাখিয়া দিল ও পুনরায় দুয়ার বন্ধ করিয়া, অন্ধকারেই বাহির হইল।"

জগাইয়ের কুটীর হইতে ইচ্ছামতী নদী এক রশি মাত্র দূর। নৌকায় উঠিয়া সে খেয়া ঘাটের খোঁটার সহিত নৌকাখানি খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতেছিল, এমন সময় বাতাসে তাহার ছাতি উড়িয়া গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষীণ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"মাঝি—ওগো-মাঝি।" সে তাড়াতাড়ি ছাতিটী কুড়াইয়া আনিয়া বন্ধ করিল ও উৎকর্ণ হইয়া বসিল। আবার ওপার হইতে শব্দ আসিল "ওগো পার করে দাও না গা"। দ্বিতীয়স্বর বালিকার, জগাই বুঝিতে পারিল। সে স্থির করিল নিশ্চয়ই ওপারে কেহ অনেকক্ষণ হইতে ডাকিতেছে ও অপেক্ষা করিতেছে। জগাই চীৎকার করিয়া "ভয় নেই — এই ছাড়্‌লাম নৌকা।" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে নৌকা খুলিয়া দাঁড় ঠিক করিল। উদ্দাম বাতাস ও তুফান মিলিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীবক্ষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল জগাই অভ্যাস মত এবং বিদ্যুতের আলোকে পরপারের উদ্দেশে বাহিয়া চলিল।

পরপারে নৌকা লাগাইতেই জগাই তাড়িতালোকে দেখিতে পাইল দুটী সিক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি তীরে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি তাহারা নৌকায় উঠিয়া বসিলে জগাই নৌকা ছাড়িয়া দিল। বার-কয়েক পর পর বিদ্যুতের আলোকে সে দেখিল পথিকদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও একটী বার তে'র বৎসরের

বালিকা। পারঘাটে নৌকা বাঁধিয়া জগাই বলিল "নাব গো এবার। তা' তোমরা এ-দুর্য্যুগ কোথায় যাবে এ রাতে ?" বৃদ্ধ "বলিল আমাদের বাড়ী রতনখালি এখান হতে চার ক্রোশ। রাতে আর কেমন করে যাব। এখানে কি বাবা, কোন বাড়ীতে রাতটার জন্য মাথা রাখবার ঠাই পাব না ?" "এত রাতে আর কেথায় যাবে ? তা চল আমার ঘরেই চল যাই।" বলিয়া জগাই দুই অতিথিকে পদ দেখাইয়া আপনার কুটীরে আনিল।

জগাইয়ের একটী মাত্র ঘর। তাহারই কিয়দংশ সে রন্ধনের জন্য ঘিরিয়া লইয়াছে। ঘরে একটী চৌকী তাহাতে জগাইয়ের যৎসামান্য শয্যা সর্ব্বদাই বিছান থাকিত। একটা মাদুর ঘরের এক কোণে থাকিত; সেখানি অভ্যাগত বা বন্ধুবান্ধবদের বসিতে দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

জগাই ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল ও দুইখানি বস্ত্র দুই জনকে দিল। তার পর তামাক সাজিয়া দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বৃদ্ধকে লইয়া সেখানে বসিল। বালিকাটী ঘরের ভিতর জগায়ের শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

জগাই জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা আপনারা ?"

বৃদ্ধ বলিল আমরা "পাটনী"।

জগাই—তাহলে আর ভাবনা কি ? তোমাদের ত এবেলা থাওয়া হয়নি আমি চট্ করে চারটা ভাত চড়িয়ে দিই, দিয়ে গল্প সল্প করি।

কথামত জগাই ভাত চড়াইয়া কলিকাটী পালটাইয়া লইল। হুঁকাটা বৃদ্ধের হাতে দিয়া জগাই জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কেথায় গিয়েছিলে ? এত রাতে আসছিলে কেন ?" বৃদ্ধ বলিল "সে অনেক কথা বাপু; স্থির হয়ে তোমায় সব বলছি। তুমি বড্ড উপকার করেছ কিন্তু; এসময়ে নদীর ধারে তুমি যদি না যেতে তাহলে কি দশাটাই হ'ত আমাদের।"

জগাই—পরমেশ্বর তোমাদের বাঁচায়েছেন তাঁ না হলে এমন দুর্য্যোগে কি আমি গাঙের ধারে যাই। ভাগ্যে আমি নৌকার বাঁধনটা খুলে এসেছিলাম। আচ্ছা তোমরা রতনখালি যাবে তা এ খেয়া পার হতে এলে কেন ? নবীননগরের ঘাটে গেলেই ত' সুবিধা হত।

বৃদ্ধ—তা হ'ত কিন্তু সে জো' যে নেই। তবে বলি শোন। গাঁয়ের লোকেরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হয় তাই আমি এগাঁ ছেড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হোল না। হয়েছে কি জান ? আমার মেয়েটী আজও বিয়ে

দিতে পারিনি। সবাই যদি মিনি দোষে গরীবের উপরে আড়ে হাতে লাগে তাহলে আমি কেমন করে পারব। গেল বছরের আগের বছর একটা পাত্তর ঠিক করলাম। ছেলেটা খাটীয়ে, বেশ কাজের লোক, শিষ্ট শান্ত, ধানের জমিও কিছু ছিল। কিন্তু আমার এমনি বরাত যে বিয়ের আগের দিন রাতে ছেলেটা সাপের কামড়ে ম'ল। তারপর দিনকতক আর পাত্তর পাইনে। একদিন আমাদের গাঁয়ের মহিন্দর, তার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, সে কিনা এসে বলে পাটনীর পো আমার সঙ্গে তোমার লক্ষ্মীমণির বিয়ে দাও। এখন ওকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হবেনা। দেখদেখি আমার একটী মাত্র সন্তান, আমার মাওড়া মেয়ে তাকে কি আমি একটা বুড়োকে ধরে দিতে পারি। আমি স্বীকার হলাম না। এই হল তার রাগ, বলে গেল "দেখি আমি থাকতে কে তোমার এই ধেড়ে মেয়েকে বিয়ে করে। তার পর বিদেশ থেকে কত পাত্তর আনলাম সবাইকে সে ভাংচি দিয়ে খেদিয়ে দিলে। শেষ গাঁ ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী গেলাম, ভাবলাম সেখানে কেউ জানবেনা, একটী পাত্র সন্ধান করে লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে আসবো, এক জায়গায় সব স্থির করেছিলাম, সেটা ঐ দুষমন্ কি করে জানতে পেরে আবার ভেঙে দিল। তারপর সেখানে টেকা ভার হ'ল। তাই চলে আসছি। নবীনগরের ঘাটে গেলে মেয়ের সামনে সবাই নানা কথা বলবে তাই এখান দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছিলাম।

ক্রমে বৃদ্ধের মনের বাঁধ খুলিয়া গেল। নির্ব্বিচারে সে জগাইকে তাহার সমস্ত কথা বলিয়া গেল। তাহার কথার অধিকাংশই মেয়ে লক্ষ্মীমণির সম্বন্ধে। বৃদ্ধ বলিল "দেখ জগাই, আমার লক্ষ্মী ছেলেবেলা থেকে বড় শান্ত। মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ। আমারই স্তিরিও বড় ভাল ছিল। তার নবদ্বীপের কাছে বাপের বাড়া কিনা খুব লেখাপড়া শিখেছিল। আমায় কত রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত। আমি ত অবাক্ হ'য়ে যেতাম। সেই ইস্তিরি যখন আমার মরে গেল লক্ষ্মীর বয়স তখন সবে সাত বছর। আমায় কাঁদিতে দেখে আমার চোখ মুছিয়ে বল্লে— বাবা তুমি কেঁদনা আমি তোমায় মার মত করে রেঁধে দেব, তোমায় কখনো বকব না। সেই ইস্তক আমি আর ওর সুমুখে চোখের জল ফেলিনি। কিন্তু এমনি আমার বরাত বাবা যে সেই মেয়ে আমার পনেরো বছরে পড়ল, আজও তার বর জোটাতে পারিলাম না। মেয়ে আমার মনমরা হয়েছে, মনের ঘেন্নায় আর আমার পানে তেমন ভালোকরে চায় না।"

কথায় বার্ত্তায় রাত বেশী হইয়াছে দেখিয়া জগাই সবাইকে খাইতে দিল। অতিথি দুইজনকে ভিতরে স্থান দিয়া আপনি দাওয়ায় শয্যা গ্রহণ করিল।

(২)

পরদিন প্রভাতে জগাই যখন তাহার অতিথি দুটীকে রতনপুরের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া গৃহে ফিরিল তখন তাহার চিত্তে সে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতে লাগিল। সেই একরাত্রির অতিথিকে আর একটী-বার ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীমণির দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সে লক্ষ্মীমণির চক্ষে যে অশ্রুরেখার কল্পনা করিয়াছিল তাহাতে তাহার চক্ষে সেই প্রিয় অতিথিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিল। তিনবারমাত্র সে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। প্রথমবার সেই নদীতীরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে যখন সে দুটী ভীত কম্পমান অতিথিকে নৌকা হইতে নামাইবার জন্য বাহু অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সেই তড়িতালোকে তাহার প্রথম দেখা। তারপর যখন সকলকে আহার করাইয়া তাহাদের জন্য শয্যা পাতিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিতেছিল তখন লক্ষ্মীমণি তাহার দিকে চাহিয়াছিল। সেই একটীমাত্র প্রশংসমান দৃষ্টি তাহার সমস্ত পরিশ্রমকে প্রাপ্য হইতেও অধিক পুরস্কৃত করিয়াছিল। কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি তাহার মর্ম্মস্থান আলোড়িত করিয়াছিল।

শেষ বারে যখন সে তাহাদের বিদায় দিয়া পথের ধারে ম্লান-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময়ে আর একটীবার লক্ষ্মীমণি তাহার পানে চাহিয়াছিল। সে চাহনি তাহার সমস্ত শরীরে পুলক সঞ্চার করিয়া চক্ষে অশ্রু আনিয়াছিল।

জগাইয়ের আটবৎসর বয়সের সময় মা মারা যান, তারপর চৌদ্দবৎসর বয়সে সে বাপকে হারায়। তাহার পর হইতে সে কাহারও ভালবাসা পায় নাই কাহাকেও ভালবাসে নাই। কোন গতিকে এর ওর দ্বারে খাটিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহাকে সকলে আধপাগ্‌লা বলিত। ইদানীং তাহার কোন পাগলামি দেখা যাইত না কিন্তু ছেলেবেলা হইতে তাহার হাতে পাগ্‌লাকালীর লোহার বালা ছিল। বিশেষ কোন উত্তেজনার কারণ ঘটিলে তাহার সে উন্মত্ততা দেখা দিত, আবার দুইএক মাস পরে সারিয়া যাইত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর এ রোগ প্রথম দেখা দেয়। পিতৃ-

বিয়োগের পর দ্বিতীয় বার হয়, তারপর উন্মত্ততা আবার আসে যখন তাহার এক মনিব একবৎসরের বাকী বেতন না দিয়া—তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিল। যে কোন কারণে অতিরিক্ত ভাবিলেই তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিত, সে বুঝিতে পারিত আবার শীঘ্রই জ্ঞান হারাইবে।

লক্ষীমণি ও তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের পর দুই তিন দিন সে কেমন এক রকম উদাস হইয়া রহিল। দুইদিন তাহারমুখে অন্ন রুচিল না, তাহার ভয় হইল হয়ত সে আবার পাগল হইয়া যাইবে।

কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল—আচ্ছা লক্ষীমণি যদি আমার বউ হইত। সারাদিন খাটীয়া গিয়া যদি দেখিতাম সে কুঁড়েখানি আলো করিয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার হাতের দাড় হাতে রহিত। একখানি হাসিভরা ভালবাসাভরা মধুর মুখ তাঁহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়া তাহার দুটীচক্ষু সজল করিয়া তুলিত। শেষে আরোহীরা যখন বলিত কিরে জগা দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছিস্ নাকি ? তখন তাহার চমক ভাঙ্গিত, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে সে পথিকদের পার করিয়া দিত।

একদিন সকালে উঠিয়া জগাই ভাবিল আমি কেন একবার চেষ্ট করিয়া দেখিনা লক্ষীমণির সহিত আমার বিবাহ হয় কি না। তার বাপ যদি মত দেয়। জগাইয়ের একটী ছোট বাক্সো ছিল, সেটী খুলিয়া গণিয়া দেখিল তাহার ৩৮ু টাকা আছে। জগাই টাকা কটী চাদরের খুটে বাঁধিল। ভাবিল একটী বিবাহের পণস্বরূপ দিবে, তবু কি লক্ষীমণির বাপ রাজী হইবে না ? সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া রতনখালি অভিমুখে রওনা হইল।

লক্ষীমণির বাপ বনমালীর নিকট আসিয়া জগাই সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ভাবার্থ সহজেই বোধ-গম্য হইল। জগাই যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই—সে লক্ষীমণিকে বড্‌ড—সত্যি—বড্ড ভালবাসে, তাহার সঙ্গে লক্ষীমণির বিবাহ না দিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। ৩৮ু সে বিবাহে পণ দিবে। তাহার পর সে বনমালী পায়ে ধরিল ও বেশী বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী তাহাকে সস্নেহে হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল—তুমি বাবা আমাদের সে দিন বাঁচিয়েছ। আজ আবার দুবার ক'রে বাঁচালে। আমিও ভাবছিলাম তোমাকে এক-বার একথা বলে দেখ্‌বো। পণের টাকা কি দরকার বাবা ? আমার যা

কিছু খুদকুঁড়ো আছে সবইত আমার মেয়ে জামায়ের। তুমি বাবা এখানেই থাকবে। আমি বুড়ো বয়সে আমার লক্ষীকে ছেড়ে কি নিয়ে থাকবো? বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল—বল থাকবে তো বাবা?

জগাইয়ের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বনমালা বলিল—চার দিন তোমার ওখান হ'তে এসেছি—বড্ড ভিজেছিল কিনা, তাই এসেই লক্ষীর জ্বর হয়েছে। দু'দিন কিছু খায়নি। জ্বরটা মা দুর্গার কৃপায় সেরে গেলেই বিয়েটা শীগ্‌গির দিয়ে ফেলি।

পাশের ঘরটীতে লক্ষীমণি শুইয়াছিল, সে জগাইয়ের কথা সব শুনিতে পাইয়াছিল। রোগযন্ত্রণার ভিতরেও সেই উন্মত্তের প্রলাপের মত কথা কটা তাহাকে অপরিসীম তৃপ্তি দিতেছিল। "লক্ষীকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব"—কথাটা সুরের মত তাহার কাণে বাজিতেছিল।

লক্ষীকে দেখিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জগাই লক্ষ্য করিল—লক্ষীর দুটী চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু, মুক্তার মত টলটল করিতেছে। তাহার মনে হইল যদি সে সোহাগচুম্বনে ঐ দুটী বিন্দু মুছাইয়া লইতে পারিত? তাহার কম্পিত করস্পর্শে যদি মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষীর সমস্ত রোগ দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার থাকিত

(৩)

বড় আনন্দে জগাই গৃহে ফিরিল। তাহার আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। পথে ফিরিতে সে যা কিছু দেখিল তাহাতেই তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল। পাখীর ডাক যে এত মিষ্ট, নদীর ঢেউ, ধানের ক্ষেত যে এত সুন্দর সে তো এতদিন তাহা লক্ষ্য করে নাই! কে তাহার চক্ষে নিমিষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অঞ্জন পরাইয়া দিয়া গেল যে, যাহার পানে সে চায়—তাহাই এত সুন্দর দেখায়? জগাই দেখিল নদী হইতে জল লইয়া পল্লী তরুণীরা চঞ্চল চরণে চলিয়াছে। একখানি সুন্দরমুখভরা ক্ষুদ্র গৃহকোণ কল্পনা করিয়া জগাইয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে তো এতদিন গৃহহারা হইয়া বেড়াইয়াছে এবার গৃহলক্ষীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সে গৃহকে বরণ করিয়া লইবে।

সন্ধ্যার পর জগাই গৃহে ফিরিল। আনন্দে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল।

অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে কি করিয়া নূতন সংসার আরম্ভ করিবে তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল। অবশিষ্ট অংশ সুখস্বপ্নে কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাত হইতে সকলে জগাইয়ের কার্য্যতৎপরতা ও শিষ্টাচারে মোহিত হইয়া গেল। জগাই যেন এক গুপ্তধন পাইয়াছে—৪।৫ দিন পরে জগাই গ্রামের আর একটা যুবকের উপর খেয়ার ভার দিয়া প্রভাতে রতনখালি চলিল। ইচ্ছা লক্ষ্মামণি কেমন আছে দেখিয়া আসিবে ও বিবাহের একটা দিনও স্থির করিবে।

দু ঘণ্টায় সে রতনখালি পৌঁছিল। তাহার স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে সে বুঝিতে পারিত গ্রামে একটা দুর্ঘটনা হইয়াছে। ২।৪ টী লোক একস্থানে জুটিয়া বলাবলি করিতেছিল—তাইত হঠাৎ যে এমন হবে তাত জানিনি। বুড়োটা কিন্তু আর বাঁচবে না। জগাইয়ের কিন্তু সে দিকে কাণ ছিল না,—সে আপনমনে চলিয়াছে। যখন বনমালীর বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়াছে—সে সময়ে একটা ক্রন্দনের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। কে কাঁদিতেছে—"মা, মা আমার, লক্ষ্মী আমার" আর বুক চাপড়াইতেছে।

জগাই একলম্ফে দুয়ার অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গনে আসিল।

সেখানে দেখিল বনমালী মাটীতে লুটাইতেছে ও কাঁদিতেছে। ২।৪জন প্রতিবেশী তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। আর প্রাঙ্গণের মাঝখানে লক্ষ্মীমণির প্রাণহীন দেহ এইমাত্র নামাইয়া রাখা হইয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় তাহার মুখখানি কিছু শীর্ণ দেখাইতেছে কিন্তু তাহা বিন্দুমাত্র বিকৃত হয় নাই। আঁখিদুটী নিমিলিত। হাত দুখানি বক্ষের উপরে ন্যস্ত।

জগাই মন্ত্র-চালিতের মত লক্ষ্মীমণির পায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে তাহার মুখপানে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সহসা জগাই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণে কাহার সহিত বাক্যব্যয় না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

(৪)

২।৩ মাস হইল আর জগাইয়ের কোন সন্ধান নাই। তাহার নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে, কুটীর চাবি বন্ধ, প্রাঙ্গণে ধূলা জমিয়াছে। গ্রামবাসীরা প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। তার পর লোক-পরম্পরায় তাহার বিবাহের সম্বন্ধের কথা ইত্যাদি সবই শুনিল। তাহারা ভাবিল হয় সে পাগল

হইয়া কোথাও ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নয় ত নদী বা পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তা না হইলে কি সে এতদিনে একবার আসিত না !

শ্রাবণ মাস। নদীর কূলে কূলে জল, গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল জগাই নদীতীরে দাঁড়াইয়া পরপারের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। তাহার শরীর শীর্ণ, চক্ষুতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। তাহারা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কিরে জগাই এতদিন কোথায় ছিলি ? তোর হয়েছিল কি ?" জগাইয়ের সংজ্ঞা নাই।

তারপর একজন যখন গায়ে হাত দিয়া তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, সে চমকিত হইয়া তাহার পানে ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বারকয়েক ঘাড় নাড়িল, শেষে শুধু বলিল "হুঁ—"

সকলে বুঝিল আবার জগাই পাগল হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে জগাইয়ের ব্যবহার স্বাভাবিক হইল। তাহার অনুপস্থিতিতে যে খেয়ার কাজ করিতেছিল তাহার নিকট হইতে পুনরায় সে আপনার পুরাতন কার্য্য ভার গ্রহণ করিল। তাহার সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বের মত হইয়া দাঁড়াইল। খেয়ার কাজে বরং তাহার পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক উৎসাহ দেখা গেল। গ্রামবাসীদের নদীর তীরে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার ডাকিতেই জগাই আসিয়া তাহাদের পার করিয়া লয়। লোককে পার করিয়া লওয়াই যেন তাহার জীবনের একমাত্র সুখ ও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাহিরে তাহার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও তাহার মস্তিষ্ক এক অদ্ভুত ভাবাবেশে দিবারাত্র পূর্ণ থাকিত। তাহার কেবলি মনে হইত সে আবার একদিন আমায় ডাকিবে, আমি তাহাকে পার করিয়া আনিব, আবার সে আমার নিকট ধরা দিবে। তাই ওপার হইতে কাহারও ডাক শুনিলেই তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বহিয়া যাইত। স্বর শুনিয়াই সে বুঝিত সে স্বর তাহার নয়, তবু সে আসিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার করিয়া লইয়া তবে অন্য কাজ করিত। সকাল হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া আসিয়া রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কেহ ডাকিল "মাঝি" আর তাহার খাওয়া হইত না, হাত ধুইয়া তৎক্ষণাৎ নদীতীরে ছুটিত। যে রাত্রে ঝড় জল হইত, সে রাত্রে আর তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না। তাহার দীর্ঘ কেশরাশি দুই হাতে টানিয়া ধরিয়া তাহার জ্বলন্ত চক্ষু দুটী বাত্যাবিক্ষোভিত

নদীর পানে সারারাত্রি চাহিয়া রহিত। উৎকর্ণ হইয়া শুনিত সেই পরিচিত সুরে কেহ যদি ডাকে ! কেবলি ভাবিত এমনি দুর্য্যোগের মাঝে সে আসিয়াছিল, আমায় ডাকিয়াছিল ; আর কি সে আসিবে—আর কি একবার ডাকিবে না ?

(৫)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। অপরাহ্ণ হইতে ঝড় জল আরম্ভ হইয়াছে। মধ্য রাত্রি, এখনও জলের বিরাম নাই। জগাই দাওয়ার উপর অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে বাহিরের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

সহসা জগাই শুনিল কে ডাকিতেছে 'মাঝি ওগো মাঝি।' ঠিক সেই স্বর ! এতদিন পরে সেই দুর্য্যোগের মাঝে আবার সে ফিরিয়াছে। জগাইয়ের সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার মস্তকের সমস্ত কেশ সোজা হইয়া উঠিল। দাঁড়খানি হাতে লইয়া সে দাওয়া হইতে নামিল ও এক নিশ্বাসে নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল।

নৌকার নিকট আসিতেই জগাই আবার শুনিল—"ওগো কে আছ আমাদের পার ক'রে দাওগো"—চিৎকার করিয়া জগাই বলিল—"ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে আমি নৌকা ছাড়্‌লাম"। নৌকা যখন পরপারে পৌঁছিল অন্ধকার হইলেও জগাই চিনিল তীরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী ও তাহার পিতা। তাহার শিরায় শিরায় উন্মত্ত আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। নৌকা তীরে লাগিবার পূর্ব্বেই সে লাফ দিয়া পড়িল। অনবরত উত্তেজনায় তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া সে সিক্ত বালুকার উপর পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল—"লক্ষ্মি, আর আমার গায়ে জোর নেই, আমায় একটীবার ধর" বলিতে না বলিতে জগাই দেখিল লক্ষ্মী তাহার মাথা কোলের উপর লইয়া সেই বালুকার উপর বসিল। বলিল "ভয় কি আজ তো তেমন বিষ্টি হচ্ছে না।"

জগাই বলিল—"কেন বিষ্টি ত হচ্ছিল।"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—"বিষ্টি কোথায় ! দেখনা দিব্বি চাঁদের আলো" জগাই চাহিয়া দেখিল সত্যই চারিদিক চাঁদের আলোকে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে ! কেহ কোথাও নাই। সেই নির্জ্জন নদীতীরে সে শুধু তাহার আকাঙ্ক্ষিতা দয়িতার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে !

লক্ষ্মীর একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের

পানে চাহিয়া! জগাই জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মি, তুমি আমায় ফেলে চলে গিয়াছিলে কেন? তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে গিইছিলাম।" বলিতে বলিতে জগাইয়ের চোখে জল আসিল।

লক্ষ্মী তাহার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠপুট দিয়া সে জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা কর! আর আমি কখন তোমায় ছেড়ে যাব না।"

জগাই আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সে আর চাহিতে পারিতেছিল না, জড়িত কণ্ঠে বলিল "আমি কত দিন ঘুমাই-নি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাব! তুমি আর পালাবে না ত?"

লক্ষ্মী কোমলস্পর্শে তাহার চক্ষুদুটী মুদিত করিয়া দিয়া বলিল—"না, ভয় কি তুমি ঘুমাও।"

নিমিলিত নেত্রে জগাই লক্ষ্মীর একখানি হাত স্বীয় ওষ্ঠের উপর রাখিল। ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি চলে যে-ও না!"

পরদিন সকালে দুর্য্যোগ থামিয়া গেলে সকলে দেখিল জগাইয়ের নৌকা দূরে ভাসিয়া গিয়াছে। আর বালুকাতটে জগাইয়ের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ষার জল কূলের উপর অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল, একটী বন্য নাতি ক্ষুদ্র গাছের শিকড়ের উপর কে যেন যত্ন করিয়া জগাইয়ের মাথাটী রাখিয়া দিয়াছে। তাহার শাখার একটী পাতা জগাইয়ের ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। জগাইয়ের একখানি হাত সেই পাতাটীর উপর ন্যস্ত। তাহার মুখে শান্তির একটী স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ লাগিয়া রহিয়াছে!

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বৈষ্ণব মহাসম্মিলন।

(২)

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবের পর যে সকল মহাপুরুষ প্রেম-ভক্তির পতাকা উড়াইয়া দেশ দেশান্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আমরা বলি মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অঙ্কুরিত ও বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া যে বিরাট

বিটপী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল তাহারই ফল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর। বঙ্গে এই সময়ে মোসলমানাধিকার ব্যাপ্ত হইয়া বিজাতীয় ধর্ম্মের বিজয় গৌরবে হিন্দু ধর্ম্মকে ম্রিয়মাণ করিয়াছিল। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ভক্তগণ এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে আপন আপন জীবনের মূল মন্ত্র সাধনে নিয়োজিত ছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সে সময়ের গৌড়ীয় সাধকগণ ব্রজধামে সকলের পূজ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থান গুলি প্রকট করিয়া সাধকের প্রাণে অভিনব প্রেম রসের সঞ্চার করিতেছিলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেব পর্য্যন্ত ব্রজধামে যাইয়া গৌড়বাসী তাৎকালিক মহান্তগণের চরণতলে উপবেশন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজ-ধাম সে সময়ে গৌড়ীয় প্রভাবে সমাচ্ছন্ন ও উদ্ভাসিত। আজ সে ব্রজধাম বর্ত্তমান থাকিয়া সাধকের প্রাণে আশা ও মুক্তির আলো দেখাইয়া শত সহস্র প্রেম প্রবাহে বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহা গৌড়ীয় সাধকগণের তপস্যার একমাত্র ফল। আজ হিন্দুধর্ম্মমহামণ্ডলে ব্রজধাম বাঙ্গালীর অনন্ত গৌরব ঘোষণা করিয়া মুমুক্ষুকে হরি, হরি ! হরি ! বলিয়া ভবসিন্ধু পারে যাইতে আহ্বান করিতেছে ! হীনপ্রাণ আমরা সে মহাহ্বান শুনিতে না পাইয়া জড়ের মত অচল অটল হইয়া সংসারের আবিলতায় আত্মহারা হইয়াছি। জানিনা কবে আবার আমাদের সেই মহাশুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া দিবে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিবাস ছিল পবিত্র সলিলা জাহ্নবী তীরে "চাকন্দী" গ্রামে, তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী। মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া, মাতুলালয় জাজীগ্রামে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে "প্রেম" বিলাইতেছিলেন, যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সেই প্রেমবন্যায় ভাসিয়া সেই একমাত্র প্রেম মহাসাগরে মিশিবার আশায় শ্রীক্ষেত্রে ছুটিয়াছিলেন, গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীও সেই সময়ে ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভুর দর্শনাশয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হন। সাধনার চরমাবস্থায় সাধকের মনোবৃত্তি ঈশ্বরোন্মুখী হইয়া সাধককে অপার আনন্দে ভাসাইতে থাকে। সে তখন কেবল খ্বষিস্বপ্ন দেখিতে থাকে। ইন্দ্রিয় নিচয় ঈশ্বরের কার্য্য করিতে থাকে বাহ্য পদার্থ তখন আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। গৃহে কিছুকাল গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ভাবে কার্য্য করিয়া উদাসীন হন। প্রাণে কিছুতেই শান্তি না পাইয়া গঙ্গাধর নীলাচলে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে লোটাইয়া পড়েন। কবি নরহরি এই ভাবে স্বীয় গুরুদেবের জনকের সাধনা ও সিদ্ধির কথা প্রকটিত করিয়াছেন ;—

দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস।
নীলাচলে গেলা পূর্ণ হৈল অভিলাষ ॥

মহাপ্রভু গঙ্গাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলে সাধক বৈষ্ণবগণ তাঁহার চৈতন্যদাস নাম রাখিয়াছিলেন। চৈতন্যদাস বৃন্দাবনে মন্ত্রের সাধনে আপনার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। এ হেন পিতার চরণতলে উপবেশন করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বিষয়ে বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়া শ্রীনিবাস শ্রীক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দর্শন লালসায় গমন করেন। তথায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সঙ্গোপন সংবাদে মর্ম্মাহত হন। দুঃখভারে শ্রীনিবাস ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। নরহরি বলিয়াছেন "প্রভুগণ কৃপা কৈল আইল গৌড়দেশে"।

কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। সে সময়ে যে সকল ঘটনা বৈষ্ণব সমাজে ঘটিয়াছে, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, অথবা সেই সমস্ত ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া "ভক্তিরত্নাকর" নামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক বিরাট ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অতুলনীয়। তবে তিনি অন্ধ ভক্তির আবরণে অনেক দোষও, গুণের তুলিকায় অঙ্কিত করিতে যাইয়া একদেশদর্শী হইয়াছেন। নরহরি ব্রজধামের ও নবদ্বীপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হোমেরথসঙ্গের কুশী নগরের বর্ণনা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমরা নবদ্বীপ ও ব্রজপরিক্রমা পাঠ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের উজ্জ্বল মানচিত্র অঙ্কিত করিতে পারি। নরহরির অপর নাম ঘনশ্যাম। স্বরচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ;—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥
না জানি কি হেতু মোর হৈল দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহা পাপ বিষয়ে মজনু রাত্র দিন ॥ ইত্যাদি

বোরাকুলীর মহামহোৎসবে প্রেমোন্মত্ত সাধক ভক্ত নরহরি শ্রীনিবাসাচার্য্যের

নিকট দীক্ষিত হন। এই দীক্ষার পর কবি ব্রজধামে যাইয়া কিছুকাল বসবাস করিয়া স্বীয় গুরু শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত গৌড়ে ফিরিয়াছিলেন। অতি পরিণত বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পিতার পদাঙ্কানুসরণে নরহরি বঙ্গবাসীকে যে সুধামৃত দান করিয়া গিয়াছেন তাহা যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে তত দিন "ভক্তি-রত্নাকর" সুরস থাকিবে।

শ্যামানন্দ প্রকৃত নাম নহে। ইহার পিতৃদত্ত নাম "দুঃখী"। যৌবন কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহার নাম কৃষ্ণদাস রাখেন। তারপর যখন ব্রজধামে যাইয়া শ্যামপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তখন আবার ইহার উপাধি শ্যামানন্দ হয়। সুতরাং ইহার পূরা নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ। হৃদয় চৈতন্য ইহার দীক্ষা গুরু। পিতার নাম রামকমল মণ্ডল, বাড়ী দণ্ডেশ্বর, জেলা বর্দ্ধমান। জাতিতে ইনি সদ্‌গোপ ছিলেন। ইহার মাতায় "দুরিকা" বলিয়া জানা যায়। সেই তপোবনের বিদ্যা-ব্রহ্মণ্যের অধিকার দিন হইলে বোধ হয়, ইনি ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণেরা অতি সহজে এই সদ্‌গোপ তনয়কে ব্রাহ্মণোচিত পূজা না করিয়াই স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন।

নরোত্তম ঠাকুর—ইনি বঙ্গের বুদ্ধদেব, উত্তর বঙ্গবাসী ছিলেন। সেকালে রাজসাহী জেলায় গোপালপুরে একটী ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা মোসলমানবাদশাহ অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। এই বংশের রাজারা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। উপাধি ছিল দত্ত। নরোত্তম এই বংশের রাজকুমার। গোপালপুর, পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল খেতুরি। নরোত্তমের পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। মাতার নাম নারায়ণী দাসী রাজৈশ্বর্য্যে নির্ম্মম হইয়া রাজপুত্র নরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন। সেই আর্য্য প্রতিভার মধ্যাহ্ন ভাস্কর প্রভার সময় হইলে, ঠাকুর নরোত্তম ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় রাজর্ষি উপাধি পাইয়া ব্রাহ্মণকুলে স্থান পাইতেন। ঘোরতর বৈষম্যের সময় জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার নরোত্তম বিলাসে এই মহাপুরুষের বাল্য জীবন এই ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্র সম॥

সর্ব্ব প্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণে মত্ত রাত্র দিন॥
প্রেম-ভক্তি-মূর্ত্তি প্রভুর ইচ্ছাতে।
মহারাজ বিষয় নাভায় কিছু চিতে॥
অল্প কালে এই চিন্তা করে রাত্র দিন।
কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদাসীন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতগণে।
কর্য়ে বিভ্রান্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে॥
স্বপ্ন ছলে প্রভু গণ-সহ দেখা দিয়া।
প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল প্রেম দিয়া॥
অকস্মাৎ গৌড়রাজ মনুষ্য আইল।
গৌড়রাজ স্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইলা॥
অতি সুচরিতা মাতা নারায়ণী।
পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে না জানি॥
স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে।
পুত্র সে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে॥
হেথা নরোত্তম অতি সংগোপন হইয়া।
করিলেন যাত্রা প্রভু চরণ স্মরিয়া॥
কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর।
কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥

নরোত্তমের সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু দিন পরে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দের পরকাল হয়। নরোত্তমের পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষদত্ত গোপালপুর রাজ্যের রাজা হন। নরোত্তমের সময় গোপালপুর রাজধানী "খেতুরিতে"

কৃষ্ণদাস নামে একজন জিতেন্দ্রিয় প্রেম-ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের হস্তে এই রাজ-পরিবারের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের পূজার ভার ছিল। এই মহাপুরুষের নিকট কুমার নরোত্তম কৃষ্ণ-কথা ও বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের প্রকট লীলা-কাহিনী অবগত হইয়া তাঁহাদের চরণতলে আত্মবিসর্জ্জন দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সে সময়ে যুগাবতারের জন্মভূমি নবদ্বীপে যে প্রেমপ্রবাহ ছুটিয়া বঙ্গের শ্মশানভূমি পবিত্র করিয়া লোকের হৃদয়-মরুভূমিতে অমৃত সিঞ্চন করিয়া প্রেমবন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত হইতেছিল, সাধক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস আপনার মানস-নয়নে সেই দৃশ্য চিত্রকরের ভৌতিক তুলিকায় চিত্রিত করিয়া কুমার নরোত্তমকে দেখাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের সেই শিক্ষা, সেই আত্মসংযম, সেই দৃঢ় নিষ্ঠা নরোত্তমের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রেমোন্মাদে উন্মাদ করিয়াছিল। তিনি প্রস্রবণের মূলে যাইতে রাসযাত্রা দিনে রাসরাজ দর্শনে সখীভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রেম-বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি জানিতে পারেন মহাপ্রভুর লীলা অপ্রকট হইয়াছে, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতপ্রভু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তখন বঙ্গে ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইয়াছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অদ্বৈতগণ আর কেহ নাই কেবলমাত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম-প্রেম-ভক্তি-যোগ প্রজ্জ্বলিত হইয়া গৌড়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতেছিল। নরোত্তম তাঁহারই উদ্দেশ্যে অন্ধকারস্থিত লতার মত প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামী সংসারে বীতরাগ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিশাল ভারতভূমির গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে "প্রেম বিলাইয়া" বেড়াইতেছিলেন। লোকনাথ তখন তাঁহার অন্বেষণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগাবতারের সহিত তাঁহার আর সন্দর্শন ঘটে নাই। লোকনাথ যখন প্রয়াগ-তীর্থে তখন তিনি সংবাদ পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব অপ্রকট হইয়া ভক্ত হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই সংবাদে লোকনাথ মর্ম্মাহত হইয়া অক্ষয় বটবৃক্ষমূলে অচেতন হইয়া পতিত হন। মূর্চ্ছাবস্থায় তাঁহার প্রতি ব্রজধামে যাইয়া ভজন সাধনে ব্রতী হইবার প্রত্যাদেশ হয় এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ লীলাপট তাঁহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হওয়ায় তিনি জানিতে পারেন :—

কত দিন পরে এক নৃপতি নন্দন।
হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম॥

এখানেই লোকনাথ জানিতে পারিলেন তাঁহার জীবনের গতি অন্য পথে। সাধকের পরিতৃপ্তি সাধনায়, তপঃ সিদ্ধিতে নহে। এই লোকনাথ গোস্বামীই দীক্ষা গুরু হইয়াছিলেন নরোত্তম ঠাকুরের। কবি নরহরি এই ভাবে স্বীয় নরোত্তম বিলাসে লোকনাথের পরিচয় দিয়াছেন ;—

যশোহর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম।
তাহাতে প্রকট সর্ব্ব মতে অনুপম॥
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি সে দোঁহার যৈছে কীর্ত্তি॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে।
প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্ব কাজ।
সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ॥

পিতামাতার চরণতলে উপবেশন করিয়া লোকনাথ পরম বৈষ্ণব-ভাবে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। লোকনাথ বৃন্দাবনধামে যাইয়া প্রেমভক্তি আরাধনায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছিলেন। সেই সময়ে নরোত্তম দীক্ষাশায় তাঁহার শ্রীচরণের আশ্রয় লন। যে মহাপুরুষ সংসারের বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন যাঁহার জীবন ধ্যানময় তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্তি সহজ নয়। তবে লোকনাথ পূর্ব্ব প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুভক্ষণে নরোত্তমকে দীক্ষা দেন। লোকনাথ সংসারের এক কোণে বসিয়া কানন কুসুমের মত আপন সৌরভ সংসারারণ্যে বিতরণ করিয়া উত্তরকালের অলক্ষ্যে নির্ব্বাণ মুক্তির প্রয়াসী ছিলেন। সময়ের পাষাণ-শীতল বক্ষে যে ভাবে তিনি লীন হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপনা হইতেই তাঁহার যশঃ সৌরভ উত্তরকালের লোকের মন প্রাণ আমোদিত করিয়াছে। মহাকাল অনন্তকালে তাহার পরমাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না।

গৃহ-ত্যাগী নরোত্তম ইতস্ততঃ শ্রীনিবাসাচার্য্যের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে তাঁহার সন্ধানে গমন করেন। সে সময় স্বয়ং শ্রীনিবাসাচার্য্য ব্রজধাম দর্শনে যাইতেছিলেন। পথে নরোত্তম তাঁহার দর্শন পাইয়া আত্ম-বেদনা জানাইয়াছিলেন আচার্য্য ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজধামে উপস্থিত

হইয়া লোকনাথ গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। পরে লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার দীক্ষা গুরু হন।

ইহার কিছুকাল পর শ্যামানন্দও ব্রজে যাইয়া শ্যাম প্রেমে বিভোর হইয়া বৈষ্ণব মহাজনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায় এখানে আসিয়া শ্যামানন্দ মদনগোপাল ও গোবিন্দের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে ব্রজধামে "নিত্যানন্দ অদ্বৈত বিহার" হইয়াছিল। ব্রজবাসী মহান্তগণ গৌড়বাসী শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রেম ভক্তিতে বিভোর হইয়া গৌড়ে বৈষ্ণব গ্রন্থাদির প্রচার করিবার ভার দেন।

বৈষ্ণব কবিগণ গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগোস্বামীমণ্ডলে প্রেরণ করিতেন। মহান্তগণ সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের উপযোগী বোধ করিলে বৈষ্ণব সমাজে প্রচারার্থে অনুমতি প্রদান করেন। এই অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে কোনও কবির গ্রন্থ পঠিত বা প্রচারিত হইত না। এই নিয়ম বৈষ্ণব সমাজে প্রচলন করায় কেবলমাত্র সুকবির সদগ্রন্থরাজিই সমাজে প্রচারিত থাকিত। ব্রজবাসী গোস্বামীগণ এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলামৃত যে সকল গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে সকলে উপনীত হন যে কোনও গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্ত্য লীলা মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই। সেই জন্য চৈতন্য চরিতামৃত লেখার প্রয়োজন হয়। গোস্বামীগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে লিখিতে অনুরোধ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তখন জীবন মরণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনের অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। এরূপ বয়সে কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার নয়। গোস্বামীগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারায় তিনি কলম ধরিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস সমাজে পরম বৈষ্ণব ও প্রতিভাশালী কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুভক্ষণে শুভ মুহুর্ত্তে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব গোস্বামীগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া লেখনী ধরিয়াছিলেন। সকলেই পরমানন্দে কৃষ্ণদাসকে এই মহাকাব্য লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কেবল লোকনাথ গোস্বামী

—"হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা।" (নরোত্তম বিলাস)

সেই অমৃতময়ী লেখনী যে ফল প্রসব করিয়াছিল তাহা বাস্তবিক অমৃতাখ্যা পাইবার উপযুক্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

কর্ম্মবীর সাধু নিত্যানন্দ দাস।

যাঁহার জীবন-কথা ধারাবাহিকরূপে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, সেই স্বনাম-ধন্ত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব অপ্রকট হইবার সময়ে তাঁহার তিনটী শিষ্যের উপর তিনটী গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া যান। বিখ্যাত শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের উপর "নাম" প্রচারের ভার, ও শ্রীমতী ললিতা সখীর উপর শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণব সেবার ভার ও শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিকের উপর জনসেবার ভার অর্পণ করিয়া যান। এক কথায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ "জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" যাহা তাঁহার নিজের জীবনে একাধারেই পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান্ ছিল, তাহাই যেন তিন স্থানে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ভার অর্পণ করিবার কালে তাঁহার শেষ উপদেশ— "মনে রাখিও জগতে তোমরা ছাড়া আর সকলেই পরম বৈষ্ণব, তোমরা কেবল কাঙাল, বৈষ্ণবদাস হইবার কাঙাল। বৈষ্ণবত্বের অভিমান কখন রাখিবে না। কখনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য করিবে না, হৃদয় সঙ্কুচিত করিবে না, আর কাহারও উপর অধিকার স্থাপন করিবে না। মুষ্টি-ভিক্ষার উপযোগী না হইয়া কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।" এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহাত্মা পুলিনবিহারী মল্লিক তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশপালনে কতটা সার্থকতা এ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন আমরা আজ তাহাই আলোচনা করিব।

কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ৪০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত সংসারাশ্রম করিবার পর সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া তিনি কঠোর তপস্যা করেন। ৫৪।৫৫ বৎসর বয়সে "বেশ পরিবর্ত্তন" করিয়া তিনি তাঁহার গুরু-দেবের আদেশ অনুসারে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গত তিন বৎসর যাবৎ এই সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে সে পরিশ্রম ও উৎসাহ আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত। গত ফাল্গুন মাসে মাঘোৎসবের পর নব-দ্বীপে যখন কলেরার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে অসংখ্য কলেরা রোগীকে মাতৃ-সুলভ স্নেহের সহিত সেবা করিতে করিতে স্বয়ং ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া ২রা ফাল্গুন শনিবার রাত্রি ৮ ঘটীকার সময় নিত্যধামে প্রবেশ করেন।

বাল্য কথা—এই মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় চারি বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু

"আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি।
জনতা বহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।"

আজ মনে হয় তাঁহার সহিত এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা যেন চিরকালের; এ পরিচয় যেন নিত্য। কোন বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য পাণিহাটীতে রাঘবোৎসবে গিয়াছিলাম। প্রতি বৎসর ঐ দিবস তিনিও পাণিহাটীতে যাইতেন। সকালে জনতা দেখিতে গিয়া এক অপূর্ব্ব বাবাজী দেখিয়া সঙ্গীকে বলিলাম "দেখেছ শালার বাবাজীর রকম! বাবাজী হওয়া টুকু আছে আবার সখ্ দেখ।" বাবাজীর পরণে ভাল সিল্কের কাপড় (অবশ্য মুক্ত-কচ্ছ) মাথায় ভাল সিল্কের পাগ্‌ড়ি, গায়ে সুন্দর একখানি সিল্কের চাদর, মুখে চুরুট, হাতে বেতের একটী নাতিক্ষুদ্র সুন্দর ব্যাগ, চক্ষে চশমা। এ হেন বাবাজী দেখিয়া আমি যদি খুব একটী আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধন করি সেটা বোধ হয় অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। যাহা হউক এমন সময় আমার বন্ধু আসিয়া "চল পুলিনদা'র সঙ্গে আলাপ করবে" বলিয়া আমাকে সেই বাবাজীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দাদা আমার বন্ধুটী তোমার সহিত আলাপ করিতে চায়।" তিনি এক মুহূর্ত্ত আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন "কি ভাই আমার সঙ্গে আলাপ করবে?" মানুষ যে এমন করে মানুষকে "ভাই" বলে সম্বোধন করতে পারে, আমার জানা ছিল না। সে "ভাই" কথাটী কেবলমাত্র মুখের কথা নয়, সেই কথাটীতে যেন প্রাণের সমস্ত ভালবাসা মাখান। সেই "ভাই" কথাটী সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে আপন করিয়া লইল। সে 'ভাই' সম্বোধন যে না শুনিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই বোঝান যাইবে না। তাহা কত মধুর, কত হৃদয়স্পর্শী! সন্ধ্যার সময় যখন বিদায় লইলাম, তখন যে কথা কয়টী বলিয়াছিলেন তাহা অনেক সাধু মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু সে রকম আন্তরিকতার সহিত আর কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই। 'ভাই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তাতে তোমার কোন উপকার হবে না জানি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গ পেলে আমার অনেক উপকার হবে।" এই কথা কয়টি যখন বলিয়াছিলেন তখনকার তাঁর সেই তৃণাদপি সুনীচ ভাবে মুগ্ধ হয় না, এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই। যতটুকু তাঁহার নিজের মুখে ও অন্য দুই একজন তাঁহার বাল্য-বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যে সময়ে তিনি হিন্দু স্কুলে পড়িতেন সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা শুনা যায়। ঐ সময়ে যাহাকে সাধারণে "দুষ্ট ছেলে" বলে তিনি সেইরূপ ছিলেন। স্কুলের পাঠে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া শুনা যায় না। অনেক সময়ে তাঁহাকে স্কুল হইতে পালাইয়া গোলদিঘিতে ঘুরিতে দেখা যাইত। কিন্তু শৈশব হইতে সত্যপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার ক্লাসের কোন ছাত্র একটী অন্যায় কাজ করে। মাষ্টার আসিয়া যখন অন্য ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন "কে করিয়াছে" তখন সকলেই বলে আমরা জানি না। কেবল তিনি উত্তর করিয়াছিলেন 'জানি কিন্তু বলিব না" এক সময়ে তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গ মিলিয়া একটী Spiritual সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় অনেকে মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্ব্বক আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। তিনি নাসারন্ধ্রে Smelling salt ধরিয়া গাত্রে কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র ফুটাইয়া পরীক্ষা করিতেন তাহাদের এই আবিষ্ট ভাব প্রকৃত কিংবা কৃত্রিম। কৃত্রিম হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সভ্যকে বিতাড়িত করিতেন এবং বলিতেন "নায়ের" জন্য যদি নিজেকেও এমন করে প্রবঞ্চনা করি তবে সত্য পাইব কোথায়? সত্যকে খুজ্‌তে গিয়ে এমন করে নিজেকে ঠকিয়ে মিথ্যা নিয়ে ভুলে থেকে লাভ কি? যে সমস্ত যুবক তাঁহার সঙ্গ করিত তাঁহাদের তিনি সর্ব্ব প্রথম উপদেশ দিতেন "কোন কাজ লুকিয়ে করবে না, যা' করবে বীরের মত বুক ফুলিয়ে করবে, কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না।" কোন যুবক অন্যায় করিয়া তাহা গোপন করিলে তিনি যত দুঃখিত হইতেন, এমন বোধ হয় আর কিছুতে হইতেন না।

এ সময় হইতেই পরোপকার করা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। প্রতিবেশীদের কাহারও অসুখ, স্নেহময়ী জননীর মত শিয়রে বসিয়া বিনিদ্র যুবক তাহার সেবা করিবে। কাহারও পুত্রের অসুখ ঔষধ পথ্য কিনিবার সামর্থ্য নাই, নিজে কিনিয়া গোপনে তাহা প্রেরণ করিতে না পারিলে আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাইত। সমস্ত সভা সমিতিতে উদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। বাটীতে দাস দাসীদের অসুস্থতায় তাঁহাকে সমান ভাবেই বিচলিত হইতে দেখা যাইত। হতভাগ্যদের শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেন এবং রীতিমত পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। বাটীর ছেলের

যেমন সেবা যত্ন হয়, তাহাদেরও যাহাতে সেই রূপই হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তিনি ঐ সময়ে বাটী হইতে পালাইয়া কাশ্মীরে যান। এই সময়ে নাচ দেখিবার সখ তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত নর্ত্তকীদের নাচ দেখাই তাঁহার পলাইবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। "নাচ দেখা ও গান শোনা তখন আমার একটী ভয়ানক নেশা ছিল তা' ছাড়া অন্য কোন মন্দ অভিপ্রায় সে সময়ে আমার ছিল না।" কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া তিনি ট্রামওয়ে কোম্পানির কেসিয়ারের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সময় হইতে তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও "বাবু" হইয়া পড়েন এবং হাতে যথেষ্ট পয়সা হওয়ায় তাঁহার চরিত্র দোষ ঘটে। এই দোষ সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ব কখন ম্লান হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার আর একটী মহদ্‌গুণ ছিল। তিনি কখন মদ্য পান করিতেন না। তাঁহার কোন বন্ধু অত্যন্ত মাতাল হইয়া উঠায় তিনি তাহাকে মদ্যত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে কোন একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বন্ধুটী বলিল "তুই যে দিন হতে এর বাড়ী যাওয়া ছাড়বি আমিও সেই দিন হতে মদ্‌ ছাড়ব।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমি এখন হতে আর তার বাড়ী যাব না-তুইও কিন্তু আর খেতে পাবিনা।" সেই দিন হতে আর সে স্ত্রীলোকটীর বাটী প্রবেশ করেন নাই। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে প্রকৃতই ভালবাসিত। সে প্রত্যহই তাঁহার নিকট দূতী প্রেরণ করিত সন্ধান করিয়া অন্যস্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার দুই পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছে কিন্তু তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কয়েক মাস পরে স্ত্রীলোকটী "পুলে এল না" "পুলে এল না" কেবল এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যাগ করে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাত দিন রাত আর তিনি উঠেন নাই। এই ঘটনাটী হইতে তাঁহার বন্ধু-প্রীতি, পান-দোষের প্রতি ঘৃণা ও হৃদয়ের অসীম শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন তাঁহার কোন একটী যুবক বন্ধু মদ্য পান করিয়া আসিয়াছিল, কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিয়াছিল সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই, তাহাতে তিনি বলেন নিজেকে ভুলিওনা, তোমার নিজের খাবার ইচ্ছা হইয়াছিল, নতুবা কেহ তোমাকে খাওয়াইতে পারিত না। আমি

অনেক পার্টিতে গিয়াছি যেখানে কেবল মদ্ ও মাতাল, হাতে করে সকলকে খেতে দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা কখন কেউ আমাকে খাওয়াতে পারেনি"। কলিকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সে সময়ে তাঁহার স্নানাহারের সময় ছিল না। সর্ব্বদাই একস্থানে রোগী লইয়া ব্যস্ত।

কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে সমস্ত রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিত না, যে গৃহে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিত না, সেই সমস্ত স্থানে দেবদূতের মত তিনি অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কাহারও নিষেধ বা অনুরোধ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। বিপন্ন কোন ব্যক্তি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইত না, তিনি সকলকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতেন। আমার সম্মুখে তিনি একদিবস অনেকগুলি (১৫০০৲ টাকার) "হেণ্ডনোট" ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি নিষেধ করায় বলিলেন, "আমার হাত দিয়ে রাধারমণ দিয়েছিলেন, আমার উহাতে কোন অধিকার নাই। এগুলা লিখিয়া নেওয়া আমার ভুল হইয়াছিল, এগুলা রেখে আর একটা ভুল করে এত লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করা উচিত নয়।"

শিশু-কাল হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। যৌবনের মত্ততায় তাহা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। মাতৃভক্তিরূপে তাহা জীবনের অনেক বিষম প্রলোভন হইতে অনেক সময়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। মাতার প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহা অতুলনীয়। মাতার অনুমতি না লইয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। তাঁহার জননীও যে কত উচ্চ হৃদয়সম্পন্না ছিলেন তাহা একটী কথাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অনেকে তাঁহাকে একবার বলেন যে তুমি অনুরোধ করিলেই পুলিন প্লেগের মরা ফেলিতে বা রোগী দেখিতে যাইবে না। তুমি উহাকে নিষেধ না করিলে উহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। তিনি স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "জানি, আমি বল্লে পুলে' যাবে না, কিন্তু না যেতে পেলে ও'র যে কত কষ্ট হবে তাও আমি জানি, তাই আমি ওকে যেতে নিষেধ করতে পারব না। আর কেউ যদি বেচারাদের না দেখবে ত' তারা যায় কোথায়?" এমন জননীর ক্রোড়ে লালিত, এমন জননীর স্তন্য দুগ্ধে পালিত পুত্র যদি দেশের জন্য প্রাণত্যাগ না করে ত কে করিবে? ধর্ম্মে লিপ্সা উচ্ছৃঙ্খল যৌবনে যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহা অপেক্ষা শতগুণে বলবতী হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলে

তিনি "কর্ত্তাভজাদের" দলে মিশিলেন। নেবুতলায় রামচন্দ্র দাস কবিরাজ নামে ঐ সম্প্রদায়ের এক দলপতি ছিলেন। তিনি তাহার কাছে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে "ক্রিয়া কর্ম্ম" করার পর তাঁহার "সঞ্চার" হয়। একদিন রাত্রে বাটী আসিতে আসিতে সহসা তাঁহার হাঁসি পাইল এবং অনবরত দুই দিন হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। দলে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় যেখানেই যাইতেন "পুলিনকে" সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ডাক্তারেরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ, নতুবা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দেন।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী "তাহাকে" পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কবি মহাশয় এই সময়ে প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াইতেন ও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হয়েন নাই। ডাক্তারেরা অথচ বলিতে লাগিলেন দুইটার একটা শীঘ্র না করিলে তাহার জীবন রক্ষা দায় হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবেন না এটী তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনও আর তেমন লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল না। একদিন এই কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ডাক্তারের পরামর্শে প্রথম যে দিন স্ত্রীলোকের বাটী যাই সে দিন কেবলই বোধ হইতে লাগিল ভয়ানক পাপ করিতেছি। কিছুতেই মনের শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না। পৌষ মাসের শীতে ঘামিয়া উঠিলাম। তাহার পার্শ্বে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটী আমার পূর্ব্ব পরিচিত সে আমার অবস্থা দেখিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল আমার কোন অসুখ করিতেছে 'কিনা'! পাঁচটী টাকা বালিশের তলায় গুজিয়া রাখিয়া আমি একেবারে ট্রামে করিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলাম।" এই সময়ে তাঁহার মধ্যে একটী ভয়ানক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। পূর্ব্বের মত ঘৃণিত জীবন ও ভবিষ্যতের আদর্শ জীবনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার সমস্ত জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীমৎরাধারমণচরণ দাস দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ম, অ, প, রামানন্দ রায় মিলন।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসেও তর্পণের বিধি লিখিত আছে, কিন্তু তাহা প্রবৃত্ত মার্গের ভক্তের পক্ষে। ভক্তকে স্বভাবতঃ তিনশ্রেণীতে বিভাগ করা যায় যথা প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধ। প্রচেতা-সংবাদে শ্রীনারদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, তিনি, দেব, ঋষিও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ আরাধনা করিলে, স্থাবরজঙ্গম সকলের আরাধনা করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে, তাহার শাখা প্রশাখা প্রভৃতির পুষ্টি হয়, তাহার জন্য আর পৃথকরূপে সিঞ্চন করিতে হয় না, সেইরূপ শ্রীহরির আরাধনা করিলে, সকলের আরাধনা করা হয়, "দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং ন পিতৃণাং" এই শ্লোকটীতে হরিভজনে সকলঋণ হইতে মুক্তি হয় ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে।

"যথাতরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তিতৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমুচ্যতেজ্যা॥" ৪।৩১-১২

প্রাণের পুষ্টি হইলে আর ইন্দ্রিয়াদির পৃথক্ পুষ্টি করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইতে হয় না, সেইরূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল আরাধনা সিদ্ধ হয়, এই আরাধনার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াও ভক্তকে শ্রীহরিচরণ হইতে চ্যুত করিতে পারে না, যেমন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার গজত্ব প্রাপ্তি, এবং ভরতরাজার মৃগত্ব প্রাপ্তি। ভক্তের দুইটী সংসার একটী সাধকদশায় তাঁহার মায়িক-সংসার এবং সিদ্ধদশায় শ্রীভগবানের সংসার, যতক্ষণ ভক্তিদেবী তাঁহার আধিপত্য বিস্তার না করেন ততক্ষণ ভক্তের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থাকে, কিন্তু বিস্তার করিলে আর থাকে না। সেইটী ভক্তের সাধ্য নহে, ভক্তিদেবীর অলৌকিকী গরীয়সী মধুরিমা। এইজন্য ভক্ত বর্ণাশ্রম ত্যাগ জন্য দায়ী নহেন। পয়ারে আছে "বিধিমত কৈল তেঁহ স্নানতর্পণ" অর্থাৎ তাঁহার রাগমার্গের বিধিমত তিনি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়শেখর, অষ্টসখী, অষ্টমঞ্জরীর তর্পণ এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়াছিলেন। আরও স্মার্ত্ত ব্যবস্থামত নিষ্পিতৃকের সম্বন্ধে তর্পণবিধি, তাহা হইলে শ্রীভবানন্দ রায় জীবিত থাকিতে রামানন্দ

রায়ের তর্পণ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ইহার পর ভবানন্দ রায় মিলন প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথাহি—

জরাসন্ধ নিরুদ্ধ নৃপবর্গৈঃ প্রার্থিতং দশমস্কন্ধে

"তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ

স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপিসংসরতামিহ"

হে গোবিন্দ, যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন তাহাতে ভীত নহি, তবে যেন আমাদের চিত্তমধুকররূপে, প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম সদৃশ তোমার চরণপদ্মের মধুপান করিতে বঞ্চিত না হয় সেই উপায় সাধন করুন।

ইহার পর আমরা ভবানন্দ রায় মিলন সম্বন্ধে ২।৪টী পয়ার উল্লেখ করিব যথা,—ম, দ, প, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২—

"সার্ব্বভৌম বলে এই রায় ভবানন্দ। ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ॥
রামানন্দ হেন জন যাঁহার তনয়। তাহার মহিমা লোকে কহন না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম। তারে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্তভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥

তাহার পর প্রভু মনে করিলেন ইনিই রামানন্দ রায়। যদ্যপি তাঁহারে আলিঙ্গন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন, ধৈর্য্য ধারণ করিবার এই কারণ যে, ভক্তের হৃদ্গত প্রেমই ভগবৎ পরিচয় করিয়া দেয়, যেমন জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণদর্শন করিয়াও প্রেমের অভাবে মাধুর্য্যানুভব করিতে পারেন নাই। তাহার পর রামানন্দ রায় একটী অলৌকিক রূপগুণসম্পন্ন সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন,

'শত সূর্য্য সম কান্তি অরুণ বসন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥
দেখিতে তাঁহার মনে হৈল চমৎকার। আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥"
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা, দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোহে ভূমিতে পড়িল॥"

এই স্থলে "স্বাভাবিক প্রেম" শব্দ বর্ণিত হইয়াছে ইহার অর্থ স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রেম, অর্থাৎ ব্রজপ্রেম, যে মাধুরীবিন্দু, ব্রহ্মানন্দকে ধিক্কার করিয়া দেয়, যাহা সাধন হইতে উদ্ভূত হয় না, যাহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য সমাচ্ছন্ন

করিয়া দেয়, যাহা নিন্দাকে স্তুতিরূপে এবং স্তুতিকে নিন্দারূপে পরিণত করে, যেটীতে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়, সেই প্রেম। ব্রজভূমিতে জন্ম না লইলে সে প্রেম সঞ্চার হয় না, এইজন্য শ্রুতি ব্রজ-ভূমিতে জন্ম লইয়া শ্রীগোপী দেহে শ্রীগোবিন্দ ভজনা করিয়াছিলেন, সাধন করিলেও গোপীর চরণধূলির কণা প্রাপ্তির অভিলাষ ব্যতিরেকে এই প্রেম উৎপন্ন হয় না। যেমন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আপনার দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

অদ্বৈতবীথি পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মানন্দ মগ্ন থাকিয়া তদুপাসকের সহিত প্রতিষ্ঠাসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলাম হঠাৎ কোন শঠ, লম্পট, ব্রজগোপীর মনচোরা আসিয়া আপনার স্বরূপাভাস দর্শন করাইয়া শ্রীপাদপদ্মের দাসী করিলেন। গোপী-ভাব-রূপ দর্পণ ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তিখানি দেখিতে কেহ সক্ষম হন না, অন্য দর্পণে বস্তু প্রতিফলিত হয় কিন্তু এই দর্পণে পরতত্ত্বকে আকর্ষণ করিয়া ধৃত করে। শ্রীমহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের এইরূপ ভাববিকার দর্শন করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্ন্যাসীই বা ক্রন্দন করিতেছেন কেন? আর মহাপণ্ডিত মহারাজ সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিয়া কান্দিয়া অধীর হইতেছেন কেন? তৎপরে প্রভু বলিলেন "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণ আমার নিকট বর্ণন করায় আমি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।" রায় বলিলেন 'ভট্টাচার্য্য আমাকে ভৃত্যজ্ঞান করিয়া অসাক্ষাতে আমার হিত সাধন করিলেন, আপনি সার্ব্বভৌমকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার কৃপাধীন হইয়া তৎ সম্বন্ধে আমাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। সাধুর কার্য্যে পরের গৃহে গমন করিয়া ভবতাপানলদগ্ধ জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮অং ৩য় শ্লোকে গর্গং প্রতি শ্রীনন্দ-বাক্যং"

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ।"

যাঁহারা সংসার-বিষের প্রকোপে জীর্ণশীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বিষয় ভাবনা দ্বারা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা ক্ষণকাল গৃহত্যাগ করিতে পারে না, এরূপ গৃহস্থকে উদ্ধার করিবার জন্য অর্থাৎ মহৎকৃপা করিয়া তাহাদের সংসার মহারোগ বিনাশ করিবার জন্য, সাধুসকল আগমন করিয়া থাকেন,

হে ভগবন্ এবিষয়ে আর অন্যথা নাই। হে দয়াময়! আপনার দর্শনে সকলের চিত্ত গলিয়া গিয়াছে, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাধনের অপেক্ষা না করিয়া এই অধম বিষয়ীকে আত্মসাৎ করিলেন দিনকতক অবস্থান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

আপনার দর্শনে সকলের মুখে কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আপনাকে আমার সেই ইষ্টদেব পরম ঈশ্বর বলিয়া ধারণা হইতেছে। প্রভু বলিলেন "তুমি মহাভাগবতোত্তম, তোমার প্রেমের বলে, তুমি সর্ব্বত্র প্রেমময় ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাক, এমন কি আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও তোমার প্রেমে কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হইলাম।" এস্থলে প্রভু আপনাকে মায়াবাদী বলিয়া যদিও আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি সরস্বতী প্রকৃতই শ্রীবদনে প্রভুর আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, পয়ার যথা, ম, অ, ৪:।

"অন্যের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি"

"মায়াদম্ভে কৃপাসু ইত্যমরঃ" অর্থাৎ মায়া শব্দের অর্থ কৃপা, কি উপায়ে শ্রীগোবিন্দপ্রেম জীবের অন্তর্হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবেন, কি রূপেই নাম গ্রহণ করিতে হয়, জীবের কর্ত্তব্য কি এবং উপাসনা তত্ত্বই বা কি, জগৎ কি, বলিয়া দিবার জন্য কৃপা করিয়া আপনার কৃপাতত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই অর্থে মায়াবাদী হইল। কিম্বা মায়া শব্দে "রাধা" সেই প্রেমময়ীর প্রেম যিনি প্রচার করিবার জন্য রাধা নামকে পরম পুরুষার্থ রূপে বর্ণনা করাইবেন তাঁহাকেও মায়াবাদী বলা যায়। কিম্বা যাঁহারা জগৎ উৎপত্তির কারণ এক মাত্র প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া এই কথা বলেন, তাহাদিগের সেই মত ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করাইবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকেও মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলে। প্রভু বলিলেন, সার্ব্বভৌম আমার কঠিন হৃদয়কে শোধন করিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, এইরূপে কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে একটী বৈদিক-বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভুও ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা করিলেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য স্নানকৃত্য করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীরামানন্দ রায় সমাগত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যথাস্থানে বসাইলেন। নির্জ্জনে দুই জনার কৃষ্ণ-কথা হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ।

ভাগবত ধৰ্ম্ম ।

আমরা সচরাচর লোককে বলিতে শুনি যে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কর, তাহা হইলে স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুর পর সুরলোকে পরম সুখে কাল কাটাইবে, আর যদি তাহা না কর তাহা হইলে নরককুণ্ডের মধ্যে ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ধৰ্ম্মজীবনের ইহাই শেষ কথা নহে। যে শাস্ত্র বা যে ধৰ্ম্ম, মানবকে এই প্রকারে স্বর্গসুখের লালসায় প্রলুব্ধ করিয়া, অথবা তাহার বিপরীত নরকের ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায়, সে ধৰ্ম্ম উন্নত শ্রেণীর মানবের ধৰ্ম্ম নহে, সে ধৰ্ম্মের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহা নিম্নাধিকারীর জন্য।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য দার্শনিকের মনীষা যখন হইতে সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়েই পূর্ব্বের সত্য টুকু জ্ঞানবান লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা সংখ্যদর্শনেই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। স্বর্গসুখ যে জ্ঞানবান মানবের ধৰ্ম্মজীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহা সাংখ্যদর্শনে এবং ভগবদ্গীতায় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সাংখ্যকার ও গীতাকারের এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা যে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহার দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন "জীবস্য জীবনস্য চ পুনঃ কৰ্ম্মভির্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈব।"

অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য বা ফল, স্বর্গাদি নহে। ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের কথা। বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই জীবনের ফল। শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইতেছেন, এই যে ব্রহ্ম ইনি তত্ত্বেরই একটি নাম মাত্র। তত্ত্ববিদেরা এই তত্ত্বকে অদ্বয় জ্ঞান বলেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্ এই তিন ভাবে তিন শ্রেণীর সাধক বা উপাসক এই অদ্বয় জ্ঞানকে উপলব্ধি করেন। ঔপনিষদ সম্প্রদায় ইহাকে বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভেরা বলেন পরমাত্মা, আর সাত্বতগণ বলেন ভগবান্। তত্ত্ব কিন্তু এক, অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে এই যে শ্লোকটি ইহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এই শ্লোকটি বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে

কিরূপে বেদান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ সমন্বয় করা হইয়াছে। তত্ত্ব যে অদ্বয় জ্ঞান' ইহা আমরা দৃঢ়রূপে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। এই টুকু যদি আমার ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে লীলাতত্ত্ব, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা মোটেই বুঝিতে পারিব না। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকারও এই কথাটুকু আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যথা—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বআদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

কৃষ্ণ যে "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব" ইহা হৃদয় মধ্যে দৃঢ় রূপে ধারণা না করিয়া লীলা-রস আস্বাদনে চেষ্টান্বিত হইলে যে কিরূপ অনর্থ হয়, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞেয় জগতের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জগত আমার জ্ঞানে বিদ্যমান। আমি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া আমাকেই এই জগতের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা বলিয়া অনুভব করিতেছি।, এই যে দ্বৈত, ইহাই মানব জ্ঞানের সাধারণ অবস্থা। আমরা জড় চেতনের, দেবাসুরের, অন্তর বাহিরের, দ্বন্দ্ব বা প্রভেদ সর্ব্বদাই দেখিতেছি ও জানিতেছি, কিন্তু এই উপলব্ধি মানব জ্ঞানের চরম সীমা নহে। চরমে গিয়া মানব এই উভয়কে এক একত্বের ও সামঞ্জস্যের মধ্যে অনুভব ও উপলব্ধি করে। এই যে দুই, দৃষ্ট ও দ্রষ্টা, জড় ও চেতন, প্রকৃতি ও পুরুষ, রয়ি ও প্রাণ এই দুইকে যখন এক সমন্বয়ে লইয়া গিয়া ইহাদের সেই নিত্য-সম্বন্ধের বা মিলনের বা একত্বের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায়, সেই সময়েই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয় মধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

মনে করুন, বৃন্দাবনে লীলা হইতেছে, এই লীলার যে মধুর বর্ণনা তাহা শ্রবণ করিতেছি। এখন প্রশ্ন এই, আমাদের দৃষ্ট এই প্রাকৃত জগত ও শ্রীভগবানের প্রেমলীলাস্থান আনন্দের বৃন্দাবন এই দুইটি কি এক প্রকারের জিনিস? তাহা যদি মনে করি, তাহা হইলে, তো সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তো আর বৃন্দাবনের চিন্ময়ত্ব থাকে না। বৃন্দাবন, "প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।" বৃন্দাবনের দ্রষ্টা কে? ভক্ত। ভক্ত কে? যিনি শ্রীভগবানের হইয়াছেন। ভক্ত আছেন, তিনি দেখেন, তিনি শোনেন, তিনি গান করেন, তিনি নৃত্য করেন, তিনি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, লীলা প্রভৃতি স্মরণে

ও কীর্ত্তনে সর্ব্বদা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নয়ন সলিলে ভাসিয়া যান, কিন্তু এই যে তাঁহার ক্রিয়া এই ক্রিয়ার মূলে "অহং কর্ত্তা, অহং দ্রষ্টা" এই প্রকারের অভিমান নাই। ভক্তি তো অহং অভিমান সম্পন্ন কোন জীবের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, ভক্তি ভগবানেরই স্বরূপশক্তি। অতএব ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ। ভক্ত ও ভগবান ভিন্ন হইয়া অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দেখা গেল ভগবানের লীলার দ্রষ্টা (অভেদের দিক হইতে দেখিলে) ভগবানই নিজে। আমি যখন তাঁহার, আমার নহি, সেই অবস্থাতেই আমি লীলা-রস আস্বাদন করিতে পারি। আমি যখন আমার, তখন আমার লীলারস আস্বাদনের অধিকার নাই। ব্রজদেবীগণেরও যখন মনে সৌভাগ্যগর্ব্ব জাগিল যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। ইহাই লীলার রহস্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদী গৌড়ীয় আচার্য্যগণই এই লীলাতত্ত্বের শেষ রহস্য জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব" বুঝাইবার জন্য বলিলেন "ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যবর্ত্তিতি" অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানবাদ নিরস্ত করিলেন। সাংখ্যকার ইহা করিয়াছেন। "ক্ষণিক জ্ঞানবাদ" নাস্তিক মত। বর্ত্তমান ইউরোপে জনষ্টুয়ার্ট মিল এই মতের প্রচারক। ইংরাজীতে ইহাকে sensationism বলে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এই মত বিশেষ ভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা কি বলেন?

তাঁহারা বলেন যে আত্মা নামে স্থির বা নিত্য কোন সত্ত্বা নাই। তাঁহাদের মতে "স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্।" সকল কার্য্যই অস্থির বা অনিত্য—আত্মাও এক প্রকার কার্য্য। আত্মা দীপ-শিখার মত। তৈল ও বর্ত্তিকার সহিত অন্য দীপশিখা যোগ করিলে আর একটি দীপশিখার আবির্ভাব হয়। সাধারণ লোকে মনে করে যে দীপশিখা স্থির ও একটি অখণ্ড পদার্থ। কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক ক্ষণে উহা নূতন হইতেছে। যেমন একটা গোল জিনিসে (আলাত চক্র) একটা আলো এক জায়গায় রাখিয়া যদি তাহা অত্যন্ত বেগে ঘুরান যায় তাহা হইলে মনে হয় সমস্ত চক্রই আলোক, সেই প্রকার দীপশিখার অতিদ্রুত ধারাবাহিকতা বশতঃ আমাদের মনে হয় যে উহা একটি অখণ্ড বস্তু।

আত্মাও এই প্রকার। শুক্রশোণিতে এক আত্মার যোগে অন্য আত্মার

উদ্ভব হয়, জ্ঞান প্রবাহের অতিক্রত ধারাবাহিকতা নিবন্ধন মনে হয় উহা এক অখণ্ড বস্তু।

নাস্তিকদিগের এই মতের নামই ক্ষণিক জ্ঞানবাদ, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী যাহার উল্লেখ করিলেন।

সাংখ্য-মত এই মতকে কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহারও একটু আলোচনা করা দরকার কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেও কয়েক স্থানে সাংখ্যগণের এই সকল যুক্তি অনুসৃত হইয়াছে।

সাংখ্যগণের প্রথম আপত্তি প্রত্যভিজ্ঞা। "ন, প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ।" সকল কার্য্যই যে ক্ষণিক ও আস্থির তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, এখন আবার তাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি এরূপ মনে হয় কেন? ইংরাজীতে ইহাকে বলে Identification by Memory,

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে নাস্তিকেরা যে উদাহরণ দিলেন সে উদাহরণই ঠিক নহে। "দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ" দীপশিখা অন্য দীপশিখা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা কার্য্য (caused), কিন্তু আত্মাও যে কার্য্য তাহা তোমার কেবল কথায় স্বীকার করিব কেন? ইংরাজীতে বলা যায় যে আত্মা তো causa sui হইতে পারে?

তৃতীয় আপত্তি এই যে, সকল বস্তুর ক্ষণিকত্ব মানিলে কার্য্যকারণ ভাবই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। "যুগপজ্জায়মানয়োঃ ন কার্য্যকারণ ভাবঃ" দুটি জিনিস যদি এক সঙ্গে জন্মায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে না। কারণকে কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী হওয়া চাই। যদি বস্তুমাত্রেই ক্ষণধ্বংসী হয় তাহা হইলে প্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তী যে কারণ তাহা যেমন ধ্বংস হইল অমনি পরক্ষণবর্ত্তী যে কার্য্য তাহারও ধ্বংশ হইল। "পূর্ব্বাপায়ে উত্তরা-যোগাৎ।" সুতরাং বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কারণেরও অস্তিত্ব থাকে না, কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কার্য্যেরও তাহাই হইবে, অর্থাৎ তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। "তদভাবে তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি।" সুতরাং কারণের একটা সম্ভাব আছে অর্থাৎ উহা ক্ষণিক নহে। তবে যদি কেহ বলেন "নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীতা"ই কারণ (দার্শনিক Hume এ কালে এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, মার্টিনো তাহা খণ্ডন করিয়াছেন) কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের মধ্যে প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না। "পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ" আর তাহা হইলে অভাবই

যে সকল কার্য্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক কার্য্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা তাহার অভাব। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শূন্যবাদ, অভাব-বাদ, প্রারম্ভ বাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি মত প্রায়ই অনুরূপ।

নাস্তিকেরা বলিলেন আমরা বিজ্ঞান-বাহ্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা স্বীকার করি না, ইহার উত্তরে সাংখ্য আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে "ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ।" "বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তবস্তুর "প্রতীতি" যে সকলের হইতেছে। যদি বল 'প্রতীতি' মানিনা।' তাহা হইলে বিজ্ঞানও মানিতে পার না। অথবা বিজ্ঞান মানিতে গিয়াই যে প্রতিতি মানিতেছ। "প্রতীতিহি বিষয়-সাধিকা" প্রতীতিই যে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বাহ্য সকল বিষয়েরই সাধিকা। অতএব সাংখ্য বলিলেন যে যাহারা বলে "শূন্যং তত্ত্বং" তাহারা অজ্ঞান। "অপবাদ মাত্রমবুদ্ধানাং" মূঢ় লোকের ইহা অসার কথা মাত্র। ইহার কোন সার্থকতা নাই,

"উভয়পক্ষ সমানক্ষেমত্বাদয়মপি"

বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক, বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই এই দুইটি মতই প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রতীতির দ্বারা যেমন খণ্ডন হয়, শূন্যবাদও তেমনি খণ্ডন হয়। 'অপুরুষার্থমুভয়থা" সংসারশূন্য বলিলে দুঃখ নিবৃত্তিও হইবে না, দুঃখনিবৃত্তির কোন উপায়ও হইবে না।

সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের সমন্বয়ের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইলে এই উভয় দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা আগামীবারে এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ও ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, লইয়া পুনরায় আলোচনা করিব।

নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির

অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মাইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকাপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি। দেশের ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে যে একেবারে অভিজ্ঞতা নাই তাহা নহে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। সে সময়ে তাঁহার মুখে নবদ্বীপ রাধারমণ সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির (Maternity Home) সম্বন্ধে সকল

কথাই শুনি। বৈষ্ণব সমাজে যে ভাব জাগাইয়া তোলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, সাধু নিত্যানন্দ দাস ঠিক সেই ভাবটি জাগাইয়া তোলার জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে জন-সেবার আদর্শ বৈষ্ণবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করা দরকার। তাহা ছাড়া, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যখন প্রেমের ধর্ম্ম, তখন প্রতিশোধ ও বর্জ্জনের ভাব পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হওয়া যাইবে না। প্রেমধর্ম্মের এই গূঢ় কথাটি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিলাতে একবার উঠিয়াছিল, জনহিতৈষিনী মেরি কার্পেন্টার যে সময়ে শিশু অপরাধীগণকে সংশোধন করিবার জন্য বিদ্যালয় করেন, সেই সময়ে। তাহা ছাড়া আরও দুএকবার উঠিয়াছে। যাঁহারা নানাদেশের খবর রাখেন তাঁহারা ইহার সন্ধান রাখিবেন। আমাদের দেশেও এই প্রশ্নটি উদিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নিজের জীবন দিয়া আমাদের সমাজের এক মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। সে মহাপাপ কি, দরকার হইলে পরে বলিব। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কথা, কিছুই আমার বলিবার নাই, মাতৃমন্দিরের কথাই আলোচ্য।

কৃষ্ণনগরে এক বৃহৎ কমিটি হয়। নবদ্বীপে কার্য্য করিবার জন্য ইহার অধীনে আর এক কমিটি হয়। গত মে মাস হইতে এই প্রকারে মাতৃমন্দির চলিতেছে। আমি নিজে নবদ্বীপ গিয়া সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি, দেশের অনেক প্রধান প্রধান লোকের সহিত এ বিষয়ে অনেক আলোচনাও করিয়াছি, কারণ আমি জানি মাতৃমন্দিরের বিশেষ দরকার। কেবল নবদ্বীপে নহে কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ও দক্ষিণাপথের অনেক তীর্থে এই রূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

কৃষ্ণনগরের কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ইহার নাম "নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির" হইয়াছে। ইহার পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে ও নবদ্বীপে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ঐ উভয়স্থানের প্রায় অধিকংশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলো-কের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ নাকি বলিয়াছিলেন যে প্রতিবৎসর ৬০০ গর্ভবতী স্ত্রীলোক নবদ্বীপে আসেন। কোন কোন ভাললোক এইরূপ ভাবিলেন যে হিন্দুসমাজের অযথা কুৎসা করা হইয়াছে। তদনুসারে তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়া বসিলেন তিনি এরূপ কথা বলিয়াছেন কি না, আর যদি বলিয়া

থাকেন তাহা হইলে কি প্রমাণের জোরে তিনি এরূপ কথা বলিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন তিনি এরূপ কথা বলেন নাই। এরূপ ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র না লিখিয়া নবদ্বীপে যাইয়া যাঁহারা মাতৃমন্দির চালাইতেছেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। শুধু তর্ক করিয়া কি হইবে? তর্কের তো শেষ নাই। তর্ক করিতে বসিলে বলা যায় যে মাতৃমন্দিরের পৃষ্ঠপোষকগণের সাধারণ সভায় পৃষ্ঠপোষকগণেরই অন্যতমরূপে ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা বলিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণকে, নিজের পদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া তিনি তাহা নাও বলিতে পারেন; এরূপ ঘটনাতো অনেক ঘটিয়াছে। এই কৃষ্ণনগরেই আর একবার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকের মনে আছে। যে বিষয় লইয়া আলোচনা, তাহাতো তর্ক নহে, কার্য্য। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লেখা তর্কে পরাজয় করার উপায় হইলেও সত্যানুরাগের ও সমাজহিতৈষণার পরিচয় কিনা, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যেখানে প্রত্যক্ষজ্ঞান অত্যন্ত সুলভ সেখানে তর্ক না করাই ভাল। যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহারা কার্য্যে করিতেছেন, দূরে বসিয়া তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করা কি ভাল?

সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কঠিনও নহে অসম্ভবও নহে। আমার মনে হইয়াছিল, বোধহয় যুদ্ধ লাগিল। যুদ্ধ লাগিলে বড় ভয়ানক হইত; কারণ স্থানীয় অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহারা অপরাজেয়। যাহা হউক যুদ্ধ হয় নাই ভালই হইয়াছে। এখন গোলযোগ মিটিয়া যাহাতে কার্য্যটি হয়, তাহাই আমার অনুরোধ। আমার ভয় এই, পাছে কর্ম্মীদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও তাঁহারা তর্ক আরম্ভ করেন। কারণ তর্ক উঠিলে বহু অপ্রীতিকর কথা বাহির হইয়া পড়িবে। যাহা বেশী প্রকাশ না হওয়াই ভাল। মাতৃমন্দির বিষয়ক আলোচনায় একটি বড় অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। দুইখানি বিখ্যাতপত্রে মাতৃমন্দির সম্বন্ধে লেখা বাহির হয়। কেহ বলিতেছেন যে এই দুখানি পত্রই ব্রাহ্মসমাজের লোকের দ্বারা সম্পাদিত, সুতরাং এই সংবাদ বাহির করিয়া তাঁহারা হিন্দুসমাজের ও হিন্দুতীর্থের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন। এমন কথা ভাললোকের মনে কেন উদয় হয়? যে দুইজন সম্পাদককে এ কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের লোক ইহা ঠিক, কিন্তু এটা তাঁহাদের গৌণপরিচয়, মুখ্যপরিচয়ে তাঁহারা স্বদেশ সেবক। তাঁহারা যখন অর্দ্ধোদয় যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিয়া যাত্রীদের

সেবা করিয়াছেন তখন এ কথা ওঠে নাই। দেশাত্মবোধের ভূমিটা কি মিথ্যা, আমরা কি সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছাড়িয়া কখনই উঠিতে পারিব না ?

যে কথাটাকে হিন্দুসমাজের কলঙ্ক বলা হইতেছে তাহা যখন সত্য, আর হিন্দুই যখন তাহা দূর করিতেছে তখন আমরা তজ্জন্য লজ্জিত হইব কেন ? বরং আমরা যে তাহা নিবারণের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছি, এজন্য গৌরব বোধ করিব। দোষ বা চ্যুতি সকল সমাজেই আছে। কেহ গোপন করিয়া নিদ্রা যান, কেহ তাহা সারাইতে চেষ্টা করেন। এ লইয়া বিরোধ করা কেন।

হিন্দু সমাজ একটা বৃহৎ ও জটিল জিনিস। হিন্দু সমাজের পক্ষ হইয়া কথা বলিতে কে অধিকারী তাহার যখন মীমাংসা হইতে পারে না, তখন তর্ক করিয়া অকারণ কথা কাটাকাটি না করাই ভাল। আমি সপ্রমাণ করিতে পারি, আমি হিন্দুসমাজের নেতা, আপনি বলিবেন না তুমি নও, আমি ! সুতরাং সমাজের একটা গ্লানি দূর করিতে যাঁহারা পরিশ্রম করিছেন এ বিষয়ে তাঁহারাই নেতা, কর্ম্মীই নেতা, তার্কিক নহে। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী মাতৃমন্দিরের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া এক ব্যবস্থা পত্র দিয়াছেন, ইহা বোধ হয় সকলে জানেন না।

আমি বিশ্বাস করিতে চাই যে যাঁহারা গালি দিয়াছেন তাঁহারা সরলভাবেই দিয়াছেন, যাঁহারা গালি খাইয়াছেন, সত্যের জন্যই খাইয়াছেন, এখন যাঁহারা নবদ্বীপে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া দিনরাত্রি অশেষ অসুবিধার মধ্য দিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, যাঁহাদের অসুবিধা ও অভাবের কথা এখনও দেশে প্রচারিত হয় নাই উভয় পক্ষই সত্য ও মানবতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের তল্লাস করুন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থা এবং সেবাশ্রমের কর্ম্মীগণ প্রতিমুহূর্ত্তে কিরূপ বিপদাপন্ন তাহার খবর তো কেহ জানেন না ! তাঁহারা মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না কিন্তু দেশহিতৈষীগণের, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তো একটা কর্ত্তব্য আছে। সেবাশ্রম সম্পর্কে নিদাঘবিদ্যালয় হইয়াছিল। জাপানে নিদাঘ বিদ্যালয় হয়, মার্কিণে হয়, এ দেশে এই প্রথম হইল। অনেক টাকা টাকা ব্যয় হইয়াছে। সে কার্য্য স্থায়ী হইল, কি করিয়া তাহা হইল ?

তীর্থের কথা উঠিয়াছে, সুতরাং বলা ভাল। দশহরার দিন দিবা দ্বিপ্রহরে কয়শত (আমার একেবারে অঙ্ককশা হিসাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে পত্র

লেখার দরকার নাই) মাতাল গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে এ খবর তো সহজেই পাওয়া যায়। তাহা নিবারণের জন্য কেহ কোনো চেষ্টা করিয়াছে কিনা—এ সবও তো খবর, তীর্থের পবিত্রতার জন্য আমরা ব্যাকুল কাজেই উর্দ্ধগ্রীব হইয়া এ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকি।

মোট কথা নবদ্বীপের এই কার্য্যগুলির একটা খুব বেশী রকম উপযোগীতা আছে, একটু স্থিরভাবে যিনি তাহা ভাবিবেন, অথবা যিনি তাহা জানিবেন, তিনি (অবশ্য ভাল লোক হইলে) ইহাতে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মাতৃমন্দিরের পরিচালনার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি, ইহার শেষটুকু বলা দরকার। কৃষ্ণনগর কমিটিই এই মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নিত্যানন্দ দাস মহাশয় যাহা করিয়াছিলেন অবশ্য তাহাই লইয়া ইহা হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে মাসে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ব্যয়ভার কৃষ্ণনগর কমিটিরই দিবার কথা। কিন্তু এখন এই কমিটির আয় খুব অধিক না হওয়ায় কমিটি মাসে মাসে ৫০টি করিয়া টাকা দিতেছেন। অবশিষ্ট প্রায় ১২০৲ টাকা রাধারমণ সেবাশ্রম হইতে দেওয়া হয়। এমন কথাও হইয়াছে যে কৃষ্ণনগর কমিটি পরে এই টাকা রাধারমণ সেবাশ্রমকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি, মাতৃমন্দিরের প্রয়োজন অনেক সময় তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছি। হিন্দু প্রশ্ন করিবেন এই সব সন্তান কি জাতি হইবে? বৈষ্ণব উত্তর দিবেন বৈষ্ণব হইবে। ইহা না হইলে তাহারা খৃষ্টান হইত, গুণ্ডা হইত, নতুবা মরিয়া যাইত। হিন্দুরা মাতৃমন্দির করিয়াছে, ইহাতে প্রমাণিত হয়, হিন্দু এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার বর্ণবিভাগে যদি নাও বাঁচিয়া থাকে, তাহার বৈষ্ণবতার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। মাতৃমন্দির পাপের প্রশ্রয় দেয় না, পাপীকে আশ্রয় দেয়। হিন্দু যদি ইহা না করিতে পারিত তাহা হইলে মাতৃমন্দির হইত। খৃষ্টান করিত, এবং খৃষ্টান করিয়াছে। তাহা হইলে কি হইত? উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এ সম্বন্ধে যেন কোনরূপ বিতণ্ডা না হয়। যাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সত্য প্রেম ও সমদর্শীতার অনুরোধে এই কার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহারা তর্ক করিবেন না। তাঁহারা বলেন "প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া কুড়িটি টাকা চাই, নতুবা ৫০টি রোগী, স্থবির ও শিশু খাইতে পাইবে না, দুই হাত ও মাথা চব্বিশ ঘণ্টায় কুড়ি টাকা সংগ্রহ করে। কেহ যদি পৃষ্ঠে পাদুকার আঘাত করে, সহ্য করা ছাড়া উপায়

নাই, কারণ হাতের সময় থাকিলে প্রতিরোধ করা যাইত। মারিতে দাও, কতক্ষণ মারিবে। এ তো ভাল।" এই আদর্শে যাহারা চলে। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে যাহারা জন্মিয়াছে, খড়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতির দাবীতে যাহারা পায়ের উপর পা দিয়া কেবল কাণে ফুঁ দিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিতে পারিত, আজ তাহারা হাঁসপাতাল করিয়া প্রত্যহ প্রভাতে স্বহস্তে রোগীর বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, যে কোনো জাতির মৃতদেহ আনন্দের সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া প্রায় প্রত্যহ নবদ্বীপের পথে যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, বদান্য ধনীগণের আনুকূল্যের জন্য যাহারা ব্যস্ত নহে, নিজের শেষ কপর্দ্দকটি দেওয়ার পর যাহারা ভিক্ষা করে অথবা উপার্জ্জন করে, শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবেরা তাহাদের অপাংক্তেয় করুণ আপত্তি নাই, ইহাই তাহাদের যথেষ্ঠ শাস্তি আর কেন? যে মূর্খেরা অনায়াসে ক্ষীরসর ননী খাইয়া শুইয়া শুইয়া পাখার বাতাস খাইতে ও সেবাদাসীর দ্বারা পদসেবা করাইতে পারিত, তাহাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল তো যথেষ্ঠ হইয়াছে। আর কেন? পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ।

পারিজাত।

ভুলে বনে ফুটেছিল পারিজাত হায়,
জগতের এক কিনারায়!
হাসিতে সে এসেছিল, হাসিয়া বিদায় নিল,
নীরবে মরিয়া গেল বন বিছানায়,—
জগতের এক কিনারায়।
তুলিয়া আনন ফুল্ল, বনের লতায়,
ফুটেছিল কানন লতায়;
কোমল মরমে তার, ভরিয়া বেদনা ভার,
বিরলে শুখায়ে যেতে বুঝি কুয়াসায়,—
ফুটেছিল কানন ছায়ায়।
এনেছিল দিনেকের, হাসিমাখা গান,
রেখে যেতে বিষাদের তান;
কেবল আসিয়া তারা, কোথা হয়ে যায় হারা!
দিয়ে যায় বুক ভরা বেদনার দান,—
রেখে যেতে বিষাদের তান।
ভুল করে আসে তারা ভুলে চলে যায়,
ফেলে যায় কেবল আমায়;
আমার নয়নাসার, তারা তো দেখেন আর?
নয়নের তপ্ত জলে সিক্ত নিরাশয়,—
ফেলে যায় কেবল আমায়। ভোলানাথ সেন।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,
শ্রাবণ, ১৩২১।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। (১)

[শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। ভাগবত-ধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা সকলের চিত্তে এক ভাবে উদিত হয় না। শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তবে যেমন ভাগবতধর্ম্মের ভিত্তি এক প্রকারের বিশিষ্ট চিন্তার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তবেও তেমনি আর একদিক হইতে তাহার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম-চিত্র। ভাগবতধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা উপনিষদের মধ্যে ব্যাখ্যাত ও উপদিষ্ট হইলেও কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধের পরই তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগের সাধনার আদর্শ খুবই মহান্, খুবই উন্নত, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাহা কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দ্বাপরের মহাসভ্যতাকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের দুই প্রান্তে দুই জনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, একদিকে দুর্য্যোধন আর একদিকে ভীষ্ম। উভয়েই মুমূর্ষু। একজন ভীমের গদাঘাতে উরুভঙ্গ হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আর একজন বীরের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্বাপর যুগের যাহা জীবনের আদর্শ তাহার নিকৃষ্ট ফল দুর্য্যোধন, আর শ্রেষ্ঠ ফল ভীষ্ম। ভীষ্ম দেবব্রত, ধর্ম্ম তাঁহার চরিত্রে মূর্ত্তিমান। সেই রাজসিক যুগে ভীষ্মচরিত্র অতুলনীয়। দ্বাপরের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা ধ্বংস হয় নাই, কলিযুগের যাহা যুগধর্ম্ম, সেই ভাগবতধর্ম্মে আসিয়া তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তবে এই পরিণতি লাভের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।]

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি, জীবনের পরিণতি,
সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল,
আর কোন সাধ নাই, যেন সেই রতি পাই,
এই মোর আকাঙ্ক্ষা কেবল।

আয়ু মোর অবশেষ, হে প্রভো, হে পরমেশ,
কৃপা করি দিলে দরশন,
বলিবারে আপনার, কোন কিছু নাহি আর,
কি দিয়া পূজিব শ্রীচরণ?
নানা ধর্ম্ম আচরিয়া, সংযত একাগ্র হইয়া,
মনোজয়রূপা এই মতি
করিয়াছি উপার্জ্জন, হে কৃষ্ণ, হে নারায়ণ,
তাই দিয়া পূজিব সম্প্রতি।
শুধু নানা উপচারে, তোমারে যে পূজা করে,
কিন্তু যার মন বশ নয়,
বিষয় কামনা শত, মনে জাগে অবিরত
তাহার হে পূজা নাহি হয়।
শাস্ত্র-উপদেশ মত, ধর্ম্ম করা শত শত
মনের ধারণা ফল তার,
হৈলে পরে মনোজয়, হে হরি, হে দয়াময়,
তব পদে জন্মে অধিকার।
সকল জীবন ধরি, সর্ব্ব তৃষ্ণা পরিহরি,
সাধন করেছি যেই মতি
আজি এই অন্তকালে, পদে রতি পাব ব'লে,
দিনু পদে হে সাত্বতপতি!
তুমি তো সাত্বত-পতি দেব নারায়ণ।
এই ভাবে ভজি তোমা সার্থক জীবন॥
যতদিন তত্ত্বরূপে, দেখে নর বিশ্বভূপে,
ততদিন থাকে ব্যবধান,
ততদিন ভয়ে লোভে, লোকে ভগবানে সেবে
প্রেমপূর্ণ নাহি হয় প্রাণ।
সত্ত্ব-গুণে অবস্থিত, জগতের সাধু যত,
বিশ্বহিত যাঁহাদের ব্রত
বিশ্ব সনে আপনার, ভেদ বুদ্ধি নাহি যার,
পূর্ণজ্ঞানে সমুজ্জল চিত্ত।

তুমি তাহাদের পতি, তুমি তাহাদের গতি,
তুমি তাহাদেরি একজন,
তাহাদের নেতা হয়ে, বিশ্বহিত ব্রত লয়ে
নিরন্তর কর পরিশ্রম।
সকল মহত্ত্বালয়, জয় দেব দয়াময়
তুমি কৃষ্ণ, তুমি ভগবান,
তোমায়ে এভাবে চিনে, আজি এ আমার প্রাণে
প্রেমের প্লাবন বহমান।
দূরবর্ত্তী নও তুমি, ওগো অখিলের স্বামি,
তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটেতে,
সব চেয়ে আপনার, তুমি প্রেম-পারাবার,
এই ভাব আজি হৃদয়েতে।
তোমার অপূর্ব্ব লীলা ভাবিয়া বিস্মিত।
স্বরূপ পরমানন্দে নিত্য অবস্থিত॥
কখনই সে আনন্দ, নহে ক্ষীণ, নহে মন্দ
আমরা বুঝিনা, কিন্তু নিত্য তাহা আছে,
মোরা দেখি শোক তাপ, মোরা দেখি দুঃখ পাপ,
এ সব অবিদ্যা জাত, এ সকল মিছে।
পূর্ণানন্দে বিরাজিত, হয়ে তুমি ক্রীড়ারত,
প্রকৃতি লইয়া কর লীলা
তোমার আনন্দ লীলা, বিশ্বরূপে প্রকাশিলা,
বোঝেনা মানব, মোহে ভোলা।
আজ, ঘুচে গেছে মোহ বন্ধ, টুটে গেছে দ্বিধা দ্বন্দ্ব,
অনন্ত এ বিশ্বে আজি হেরি,
অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে, নিরন্তর হেসে হেসে
সদা ক্রীড়ারত তুমি হরি।
আছে মৃত্যু কিন্তু তাহা অমৃতের দ্বার।
শোক শুধু অশোকেরে করিছে প্রচার॥
আছে দুঃখ, কিন্তু তাহা করিছে খ্যাপন
তোমারি করুণা, তব শান্ত শ্রীচরণ॥

'রেণেটির পদকর্ত্তা' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।

চট্টগ্রামের মৌলবী আবদুল করিম সম্পাদিত "রাধিকার মানভঞ্জন" নামক অন্যতম পরিষৎ গ্রন্থাবলীর মুখবন্ধে আছে "গরাণহাটী, রাণিহাটী বা রেণিটী কীর্ত্তন, সকল কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মধুর; যে কীর্ত্তন জমিলে স্বয়ং গৌরাঙ্গ স্বর্গ হইতে আসিয়া কীর্ত্তনে মাতিতে থাকেন"। এমন কীর্ত্তনের পদকর্ত্তা হওয়ার দাবী যে অনেকেই করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার প্রবন্ধটি প্রস্তুত হইবার পর পত্রব্যবহারে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারি "রেণিটী সুরের কবে কি ভাবে উৎপত্তি হইল তাহা প্রসিদ্ধ "ভক্তিরত্নাকরে" বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। খেতুরের মহোৎসবে এই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তাহাতেই উল্লিখিত আছে।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কৃপাপূর্ব্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন "আমারও ধারণা আছে রেণিটী ও গরাণ-হাটী একই পদ।" কিন্তু আমি বিশেষ সাবধানের সহিত এই ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে খেতুরের মহোৎসবে নূতন গানের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই যে রেণিটীর পদ এ কথা উক্ত গ্রন্থের কোন স্থানে উল্লেখ নাই। সেইজন্য আমরা মূল প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন না করিয়া পরিশিষ্ট অংশে তাহা খণ্ডন করিয়া দিলাম। ভক্তি-রত্নাকরে একাদশ তরঙ্গে—

"কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর।
প্রভুর প্রাঙ্গন ধূলে সদাই ধূসর॥
নিজ সৃষ্ট গান নৃত্য বাদ্য প্রভেদেতে।
গন্ধর্ব্ব বিস্ময় তাহে উপমা কি দিতে॥ (৬৫৯ পৃঃ)
তথাহি স্তবামৃত লহর্য্যাং॥

আনন্দমূর্চ্ছাবলিপাত ভাত ধূলীভরালঙ্কৃত বিগ্রহায়
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।
গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব-ক্ষপণস্বলাস্যবিস্মাপিতাশেষকৃতি ব্রজায়॥
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

অন্যত্র দশম তরঙ্গে

গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সভার শোভা কহিল না হয়॥

নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাধুর্য্যের নাহি সীমা
সংকীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে॥
বারবার প্রণমিয়া সবার চরণে
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিনী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বরগ্রাম মূচ্ছর্নাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন
পরম মঙ্গল সুধা নহে তার সম॥
তাল পাঠাক্ষরে চারু ছন্দে উচ্চারয়
বাদকগণের যাতে মোদ বৃদ্ধি হয়॥　(৬৪৩পৃঃ)

মূল প্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি আমাদের এই রেণিটীর পদে গোষ্ঠই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু খেতুরে মধুর ভাবেরই সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছিল এবং পরেও সেই মধুর ভাবের সংগীতই গীত হইত।

দশম তরঙ্গে গীত সৃষ্টির সময়—

"নরোত্তম গণ-সহ তাঁরে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয়॥
শ্রীরাধিকা ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥
আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তায় দিতে।
হইল বিহ্বল তাহা প্রথমে গাহিতে॥
তদুপরি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাষ॥
গৌরগুণ গীতারম্ভে অধৈর্য্য সকলে।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেম জলে॥" (৬৪৩ পৃষ্ঠা)

একাদশ তরঙ্গে মহোৎসবের পর অন্যান্য স্থানের ভক্তবৃন্দ নিজালয়ে গমন করিলে অন্য দিন সংকীর্ত্তনের সময়—

প্রিয় রামচন্দ্র আর গোকুলাদি সনে।
সদা নানা রস আস্বাদয়ে সংকীর্ত্তনে॥
পূর্ণিমা রজনী পূর্ণ চন্দ্রের উদয়।
কহি সে দিবস যৈছে রস আস্বাদয়॥
প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামৃত প্রকাশিয়া।
গায় রাসলীলা রসে নিমগ্ন হইয়া॥

আমাদের মনে হয় রেণিটী গানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মধুরত্বে মুগ্ধ হইয়া খেতুরের কোন ভক্ত শিষ্য বৈষ্ণব বা নরোত্তম ঠাকুরের পার্শ্বচর কোন শিষ্য বা প্রশিষ্য ইহাই রেণিটীর পদ বলিয়া স্থানবিশেষে প্রচার করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি মনোহর সাঁই পরগণার নামানুসারে যেমন মনোহর সাঁই পদের নাম, সেইরূপ রাণিহাটী বা রেণিটী পরগণার নাম অনুসারে পদের নাম রেণিটী হইয়াছে। রাণিহাটী বা রেণিটী পরগণা সরকার সপ্তগ্রামের অধীন। সুতরাং খেতুরে নূতন পদের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই রেণিটীর পদ নহে। আমাদের অনুমান আর একটি কারণেও ঐ কথা রটনা হওয়া অসম্ভব নহে। রেণিটীর পদকর্ত্তা বিপ্রদাসের পিতার নাম দেবীদাস, নরোত্তম ঠাকুরের জনৈক পরিকরের নামও দেবীদাস ছিল। দশম তরঙ্গে—

"শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের প্রিয় পরিকরগণ
সকলেই গীত বাদ্যে নৃত্যে বিচক্ষণ॥
প্রথমেই দেবীদাস মঙ্গল বাদ্যেতে।
করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে॥" (৬৪২ পৃষ্ঠা)

রেণিটীর পদকর্ত্তা বিপ্রদাসের পিতা দেবী দাস ও নরোত্তমের পরিকর দেবীদাস এক ব্যক্তি হইলেও হইতে পারিতেন, কেননা মূল প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে দেবীদাস অন্যত্র হইতে আসিয়া অরণ্য কাটিয়া দেবীপুর গ্রাম বসাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দেবীদাসের পুত্র যে বিপ্রদাস একথার কোন উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরে নাই। বিশেষ বিপ্রদাস ও তৎপুত্র বিজয়কৃষ্ণ ঐ সময়েরই লোক তাঁহারাও খেতুরের মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাহার উল্লেখ আছে; সংকীর্ত্তনে যখন ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন তখন—

"নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ধনঞ্জয়।
বিপ্রদাস বাণী শিখি কানাই বিজয়॥
নাচে সূর্য্য দাস শ্রী নৃসিংহ নানাছন্দে।
হৃদয় চৈতন্য নাচে গৌরা ভাবানন্দে॥" (৬৪৬ পৃষ্ঠা)

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐ নৃত্যকারী বিপ্রদাস ও বিজয় যে আমার মূল প্রবন্ধের বিপ্রদাস ও বিজয় তাহার প্রমাণ? তাহার প্রমাণ, মূল প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি বিপ্রদাসের গুরু আচার্য্যের শিষ্য শ্যামদাস ও বিজয়কৃষ্ণের গুরু নৃসিংহ দেব আর এখানেও শ্যামানন্দ ও নৃসিংহ দেব বিপ্রদাস ও বিজয় এক সঙ্গেই মহোৎসবে নাচিতেছেন—গুরুদেবের সহিত তীর্থ স্থান ও মহোৎসবাদিতে গমন এখনকার সভ্যতার বিরোধী হইলেও বোধ হয় রেল সৃষ্টির পূর্ব্বপর্য্যন্ত উহার খুবই প্রচলন ছিল। বিপ্রদাস ও বিজয়কৃষ্ণ যে তাঁহাদের গুরু দেবের সহিত খেতুরের মহোৎসবে গান করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। শ্যামানন্দ ও শ্যামাদাস একই ব্যক্তি। ভক্তি-রত্নাকরে অষ্টম তরঙ্গে

"প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর।
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা সত্বর॥
শ্যামাদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয়।
শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥
দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত্র।
এথা অল্পে কহিল সর্ব্বত্র বিদিত॥"

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বিপ্রদাস ও বিজয়কৃষ্ণ যে অমন পদকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু এ গ্রন্থের তাঁহাদের গানের কোন উল্লেখ নাই কেন, তদুত্তরে বলা যায় যে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরেরই লীলা-বর্ণন। সুতরাং সে গ্রন্থে অন্যের গুণপনা বিশেষভাবে উল্লেখ থাকা সম্ভবপর নয়। বিশেষ গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখা যায় "হেথা অল্পে কহিল এসর্ব্ব বিদিত' ইত্যাদি সংক্ষেপ বর্ণনা করার উল্লেখ আছে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পরিকর দেবীদাস ও রেণিটীর জন্মদাতা বিপ্রদাসের জনক দেবীদাস একই ব্যক্তি নহেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যখন কাঞ্চনগড়িয়া (বর্দ্ধমান নবগ্রামবাসী গোস্বামী প্রভু দিগের নিবাস, কেহ কেহ বুধরি বলেন বর্ত্তমান নবগ্রামই প্রাচীন কাঞ্চন গড়িয়া) হইতে বুধরি গমন করেন তখন বিপ্রদাসের বাড়ী হইতে প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ সুন্দরের মূর্ত্তি লইয়া গিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীসন্তোষ দত্তের বাড়ীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন ভক্তি-রত্নাকর দশম তরঙ্গে—

"গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥

ধান্য সর্ষপাদি গোলা তার গৃহান্তরে।
তথা সর্পভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥
সর্প বিকারের কেহ না জানে কারণ।
মন্ত্রৌষধি কৈলে সর্প গর্জ্জে অনুক্ষণ ॥

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

গোলা হইতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌর সুন্দর।
ক্রোড়ে আইলে হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর ॥
প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌর সুন্দরে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইল বাসা ঘরে ॥"

(৬২২ ও ৬২৩ পৃষ্ঠা)

দেবীপুরের বিপ্রদাসের বাটী হইতে যে ঐ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া গিয়াছিলেন তাহার বেশ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; কারণ দেবীদাসের নব প্রতিষ্ঠিত দেবীপুর বিপ্রদাসের সময়েও ক্ষুদ্র গ্রামই ছিল, তখনও হয়ত গ্রামের কোন নামকরণ হয় নাই সেইজন্য গ্রন্থে গ্রামের নামোল্লেখ হয় নাই, বর্ত্তমান গোপালপুর দেবীপুরের সন্নিকট ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম হইলেও তখন বোধ হয় একখানি সমৃদ্ধশালী গণ্ডগ্রাম ছিল। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর কোম্পানী ইয়ংনিয়াস Messrs. Alexander Young and Co. বাড়ীর বেনিয়ান শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুমার তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র কুমার ভ্রাতৃত্রয় ও বৈদ্যপুর নিবাসী নন্দী বাবুরা এই গোপালপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির জমিদার। প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ-সুন্দরের মূর্ত্তি প্রাপ্তি বৈষ্ণবের চক্ষে এত বড় একটি ঘটনা, অথচ দেবীদাসের কোন উল্লেখ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের লীলাগ্রন্থে তাঁহার পরিকর দেবীদাসের বাড়ীতে এত বড় একটি ঘটনা ঘটিল যে তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহার পুত্রের নাম উল্লেখিত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের দেবীদাসেরও যে উল্লেখ নাই তাহার কারণ তিনি তখন মৃত অথবা বৃদ্ধ জরা-জীর্ণ, পুত্র দেশ বিখ্যাত গায়ক সেই জন্য বিপ্রদাসের নামোল্লেখ হইয়াছে, এই ঘটনায় আর একটি কথা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। আমরা মূল প্রবন্ধে জনশ্রুতি শ্রবণে বলিয়াছি যে বিপ্রদাসের গৌরাঙ্গ দেবের উপর অভিমান ছিল তাহাও যথার্থ, সেই জন্যই হয়ত বিপ্রদাসের অনুরোধ ক্রমে

তাঁহার নামোল্লেখ হয় নাই। নচেৎ তখনকার দিনে যে কোন ব্যক্তি নিজের গৃহে প্রাপ্ত দেববিগ্রহ নিজে প্রতিষ্ঠা না করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে দিবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। অবশ্য এখনকার দিনে বিগ্রহ (বি+গ্রহ) বিশিষ্ট গ্রহ, আপদ বালাই বাজে খরচের আকর মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে—কেন, —বোধ হয় ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের এমন অবস্থা ছিলনা। বিশেষ আবার বিপ্রদাস "ভাগ্যবন্ত" ছিলেন। বিপ্রদাসের গৌরাঙ্গ দেবের প্রতি অভিমান না থাকিলে এমন ঘটনা কখনই ঘটিত না। বিগ্রহ কখনই স্থানান্তরে লইয়া যাইতে দিতেন না। অন্যত্র যাজিপুর ও শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে নৃসিংহ দেব ও বিজয়কৃষ্ণের গমনের উল্লেখ আছে।—

"যে যে মহান্তের আগমন যথা হৈতে।
গ্রন্থ বাহুল্যার্থে তাহা নারি বিস্তারিতে ॥
নাম মাত্র কহি অতি উল্লাস হিয়ায়।
যে নাম শ্রবণে ভক্তি-রত্ন লভ্য হয় ॥
কুমুদ গৌরাঙ্গ দাস দুঃখীর জীবন।
নৃসিংহ চৈতন্য দাস দাস বৃন্দাবন ॥
বনমালী দাস ভোলানাথ শ্রীবিজয়।
শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয় ॥"

(নবম তরঙ্গ ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

এখানেও দেবীদাস বা বিপ্রদাস কাহারও গমনের উল্লেখ নাই। অনুমান, দেবীদাস তখন জীবিত ছিলেন না। বিপ্রদাসও স্থবির বৃদ্ধ অথবা তিনিও মৃত, সেই জন্য গমন করেন নাই, পুত্র বিজয়কৃষ্ণ উপযুক্ত দেশ বিখ্যাত গায়ক, তিনিই সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতেন। সুতরাং তখন যে দেবীদাস জীবিত থাকিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পরিকর ভাবে খোল বাজাইতেন ইহা অসম্ভব। রেণিটির পদকর্ত্তা বিপ্রদাসের পিতা বিজয়কৃষ্ণের পিতামহ দেবীদাস ও শ্রীল নরোত্তম প্রভুর পরিকর দেবীদাস এক ব্যক্তি নহেন। বোধ হয় আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, ইহাতেই পাঠক মহাশয়গণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে খেতুরের মহোৎসবে স্পষ্টপদ রেণিটির পদ নহে; খেতুরের পদ ও রেণিটীর পদ ভিন্ন। পরিশেষে আর একটি মাত্র অবশ্য বক্তব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সপরিশিষ্ট আমার এ অযোগ্য প্রবন্ধের উপসংহার

করিতেছি। হিন্দু স্কুলের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার সুকণ্ঠ গায়ক যিনি সমস্ত রকম কীর্ত্তনের পদ আলাপ করিতে ও বিশুদ্ধ তাল লয়ের সহিত গাহিতে পারেন, রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুর, যাহার সাহায্য না পাইলে আমার এ প্রবন্ধ প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না, এবং দেবীপুর নিবাসী সেই সুদক্ষ গায়ক পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সিদ্ধান্ত শিরোমণি মহাশয়দ্বয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে খেতুরের মহোৎসব কালে নরোত্তম ঠাকুরের সৃষ্টপদের নাম গড়ের হাটী বা গরাণহাটী, রেণিটী নহে। বর্দ্ধমান দেবীপুরই রেণিটী পদের জন্ম-স্থান। গড়ের হাটী বা গরাণহাটী এবং রেণিটী উভয় পদই উচ্চাঙ্গের পদ। কিন্তু সুর লয়ে প্রভেদ অনেক! কীর্ত্তন গানের মধ্যে রেণিটীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাল লয়ের গান; গড়েরহাটী রেণিটী অপেক্ষা ছোট তাল ও লয়ের গান, গড়ের হাটী গান অনেকেই আদায় করিতে পারেন, কিন্তু রেণিটীর পদ আদায় করিতে হইলে কীর্ত্তন সঙ্গীত শাস্ত্রে দস্তর মত দখল থাকার প্রয়োজন।

এখন বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে খেতুরের পদ ও রেণিটির পদ ভিন্ন। খেতুরের সৃষ্ট পদের নাম গড়ের হাটি বা গরাণ হাটি; পদকর্ত্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর; এবং বর্দ্ধমান দেবীপুরে সৃষ্ট পদের নাম রেণিটি, পদকর্ত্তা সদ্গোপ বংশজ স্বর্গীয় বিপ্রদাস বিশ্বাস ও তৎপুত্র বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস। ইতি—

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

বৈষ্ণব মহা-সম্মিলন

(৩)

কবিরাজ বৈষ্ণবসমাজের, বৈষ্ণবসাহিত্যের ও চৈতন্য-লীলার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা রাফেলের চিত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী আজও এই বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবির ভক্তিকাব্য সম্যগ-ভাবে উপলব্ধি করে নাই। ঐতিহাসিক ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ব্যাপার জানিতে পারিবেন, ভক্ত ভক্তিজীবনের ক্রমিক বিকাশ দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইবেন, সমাজতত্ত্ববিৎ সে সময়ের হিন্দু সমাজের অবস্থাদি দেখিয়া আপনার সমাজে শক্তির হীনতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। নবমবর্ষ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া "কবিরাজ" গ্রন্থ সমাপন করিয়া গোস্বামীদের হস্তে সমর্পণ করেন।

গোস্বামীগণের অনুমোদিত হইলে তাহা অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সহিত প্রচারার্থে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামৃতের ভাবী যশোপ্রভার কণিকামাত্রও কবিরাজ জানিয়া যাইতে পারেন নাই। কবিরাজ আপনগ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। চরিতামৃতের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১। আদি খণ্ডে ১০ পরিচ্ছেদে ২৫০০, মধ্যখণ্ডে ২৫ পরিচ্ছেদে ৬০৫১ অন্ত্যখণ্ডে ২৮ পরিচ্ছেদে ৬৫০০। এই পুস্তকে ৬০খানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী বৈদ্যবংশসম্ভুত। বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ, মাতার নাম সুনন্দা। শৈশবে মাতা পিতার অভাব হইলে সংসার বিরাগী হইয়া ব্রজধামে গমন করেন এবং সেইখানেই সমাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পরিশেষে এই প্রামাণিক শ্লোকটী আছে বলিয়া অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাংগতঃ॥

এই তারিখ নানা কারণে ঠিক নহে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পরবর্ত্তী কালের কোনও লিপিকর তাহার প্রতিলিপিতে ইহা যোজনা করিয়া তাঁহার নকলের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে! বৃন্দাবন দাস, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতির জীবন, এই তারিখ চৈতন্যচরিতামৃতের পরিসমাপ্তি ধরিলে অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে সে বৃদ্ধ বয়সে আর কর্ম্মশক্তি থাকে না, কেবলমাত্র বৈরাগ্যের উপাসনা চলিতে পারে।

এই চৈতন্য-চরিত পরিসমাপ্তির পর ব্রজবাসী গোস্বামীগণ সমবেত হইয়া গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থে গ্রন্থ প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের প্রতি এই ভার অর্পিত হয়; একাদশ জন রক্ষী সহ গোশকটে গ্রন্থরাজী পরিপূর্ণ করিয়া ত্রিবৈষ্ণব মূর্ত্তি শুভক্ষণে গৌড়াভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য সেই মহাদিন বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থান পায় নাই।

লোকনাথ গোস্বামী ধ্যানস্তিমিত চক্ষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন নরোত্তমের জীবনের গতি অন্য পথে। তপোবনের তপশ্চর্য্যায় তাঁহার জীবনের সমাধি হয় তাহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। তাই তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে

ফিরিয়া যাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আপনার চরিত্রবলে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে আদেশ দেন। নরোত্তমকে গৌড়ে প্রেরণ সম্বন্ধে ব্রজবাসী গোস্বামীগণের কি মন্ত্রণা হইয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে না পারিলেও আমাদের মনে এইমাত্র অনুমান আইসে যে, সে সময়ের বৈষ্ণব-সমাজ কতকগুলি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের কেহ পৃষ্ঠপোষক ছিল না। মোছলমান নৃপতিরা বৈষ্ণবগণের প্রতি অত্যাচার করিতেন। বৈষ্ণবগণ ছিন্নভিন্নাবস্থায় বঙ্গের নানাস্থানে পড়িয়াছিলেন। ইহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সেই পবিত্র ব্রজধাম হইতে এই ত্রি-দেবমূর্ত্তির অভিযান হইয়াছিল।

সে-কালে দেশের পথ ঘাটে চলাফেরা নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে দস্যু-ভয় ছিল। দেশের রাজা জমিদার অনেকেই এই দস্যুগণের সহায় ছিলেন। শ্রীনিবাসচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম যে সময়ে বনবিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত) রাজ্যে শকটপূর্ণ গ্রন্থরাজিসহ উপনীত হন, সেই সময় রাজা বীরহাম্বির বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। গৌড়াভিমুখগামী এই ত্রি-বৈষ্ণব মূর্ত্তি সহসা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গেল। শ্রীনিবাসচার্য্য এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি শ্যামানন্দকে নররোত্তমকে তাঁহার পিতৃ রাজ্যে পৌঁছাইতে নিয়োজিত করিয়া, ব্রজধামে এই গ্রন্থলুঠের সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

শ্যামানন্দও নরোত্তমকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্প-পূর্ণ লোচনে এই বলিয়া বিদায় দিলেন গ্রন্থ উদ্ধার যদি ভগবানের কৃপায় হয়, তবে আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত, তাঁহারা যেন ভগবানের কার্য্য করিতে কেহ বিমুখ না হন। ভগবান কি উদ্দেশ্যে এই বিপদ সংঘটন করিলেন আচার্য্য শ্রীনিবাস তাহা যেন যোগ-নেত্রে দেখিতে পাইয়াও তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন না। শ্যামানন্দ ও নরোত্তম কর্ত্তব্য সাধনে গৌড়ে রওনা হইলেন।

ব্রজধামে এই গ্রন্থ-চুরি সংবাদ পৌঁছিলে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। একে বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ, তাহাতে আবার শেষ জীবনের নবম বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল তাঁহার "প্রেম

সাগর” দস্যু হস্তে নষ্ট হইল, এ আঘাত কবিরাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহার কিছুদিন পর রাধাকুণ্ডে হরি বোল! হরি বোল! বলিতে বলিতে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন। একটী মহাপ্রাণ এই ভাবে আপনার ধর্ম্মজীবনের বিভূতি উত্তর কালের জন্য রাখিয়া বাঙ্গালী-যতি নামের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্যামানন্দ ও নরোত্তমকে বিদায় দিয়া শ্রীনিবাসচার্য্য গ্রন্থান্বেষণে বহির্গত হইলেন। এদিকে রাজা বীর হাম্বিরের দস্যুগণ গ্রন্থ-রত্নের ভারগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে,

“সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির।
বার বার প্রণময়ে ভূমিতে পড়িয়া।
রাজা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া॥
রাজা কহে একি হৈল আমার অন্তরে।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে॥
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল।
ভক্তি দেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল॥ [নরোত্তম বিলাস]

বিধাতা কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য সাধন করেন, মানব আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার বিচার করিতে যাইয়া আরও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া থাকে। অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আছে আমরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবল হা! হুতাশ করিয়া মরি।

পরদিন শ্রীনিবাসাচার্য্য রাজা হাম্বিরের রাজ সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় শ্রীনিবাসচার্য্য শোকে বিহ্বল, জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, বজ্রাহত তরুর ন্যায় তিনি নিস্পন্দ। সে সময়ে সেই সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সেই দেবকান্তি ভক্তবীরের তেজঃপূর্ণ বাহ্যাকৃতি দেখিয়া বীর হাম্বির ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সেই রাজ সভায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আগন্তুকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। অসহ্য দুঃখভার-কাতর শ্রীনিবাস কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া কেবল বলিলেন, “ভাগবত পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।” পরম ভাগবত সেই দুঃখের সময়েও ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া সকল ভুলিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতে

ছিলেন। আগ্নেয় পর্ব্বতের বক্ষে যেমন অলক্ষিতে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, আচার্য্যের হৃদয়েও তখন তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভক্তির অগ্নি বিধূমিত হইতেছিল। আচার্য্য সেই মহাশঙ্কট মুহূর্ত্তেও আত্ম সহিষ্ণুতা বলে ভক্তি স্রোতে না ভাসিয়া অচল অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার আগমনে স্বর্গীয় ভাবে সেই দস্যু-রাজ-সভা পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ভাগবৎ পাঠ আরম্ভ করিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তি মাথা কণ্ঠে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে সমুদয় বর্ণস্থান হইতে সমানভাবে উচ্চারিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যের মুখে মূল ব্যাখ্যা যে ভাবে উচ্চারিত হইয়া প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বীর হাম্বির ও ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ দাস্য ভাবে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রেমাশ্রুতে সভা ভাসিয়া গেল। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে বনবিষ্ণুপুর বিভাসিত হইয়া স্বর্গীয় শোভা সম্পদ ধারণ করিল, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তীর্থ যাত্রীর বিভীষিকা বনবিষ্ণুপুর হইতে তিরোহিত হইল। পরে,

শ্রীনিবাসচার্য্য বনবিষ্ণুপুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীর হাম্বিরে ॥
গ্রন্থ রত্ন দিয়া রাজা লইলা স্মরণ।
গোষ্ঠী সহ হৈল মহাভক্তি পরায়ণ ॥

এইরূপে লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া নরোত্তমের আবাসভূমি খেতুরি ও ব্রজধামে শ্রীনিবাসচার্য্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ব্রজের গোস্বামীগণের অপহৃত গ্রন্থাদি প্রচারের জন্য উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইল।

এদিকে শ্যামানন্দ ও নরোত্তম গৌড়ে আসিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণব মোহান্তগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ব্রজধামের সংবাদাদি প্রচার করিলেন। তাঁহাদের আগমনে ম্রিয়মান বৈষ্ণব সমাজ যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। নরোত্তমের সহিত জাহ্নবী ঠাকুরাণীর যে কথোপকথন হইয়াছিল কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাহা গোপন রাখিয়াছেন। নির্জ্জনে উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কবি এই মাত্র বলিয়াছেন। এখান হইতে নরোত্তম শ্যামানন্দের সহিত স্বীয় রাজধানী খেতুরী অভিমুখে গমন করেন।

গ্রন্থোদ্ধারের পর শ্রীনিবাসাচার্য্য বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এখান হইতেই পুনরায় ব্রজধামে গমন করেন। এ গমনের উদ্দেশ্য কি, কবি নরহরি তাঁহার চরিতাখ্যানের কোনও স্থানে কিছুই বলেন নাই।

শ্রীনিবাসচার্য্য ব্রজধামে যাইবার পর গোস্বামীগণ পুনরায় তাঁহাকে আরও কিছু গ্রন্থ দিয়া পুনরায় গৌড়ে প্রেরণ করেন। এ যাত্রায় তাঁহার সঙ্গে চারিজন মাত্র অনুযাত্রী বা রক্ষী ছিল। শ্রীনিবাস পথে যেখানে যেখানে বৈষ্ণবের পাঠ আছে সেই সেই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া খেতুরীতে উপস্থিত হন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্যামানন্দকে উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করেন।

নরোত্তম শ্যামানন্দের সহিত যখন স্বীয় রাজধানী খেতুরীতে উপস্থিত হন সে সময় গোপালপুর রাজ্যের সিংহাসনে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ-দত্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। সন্তোষদত্ত তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। নরোত্তম বুদ্ধদেবের ন্যায় আপন পিতৃব্যকুলের সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময়ের বৈষ্ণব সমাজের প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিভ্রমণের পর আপন ভক্তি-জীবনের উদাহরণে সকলকে মুগ্ধ করিয়া খেতুরীতে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাসচার্য্য ও ব্রজের গোস্বামীগণের নরোত্তমকে স্বধামে প্রেরণ সম্বন্ধে কি মন্ত্রণা হইয়াছিল অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারি নাই। কেবল বুঝিতে পারিয়াছি যে আদর্শ মহাপুরুষ শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য কোনও মহাকার্য্যে নরোত্তমকে গৌড়ে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই ত্রিমহাশক্তি একত্রে পরামর্শ করিয়া খেতুরীতে "ষড়বিগ্রহ" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিখিল বৈষ্ণবসমাজকে খেতুরীতে আহ্বান করিয়া এক বিরাট বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের উদ্যোগ করেন। ব্রজবাসী গোস্বামী প্রভুদের ইহাই বুঝি অভিপ্রায় ছিল। ভগবান তাঁহাদের সে সদিচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

এই মহা সম্মিলন শ্রদ্ধা ও ভক্তি-মুগ্ধ রাজা সন্তোষ দত্ত মহানন্দে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে নিখিল বৈষ্ণব-গণের সমাবেশ দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া নরোত্তমের এই ষড়বিগ্রহ স্থাপনের শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় অত্যল্প কালের মধ্যে এই বিরাট অধিবেশনের যাবতীয় দ্রব্য একত্র হইলে সন্তোষদত্ত তৎসমুদয় শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্যকে দেখাইলেন। তাঁহারাও উদ্যোগ আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া মহাধি-বেশনের দিন স্থির করিতে ব্যস্ত হইলেন।

এই দিন স্থির হইবার পূর্ব্বে এক অদ্ভুত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। নরোত্তম গৌড়ের যাবতীয় পীঠস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, আপন আবাসে ফিরিয়া আসিয়া, "কেমনে সেবা সৃজন" করিবেন দিবানিশি কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁহাকে বলিতেছেন :—

ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্ব্বেই আছি যে ধাতু বিগ্রহ হইয়া॥
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি ধনবান॥
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা হয়।
তথা কেহ যাইতে নারে মহা সর্প ভয়॥
তাহার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি॥
পুনঃপুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈল অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥ [নরোত্তম বিলাস

এই নির্দ্দেশানুযায়ী নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীর অতি সন্নিকটে এক গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে বহু লোক তামাসা দেখিতে গিয়াছিল। সেই গৃহস্থ, মহাজনসঙ্ঘ তাহার বাড়ীতে সহসা উপস্থিত দেখিয়া মহা ভীত হইল। কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিল, তাহার ধান্যের গোলার মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আছে। তাহাই উদ্ধার করিতে রাজেশ্বর তাহার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। করপুটে গৃহস্থ নৃপসন্নিধানে জানাইল, গোলা সর্পে পরিপূর্ণ, সর্প-ভয়ে কেহ তাহার সন্নিকটে যাইতে পারে না। কত শত ওঝা ও মাল বৈদ্য সে আনাইয়াছিল কিন্তু কেহই সে সর্প ভয় দূর করিতে পারে নাই। নরোত্তম কাহারও কথা শুনিলেন না। তাড়াতাড়ি সেই গোলার দ্বার মোচন করিলেন সর্পগণ তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ণ করিল কেহ দেখিতে পাইল না! গোলার দ্বার মোচনমাত্র সর্ব্ব সাধারণের নয়নপটে প্রতিফলিত হইল :—

প্রেমাবশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥

ঝল মল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোন স্থানে ॥
হস্ত প্রসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে।
চমকি বিদ্যুৎ প্রায় সামাইলা কোলে ॥
দেখি সর্ব্ব লোকের হইল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার। [নরোত্তম বিলাস

এইখানে গৌরাঙ্গের অবতার-বাদ বৈষ্ণবসমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা পাইতে পারেন, দ্বাপরের অবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পূজা হইতে পারে, কলির পঞ্চদশ শতাব্দীর অবতার পূজা পাইবেন না কেন? গৌরাঙ্গের "অবশেষ পাত্রী" নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তান, বৈষ্ণব বেদব্যাস বৃন্দাবনদাস লেখনীর প্রভাবে অবতার-বাদ স্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয় গোস্বামীদের মন্ত্রণায়, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রতিভায় উত্তরবঙ্গ খেতুরীতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মনাট্যের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিয়াছে।

শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্তির পর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর উৎসবের বা মহাসম্মিলনের দিন স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বিবেচনার পর নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্যকে জানাইলেন ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনেই উৎসব হইবে। আচার্য্যও সেই দিন স্থির করিলেন। দিন স্থির হইবার পর দেশে দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল, তাঁহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। কেবল মাত্র বলিয়াছেন:—

শ্রীগৌড় মণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলেন তথা তথা ॥
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা ॥
সর্ব্বত্র লিখন পাঠাইয়া হর্ষ মনে।
না জানি কি মহাশয় করিলা নির্জ্জনে ॥ [নরোত্তম বিলাস

এই প্রকারে নিমন্ত্রণ শেষ হইলে, দেশে বিদেশে খেতুরীতে মহোৎসবের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। লোকমুখে কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী সেই সময়ের উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও লৌকিক ধর্ম্মের অবস্থা এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন:—

এদেশের লোক দস্যু কর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন ॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ-মেষ-মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে ॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায় ॥
সভে স্ত্রী-লম্পটজাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয় কদাচিত ॥
ওহে ভাই কৈলা ইথে সুদৃঢ় বিচার।
নরোত্তম করিব এ সবার উদ্ধার ॥

* * *

লইয়া বিবিধ দ্রব্য মহাকুতুহলে।
শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র আইসে সকলে ॥ নরোত্তমবিলাস

বঙ্গদেশে এই সময়ে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। তান্ত্রিকেরা মদ্য-মাংস প্রভৃতির সাহায্যে সাধনা করিতেন। না বুঝিয়া তান্ত্রিকধর্ম্মের সাধনায় লোকের চরিত্র কতদূর জঘন্য হইতে পারে, কবি তাহারই একখানা চিত্র উজ্জ্বলভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। উদ্ধৃতাংশের কোনও সমালোচনা প্রয়োজন করে না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ বঙ্গদেশে চিরকালই আছে। উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম চৈতন্যের সময় স্থান পায় নাই। নরোত্তমঠাকুর সর্ব্ব-প্রথম "খেতুরি" গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোথায়ও বৈষ্ণবমহাসম্মিলন হয় নাই। আত্মত্যাগী জীবহিতব্রত বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণবগণ আপনাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারায় জাতীয় উন্নতির যে মহাধ্বজা খেতুরীতে উত্থিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবতার-বাদের বাহুল্যতায়, বিষয়সুখসলিলে জ্ঞানসাধন ভাসাইয়া দেওয়ায়, অল্প-কালের মধ্যে ভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের সাধারণ লোকমধ্যে এই ধর্ম্মোন্মত্ততায়, লেখাপড়ার যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালীজাতির উন্নতিতে আজ বিংশশতাব্দীর ভারতবাসী স্তম্ভিত। যে ধর্ম্মজ্ঞান সাধারণ লোকের বাঙ্মানসেগোচর হইয়া ইতর শ্রেণীর লোকের

মধ্যে অন্ধভক্তির জটিল আবরণে আবদ্ধ ছিল, তাহাই এই বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের কৃপায় লোকশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেয়। সেই শিক্ষার ফল, কলিযুগের নবগায়ত্রী, শাক্ত বৈষ্ণব আপন আপন বিদ্বেষ ভুলিয়া, অনন্ত উদ্দেশ্যে দেহমনপ্রাণ উধাও করিয়া গাইয়া থাকে। সে নামে ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল একবারে ভেদাভেদ ভুলিয়া একত্রে মিশিয়া যায়, সেই নাম সমগ্র বঙ্গভূমিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার বীজমন্ত্রস্বরূপ, সেই অষ্টবিধসিদ্ধির একমাত্র অধিকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইয়া বঙ্গভূমিকে পাবন করিয়াছিল—বাঙ্গালা সেই নাম ভুলিয়া আবার বৈষম্যমধ্যে আত্মহারা হইয়া সকল জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

কর্ম্মবীর সাধু নিত্যানন্দ দাস !

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই অবতারবহুলযুগে আর একটী নূতন অবতারের অবতারণা করিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই, তাই সাধু নিত্যানন্দ দাসের ধর্ম্মজীবনী প্রকাশ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করি নাই। ভগবৎকৃপায় মানুষ যে যথার্থই কত উন্নতি করিতে পারে সাধুর জীবনী আলোচনায় আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

শ্রীশ্রীরাধারমণ দাস দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে নিত্যানন্দদাসের জীবনে এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হয়। অনুতাপই ধর্ম্মজীবনলাভের প্রথম সোপান। অনুতাপের অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়সিংহাসনই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভগবদ্‌কৃপায় মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তিনি বর্ত্তমান জীবনের অন্তরালে এক অপূর্ব্ব শান্তিময় জীবনের আদর্শলাভ করিলেন। এই পাপময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যময় জীবনলাভের জন্য তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে নিজেকে তৃণ হইতেও হীন মনে করে সেই হরিনাম কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত। "Blessed are the poor in spirit for thiers is the kingdom of Heaven"—দীনাত্মারা ধন্য কারণ তাঁহারাই স্বর্গের অধি-

কারী। দীনতাই ভগবৎলাভের প্রধান উপায়; যাহার হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ জাগিয়াছে সে নিজেকে দীন হীন কাঙাল বলিয়া মনে করে। নিত্যানন্দদাসের জীবনে এই ভাবটী যে কিরূপ প্রবলভাবে আসিয়াছিল তাহা তাঁহার সেই সময়কার দুই একটী রচনা হইতে বুঝা যাইবে—

"নরকের অতি হীন ঘৃণ্য কীট আমি
সতত বাসনা প্রাণে
আপনারে সংগোপনে
রাখিতে জগতমাঝে অতীব যতনে।
প্রকৃত আমি গো যাহা
না চাই দেখাতে তাহা
প্রতারণা মূলমন্ত্র হয় মোর প্রাণে।
আমার এ নগ্ন প্রাণে
ধরমের আবরণে
সতত আবরি রাখি ভুলাতে সংসার।
প্রতিষ্ঠার তরে দয়া
ভালবাসা স্বার্থছায়া,
খ্যাতির আশায় দান জানিও আমার।
দেখে যদি কেহ প্রাণ
দেখিবে এ মূর্ত্তিমান
দয়াহীন স্বার্থময় পিশাচের স্বামী
নরকের অতি হীন ঘৃণ্যকীট আমি।"

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের তীব্র অনুতাপ কবিতাটীতে মুর্ত্তিমান হইয়া বাহির হইয়াছে। আমি যে অতি হীন, অতি ঘৃণ্য, আমি কি ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারিব! আমার ত সে শক্তি নাই। সাধনার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মশক্তিতে নির্ভর নাই, তাই আত্মসমর্পণ করিলেন।

কি হবে কি হবে গুরো কি হবে আমার
নাহি মোর শ্রদ্ধা ভক্তি
নাহি মোর কোন শক্তি
ভবের সম্বল মোর শুধু পাপ ভার।

মরুভূমি কামনার
কেমনে হইব পার
চিদানন্দে যাব ডুবে অতলে প্রেমার
এক মাত্র আশা মোর
শ্রীগুরুর চরণ সার
লয়েছি শরণ যায় হইয়ে কাতর
দিও প্রভু পায়ে স্থান বাঞ্ছা এই মোর।

ইহার পর হইতে শ্রীগুরুদেবের সেবাতে, তাঁহার আদেশ পালনে, তাঁহার সাধনায় জীবন ঢালিয়া দিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ দাস মহাশয় সর্ব্বদাই নিত্যানন্দ দাসের সহিত থাকিতেন। তাঁহারই একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপায় নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এত শীঘ্র জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই নবদ্বীপ দাস বীরভূমির পাঠকগণের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। "আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথায়" তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই হইবে যে তিনিও তাহার শ্রীগুরুদেবের মত একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জীবনে ভগবৎকৃপালাভ করিয়া বিশ্বসংসারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্ব-সংসার প্রত্যক্ষ করিতেন। জগতের ঘৃণ্য পতিত ও বিলাসসাগরে নিমজ্জিত ঘোরতর সংসারীদের মধ্যে "নাম" প্রচার করাই নবদ্বীপদাসের প্রধান কার্য্য ছিল। তাঁহার নিঃসঙ্কোচভাব, শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ও আনন্দময় হাস্য সকলকেই মুগ্ধ করিত।

এই সময়ে জীবনে শেষবার নিত্যানন্দ দাস এক প্রলোভনে পতিত হয়েন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় তাঁহার প্রবৃত্তি একবার তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া প্রবল হইয়া উঠিল। রাত্রে তিনি নবদ্বীপদাস নিদ্রাগত হইলে গোপনে উঠিয়া আসিতেন, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিতার দ্বারদেশে পৌঁছিয়াই দেখিতেন "নবদ্বীপ দাস" পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন। এইরূপে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত। একদিন নিত্যানন্দ গোপনে আসিয়া তাঁহার প্রণয়িনীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় বাহির হইতে নবদ্বীপদাদা ডাকিলেন "ওরে, পুলে! আমায় একা ফেলে এলি কেন? দুয়ার খোল আমার বড় ভয় করেছে।" সেই দিবস হইতে স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্যরূপ হইয়া গেল এবং মহাপুরুষের কৃপা

লাভ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীও ধন্যা হইলেন। এই প্রলোভনের সহিত যে নিত্যানন্দদাস সংগ্রাম না করিয়া একেবারেই ইহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এমন নয়। এই সময়ে তাঁহার মনে তীব্র অনুতাপ হইতেছিল। এই দুর্ব্বলতা কিছুতেই জয় করিতে না পারিয়া তিনি দেবতার শরণাপন্ন হইলেন।

নমামি মদনরাজ বন্দি শ্রীচরণ,
ক্ষম ক্ষম অভাগায় লইনু শরণ।
দেবাদি-গন্ধর্ব্ব চয়
সদা পরাভূত হয়
অসীম বিক্রমে তব আমি ছার নর,
কেমনে সহিব বল তব শঙ্ক শর॥
সুজন কুজন আদি সকলেই করে
শরণাগতেরে ক্ষমা এবিশ্ব সংসারে॥
এবিশ্ব সংসার মাঝে
তোমার খেয়াতি আছে
দেবতা বলিয়া দেব! তুমি সুনিশ্চয়
এ দীন শরণাগতে ঠেলিবে না পায়।

* * *

রক্ষ প্রভু রক্ষ রক্ষ এই অভাগায়
তব কৃপা ভিন্ন মোর গতি নাহি হায়
আমার যে ছিল রাজা
এবে সেই তব প্রজা
মন মোর বিমোহিত মায়ায় তোমার
তুমি তারে না ফিরালে কে ফিরাবে আর।
গুরুত্বে বরণ আজ করিনু তোমায়
সত্যপথ দেখাইয়ে দাও গো আমায়
বলে দাও মোর মনে
বিলাস বাসনাগণে
লক্ষ্য নহে জীবনের নাহি শান্তি তায়
কাম সুখহেতু নয়, শুধু শূন্যময়।

বুঝায়ে ফিরায়ে দাও মনেরে আমার
আলোক দেখাও তায় হ'তে অন্ধকার
নিতাই গৌরাঙ্গ নামে
শিখাও করিতে কামে
কাম্যবস্তু সেই মাত্র জগত সংসারে
সেই কাম শান্তিময় প্রেম'নাম ধরে॥

শ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস দেব মিরজাপুর ষ্ট্রীটে একটী "মঠ" করিবার সম্পূর্ণ ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কে অর্পণ করেন। "মঠ" নামে অভিহিত হইলেও সেখানে কেবলমাত্র শ্রীবিগ্রহের সেবা হইত না। অনেক অসমর্থ ছাত্রকে বেতন দেওয়া হইত এবং অসহায় রোগীর সেবার ব্যবস্থা ছিল। এই মঠের সমস্ত ব্যয়ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কেই বহন করিতে হইত। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের সাধ্যমত সাহায্যসত্ত্বেও নিত্যানন্দ দাস ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই ঋণমুক্ত হইতে তাঁহাকে নিজের বিষয় সমস্ত বিক্রয় করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন 'আমার ধনী বলে যে অহঙ্কার ছিল, বাবাজি মহাশয় এইরূপে আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন।" বাবাজী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার যে অসীম বিশ্বাস ও ভক্তিছিল ইহা হইতে তাহার সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। আর একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাবাজী মহাশয় তখন বরাহনগর বাগানে ছিলেন, একদিন সহসা তিনি ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, নিত্যানন্দ দাস সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অমনি বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং আগ্রহাতিশয্য ভাড়াটীয়া গাড়ী করিতে পাছে বিলম্ব হয় মনে করিয়া, সেখান হইতে দৌড়িয়া বউবাজার চলিয়া আসিলেন. ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেছেন এমন সময় স্বয়ং বাবাজী মহাশয় আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "তুই ছুটে চলে গেলি পুলে।"

বাবাজীমহাশয়ের আদেশক্রমে "মঠ" উঠাইয়া দিবার পর তিনি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। মধু গব্যঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রত্যেক একছটাক পরিমাণ, অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চরু প্রস্তুত করিতেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে

তাহাই আহার করিয়া একটী নির্জ্জন কক্ষে সমস্ত দিবারাত্র একা থাকিতেন। ছয়মাস এইরূপ করিবার পরে চরু ছাড়িয়া প্রত্যহ বৈকালে একটী করিয়া বেল খাইতেন। একটী বেল হইতে অর্দ্ধখণ্ড বেল, পরে একটী পেয়ারা, ক্রমশঃ তিন চারিদিন পরে একদিন ঘর হইতে বাহির হইয়া সামান্য একটী কোন ফলমাত্র আহার করিতেন। এইরূপ কঠোরতার সহিত প্রায় দুই বৎসর সাধনা করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার এমন একটী অবস্থা আসে যে সময়ে গৃহের প্রত্যেক দেবদেবীর চিত্রপটের রীতিমত সেবা না হইলে তিনি ক্রন্দন করিতেন। নিত্যসেবার ভোগের সময় সে গৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। আচার ও নিয়মপালন এই সময়ে তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। এই অবস্থা তাঁহার বেশী দিন ছিল না। কঠোরতা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার পর তিনি সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও সদালাপ করিতেন কিন্তু নিজে অনেক কঠোর নিয়মও পালন করিতেন। ছয়মাস কোন জলীয় পদার্থ সেবন করেন নাই। কিছুদিন লবণ ও মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে সাধনমার্গে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন এইরূপ সময়ে শ্রীমৎ রাধারমণ দেব তাঁহাকে একদিন নবদ্বীপে ডাকিয়া পাঠাইয়া শ্রীধামে সেবাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন এবং শ্রীধামে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিলেন। নিত্যানন্দ দাসের বাবাজীমহাশয়ের প্রতি এমন অনুরাগ হইয়াছিল যে বাবাজীমহাশয় দেহরক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। বাবাজী মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া নিরস্ত করেন।

শ্রীমৎ রাধারমণ দেব অপ্রকট হইবার পর হইতে নিত্যানন্দদাসের সাধনা হইয়াছিল বিশ্বজগতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহাকে ও তাঁহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুকে দর্শন করা। এই সাধনায় তিনি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা সাধুর জীবনের প্রত্যেক ছোটবড় ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। নবদ্বীপে যখন প্রথম সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে একটী পাগল আশ্রমে আশ্রয় পায়। এই পাগল সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা মাখিয়া বসিয়া থাকিত এবং ঘরে কেহ প্রবেশ করিলেই প্রহার করিত। নিত্যানন্দ দাস ভিন্ন কেহই ইহার নিকট যাইতে পারিত না। তিনি স্বয়ং তাহাকে

প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া দিতেন ও বসিয়া আহার করাইতেন। একদিন এই পাগলকে আহার করাইতে করাইতে অশ্রুধারায় তাহার গাত্রবস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল। তাঁহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। একটী ছেলে পাগলের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহার নিমিত্ত দ্বারদেশে অপেক্ষা করিত। সে এই দৃশ্য দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আর একটী সেবককে ডাকিয়া আনিল। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিলেন যে পাগলকে খাওয়াতে তাহার স্পষ্ট মনে হইল বাবাজী মহাশয় বসিয়া খাইতেছেন। তিনি বাসায় সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুগত কোন যুবক আসিলেই অমনি আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া সদালাপ আরম্ভ করিতেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "ছেলেরা আসিলে আমার আনন্দ হয় কেন জান, ছেলেরা এলেই আমি বেশ অনুভব করি যে বাবাজী মহাশয় ছেলেদের রূপ ধ'রে আমার নিকট এসেছেন, নতুবা জগতে কেহ কি আর কাহাকেও আনন্দ দিতে পারে। ছেলেরা সব তিনি। দয়া ক'রে আমার কাছে আসেন।" একদিন কোন বিশেষ কারণে মন বড় চিন্তান্বিত ছিল, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় কৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক একজন গুরুভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে অনেক কথা বলিলেন। গুরুভ্রাতার প্রস্থানের পর সহসা সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন "দেখ্‌লি, বাবাজীমহাশয় এসে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করে গেলেন। আজ কৃষ্ণচৈতন্যদাসের রূপ ধরে এসে কৃপা করে গেলেন"।

বাবাজীমহাশয়ের অপ্রকট হইবার পর হইতে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ঐ কার্য্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন। কোন্ স্থানে অসহায় কোন্ ব্যক্তি অভাবে কষ্ট পাইতেছে, কোথায় পিতৃহীন যুবক অর্থাভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছে না এ সমস্ত খবর তিনি রাখিতেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতেন। মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, যে ভদ্রলোকের বাটী বাসা লইয়াছিলেন তাহার মালির কলেরা হইয়াছিল, যাহাদের মালী তাহারা কোন খবরই লইলেন না; কিন্তু নিত্যানন্দ দাস সংবাদ পাইয়াই সেই নিশ্বাসরোধকর ক্ষুদ্রকুটীরে প্রবেশ করিয়া তিন দিবস, রাত্রিদিন তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন। ঔষধের বাক্স লইয়া তিনদিন অনবরত তাহার শিয়রে বসিয়াছিলেন, যাহা কিছু সামান্য আহার করিতেন সেই খানেই বসিয়া। একটু সুস্থ হইয়াই মালী

বাটী যাইবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া, নিজব্যয়ে "ডুলি" ভাড়া করিয়া প্রায় পাঁচছয় ক্রোশ রাস্তা সেই ডুলির সহিত ছুটিয়া তাহাকে বাটী পৌঁছিয়া দিতে চলিলেন। সে দিন একাদশী, জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন না। সামান্য একটী মালীর জন্যও এত কষ্ট করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। মানুষের হৃদয়ের ত' কোন জাত নাই, সেই স্থানে ভগবান স্বয়ং আসিয়া মিলিত হন। মানুষের হৃদয়কে হৃদয় দিয়া দেখিতে পারাই সাধুর জীবনের একটী প্রধান মহত্ব ছিল। শোভারাম বসাকের ষ্ট্রীটে স্কুলবাটীতে একটী গরীব মাষ্টার ও তাহার স্ত্রী বাস করিত। মষ্টারের আর কেহই ছিল না। প্রায় ছয়মাস তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন, সংসারের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। একদিন সকালে নিত্যানন্দদাস ডাক্তার খগেন্দ্রলাল সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া দেবদূতের মত সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন হইতে সেই দরিদ্র সংসারের সমস্ত ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন। রোগীর সেবা হইতে সংসারের প্রত্যেক কাজটী তিনি নিজে করিতেন, যেন সেটি তাঁর নিজেরই সংসার। মাষ্টার মহাশয়ের মৃত্যুর পর সন্ধান করিয়া বিধবাকে তাহার আত্মীয়ের বাটী পাঠাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। এইরূপে কত অসহায় রোগীর জন্য তিনি যে তাঁহার পরম সুহৃদ সহৃদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল সেন মহাশয়ের সাহায্য লইয়াছেন, কতস্থলে যে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছেন "রোগী দিয়াছে" একথা যদি কেহ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে উক্ত ডাক্তারবাবুর নিকট সন্ধান লইতে পারেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে ৬।৭টী স্কুলের ছাত্র খাইয়া প্রত্যহ স্কুল ও কলেজে যাইত এবং কত ছাত্রের যে বেতন দিতেন তাহার সংখ্যা নাই।

সাধন পথেও তিনি ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিলেন, বিশ্বের মধ্যে তিনি বিশ্বনাথকে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, এবং বিশ্বনাথের মধ্যে সকলকে দেখিতে লাগিলেন। একদিন ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখনও ঠাকুরের ভোগ লাগে নাই। একটী ছাত্র আসিয়া বলিল যে তাহার আজ একটু শীঘ্র কলেজ যাইতে হইবে। তখনও "ভোগ সারিতে" প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব, কাজেই না খাইয়া কলেজ যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। নিত্যানন্দ দাস এই সংবাদ

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবতার মত যত্নের সহিত খাইতে দিলেন এবং বলিলেন যে আজ আর ঠাকুরের ভোগ দিতে হইবে না, ঠাকুর আজ ছাত্রের রূপে আসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি করায় তিনি এখন জোরের সহিত "আমি বল্‌ছি প্রসাদ হয়েছে" "আমি বল্‌ছি প্রসাদ হয়েছে" বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সকলেই নিসংশয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিল।

দামোদর জলপ্লাবনের সময় তিনি বন্যাপীড়িতের সাহায্যে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন এমন সময় সংবাদ আসিল তাহার সংসারাশ্রমের পুত্র মৃত্যুশয্যায়, এখনি যাইতে হইবে। পার্শ্বে যে সঙ্গীটী ছিল তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এটা হচ্ছে রাধারমণের পরীক্ষা, তিনি দেখ্‌তে চান আমি ঐ একটী ছেলেকে বেশী ভালবাসি কি আমার যে শত শত ছেলে বন্যায় কষ্ট পাচ্ছে তাদের বেশী ভালবাসি।" তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সাহায্যে চলিয়া গেলেন। প্রায় একমাস বাহিরে ছিলেন, ঐ সময়ের মধ্যে তিনি একবারও পুত্রের কথা বলেন নাই বা তাঁহার মনও কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সহকারীদের যত্ন ও আদরে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন, নিজে শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধায় রাখিতে একদিনও কুণ্ঠিত হন নাই। ভগবানে তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসই তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষত্ব। রাণাঘাটে কোন বন্ধুর বাটী একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। যন্ত্রণার ছটফট্ করিতে লাগিলেন, ডাক্তার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিলেন না। অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। এই যন্ত্রণার মধ্যেও হস্তস্থিত ক্ষুদ্র মালাগাছটীর বিরাম ছিল না (তিনি সর্ব্বদাই "নাম" করিতেন) মন হইতে অবিশ্বাসের ছায়াটুকুও দূর করিবার জন্য, "ইহা ভগবদ্ কৃপা" এই কথাটী বার বার সবলে বলিতে লাগিলেন। শারীরিক সুতীব্র যাতনার সময়ে যিনি মনে করিতে পারেন সে যাতনা ভগবদ্‌কৃপামাত্র তিনি যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া হৃদয়েশ্বরকে লাভ করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশ্রমে একবার ৪০০৲ টাকা বিশেষ প্রয়োজন হয়, সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও কোথাও কিছুই পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত নিশ্চিন্তভাবে গল্প করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতেই অর্থের প্রয়োজন, নতুবা বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আমাদের ব্যস্ত হইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কেন চিন্তিত হচ্ছ আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করেছি এখন যার কাজ সে চেষ্টা করুক। সে যেখান হতে পারে টাকা দিবে তোমার আমার ভাবনা নাই।" নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। আমার কোন বন্ধু এমন সময় তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আসিল। সে আমাদের নিকট ঘটনা শুনিয়া ৪০০্ টাকাই পরদিন প্রত্যুষে দিতে স্বীকৃত হইল। তখন তিনি বলিলেন "দেখ্‌লি, যার কাজ সে ঘরে ব'হে এনে টাকা দিয়ে গেল।" তিনি জীবনে ভগবদকৃপা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সঙ্গ করিলেই অনুভব করা যাইত। তাঁহার চতুর্দ্দিক হইতে ভালবাসা উছলিয়া পড়িত। "তুমি আপনার হতে হও আপনার" এই কথাটী সাধুর সম্বন্ধে নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যায়। যে সমস্ত যুবক তাঁহার সঙ্গ করিত তিনি তাহাদের সকলের আপনার হইতেও আপনার ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহার দীনতা অপার্থিব, সে দীনতা হীনতা নয়, সে দীনতার নিকট মাথা নত না করিয়া কেহ থাকিতে পারিত না, সে দীনতার মধ্যে যে দীপ্ত তেজ ছিল তাহা কোন দিন কোন কারণে খর্ব্ব হয় নাই। সাধুর সহিত বহরমপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে একবার যাইবার সৌভাগ্য এই দীনের হইয়াছিল। সেবাশ্রমের বার্ত্তা প্রচার করিতে যাওয়াই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কোন "সিদ্ধান্ত-সরস্বতী" নিত্যানন্দ দাসের নিকট তর্কদ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে সেবাধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়, এমন কি সেবা দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে পতিত হয়। সাধু ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন "আজ্ঞে আপনি যা বল্‌ছেন সব ঠিক।" সাধুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে "সিদ্ধান্তসরস্বতী" মহাশয়ের যুক্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেবলই তাহার অনুমোদন করিতে লাগিলেন। তাঁবুতে অনেক ভদ্রলোকের সাম্‌নে সাধুর এইরূপ ব্যবহার আমার ভাল লাগিল না। সরস্বতী মহাশয় শেষে যখন বলিলেন যে বৈষ্ণবের বিশ্বজগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, কেবল নির্জ্জনে বসিয়া ভজন করিবে তখন আমি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি নিজে এই সম্মিলনীতে তবে কি জন্য আসিয়াছেন। আমার মুখ হইতে এই কথা কয়টী সম্পূর্ণ নিসৃত হইবার

অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরে সরস্বতী মহাশয় চলিয়া যাইলে আমাকে আদর করিয়া কত স্নেহের কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন "উনি এসেছেন নিজের বিদ্যা প্রচার করতে, আমাদের উপদেশ দিতে। বেশ ত আমরা কেবল শুনে যদি একজনকে একটু সুখ দিতে পারি ত' তা না করি কেন? উহাকে তুমি যতই বোঝাও কেবল তর্ক হইত কারণ বুঝিবার ইচ্ছা উহার নহি। জগতে ত কাউকে সুখী করতে পারি না, একজনকে সুখী কর্‌বার এমন সুযোগ পেয়ে কেন ছাড়ি ভাই? আমার যদি মনে জোর থাকে ত পরের কথায় আমার কোন ক্ষতি হবে না। নিজে ঠিক থেকে যে যা বলে শুনে যাও।" নবদ্বীপে সেবাশ্রমের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে এমন সময় একটী বৃদ্ধ, সাধুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধুলি গ্রহণ করিলেন ও "আশির্ব্বাদ করুন আমার মনে যেন কখন প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা না আসে, আমি যেন ভুলে না যাই এটী রাধারমণের কাজ আমি তাঁর দাস" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি সকলের মনের ভাব বলিয়া দিতে পারিতেন এবং পশুপক্ষীও অনেক সময় তাঁহার আদেশ পালন করিত। অনেকদিন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে প্রশ্নটী করিব মনে করিয়া গিয়াছি সেই বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা আরম্ভ করিতেন। নবদ্বীপে একদিন অনেক লোকের সম্মুখেই ৭।৮ টী কুকুর তাঁহার কথামত খাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন ইহাতে মানুষের ভাল বা মন্দ হইবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সামান্য মনঃস্থির হইলেই যে কেহ এই সমস্ত করিতে পারে। কোন সাম্প্রদায়িক ভাব বা সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ছিল না। তিনি উদার প্রেমধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে এখন যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি জীবন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলের ঘৃণিত হইয়া সকলের পশ্চাতে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রার্থনাই ছিল

"বল প্রভু কবে মোর হবে সেই দিন

* * * *

সবাই করিয়া দয়া
আর না স্পর্শিবে কায়া
মোর প্রতি হবে কবে কৃপা সবাকায়"

*   *   *

কেহ রবেনা আমার
আমি হব সবাকার
কবে হবে হেন ভাব হৃদয়ে আমার
হইব সবার দাস
নাহি রবে অন্য আশ
কবে পাব পদরেণু শিরে সবাকার”

সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সকলের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে চলিতে এরূপ আগ্রহ আর কাহারও দেখি নাই। বৈষ্ণবের আদর্শ প্রেম, সেবায় মূর্ত্তিমান হইয়া বিশ্বে যে কি কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহা তিনি জীবন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রকৃত প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জনসেবার আদর্শ প্রচার করিয়া বৈষ্ণব সাধনাকে বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত ছিল।

শ্রীধামে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। অনেক সময়ে অনেক অভাবে পড়িতে হইয়াছে কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি বিচলিত হন নাই। কেবলই বলিতেন “যার কাজ সে করবে, সেই করে আমি নিমিত্ত মাত্র।” মাতৃমন্দিরের আদর্শ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সাধুর সম্মুখে স্থাপিত করেন। ব্যবসায়-লব্ধ বহুদর্শিতায় ডাক্তার বাবু আমাদের দেশে একটী মাতৃমন্দিরের অভাব অনুভব করেন এবং সোদরপম নিত্যানন্দ দাসকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। নিত্যানন্দ দাসেরও একান্ত ইচ্ছা যে এইরূপ একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নামিয়া আশ্রমে যাইতেছেন এমন সময় পথিপার্শ্বস্থ কানন হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং গিয়া দেখিলেন একটী সদ্যজাত সুকুমার শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া কে চলিয়া গিয়াছে। শিশুটীকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন এবং শীঘ্র মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির করিলেন। এই সমস্ত শিশু যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যক্ত হইতেছে, অসহায় ভাবে প্রাণ হারাইতেছে, তখন ঘরের কোনে বসিয়া মালা জপিয়া আর ধর্ম্ম হইবে না; মহাপ্রভু যদি এখন কোথাও থাকেন ত

এদের সঙ্গেই আছেন, তাঁকে পাইতে হইলে এদের আপনার করিতে হইবে। এই কথা তিনি তার সহচরদের বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর-সপ্তাহে সাধু আবার কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে নামিয়া আশ্রমে যাইতেছেন এমন সময় রাস্তার মাঝে আর এক বীভৎস্ দৃশ্য তাঁহার নয়ন গোচর হইল। একটী স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা হইয়াছে এমন সময় সে তাহার গৃহস্বামী কর্ত্তৃক নিতাড়িত হইয়া প্রকাশ্য রাস্তায় ক্রন্দন করিতেছে। তাহার দুই উরু বহিয়া রক্তস্রোত বহিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি একখানি গাড়ী করিয়া স্ত্রীলোকটীকে আশ্রমে লইয়া আসেন। "এইরূপে রাধারমণ আমার ঘাড় ধরে এই কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন" পরে এ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলেন। মাতৃমন্দির প্রথমে সেবাশ্রমেই হয় কারণ সে সময়ে অন্য বাটীর সন্ধান করিবার অবকাশ ছিল না।

মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে ও অনেক কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। সেবাশ্রমের ভার সে সময়ে সাধুর কয়টী গুরুভ্রাতার উপর ছিল। তাঁহারা প্রাণপণে সেবাশ্রমের সমস্ত কার্য্য করিতেন। রন্ধনকার্য্য হইতে রোগীর বিষ্ঠা পরিষ্কার পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজ হাতে করিতেন। কিন্তু যে দিন সেবাশ্রমে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইল সেই দিনই তাঁহারা সকলে একসঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করিলেন। যেখানে স্ত্রীলোক প্রসব হয় সেখানে থাকিলে বৈষ্ণবের ধর্ম্মহানি হয়। সাধুর পরিচিত অপরিচিত এমন কি তিনি যাহাদের পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি ও স্নেহ করিতেন এইরূপ সমস্ত বন্ধুরাও তাঁহার এই কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সংসারাশ্রমী অনেক বন্ধুও তাঁহার একার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিলেন না এবং পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে বলিয়া তাহার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সেবাশ্রমের অনেক সাহায্যকারী বন্ধু ইহাতে সেবাশ্রমে সাহায্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু সাধু কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত স্থিরভাবে তিনি এই কার্য্য করিয়া চলিলেন। তাঁহারই কোন গুরুভ্রাতা এই সময়ে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির বাবাজীমহাশয়ের অনুমোদিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখেন। পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা হইতে সাধুর আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইবে। আপন কলঙ্ক-কালিমা গোপন করিবার জন্য পুরীর কোন মোহান্ত একটী গর্ভনষ্ট করিবার

চেষ্টা করেন। বাবাজীমহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া সেই মোহান্তের পদে ধরিয়া এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন এবং সকলকে এই কার্য্য তাঁহারই অর্থাৎ বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে এই কথা প্রচার করিতে অনুমতি করেন। এবং সেই স্ত্রীলোকটীর সম্পূর্ণ ভার নিত্যানন্দদাসের উপর ন্যস্ত করেন। এই ঘটনা হইতে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির যে বাবাজী মহাশয়ের অনুমোদিত তাহা সপ্রমাণ করিয়া নিতানন্দ দাস মহাশয় লিখিয়া ছিলেন "মানুষের প্রয়োজন, একমাত্র প্রয়োজন প্রেম। প্রেমের ধর্ম্ম সাম্য; সমস্ত বিরোধের মধ্যে প্রেম সাম্য আনে। প্রেমে মিলায়, প্রেমে এক করে; আর এই একত্ব সম্পাদন হয় সেবায়।' ইহা শ্রীবৃন্দাবনলীলা অনুশীলনে বুঝা যায়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের প্রত্যেকটীর মূল সেবা। এই প্রেমের ধর্ম্ম যাজন করিতে সেবা করিব কাহার? উত্তর ইষ্টের। এই ইষ্ট কোথায়? গোলোকে, বা বৃন্দাবনে। যাঁহারা গোলোক বা বৃন্দাবনের অধিকারী, তাঁহারা নিজের চিন্ময় দেহে সেই নিত্যধামে নিজের ভাব অনুযায়ী সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দ আস্বাদন করেন। এই মর্ত্ত্যধামের কোন কার্য্যই তাঁহারা এ স্থূলদেহে করেন না সত্য, কিন্তু এরূপ মহাপুরুষদের ইচ্ছাশক্তি যে কত প্রবল তাহা লোকহিতার্থে ভগবান মানব দেহধারণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা, যাহারা শ্রীবৃন্দাবন বা গোলোক কি জানি না বা বুঝি না গোপীজনবল্লভ কেমন কখন আভাসেও দেখি নাই, আমরা সেবা করিব কাহার? শ্রীমূর্ত্তির। এই শ্রীমূর্ত্তি বলিতে কি বুঝায় আর শ্রীমূর্ত্তির সেবাই বা কি হইতে পারে? হিদুর শ্রীমূর্ত্তি নিত্যবস্তু তাহা কাঠ বা পাথরের নয়। তাহা ভক্তের ভাব ও ভগবানের প্রেমে গঠিত। আমাদের ন্যায় অনধিকারী এই শ্রীমূর্ত্তি সেবার উপযোগী হইতে পারে না। শ্রীমূর্ত্তির তত্ত্ব না বুঝিয়া, ভাবে ভাবিত না হইয়া, প্রেমে না গলিয়া, যাহাকে তাহাকে দিয়া সাধনার জন্য নয়, প্রাণের আবেগে নয়, ভব্যতা রক্ষার জন্য, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, দোকানদারীর জন্য শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। আমরা অধিকাংশই এখন শ্রীছাড়িয়া মূর্ত্তির, নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যের, সূক্ষ্ম ছাড়িয়া স্থূলের, spirit ছাড়িয়া matterএর সেবা করিয়া থাকি। সে সেবার ফল হইয়াছে আত্মতৃপ্তি, সে সেবার পরিণাম হইয়াছে ভগবানকে একটা প্রথা অনুযায়ী ভোগ দেখাইয়া বা ভোগা দেখাইয়া নিজের ও আপনজনের

উদরপূর্ত্তি। হিন্দুর যেখানে দেবসেবা বা শ্রীমূর্ত্তির প্রকৃত সেবার ব্যবস্থা সেই খানেই অতিথি অভ্যাগত, আহুত অনাহুত, ক্ষুধিত অসহায় নিরাশ্রয়ের সেবা। এই জন্যই মহাত্মা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
যেই জন সেবিছে মানব সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আমাদের এই আশ্রম মানবরূপী শ্রীভগবানের সেবার জন্য। ইহা Charitable dispensary নয়। ইহার দ্বারা আমরা অন্যকে কৃতার্থ করি না, আমরা নিজেরাই শ্রীভগবানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।" সাধুর এই পত্র হইতে তিনি যে কি প্রাণে সেবাশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যে কত উন্নত ছিলেন, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরে মাসিক প্রায় ৪০০৲ টাকা ব্যয় হইত। প্রতিমাসে সমস্ত টাকা তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নিয়মিত প্রার্থনা করিয়া বাহির হইতেন, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিতেন। আহার করিয়া নিয়মমত অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া বাহির হইতেন রাত্রি দশ ঘটীকার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এইরূপে দিবারাত্র ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা একদিবস আশ্রমের সমস্ত খরচ নিজে বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, পরের জন্য ভিক্ষা করা তাঁহার জীবনের পরম সুখ ও শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল।

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্নের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সে দিন রাত্রে অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া বলিলেন "আজ একটী মনের মত মানুষ পাইয়াছি আর সেবাশ্রমের জন্য কোন ভাবনা নাই, সেবাশ্রম চালাইবার মত একটী মানুষ পাইয়াছি।" ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা তাহার অনেকদিন হইতেছিল। ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সহিত পরিচয়ের পর তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নবদ্বীপে নিদাঘ বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ের কার্য্য তিনি সশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া সম্পন্ন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। মাঘমাসে নিত্যানন্দ উৎসবে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রতিবৎসর নানা স্থান হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর যাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প

হইলেও ভয়ানক বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হয়। আশ্রমে অর্থের অভাব হওয়ায় নিত্যানন্দ দাস কলিকাতায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন এমন সময় সংবাদ আসিল শ্রীধামে কলেরা হইতেছে। রবিবার সকালে বাসায় বসিয়া আছি এমন সময় সাধু আসিয়া উপস্থিত। আজই নবদ্বীপ যাইতেছেন, সেইজন্য দেখা করিতে আসিয়াছেন। হস্তস্থিত ব্যাগটী টেবিলে রাখিয়া চেয়ারে বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই আমায় ভালবাসিস্?"

"তা তুমি আমার অপেক্ষা ভাল জান।"

"তা নয় তুই আমায় ভালবাসিস্, না আমার এই দেহটাকে"?

"আমি তোমাকেই ভালবাসি"

"কাজের সময় মনে থাকে যেন! কোন কারণে মনে ভাবিয়াছিলাম মানুষ বড় দুর্ব্বল।"

"মানুষের মন দুর্ব্বল নয় মানুষ তাকে ইচ্ছা করে দুর্ব্বল করে" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইলেন।

রবিবার বৈকালে নবদ্বীপ আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার কোমল হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। রাস্তার দুইধারে বিসূচিকা রোগী পড়িয়া জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে। গাড়ী করিয়া শীঘ্র আশ্রমে আসিয়া শুনিলেন সরকারের হুকুম আশ্রমে কলেরা রোগী আনা হইবে না। "পথের দুই ধারে বাজারে লোকের বাটীর সম্মুখে যখন বহু রোগী পড়িয়া আছে, তখন আশ্রমে রোগী লইলে কোন ক্ষতি হইবে না" বলিয়া আশ্রমের অন্য রোগীদের কিছুদিনের জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া সমস্ত ঘর খালি করিয়া ফেলিলেন। রোগী আনিবার গাড়ী দিয়া সেবকদের একদিকে পাঠাইয়া দিয়া—নিজে অন্যদিকে চলিয়া যাইলেন। সেবকেরা গাড়ী করিয়া রোগী আনিতে লাগিল তিনি নিজে বুকে করিয়া রোগী আনিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত রোগীদের পরিষ্কার করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, আবার ছুটিয়া রোগী আনিতে যাইতেছেন। আহার নিদ্রা আর কিছুই মনে নাই, লোকের কষ্ট দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠাময় দুর্গন্ধে যাহার নিকট মনুষ্য যাইতে পারে না সেই সমস্ত রোগীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে কোলে করিয়া লইয়া আসিতে লাগিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনে যখন পিতা পুত্র ছাড়িয়া, ভ্রাতা ভগ্নী ছাড়িয়া, বন্ধু বন্ধু ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামী ছাড়িয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পালাইতেছে,

যখন আশার কথা বলিবার কেহ নাই, মৃত্যুকাতর মুখের প্রতি করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই, যখন নবদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ বিসূচিকা বীজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছে, দেশ হইতে পলাইতেছে, যখন গৌরাঙ্গধর্ম্মী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া ভগবৎ নাম কীর্ত্তন ভুলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া ছুটিতেছে, তখন ঐ কে যায় শান্ত সমাহিতচিত্তে, দুই হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিতে করিতে! নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে করিতে, আসন্ন মৃতের মৃত্যুযাতনা লাঘব করিতে করিতে, কাহারা যায় ঐ তাঁহারি পশ্চাতে, দেবতার পশ্চাতে দেবদূতের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে

"নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম"

কীর্ত্তন করিতে করিতে! কাহারা গো উহারা, আজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত রোগীকে বুকে তুলিয়া লইতেছে! এতশক্তি উহারা আজ কোথা হইতে পাইল! ঐ যে সম্মুখে দেবতা, ঐ দেবতার শক্তিতে আজ এই বালকেরা শক্তিমান! দেবতা না হইলে কি এই বিষ্ঠাময় দুর্গন্ধ রোগীকে চুম্বন করিতে পারে, দেবতা না হইলে কি বিষ্ঠা চন্দনে এমন সমজ্ঞান হয়? আত্মীয়ের, সমাজের, জগতের পরিত্যক্তের বন্ধু, ওগো শ্মশানের বন্ধু, ওগো দেবতা তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার!

স্নানাহার ও নিদ্রা বন্ধ করিয়া রোগীর সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ টী সৎকারও করিতে হইত। এই সমস্ত কার্য্য যে তিনি কিরূপে করিতেন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। রোগীরা সকলে তাঁহাকে দেখিলেই "সাধুবাবা" বলিয়া ডাকিত ও তাঁহাকে নিকটে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। নিত্যানন্দদাসের এই "সাধু" উপাধি (Alleged) নয়। জীবনের শেষ দিনে যাহারা তাঁহাকে "সাধু" বলিয়া গিয়াছে জগতে তাহারাই, কেবল তাহারাই, "সাধু" নির্ব্বাচনের একমাত্র অধিকারী। নিত্যানন্দদাসের সহিত কেহ দাঁড়াইয়া কথা কহিত না, কেহ দেখা করিত না, রোগীর অপেক্ষা লোকে তাহাকে অধিক ভয় করিত। নবদ্বীপের সুযোগ্য সহৃদয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন "আপনি নিজে যেরূপ সর্ব্বদা কলেরা রোগী বুকে করে আন্‌ছেন, আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা কইতে আমাদের ভয় হয়।" শুক্রবার সকালে একটী

সেবকের মনে পড়িল, নিত্যানন্দ দাস এই কয়দিন স্নানাহার করেন নাই, নিদ্রা যাইবার ত অবকাশই নাই। তাঁহাকে যখন এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "বল কি পাঁচদিন খাইনি তা ত' আমার মনেই নাই।" অথচ তিনি নিজে প্রত্যহ দাঁড়াইয়া সেবকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় সংবাদ আসিল একটী রোগী পড়িয়া আছে, আর আহার করা হইল না। সেবকদের আহার করিতে বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রোগীটীকে বুকে করিয়া আনিয়া তাহাকে পরিষ্কার ও তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তবে খাইতে বসিলেন। শুক্রবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তাঁহার প্রথম ভেদ হইল, বাহিরে আসিয়াই আর একটী সেবককে বলিলেন "আমার অসুখ করেছে" এবং অন্য একটী সেবককে ডাকিতে বলিলেন। আবার তখনি বলিলেন "না ডেকনা সে ঘুমুচ্ছে।" কিন্তু একটু পরেই সেই সেবকটী আসিয়া বলিল "দাদা তোমার জন্য বড় মন কেমন করছে।" সমস্ত রোগীদের দেখিয়া ঔষধ দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইয়া আসিয়া আর একবার ভেদ হইল। এই বার বলিলেন "তোদের দাদা আজ চলিল।" পরে লেঙটী পরিতে পরিতে বলিলেন "দেখ অসুখ করবে, তখনও লেঙটী আঁটবি আর কাজ করবি।" আবার সমস্ত রোগীদের দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার গুরুদেবের স্থান শ্রীরাধারমণ বাগে গেলেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সমাধি মন্দিরে উপাসনা করিতেন। বাগে আসিয়া ললিতা দিদিকে (ইনি একজন পুরুষ, সখী ভাবে ভজনা করেন) ডাকিয়া "দিদি আজ আমার পরম সৌভাগ্যের দিন, এ দিন জীবনে আর আসবে না। তুমি আমাকে "নাম" শোনাবার ব্যবস্থা কর" বলিয়া তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করিতে যাইলেন। তিন ঘণ্টা প্রার্থনা করিয়া আসিয়া বাহিরে বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিসূচিকা রোগী বলিয়া বুঝা যায় না। গুরুভ্রাতা বাটীতে তাঁহার পুত্রকে সংবাদ দিবার কথা বলায় তিনি বলিলেন "ওরে বলাই একা কি আমার ছেলে, সেখানে কত ছেলে আছে যারা আমাকে ভিন্ন আর কিছু জানে না, যাদের আমিই সব। তাদের খবর না দিয়ে বলাকে খবর দেব!" একজন গুরু ভ্রাতা ও অন্য দুইটী যুবক বন্ধুকে সংবাদ দিবার জন্য নিজে টেলিগ্রাম লিখিয়া দিলেন। এমন সময় ভাল ডাক্তার আনিবার কথা উত্থাপিত হইল। ইহাতে তিনি ঘোরতর

আপত্তি করিয়া বলিলেন "কই আমি ত আমার ছেলেদের ভায়েদের, কাউকে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারিনি তবে আমায় ভাল ডাক্তার দেখ্‌বে কেন ? যে ডাক্তার আশ্রমে রোগী দেখেছে সেই আমাকে দেখ্‌বে।" আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও তাঁহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। বেলা দশটার সময় হইতে শরীরে খাল্‌ ধরিতে লাগিল, কিন্তু এই শারীরিক যন্ত্রণা তাঁহার প্রসন্ন সুন্দর মুখে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই। তিনি সহাস্য মুখে বলিতে লাগিলেন "রাধারমণ আজ কৃপা করে জানিয়ে দিচ্ছেন, যাদের সেবা করেছি তাদের কি কষ্ট" এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ ঘরের কোন্‌ রোগীকে এখন কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সেবকেরা সকলে ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, অমনি তিনি তাঁহাদের বুঝাইয়া রোগীদের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন "ভাই আমার কাছে তোমরা সব কেন, এখানে থেকে ত কোন উপকার হবে না। তোমরা সব রোগীর সেবা কর্‌ছ এটা জান্‌লে আমি বড় আনন্দে থাক্‌ব।" সমান বসিয়া আছেন "শুলেই ত রোগী হয়ে যাব বসে গল্প করা যাক্‌," বলিয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। কয়েক জন ভদ্র লোক ডাকাইয়া সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন "Recklessly রোগীগুলা ঘেঁটে প্রাণটা হারালে কথা ত কাণে তুল্‌বে না" তিনি বলিলেন "ভাই এর চেয়ে আমার জীবনের অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছিল না। রোগীর সেবা কর্‌তে কর্‌তে সেই রোগ হয়ে মরা, ভগবদ্‌ কৃপা ভিন্ন হয় না। আজ Father Damien এর মত আমার জীবন ধন্য হল।" বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আর বসিতে পারিলেন না, বলিলেন "দিদি দেহটা আর বইছে না, কলিকাতা হতে ছেলেরা আস্‌ছে তারা সাতটার সময় আস্‌বে, তাদের সঙ্গে দেখা না করে আমার প্রাণ যাবে না, তবে যদি রাধারমণের এমন ইচ্ছা হয় যে তাদের সঙ্গে দেখা হবে না, তা হলে আমার এ দেহটা তাদের দিও এটাতে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার।" তাঁহার দেহের কি হইবে, এই সময়ে জিজ্ঞাসা করায় বলেন, "বৈষ্ণবের যে গতি আমার যেন সে সদ্গতি না হয়, আমি তার উপযুক্ত নই। আমি জীবনে বৈষ্ণবদাস হবার কাঙাল ছিলাম, আর আমার দেহ আজ সমাধিস্থ করে কাল যে ছেলেরা সেখানে পূজা আরম্ভ কর্‌বে, তা আমি পছন্দ করিনে। ছেলেদের বল্‌বে কোন গোল না করে যেন আমার দেহ গঙ্গাতীরে সৎকার করে।" জীবনে সকলের পশ্চাতে সকলের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য

করিয়া গিয়াছেন, আজ মৃত্যুর দ্বার দেশেও সে পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। নিজেকে প্রচার করিবার বাসনা তাঁহার মধ্যে কোন দিন বিন্দুমাত্র অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে ম্লান মুখে সন্ধ্যা নামিল। দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন কাঁদিয়া উঠিল। তাহার প্রতি চাহিয়া তাহার মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে করসঞ্চালন করিয়া তাহাকে "নাম" করিতে বলিলেন। সংবাদ পাইয়া পুত্র আসিয়াছিল, পিতার জন্য অনেক দ্রব্য আনিয়াছিল; একটু বরফ চাহিয়া লইলেন। পুত্রের হাত ধরিয়া আছেন এমন সময় আর একটী যুবক পাশে বসিল অমনি পুত্রের হস্ত ছাড়িয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। দেবালয়ে দেবালয়ে সান্ধ্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গের ধ্বনির সহিত কীর্ত্তনধ্বনিতে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুখে "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" উচ্চারণ করিতে করিতে, কর্ণে "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" নাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে সানন্দচিত্তে, প্রফুল্লমুখে সমস্ত দেশকে কাঁদাইয়া মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করিলেন। এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব হাস্যরেখা মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহারই আদেশমত নিঃশব্দে গঙ্গাতীরে, তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্ব্বগগনে একবার উদিত হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া মেঘের অন্তরালে চলিয়া গেলেন। গঙ্গাতীরের আর্দ্রবায়ু সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির হইয়া হাহা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গঙ্গাদেবীও যেন সাধুর চিতাভস্ম স্পর্শ করিতে জোয়ারে হস্ত বাড়াইয়া চিতাভস্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

যাও—দেব যাও চির আকাঙ্ক্ষিতের নিকট নিত্যধামে যাও। সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হইয়া যে প্রায়শ্চিত্তযজ্ঞ তুমি আরম্ভ করিয়াছিলে তাহাতে জীবন পূর্ণাহুতি দিয়াছ, তোমার যজ্ঞপূর্ণ হইয়াছে। তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন সেই প্রেমময়ের পদপ্রান্তে পরম শান্তিতে নিত্যসেবা কর। কেবল মাঝে মাঝে এই দীন মর্ত্যবাসী ভাইগুলির প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া তোমার পথে চলিবার শক্তি দিতে যেন ভুলিও না।

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়।

ভাগবত ধর্ম্ম।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান তিনটি পৃথক বস্তু নহেন—একই পরমতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ বা উপলব্ধি মাত্র। সকল সম্প্রদায়ের সাধক বা দার্শনিকগণ এই তিনটি প্রকাশ যে একরূপে ব্যাখ্যা করেন তাহা নহে। ভাগবত সম্প্রদায়ের যাহা মত আমরা এস্থলে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

প্রথম চিন্তা, যাহা মানবের মনে উদয় হয় তাহা এই যে তিনটি তত্ত্ব আছে। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাদের নাম দিয়াছেন The three Ideas of Reason. 1. The Theological Idea—God, 2 The Psychological Idea—Soul, 3. The Cosmological Idea—Universe as a whole,.

ভাগবত শাস্ত্রের অভিপ্রায় ধীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে যাঁহারা জগৎ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া একত্বের দিকে অগ্রসর হয়েন, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হয়েন, যাঁহারা জীবতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়েন তাঁহারা পরমাত্মতত্ত্বে আর যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়েন তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বে উপস্থিত হয়েন। প্রথমটি জ্ঞানের পথ, দ্বিতীয়টি যোগের পথ আর তৃতীয়টি ভক্তির পথ। লক্ষ্য সকলেরই এক, অদ্বয় জ্ঞান। কেবলমাত্র আলোচনার আরম্ভে যেটিকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করা যায় সেইটির জন্য চরমতত্ত্ব পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়েন। কেহ বলিতে পারেন যে ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথ কোন্‌টি? ইহার উত্তর নাই। জগতে তিন রকম মানুষ আছে, কাহারও নিকট আপনা হইতেই জগৎতত্ত্ব মুখ্যরূপে প্রতীত হয়, তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্বে নিবিষ্ট করা মানবের আয়ত্তাধীন নহে। আবার কেহ আত্মতত্ত্বকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম আলোচনায় অগ্রসর হন। ভাগবত ধর্ম্মের অধিকার শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয় না, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে জগতে এমন একদল লোক আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ও মনের স্বাভাবিক গঠনই এইরূপ যে তাঁহারা প্রথম হইতেই আত্মা ও জগৎ বা অন্তর ও বাহির এতদুভয়ের সমন্বয় রূপে যে তত্ত্ব রহিয়াছেন সেই তত্ত্বেই তাঁহাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয়; সেই তত্ত্বের ভূমিতে যতক্ষণ আরোহণ করা না যায় ততক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয়

না। ভগবদ্গীতায় যে, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম এই তিন পুরুষের প্রসঙ্গ দেখা যায় তাহাও মূলতঃ ইহাই। পুরুষ এক, কিন্তু উপলব্ধি তিনরূপ। সুতরাং এ বিষয়ে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ ইহা লইয়া বিচার চলে না। প্রারম্ভে প্রভেদ কোথায় তাহা বুঝিতে পারা গেল' তত্ত্বগত প্রভেদ কি তাহা আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজের মধ্যে যে মতভেদ তাহার দু একটি কথার আলোচনার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ প্রতিষিদ্ধ করিয়া নির্ব্বিশেষ শুদ্ধাদ্বৈত ভাব প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই ত্রিবিধ ভেদ এইরূপ। গাছের পাতা, ফুল আর ফল, ইহাদের মধ্যে যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। এক গাছ হইতে অন্য গাছের যে ভেদ তাহার নাম সজাতীয় ভেদ, আর ভিন্ন জাতীয় বস্তু, যেমন প্রস্তরাদি হইতে যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ।

"বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ পত্রপুষ্প ফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥"

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভেদই নাই: আচার্য্য রামানুজ বলেন ব্রহ্মের সজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই, অত্যন্ত বিজাতীয়ও কোন পদার্থ নাই, কিন্তু তিনি স্বগতভেদ বিনির্মুক্ত নহেন। গাছের ডাল, পালা, ফুল, ফল ইহারা পৃথক কিন্তু অবয়বী যে বৃক্ষ তাহা এক, ডাল পালা প্রভৃতি বৃক্ষের শরীর, শরীরের দ্বারা শরীরির ভেদ হয় না, তাহার অদ্বৈতত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে এই অদ্বৈতত্ব বিশুদ্ধ নহে, বিশিষ্ট। "তদানীং সূক্ষ্ম চিদাচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধং।" অর্থাৎ শরীর দ্বারা শরীরির যেমন ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনই শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ দ্বারাও তাঁহার অদ্বৈতত্বের হানি হয় না।

পরতত্ত্বের উপাসনাভেদে এই যে ত্রিবিধ প্রকাশ, ইহার বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনায় আমরা একটি সুগম পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় এই সুগম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই মন্তব্য অত্যন্ত সরলভাবে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রে শ্রীভগবানের ধাম, আকৃতি, গুণ, বিভূতি প্রভৃতির কথা আছে, এখন প্রশ্ন এই যে শ্রীভগবানের কি সত্যই এ সমস্ত আছে? জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক বলিবেন, এ সমস্ত মায়িকগুণের খেলা, অথবা কল্পনা। "তন্মতে জ্ঞানং নিরাকারং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশূন্যং চিৎসামান্যং

চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্যত্বমননাৎ। জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদংকারাস্পদস্য কার্য্যস্য বিশ্বস্য কারণ মাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতং।" জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বিভাগ শূন্য, চিৎসামান্য, ভগবদ্ধাম প্রভৃতি যাহা কিছু চিদ্বিশেষ অর্থাৎ সেই চৈতন্য হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক্, তাহাদের পার্থক্য বা সত্ত্বা স্বীকার করেন না। জীব ও মায়া তাঁহার শক্তি সুতরাং শক্তিমানের সহিত অভিন্ন তাহারা ইদং পদবাচ্য এবং কার্য্য, ইহাই বিশ্ব, ইহা কারণমাত্রাত্মক, অর্থাৎ কারণেই তাহাদের সত্ত্বা, তাহা ছাড়া আর পৃথক সত্ত্বা নাই।

যাঁহারা পরমাত্মা-রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন তাঁহাদের মত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপে বলিতেছেন 'এতন্মতে পরমাত্মনশ্চিদেকরূপত্বাজ্ জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি সাক্ষিত্বাদেজ্জ্ঞানবিশেষস্যাশ্রয়ত্বমপি। দ্যুমণি দীপাদের্জ্যোতীরূপত্বেঽপি জ্যোতিষ্মত্ত্বমিব নানুপপন্নং কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রংপুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়িকানাঞ্চ তদন্যতা-জীবস্য তদ্বিভিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদদ্বয়ত্বং।" এই মতে পরমাত্মা চিদেকরূপ বা নির্বিশেষ ও জ্ঞানমাত্র। কিন্তু তথাপি তিনি সাক্ষী এবং সেই জন্য যাহাকে বিশেষজ্ঞান বলে, যেমন পটজ্ঞান, ঘটজ্ঞান প্রভৃতি, এ সমুদয় হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইলেও একেবারে স্বতন্ত্র নহেন অর্থাৎ এ সকলের তিনি আশ্রয়। যেমন সূর্য্য ও প্রদীপ। প্রদীপে জ্যোতি আছে, এই যে জ্ঞান ইহা আমাদের সূর্য্যজ্ঞানের আশ্রয়ে বিহিত হইতেছে, কারণ জ্যোতি বলিয়া একটি নিত্য পদার্থের জ্ঞান যাহা মানবমনে বিদ্যমান তাহা সূর্য্যকে দেখিয়াই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যে যেটুকু নিত্যতা আছে দীপে সে নিত্যতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যে বলা হইয়াছে যে কেহ কেহ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজমান ইত্যাদি' যে অন্তর্য্যামী ধারণার কথা বলা হইয়াছে, এই অন্তর্য্যামীর যে সাকারত্ব তাহা মায়ার শক্তি, যাহা মায়ার কার্য্য বা মায়িক তাহা পরমার্থ নহে অর্থাৎ তাহা আছে বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ তাহা নাই। জীবও তাহারই অর্থাৎ ঐ মায়ারই বিভিন্নাংশ সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই নাই, অতএব পরমাত্মা অদ্বয় জ্ঞান।

এইবার তৃতীয় তত্ত্ব। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন "তথা ভগবানিতি ভক্তৈর্যদুচ্যতে তজ্জ্ঞানং। এতন্মতে পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি ভগশব্দবাচ্য ষড়ৈশ্বর্য্যস্যাপি। অপ্রাকৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রূপত্বং যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ॥"

তথৈব দ্বিভুজত্ব চতুর্ভুজত্বাদি-বিবিধ চিদ্ঘনকারৈবহিরন্তর্বর্ত্তিত্বেঽপি। ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্কন্দাদিবাক্যৈঃ সদৈব সেব্যসেবক-সেবাদিবিভাগেঽপি অদ্বয়ত্বং পূর্ব্ববত্তচ্ছক্তীনাং চিদাদীনাং বিলাসানাং চ বৈকুণ্ঠাদীনাং তদভিন্নত্ব মননাৎ ততো ভিন্নত্বভাবনৈবাদ্বয়পদেন ব্যাবৃত্তা।" ভক্তেরা যাঁহাকে ভগবান বলেন তিনিও জ্ঞান। তিনি জ্ঞানমাত্র হইলেও তাঁহাতে ষড়ৈশ্বর্য্য আছে। এই ষড়ৈশ্বর্য্য অপ্রাকৃত ও চিন্ময় সুতরাং জ্ঞানরূপ এবং নিত্য অর্থাৎ সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে কখনই পৃথক নহে। বিষ্ণুপুরাণে এই ছয় ঐশ্বর্য্যের নাম—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, ও জ্ঞান বৈরাগ্য। নিত্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ অসীমভাবে যাঁহাতে বিরাজমান তিনিই ভগবৎ শব্দ বাচ্য। দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ আদি বিবিধ চিদ্ঘনাকারে তিনি বাহিরে ও অন্তরে নিত্য বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণে আছে, ভগবান বলিতেছেন আমার ভক্ত সুমহান্ প্রলয়াপদেও স্থানভ্রষ্ট হন না। সেব্য সেবক ও সেবার বিভাগ সর্ব্বদাই বিদ্যমান। কেহ বলিতে পারেন তাহা হইলে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে চিদাদি যে সকল শক্তির কথা বলা হইল, ও বৈকুণ্ঠাদি যে সমস্ত বিলাসের কথা বলা হইল তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে বিভিন্ন নহে। অদ্বয় এই পদের দ্বারা বুঝাইতেছে যে এ সকলকে কেহ যেন ভগবান হইতে পৃথক করিয়া না দেখেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকার শেষ অংশে বলিতেছেন যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা ভগবানের যে সামান্য স্বরূপমাত্র যাহার নাম ব্রহ্ম তাহাতেই অধিকারী, যোগীগণ ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী এই দ্বিবিধ ভাবের অধিকারী আর ভক্তগণ অচিন্ত্য অনন্ত্য চিদানন্দময় তাঁহার স্বরূপ, গুণলীলা আদি অনেক ভাবের গ্রহণ করেন। যাঁহারা ভগবানের উপাসক তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকারী এমন প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম ও

পরমাত্মার উপাসকগণ প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অতএব ভগবত্তত্ত্বই মূল। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন এই কথা গীতাতেও বলা হইয়াছে। গীতায় আছে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণৈর্ব্বাখ্যাতেতি॥

ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে এই যে তিনটি তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—অদ্বয় জ্ঞানের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনার শেষ নাই। এই ত্রিবিধ প্রকাশ কতদিক হইতেই যে আলোচনা করা যায় তাহা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার তাৎপর্য্য অনুবাদ মাত্র করিয়া দিলাম এক্ষণে এই তত্ত্বটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য এই তত্ত্বটিকে আমরা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি অন্য কোন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—আমরা সেই সাধারণ উদাহরণটি পুনরায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই উদাহরণটির দ্বারায় কথাটা কিছু বিশদ হইতে পারে।

বায়স্কোপের ছবি দেখান হইতেছে। আমরা শত শত দর্শক মুগ্ধভাবে বসিয়া কতরকমের ছবি দেখিতেছি। হাতি আসিতেছে, ঘোড়া আসিতেছে, রাজা আসিতেছে, যুদ্ধ হইতেছে, কত বিচিত্র ঘটনা ও বস্তুর স্রোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা বালক, ছবিগুলিকে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ করিয়া মুগ্ধ-নেত্রে ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইল এই সব সুন্দর সুন্দর ছবি ইহাদিগকে কি আয়ত্ত করা যায় না—এইরূপ মনে করিয়া আমরা উঠিলাম ও ছবিগুলিকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধরিব কি, তাহারা যে ছবি! সত্য বস্তু হইলে ধরিতে পারিতাম। উৎসাহের সীমা নাই, ধরিতে পারি নাই কিন্তু এইবারে নিশ্চয়ই পারিব, এইরূপ আশায় মাতোয়ারা হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছবি ধরিবার জন্য দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছি, এখন ভাবিতেছি কি করি? দলের মধ্যে দু চারিজন লোক যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাহারা বলিল দেখ এই যে জিনিস গুলি দেখা যাইতেছে, ইহার এখানকার জিনিস নহে, আমাদের মনে হইতেছে, ইহারা এখানকার জিনিস কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে। এই কথা শুনিয়া দু-একজন বুদ্ধিমান ছবি ধরিবার জন্য এই যে ভীষণ পরিশ্রম, এই পরিশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিল এবং তাহার কথা শুনিয়া ভাবিল এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলিতেছে। এতক্ষণ উৎসাহের সহিত ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, একবার ভাবিতেছিলাম ধরিয়াছি, পরমুহূর্ত্তে দেখিতেছিল কিছুই ধরিতে পারি নাই! এইরূপে নব নব বিফলতা ও নব নব আশার উন্মাদনায় একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলাম, কোনরূপ সন্দেহ বা চিন্তার ভাব মনে আসে নাই। এখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সত্যইত পিছন দিক হইতে একটা যেন আলোকের ছটা আসিতেছে, সেই ছটা আসিয়া যবনিকার উপর পড়িতেছে; তখন চিন্তার স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল, চেষ্টাও অন্যমুখী হইল। এখন আমরা ফিরিলাম, এতক্ষণ সম্মুখে কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, এখন পশ্চাতে ফিরিলাম। ধীরে ধীরে পশ্চাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটি অতি ক্ষুদ্র সিঁড়ি আছে, ভাবিলাম এই সিঁড়ি ধরিয়া উঠিয়া গেলে বোধ হয় সেই আলোকের ছটা যে স্থান হইতে আসিতেছে সেই স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অল্প যে কয়জন লোক ছবি হইতে মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির নিকট আসিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিল এই দুর্গম সিঁড়ি অতি সঙ্কীর্ণ আবার অন্ধকার, এ সিঁড়ি কোথায় লইয়া যাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। এই স্থানেই দু একজন নিরাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িল, আর অগ্রসর হইল না। যাহারা সাহসী তাহারা এই সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া সতর্কভাবে উঠিতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল সিঁড়িতে পদচিহ্ন রহিয়াছে, আরও অনেক লোক যেন পূর্ব্বে এই পথে গিয়াছে, পথে আলোকও আছে। ক্রমে ক্রমে দু একজন লোক সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল একটি বালক, তাহার সমস্ত দেহ আনন্দপূর্ণ, খল্‌খল করিয়া হাসিতেছে আর কল ঘুরাইতেছে। যাহারা উপরে উঠিয়াছে তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ তুমি এমনি করিয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া, খেলা করিতেছ আর আমরা

নীচে বসিয়া ছবি দেখিয়া বঞ্চিত হইতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা যাইয়া সেই বালক খেলোয়ারের পা চাপিয়া ধরিল। খেলোয়ার তাহাদের দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বা! তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করিয়াছ—আমিও তাই চাই; আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, সেই অসীম আনন্দের আবেগে আমি নিত্যকাল এইরূপ খেলিতেছি, এ খেলা, আমার নিজের অন্তরের আনন্দ মূর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া অনুভব করা মাত্র। তোমরা এমনি করিয়া আমার নিকট আসিবে ইহাই আমার আনন্দ। তোমরা আসিয়াছ ভালই করিয়াছ। এখন হইতে তোমরা আমার স্বজন হইলে, আর তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এখন হইতে তোমরা আমার নিকটেই থাক।

এই পর্য্যন্ত সাধারণ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই উদাহরণের দ্বারা প্রতিপাদ্য যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাহা সকলকেই পাইতে হইবে। প্রথমে মানুষ বহির্মুখ, বিশ্ববৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া সুখের অন্বেষণে ধাবিত, কিছুদিন এই ভাবে জীবনের পথে চলিয়া দেখিল যে 'সুখে সুখ নাই', তখন মানব স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হইল, এই সময়ে প্রাচীন আচার্য্যগণের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করায় মানব সংযমের পথে চলিতে লাগিল। তাহার পর সাধন পথ এবং আনন্দময়রূপে বিশ্বকারণের উপলব্ধি। লোকগুলি আনন্দ-পূর্ণ ও ক্রীড়ারত সেই কিশোর মূর্ত্তির সমীপে আসিয়াছে, এইবার চিন্তা করুন সেই খেলোয়ার কি করিবেন? তিনি এখন তিনরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিতে পারেন, যে খেলা হইয়া গিয়াছে এই বলিয়া তিনি খেলা বন্ধ করিয়া ও কলটি ফেলিয়া দিয়া তাঁহার স্বগনীবর্গকে লইয়া বসিতে পারেন। আর যখন খেলা নাই তখন আমরা আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলিতে পারি না, কারণ আমাদের পরিচয় তো খেলার মধ্য দিয়া। তিনি আছেন এই মাত্র বলি বটে কিন্তু তাহাও ঠিক বলা যায় না। অর্থাৎ ইহা নির্বিশেষ সত্তামাত্র, অনির্ব্বাচ্য, অননুমেয়, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। এই গেল প্রথম কথা। তাহার পর এই খেলোয়ার আর এক কাজ করিতে পারেন তিনি খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন, তবে কলটি থাকিল, ভবিষ্যতে যদি কখন খেলা করেন তাহা হইলে যাহা আশ্রয় করিয়া খেলা করিবেন সেই কলটি বা খেলার সম্ভাবনাটি থাকিল। ইহার নাম পরমাত্মা ভাব।

আর এক হইতে পারে যে ঐ খেলোয়ার ঠাকুরের কলও থাকিল খেলাও চলিতে লাগিল স্বগণ-গণও তাঁহার নিকটে থাকিলেন। এইটির নাম ভগবদ্ভাব। এখন আর বিত্ব নাই, লীলা আছে। এখন আর জড় নাই সব চিন্ময়। এখন আব স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি সম্পন্ন স্বপ্নের যে একটা কল্পিত আমি তাহা নাই, নিত্যজীবের আমি ভগবানের এই যে স্বরূপের অভিমান এই অভিমানে জীব জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহার নাম Spiritual archemy

এই গেল ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র তত্ত্ব ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নহে। এই ত্রিবিধ প্রকাশে পরমার্থতত্ত্বের উপলব্ধির ফলে মানবের জীবনের আদর্শ বা বাস্তব জীবন কি ভাবে নিয়মিত হয় তাহা আমরা পরের প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটি তত্ত্ব লইয়া বহুল আলোচনা কেবল যে করা যাইতে পারে তাঁহা নহে, নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতীচ্য দার্শনিক চিন্তা প্রণালীর মধ্য দিয়া যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ কর্ত্তৃক বিকাশিত এই ভাগবত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এই তত্ত্ব কি ভাবে উপলব্ধি করেন তাহা আলোচনা করিলে অনেকের সুবিধা হইতে পারে। এই জন্য আমরা নিম্নে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের Hindu Review পত্রে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নের অংশ-টুকু উদ্ধৃত করিলাম।

Those who know the Ultimate Reality, call that, which is undivided consciousness—যজ্জ্ঞান-মদ্বয়ং—the Jnanam which has no duality in it, as the Ultimate Reality, which is spoken of as Brahman (in the Upanishads) as Paramatman (by the Yogees) and Bhagaban—(by the Bhagavatas)" :—so says the Sreemad Bhagabata—the special scripture of the Vaishnavas. Brahman, Paramatman and Bhagavan, are not three beings, but one Truth or Reality. They represent not three Personalities, but really three aspects of the same Person. And it is here that the Vaishnava Trinity differs from, and becomes at once more rational than, the Christian Trinity. The Bhagavan of the Vaishnavas is the son in the Christian Dogma; yet in one sense, Bhagavan is greater than the son of the Christian

Trinity. For Christian thought has never dared to conceive the father as a mere moment in the perfected personality of the son; while Vaishnava thought has boldly declared Brahman, who stands really for the Father in the Christian Dogma, to be a mere "Effulgence of the Body of Sree Bhagavan." Like the Brahman of the Upanishads, that which is called Paramatma or the Indweller or Antaryamin অন্তর্যামিন by the Yogees, and which corresponds to the Holy Ghost of the Christian Trinity, is also regarded by the Bengal school of Vaishnavism as a mere part manifestation অংশবিভবঃ of Sree Bhagaban. Both Brahman and Paramatman,—the Father and the Holy Ghost of Christian Doctrine—are held together, as parts in the whole, in Sree Bhagaban who is represented in the Christian consciousness by the Son. Brahman is that from which the Universe has come to being, having come to being, by which the universe continues to be, and towards which the universe is perpetually moving through the eternal processes of cosmic evolution. The ulimate Reality as revealed in cosmic life is Brahman. The same Reality as revealed in individual life and consciousness is Paramatma. But the cosmic process and individual life and consciousness are related to each other. The one corresponds to the other. The one is a counterpart, so to say, of the other. It is therefore that the Jeeva understands the Jagat, the human intelligence is able to construct a system of intelligible relations in natural objects and Phenomena. This implies that the universe and man are parts of a unity;

are both expressions of one Universal Mind. This Mind stands as Brahman in cosmic life and consciousness. The same Mind stands as Paramatma in individual consciousness. Brahman is the ultimate unity in cosmic life and evolution. Paramatman is the ulti mate unity in individual life and thought. They are both expressions of a greater Unity in which both Nature and man are held together. That unity is Sree Bhagavan. Brahman, therefore, is only an impalpable indication of the Presence of Sree Bhagavan. I say umpalpable, because, what we know of the ultimate Reality in Nature is, after all, a mere logic of our thought, a conclusion of our reason. We know it, there, as Cause, as the First Cause, But we really know a cause only from its effect. We do not know what it is in itself. Brahman is established through what is called the তটস্থ লক্ষণম্ Tatastha Lakshmanam—in our Logic. In knowing a thing by its tatastha lakshmanam, we know it only from the outside. All knowledge of the Ultimate Reality as First Cause, is an outside knowledge. We can not know a thing by its tatastha lakshmanam from the inside as it exists, not in its modes, but in its own essence and being. The argument from causa tion does not tell us whether the First Cause is a mere Force or a Person; in fact, it does not even tell us whether it is conscious or unconscious. Neither consciousness nor unconsciousness, neither personality nor impersonality, is, therefore, attributed to Brahman; who is generally referred to as That or It in the Upanishads and very rarely, indeed, as He. As at early dawn we do not see

the Sun but only a reflexion of his light, reddening the eastern horizon, even so we do not see the Ultimate Reality in the cosmic life, but only a reflexion, so to say of His Body. When from outer Nature we turn to our own inner life and consciousness and recognise the Ultimate Reality; as the unity of that life, we see Him here as our own supreme Soul, as the basis of our being, the ground of our reason, the root and realisation of our intellectual, emotional and volitional life and evolution. In Nature we see Him in relation to the cosmic life,—as Brahman ; in our soul we see Him in relation to the particularities of our own individual life and experience,—as the Over-soul or the Indweller, as Paramatma. But this also is only a partial revelation of Him. For we are only a part of the universe. And that which is revealed in relation to a part, must necessarily be less than itself. Part implies a whole, there can be no part, unless there is a whole of which it is a part. We, as individual souls are parts of the universe. Any revelation, in our individual life and consciousness, of the Ultimate Reality which stands equally at the back of the universe as at the back of our own partialities or individualities, must inevitably be only partial. It is, therefore, that the Vaishnabs say that the Indweller or Paramatman or Antaryamin, is only a part-manifestation of Reality. That Reality or Tattva—the supreme Reality or পরমতত্ত্ব Paramatattva–is Shree Bhagaban: that which is Brahman in the Upanishad is a mere "effulgence of His Body ;" and that which is Paramatman or Antar-

yamin—or the Over-Soul or the Indweller in the Jeeva, is also a part-manifestation of Him. Bhagavan is the Supreme Person. He is at once both Unmanifested and Manifested; both Nirgunam and Sagunam নির্গুণম্ and সগুণম্ both the Abstract and the Concrete Universal. He is both impersonal and personal. He is the পরমপুরুষ the Supreme Person. 'He is complete and perfect Jnanam পরিপূর্ণম্ জ্ঞানম্-; and complete and perfect Anandam পরিপূর্ণম্ আনন্দম্-; and in both this Jnanam or reason-aspect and this Anandam or emotional-aspect, He is eternally self-realised. This is why Shree Bhagaban is called আত্মারামঃ Atmarama.

বিসর্জ্জন।

"এস পুত্র, আজ শুভদিন, দেবীপূজায় আজ তোমায় উৎসর্গ করিব।"

"পিতা কি করিতে হইবে? আমার রুধিরে যদি জগন্মাতা সন্তুষ্ট হ'ন, আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইবে, একি কম সৌভাগ্য!"

"না বৎস, রুধির দেবীপূজার জন্য নয়, তোমার কামনা দেবীপদতলে উৎসর্গ কর। এই লও নির্ম্মাল্য। প্রাণীহত্যায় পূজা হয় না। ছাগ, মেষ, মহিষ, শিশু যখন ভীষণ হাড়কাঠে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করে, জগন্মাতা সেই জীবের ক্রন্দনে পূজা ব্যর্থ করিয়া দেন। প্রকৃত পূজা ত্যাগে, হত্যায় নহে।"

"আমার কি কামনা আছে, পিতঃ, যে তাহা মায়ের শ্রীচরণে রাখিয়া আজ ধন্য হইব?"

"বৎস, কামনার দাস মনুষ্য, তার সমস্ত জীবন বাসনায় পরিপুষ্ট। ভোগে তার তৃপ্তি, কর্ম্মে তার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মে তার পরিতৃপ্তি। যে কর্ম্ম করিবে, ভগবানে সমর্পণ কর, কামনাপরিশূন্য হইয়া জীবনপথে অগ্রসর হও, প্রবৃত্তি দমন করিয়া পশুজীবন ও মনুষ্যজীবনের পার্থক্য দেখাও, বুঝিতে পারিবে ভগবান তোমার হৃদয়পদ্মে।

রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বতাধিষ্ঠিত আশ্রমে গুরুশিষ্য এইরূপ কথোপ-

কথন হইতেছিল। সম্মুখে মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি। অদ্য মহাষ্টমী পূজা। দেবীর চরণপদ্মাভায় গৃহ আলোকিত।

গুরু শঙ্করলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মিশ্র। তিনি মারবার রাজমহিষী-প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজারী। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ, শরীরে অমানুষিক বল, হৃদয়ে অসাধারণ সাহস, পরিধানে গৈরিক বসন, প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ডক। দেখিলে বোধ হয় আজন্ম তাঁহার সময় পূজাকর্ম্মে ব্যাপৃত আছে; তরবারীসঞ্চালনপটু দীর্ঘহস্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেও সক্ষম। তাঁহাকে দেখিলে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়; প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ লাভ হইত শত্রুতাচরণ করিলে বলবীর্য্যের পরীক্ষা শেষে ক্ষমালাভ হইত। তিনি অসিযুদ্ধে অদ্বিতীয়, বর্শাচালনে সিদ্ধহস্ত, যোগসাধনায় সফলকাম, ইন্দ্রিয়যুদ্ধে জয়ী। সুনীল অম্বরতলে যখন দেবীর মহামন্ত্র উচ্চারিত হইত, যখন হোমাগ্নির রক্তজিহ্বা শেষাহুতির হবিঃ গ্রহণ করিত, তখন মনে হইত যেন মহামায়ার পাষাণমূর্ত্তি সজীব, ত্রিনয়নে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিত, বরাভয়করা সদয়া অভয়া যেন সত্যসত্যই ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন। সে মূর্ত্তিতে করুণা, চরণে মোক্ষ, হস্তে অভয়, খড়্গে বাসনার বলিদান। এই তো পূজা।

ভক্তশিষ্য রবীন্দ্রনাথ শঙ্করলালের পালিত পুত্র। পূর্ণাবয়ব বিশিষ্টযুবক। তাহারও পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে রুদ্রাক্ষমালা। দেহের সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর, যেন যোগভ্রষ্ট দেবকুমার। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিতকুন্তল, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, কন্দর্পের ফুলধনুসম ভ্রূযুগ, রক্তচন্দনচর্চ্চিত সুদীর্ঘ ললাট যেন সতীপাদপদ্মরেখাঙ্কিত। সে আকৃতিতে মদনের লালসা নাই, আছে কেবল গুরুভক্তি, যোগশিক্ষা আর পাপভারনিপীড়িত অধার্ম্মিকের উদ্ধারসংকল্প, আর ছিল মাতঙ্গের সংযত বল।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বাংলাদেশ হইতে জয়পুরে বাস করেন। তদবধি তাহারা ও তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ রাজপুতনায় বাস করিতেছেন। তাঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। আচার ব্যবহারে ও কতকটা সামাজিকতায়ও রাজপুতদেশের প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পিতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শঙ্করলালের নিকট যোগাভ্যাস করিতেন। সেই শিক্ষার আজ পরীক্ষা।

শঙ্করলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কামনাবিদ্ধ শরীরের স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকলাপ দেবীপাদপদ্মে নিবেদন কর, সূক্ষ্মআত্মার উদ্ধারকল্পে

জননী জন্মভূমির উন্নতিসাধন জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ কর। এস বৎস, পূজার সময় উপস্থিত, মহামায়া জগদম্বার চরণে আজ শত শতদলের সহিত শত কামনার উৎসর্গ করি।"

তাঁহারা পূজার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সহচরীবেষ্টিতা মারবার-রাজরাণী কন্যাসহ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্করলাল পূজার্থ আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র।

রাণী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ আশীর্ব্বাদ করুন, আমার কন্যা উমার সর্ব্বগুণান্বিত পতিলাভ হউক।

শঙ্করলাল বলিলেন, "মা, আমি তো নিত্যাশীর্ব্বাদক, মহামায়ার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, কামনা সফল হউক।"

তখন রাজকন্যা ধ্যানাস্মিমিতলোচন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনিমেষনয়নে চাহিয়াছিলেন। কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ এ যুবাটী কে?"

"এটী আমার ... শিষ্য, পালিতপুত্র। আজ ইহার বলিদান!" সেই মুহূর্ত্তে দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ কাঁপিয়া উঠিল।

রাণী সভয়ে বলিলেন, নরবলি!

"না মা উহার বাসনার বলিদান! আজ মহাষ্টমীর শুভমুহূর্ত্তে উহার বাসনাপরিপুষ্ট শরীরের বলিদান। দেবী পাদপদ্মে উহার ভোগবিলাস আকাঙ্খার বলি দিয়া সে আজ ধন্য হইবে; পূজার সময় উপস্থিত, আমি পূজা আরম্ভ করি। এই বলিয়া চণ্ডীবচন উদ্ধৃত করিয়া পূজারম্ভ করিলেন—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা—
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা—
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—

* * *

"মা, প্রণাম কর, সকলে প্রণাম কর, ঐ দেখ দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ দুলিতেছে, দেবী রবীন্দ্রনাথের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগ্যবান যুবক, আজ তোমার জন্ম সার্থক, মহামায়া তোমার বলি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণাম কর, আবার প্রণাম কর,—

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমস্তুতে ॥
শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি ! নমস্তুতে।
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে !
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমস্তুতে ॥”

সকলে ঐ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে দেবীর আশীর্ব্বাদস্বরূপ হস্তপদ্ম ভূমিতে পতিত হইল। সেই পদ্ম ভক্তিসহকারে কুড়াইয়া লইয়া শঙ্করলাল বলিলেন, “আমার পূজা সার্থক, রবীন্দ্রনাথের ভক্তি সার্থক ! মা, ভক্তশিষ্যের আজ কামনার বলিদান হইল, সে এখন তোমার দাসানুদাস, তাহার হৃদয়ে বল দাও মা, যেন সংসারে ভীষণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হয়।”

“লও মা দেবীর আশীর্ব্বাদী ফুল।” রাণীকে শঙ্করলাল সেই ফুল প্রদান করিলেন। রাণী ও কন্যা মহামায়া শঙ্করলালকে প্রণাম করিয়া সহচরীগণসহ গৃহাভিমুখে ফিরিয়া গেলেন।

(২)

মারবাররাজকন্যা উমা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, আজ তাহার হৃদয় মহামায়ার কৃপায় মহাশক্তিতে পূর্ণ। আজ যেন জন্মভূমির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বীরাঙ্গনা পিতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিলেন, “পিতঃ, উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে আমরা শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারি নাই, মুসলামনের জয়োল্লাসে মারবারবাসী ভীত, সন্ত্রস্ত। পিতঃ আজ মহামায়ার কৃপায় সেনাপতির অভাব পূর্ণ হইয়াছে।” এই বলিয়া আশ্রম-গৃহের পূজা ও সেই মহাবলসম্পন্ন যুবক রবীন্দ্রনাথের কথা বলিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে হাজির হইবার জন্য আদেশ হইল। তিনি আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া অধোবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ্ঞা করুন মহারাজ, কি করিতে হইবে।”

“আমার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মুসলমান সম্রাটের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে ?”

অসাধ্য-সাধন ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। আপনার সৈন্যদল প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যদি যুদ্ধে অগ্রসর হয়, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা লাভ করিব, আশা করিতে পারি।”

রাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রবীন্দ্রনাথ! মারবার সৈন্য ভীরু নহে, বহুযুদ্ধে তাহার প্রমাণ হইয়াছে। এ বাংলাদেশ নহে।"

শেষ কথাটী শ্লেষব্যঞ্জক ও মর্ম্মান্তিক।

"ঠিক বলিয়াছেন মহারাজ, এ বাংলাদেশ নহে, মারবারের খর্জ্জুর ও রুটি অপেক্ষা বাঙ্গালার ভাত ও ডাল অধিক বলশালী নহে! কিন্তু মহারাজ, আমার সোনার বাংলা ভারতের মস্তিষ্ক। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ মারবাররাজের সেনাপত্যলাভ করিয়াছি, এ কি কম সৌভাগ্য!"

রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ! রাজার সম্মুখে তাহার দেশের নিন্দা করিও না। তুমি আমার গুরু শঙ্করলালের ভক্তশিষ্য বলিয়া ক্ষমা করিলাম।"

"মহারাজ, জন্মভূমি সকলেরই পক্ষে স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমি একজন সংসারত্যাগী যোগীমাত্র, যোগীকে ক্ষমা করিতে পারেন এরূপ ক্ষমতা আপনার কই? আমি দোষের জন্য ভগবানের পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি, রাজার ক্ষমতায় সে ক্ষমা নাই।"

রাজার হস্তস্থিত কৃপাণ কোষমুক্ত হইল।

"দুরাচার ভণ্ডতপস্বি! আমার কন্যার অনুরোধে তোকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছি, ভীরু কাপুরুষ বাঙালি একি তোর কম সৌভাগ্য।"

"মহারাজ, যাহার হৃদয়ে এত ক্রোধ, সে কি ক্ষমা করিতে পারে। আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, ক্ষত্রিয়যুবকের সম্মুখে তরবারি কোষমুক্ত করিয়াছেন, তাহার অসি এখনও কোষমুক্ত হয় নাই, ইহাই প্রকৃত ক্ষমা!"

রাজা ভীষণক্রোধে সিংহাসন হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথের মস্তক লক্ষ করিয়া তরবারী সঞ্চালন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই হস্তস্থিত কৃপাণ ধরিয়া ফেলিলেন।

"মহারাজ, আমি আপনার প্রজা। প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজা-শক্তির অবমাননা করিবেন না। রাজ্যে বিপ্লব ঘটিতে পারে।"

সহসা সেই সভাগৃহে নুপুরের ধ্বনি হইল। উমা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন, "পিতাকে ক্ষমা কর।" রবীন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন যেন যুদ্ধের বিজয়-লক্ষ্মী তাহার হাত ধরিয়াছে। তিনি মহামায়াকে মনে মনে স্মরণ করিলেন।

পিতার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ইনি মহাষ্টমীপূজায় দেবীর বরলাভ করিয়াছেন। পিতঃ ইনি সেই কামনাত্যাগী যুবক। রাজা কথা কহিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ

স্বকীয় কোষনিবদ্ধ তরবারী উন্মুক্ত করিয়া রাজার চরণে রক্ষা করিয়া বলিলেন,

"মহামায়ার চরণে আমি গুরুদেব কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত, তথাপি রাজভক্তি আমার সকল ইচ্ছার উপরে, আজ্ঞা করুন, মহারাজ, কোনযুদ্ধে যাত্রা করিতে হইবে। যোগীর যোগসাধনা বিফল হয় হউক, রাজার মঙ্গলের জন্য প্রজা জীবনদান করিবে। আজ্ঞা করুন মহারাজ, অসি কোষমুক্ত হইয়াছে, যোগসাধনরত যোগীর যখন যোগভঙ্গ হইয়াছে তখন মহারাজ এই অসি একবার অত্যাচারের প্রতিশোধ লউক। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, অসহায় দুর্ব্বলের জন্য অসি, শোভাসম্পাদনের জন্য নহে।"

রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

"রবীন্দ্রনাথ তুমি আমার পুত্রস্বরূপ, এই বয়সে তোমার এত ক্ষমা; যাও যোগি, এই লও তোমার কৃপাণ, আশা করি শত্রুরুধির পান করিয়া ইহা কোষ নিবদ্ধ হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ রাজার চরণ বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিল। রাজা একবার ভাবিলেন, এই রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার কন্যার কি বিবাহ হইতে পারে না? বিধাতা কি এই শুভ মিলন সংঘটিত করিবেন না? ধন্য রবীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার আদর্শ!

(৩)

অদ্য মহানবমী। শরতের নীলাকাশ শুভ্র কৌমুদী পরিব্যাপ্ত। দিগদিগন্ত প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্না যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে। ফুলের মুখে, জলের তরঙ্গে, নদীসৈকতে, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষচূড়ায় জ্যোৎস্নার শুভ্রলাবণ্য তরঙ্গায়িত, এমন সময়ে,

উমা ডাকিল—"সখী",

"কি সখি,

"সখী অমিয়সাগরে সিনান করিতে গরল বুঝি ভেল"

"এ গরলে মৃত্যু নাই, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে।"

"তিনি যদি আমায় না চান, তিনি যে যোগী,

"তুমি ত যোগিনী হইবে।"

"আমার কি সে সাধ পূর্ণ হইবে?"

'ভগবান অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।"

এমন সময় রাজরাণী ও রবীন্দ্রনাথ সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পূজা সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের অনুমতি লইয়া রাজসন্নিধানে আগমন করিয়াছেন। ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত শুভ্রযজ্ঞোপবীতধারী রবীন্দ্রনাথের হস্তে দেবী নির্ম্মাল্য দিলেন।

রাণী আদেশ করিলেন, "বৎস, দেবীনির্ম্মাল্য উমার গলায় দাও তুমি আশীর্ব্বাদ কর, সে যেন ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার সহায় হইতে পারে।"

এই আদেশের ইঙ্গিং উমা ও রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন।

আদেশক্রমে উমার গলায় নির্ম্মাল্য পরাইয়া দিয়া রাণির চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,

"মা, যোগীর যোগভঙ্গ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু রাজা ও রাণীর আদেশ আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু মা, আমি সমস্ত কামনা দেবীপদে বিসর্জ্জন দিয়াছি' সেরূপক্ষেত্রে উমার সহিত আমার বিবাহ অসম্ভব!

"উমাকে চরণে স্থান দিও, সে আর কিছু চাহে না"—এই কথা বলিয়া রাণী উমার[illegible] চলিয়া গেলেন। পরমুহুর্ত্তে সেই গৃহে শঙ্কর-লাল প্রবেশ করিলেন এবং উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "রবীন্দ্র-নাথ, মহামায়ার আদেশে তুমি প্রকৃতিকে বরণ করিয়া লও। যুদ্ধজয় অনিবার্য্য। মৃত্যুকে বরণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিও। উমা মহাশক্তি, তোমার উপযুক্ত সঙ্গিনী।"

রবীন্দ্রনাথ তখন মেঘ-নির্ম্মুক্ত পুর্ণেন্দুসম সুন্দর দেখাইতেছিল। মহামায়ার কৃপায় সে মহাবলসম্পন্ন। সে হাসিয়া কহিল * * উমা, আমি আজ মারবার সৈন্যের অধ্যক্ষ। একি কম সৌভাগ্য। একি উমা তুমি কাঁদিতেছ। তুমি রাজকন্যা, আমার জন্য কেন কাঁদিতেছ!"

"রবীন্দ্র, কেন কাঁদিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। যেদিন পূজাগৃহে তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি তোমার অনুগামিনী আমাকে দ্বিচারিণী করিও না। আমাকে দয়া করিয়া চরণে স্থান দাও।"

এই বলিয়া উমা রবীন্দ্রের চরণ ধারণ করিল।

রবীন্দ্র তখনও নির্ব্বিকার!

"আমার সংযমধর্ম্ম হইতে কেন পাতিত করিবে, উমা! আমার ধর্ম্মপথ অতি বন্ধুর, সে পথ তোমার পক্ষে অতি কঠিন। তুমি রাজোদ্যানের শ্রেষ্ঠ কুসুম। যোগীর গৃহে সে কুসুম শোভা পাইবে না।"

উমা আবার বলিল,

"কুসুম শোভার জন্য নহে। কুসুমের আশা দেবতাচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়া তাহার ফুলজন্ম সার্থক করে। তুমি আমার দেবতা, তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব, আমার আশা ব্যর্থ করিও না।"

উমা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন।

"আমি কি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, উমা? আমি ভোগলালসাশূন্য জীব, দেবীপদে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমার যা কিছু ছিল, সমস্তই মহামায়ার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। আমি সম্বলশূন্য ভিখারীমাত্র।"

"আছে রবীন্দ্র, তোমার ভিক্ষার পাত্র আছে, তাহাতে ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, বিক্রম আছে, সাধু সংকল্প আছে, তাহারই অর্দ্ধেক ভাগ আমায় দাও। আমায় স্বার্থপর ভাবিও না, আমি আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ সুখের পরিবর্ত্তে ঐটুকুমাত্র দান চাহিতেছি। তুমি তোমার হৃদয় দান কর, দেখিবে উমা তাহা রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, মারবার রাজকন্যা দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না।"

"উমা তুমি দেবী। তোমার ধর্ম্মচিন্তা আমার অনেক উপরে। দেবী, তবে এস, এ দীনকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও, আমি তোমারই রেখাঙ্কিত পথে অগ্রসর হই।"

"এত বিনয়, এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য, এত সুরভি, তোমাতে রবীন্দ্রনাথ, জানিতাম না। তোমার হৃদয়-সাগরে আমি শিশিরবিন্দু, তোমার হৃদয়-উদ্যানে আমি ক্ষুদ্র শেফালিকা, তোমার ধর্ম্ম মন্দিরে আমি সেবিকা মাত্র। এ প্রার্থনা কি আমার সফল হইবে না রবীন্দ্র?"

"দেবীর প্রার্থনা দেবতা পূরণ করিতে পারেন, আমি সামান্য মনুষ্য মাত্র। দেবী সহবাসে যদি মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, বুঝিব সে তোমারই গুণে। তুমি যদি আমার প্রতি আজ সদয়া, তবে আমার শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও, আমার ধর্ম্মকার্য্যে সহায় হও, আমার বীরধর্ম্মে উৎসাহ দাও, আমার আজ মৃত্যুতে তুমি সহায় হও।"

"তবে তাহাই হউক রবীন্দ্র। এস মনের সাধে আজ তোমার বরবপু বর্ম্মাচ্ছাদিত করি, হস্তে শত্রুধ্বংশকারী কৃপাণ ঝুলাইয়া দি, তোমার গলে আমার স্ব-হস্তরচিত মালা পরাইয়া দি। এই মালা তোমার যশোমাল্য হউক, আর আমাদের মিলনের নিদর্শনস্বরূপ এই লও প্রতিদান, আমার হৃদয়, আর আমাদের মিলনের শেষ চিহ্নস্বরূপ এই লও—

রবীন্দ্রনাথ ত্বরিৎগতিতে সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, উমা, আমাদের এই পবিত্র মিলন কামনার গন্ধে দূষিত করিও না। আমি মৃত্যুকে বরণ করিয়াছি, গুরুদেবের আদেশে। এই বলিয়া সে গৃহত্যাগ করিল।

পরদিন ভীষণযুদ্ধ সংঘটিত হইল। রবীন্দ্রনাথের অমিতবিক্রমে শত্রুব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইল। সে রণোন্মাদ, সে যুদ্ধবিক্রম, সে অসামান্য সাহস, মারবারবাসী চিরদিন মনে রাখিবে। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্ত্তে এই অমূল্য জয় ক্রয় করিতে হইল।

মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন, তখন শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে মথিত, বিধ্বস্ত। কিন্তু তখনও শত্রুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। রবীন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বচারী দেহ-রক্ষী সৈন্য ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় নাই। শত্রু তাহাকে নিজের আয়ত্তের ভিতর পাইয়া একজন তাহার প্রতি বর্ষাসঞ্চালন করিল, অপর একজন ঘোটককে বিদ্ধ করিল, রবীন্দ্রনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন। শত্রুকৃপাণ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে এক রুধিরাক্তকলেবর নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল এবং তাহারই বর্ষাঘাতে আততায়ী প্রাণত্যাগ করিল। নারী ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার মস্তক নিজ ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। তখন সমস্ত শত্রু পলায়ন করিয়াছে, আছে কেবল নীলাকাশে দশমীর চন্দ্র। নিস্তব্ধ নিশীথে উমা ও রবীন্দ্রনাথ আজ মৃতদেহ পরিবেষ্টিত রণ-ভূমিতে পরস্পরের যোগবল পরীক্ষা করিতেছে! কি ভীষণ মিলন! একটী সমৃণাল শতদল, অপরটী তরুচন্দন! চন্দনস্পর্শে শতদল আজ ধন্য হইল। উভয়ে মহামায়ার চরণ-তলে পঁহুছিবার জন্য প্রস্তুত।

"উমা, আজদশমী, মনে আছে; তুমি বীরনারী দুঃখ করিও না। আশা করি তুমি আমার সঙ্গে আসিতে পারিবে। এস তবে একসঙ্গে যাই।

"না প্রিয়তম তোমার মৃত্যু নাই। তুমি অমর অজেয়। দাসী তোমার চরণে! চল আমরা মৃত্যুর অপরপারে চলিয়া যাই। স্বদেশরক্ষার্থ বীরের জীবন মৃত্যুর অধীন নহে, তাহার স্থান স্বর্গে। চল প্রাণেশ্বর, আজ শুভ মুহূর্ত্তে দুইটী হৃদয়ে মিলিয়া সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পুণ্যধামে চলিয়া যাই।

সেই বীরাঙ্গনা তখন রবীন্দ্রনাথের মস্তক উত্তোলন করিয়া উভয়ে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মিলনের প্রেমের শেষ স্মৃতিস্বরূপ তাহারা উভয়ে চলিয়া পড়িল। পরমেশ্বর তাহাদিগকে তুলিয়া লইলেন। শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিং বি, এ।

সর্ব্বস্ব।

দিবসের আলো নিভিয়া আসিছে
মলিন নেত্র পরে,
এখনো বিবশ পরাণ আমার
কাঁদিছে কিসের তরে!
স্নেহ গরিমায় পাছে ভুলে যাই
তোমা পানে আর ফিরিয়া না চাই
তাই সে প্রভাতে আমার সবাই
ডেকেছ আপন ঘরে
তবুও আজিকে সে সকল কথা
কেন গো আকুল করে!
তাঁদের ভাবিতে তোমার কথাটী
কেন গো জাগেনা স্মরণে
তাঁরা যে আজিকে শরণ লয়েছে
তোমারি কমলচরণে!
হৃদয় তাঁদের হরষ উছল,
শান্তি তাঁদের স্থির অবিচল
ললাট তাঁদের মহিমোজ্জ্বল
তরুণ অরুণ বরে
শুধু এ ভ্রান্ত জনের লাগিয়ে
নিশ্বাস ফেলে স্বপনে!
সারাটী রজনী জ্বলিয়া জ্বলিয়া
নিভিবে যখন বাতি,
তখন কি তবে এ দীন জনের
নিঃশেষ হবে রাতি!
সে দিন আসবে নবীন প্রভাতে
মেলিব নয়ন কার আঁখিপাতে
লভিয়া চেতন কাহার আঘাতে
হেরিব নবীন ভাতি

কাহার সমুখে দাঁড়াইব তবে
রিক্ত দুহাত পাতি !
যা কিছু আমার আপনার ধন
তোমারি মাঝারে রাজে !
যা কিছু আমার করুণ রাগিণী
তোমারে ঘেরিয়া বাজে
আমার সকলি তোমার চরণ
সব আয়োজন সকল স্বপন
আমার জীবন আমার মরণ
মিলিছে তোমার মাঝে
তোমারেই যেন চিরদিন ভাবি
দুঃখ বেদনা লাজে।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব।(৯)

রাগাত্মিকা ভক্তি সাধিয়ে দুইগণ।
কামরূপা সম্বন্ধরূপা এই দুই হন॥
তাহে কামরূপা পুন দেখি দুইমত।
কেহ কৃষ্ণ সুখ হেতু কেহ আত্মমত॥
কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণা কৃষ্ণ সুখ জন্যে।
প্রেমরূপা সেই গোপীগণ বৃন্দারণ্যে॥
ব্রজদেবী শ্রীমতী রাধিকা আদি যত।
কামশব্দে প্রেমরূপা তাহাতে বিখ্যাত॥

যথা

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং॥
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেবকেবলমুত্তমঃ॥
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেম বিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং॥
স্বতামিতি স্বশ্রীকৃষ্ণঃ তস্যভাব সত্তা তাং. ইতিঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ কামইব দৃশ্যতে কিন্তু প্রেমা এব অত-এব তন্ত্রে গোপীনাং প্রেম কাম ইতি খ্যাতিঃ॥

যথা

প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং ইতি॥

কামরীতি দেখি তাহে কুব্জাতে বিখ্যাত।
শুদ্ধপ্রেম নাহি দেখি তাহাতে বেকত॥
কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্র করে আকর্ষণ।
কাম প্রায় রতি এই দেখিয়ে লক্ষণ॥

যথা—

কামঃ প্রায়রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা।
অত্র ব্যখ্যা যথা শ্রীজীবগোস্বামিনঃ॥
যত্তে সুজাতেত্যাদি শুদ্ধ প্রেমরীতি অদর্শনাৎ প্রত্যুত উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্যেত্যাদি কামরীতি মাত্রে দর্শনাৎ তথাপি রতি স্তদুপাধি তস্যাংশেন জ্ঞেয়া॥

অথ সম্বন্ধরূপা।

সম্বন্ধরূপা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাগণ।
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ আদি নিরূপণ॥
সম্বন্ধানুগ পদ্যে অগ্রে সে বেকত।
নন্দাদ্যে সম্বন্ধশ্লেষ মাত্রোপলক্ষিত॥
ব্রজে সম্বন্ধরূপা প্রেমরূপা লেখি।
সম্বন্ধরূপা গোবিন্দের যদুকুলে দেখি॥
ইহা মধ্যে কৃষ্ণে যার ঈশভাবহীন।
প্রেমে কৃষ্ণ যা সভার হয়েত অধীন॥
রাগাত্মিকা শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজবাসীগণ।
সম্বন্ধজাত স্নেহ দেখি যদুবংশ হন॥
বসুদেবাদ্যের কভু বাৎসল্য ভাবনে।
কখন ঈশ্বর বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য দর্শনে॥
যশোদা দেখিল যদি মুখে ত্রিভুবন।
তথাপি ঈশ্বরভাব না হয় কখন॥
প্রেমরূপা ব্রজবাসী রাগাত্মিকাগণ।
কামসম্বন্ধ শ্লেষ প্রেম নিরূপণ॥

যথা—
সম্বন্ধরূপা গোবিন্দেপিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপ লক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাম্ বক্রবামতা ॥
যদৈশ জ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে
প্রধানতা।

তত্রৈব—
কাম সম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্র স্বরূপিকে
নিত্য সিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্রসম্য
গ্বিচারিতে

অস্যার্থঃ—
প্রেম মাত্রং স্বরূপং কারণং যয়োস্তে
নিত্যসিদ্ধাঃ
শ্রীনন্দাদয়ো গোপ গোপ্য এব আশ্রয়া
মূল স্থানানি
যয়ো কামরূপ সম্বন্ধ রূপয়ো স্তয়োভাব
ইত্যর্থঃ॥

রাগাত্মিকাদ্বিবিধ হইল নিরূপণ।
কামাত্মিকা সম্বন্ধাত্মিকা এই বিবরণ ॥
রাগাত্মিকাদ্বিবিধ হইতে রাগানুগা দুই।
কামানুগা সম্বন্ধানুগা কহিলেন এই ॥

যথা—
রাগাত্মিকায়াদ্বৈবিধ্যাৎ দ্বিধা রাগানুগা
চসা।
কামানুগা সম্বন্ধানুগাচেতি নিগদ্যতে ॥

রাগাত্মিকারভাবে লুব্ধ যার হয় মন।
রাগানুগা অধিকারী হয় সেই জন ॥
রাগাত্মিকা নিষ্ঠা গোপগোপী
ব্রজবাসী।
তত্তদ্ভাবে লুব্ধচিত্ত আপনাতে বাসী ॥
সেইভাবে চিত্তলুব্ধ অনুগত হন।
লোভে অধিকারী হয় রাগানুগাজন ॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পরম মাধুরী।
গোপগোপী সঙ্গে কৃষ্ণ নরলীলা করি ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর লীলা ক্রমে।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা ভাগবতে শুনে ॥
কোন ভাগ্যবান জীবের মনে হয় ক্ষোভ
গোপগোপীকার ভাবে তার হয় লোভ ॥
বিধি অবিধি শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে!
ব্রজলোকের ভাব লঞা কৃষ্ণ সেবে
প্রেমে ॥
কৃষ্ণ সুখে অবিধিকে বিধি করি মানে।
কৃষ্ণ সুখ বিনে বিধি সে অবিধি জানে
সেই হয় অধিকারী রাগানুগা সাধনে।
ব্রজলীলায় লুব্ধ চিত্ত সদা যার প্রেমে ॥

যথা শ্রীমতঃ—
রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসী
জনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো
ভবেদত্রাধি কারবান্ ॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদ-
পেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি
লক্ষণং।

বৈধী ভক্তি অধিকার তদবধি রয়।
যদবধি নাহি হয় ভাবের উদয় ॥
শাস্ত্র যুক্তি তর্কাপেক্ষা বৈধির সাধনে।
রাগানুগার অনুগত কিছু নাহি মানে।

যথাতত্র—
বৈধি ভক্ত্যাধিকারি তু ভাবাবির্ভব
নাবধিঃ।
তত্র শাস্ত্রং তথাতর্ক মনুকুলমপেক্ষতে ॥

রাগানুগা সাধনের পরিপাটী ক্রমে।
তাহার সোদাহরণ গোস্বামীর বর্ণনে ॥
রাগানুগা জনে বাস করিবে ব্রজপুরে।
কৃষ্ণ কথাদি রত হৈয়া আনন্দ অন্তরে ॥

নিজ সমীহিত কৃষ্ণ আনুগত্য লঞা।
স্বযূথ আশ্রিঞা সেবা ব্রজেতে বসিঞা॥
শরীরে তেবসতি যদিবা নাহি হয়।
মানসেয় ব্রজলোক করিবে আশ্রয়॥
যথা—
কৃষ্ণধনং শরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাৎ বাসং ব্রজে সদা॥
রাগমার্গে কৃষ্ণ সেবা দুইরূপে হয়ে।
সাধক দেহেতে এক আর সিদ্ধ দেহে॥
যথাবস্থিত দেহকে সাধক বলিয়ে।
অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহ সিদ্ধ বলি কহে
দুইদেহে ব্রজলোকের হৈঞা অনুগত।
ইহ রাগ মার্গে সেব শ্রীকৃষ্ণ সতত॥
রাগাত্মিকা নিষ্ঠ প্রেষ্ঠ ব্রজবাসীগণ।
তা সভার ভাবে লুব্ধ রাগানুগা জন॥
দুই দেহে কৃষ্ণ সেবা করহ যতনে।
গোগোপীর আনুগত্যে প্রীতি আচরণে॥
যথা তত্রৈব সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধ-রূপেন চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কুর্য্যাব্রজলোকানু-সারতঃ॥
ব্রজলোকের অনুসারে রাগানুগ সাধন।
সেই ব্রজ লোক হয় দ্বিবিধ লক্ষণ॥
ব্রজলোক হয়ে এক ব্রজবাসীগণ।
গোপগোপী দাসদাসী পিতামাতা জন॥
আর ব্রজলোক কহি ভক্ত অনুগত।
সিদ্ধ ভক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সব মহান্ত॥
তাহে পরিপাটী শুন শাস্ত্রের বিচার।
সিদ্ধদেহে আচরিবে গোপের আচার॥
সাধক দেহেতে সিদ্ধ মহান্ত সম্মত।
পূর্ব্ব মহান্ত সব যেরূপে আচরিল।
সাধক দেহেতে সেবা তৈছন কহিল॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আদি সেবা শুশ্রূষণ।
সিদ্ধদেহে মানসিক শ্রীকৃষ্ণ সেবন॥
গোপগোপীর অনুসারে মানসে সেবন।
সময়ানুসারে স্ব স্ব যূথের মিলন॥
এইরূপে ব্রজলোক ত্রিবিধ কহিল।
এইরূপে দুইদেহে সেবন বলিল॥
তাহা না জানিয়া কেহ সিদ্ধরূপ ক্রিয়া।
আচরণ করিতে চায় সাধক হইয়া॥
সেই আচরণ হয় অপরাধ লাগি।
সেবাধর্ম্ম ত্যাগ করি অধর্ম্মের ভাগি॥
সাধক দেহেতে করে সেবা জপত্যাগ।
শ্রীমূর্ত্তি পূজা ধর্ম্মে ছাড়ে অনুরাগ॥
তাহা সভার হয়ে জানি সব অত্যাপাত
আপনার মুণ্ডে পাড়ে বজ্র দণ্ডাঘাত॥
যথা—
শ্রীজীব গোস্বামীনঃ ব্যাখ্যা—
সাধকরূপেন যথাবস্থিত দেহেন।
সিদ্ধরূপেন অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহেন।
তস্যব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠস্য যোভাবঃ।
রতি বিশেষ তল্লিপ্সুনা ব্রজলোকাস্তত্তৎ কৃষ্ণ
প্রেষ্ঠজনা তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ॥
অন্যচ্চ—
ব্রজলোকস্ত দ্বিবিধাস্তত্র ব্রজস্থাঃ যে গোপ গোপ্যঃ।
তথা তৎ অনুগত মহানুভাব প্রবরাশ্চ যে মহান্তাঃ
শ্রীরূপাদয় স্তেপি ব্রজলোকাঃ তয়ো-

সেবা কার্য্যা এবমজ্ঞাত্বা কেচিৎ
স্বশিরসি
মহাবজ্র নিপাত মন্বস্তে॥
বৈধিভক্তি প্রকরণে যে সব লিখন।
রাগমার্গে কোন অঙ্গ করিবে আচরণ॥
স্ব স্ব যোগ্য অঙ্গ বুঝি করিবে স্বীকার।
সাধকাবস্থায় জানি নবধা প্রকার।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি পাদ সম্বাহন।
অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন॥
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজে করি বাস।
সদা কৃষ্ণ পরিচর্য্যা প্রেম পরকাশ॥
এইরূপে দুইদেহে সাধন কহিল।
রাগানুগা ভক্ত প্রতি গ্রন্থে সূচাইল॥
যথা শ্রীমন্তঃ—
শ্রবণোৎ কীর্ত্তনাদিনিবৈধি ভক্ত্যু
দিতানিচ।
যান্যঙ্গানিচতান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি
মনীষিভিঃ॥
যথা বৈধি ভক্ত্যুদিতানীতি স্বযোগ্যা-
নীতিজ্ঞেয়ং
তত্র কামানুগা—
সাকামানুগাদ্বিধা॥
কামারূপানুগামিনি তৃষ্ণাষা তদাত্মিকা
ভক্তিঃ
সা কামানুগা মুখ্যাজ্ঞেয়া।
সংভোগেচ্ছাময়ী কাম প্রায়ানুগা-
জ্ঞেয়া সংভোগং সংযোগ ইতি॥
যথা—
কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানু
গামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি
সাদ্বিধা॥
এই দুইয়ের অধিকারী সেই জন্য হয়।

শ্রীমূর্ত্তিরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দর্শনে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী সহ বিহার শ্রবণে॥
তত্তলীলা আস্বাদনে ক্ষোভ হয় মনে।
সেই হয় অধিকারী রাগানুসাধনে॥
অতএব ত্রেতাযুগে ঋষি ভক্তগণ।
দণ্ডকারণ্যে পাঞা রাম সন্দর্শন॥
সুবিগ্রহ রামমূর্ত্তি মনোহর দেখি।
দুর্ব্বাদলশ্যামতনু কিশলয় আঁখি॥
তৈছন রূপে ভোগ করিতে হৈল মন।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি ত্যজিল জীবন॥
তাহা সবে ব্রজাঙ্গনে গোপীদেহ হৈঞা।
শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ পাইল রাসকালে
যাঞা॥
যথা পাদ্মে—
পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্য
বাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন
সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ
গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা
ভবার্ণবাৎ।
ইতি॥
রমণ রাস না করে বিধিমার্গে সেবে।
সেহ মহাষির সনে কৃষ্ণচন্দ্র লভে॥
যথা কূর্ম্মে—
অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্ব-
মাপিরে।
ভর্ত্তারং চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং
বিভুং ইতি॥

বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩২১

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। (২)

ত্রিভুবন-কমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়-সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ২

অর্জ্জুনের সখারূপে কুরুক্ষেত্র রণে
কি অপূর্ব্ব রূপ আমি দেখিনু নয়নে!
সে রূপের দরশনে, অভিলাষী সর্ব্বজনে,
ত্রিভুবনে সে রূপের তুলনা না হয়,
ফলের আকাঙ্ক্ষা হীন, প্রেম মোর অনুদিন,
সে অপূর্ব্ব রূপ তরে হউক উদয়।
তমালের মত নীল অঙ্গের বরণ
পীতবাস শোভা পায়, প্রাতঃসূর্য্যকর তায়,
নির্ম্মল উজ্জলকান্তি করিছে বিস্তার
বীররসাবেশে জাগে মাধুর্য্য অপার।
দোলায়িত কেশপাশ দিয়া পরিবৃত।
বদন কমল শোভা বর্ণনা-অতীত॥

যুধিতুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্
কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি
খিলসৎ কবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩

পার্থ সারথির বেশ সেই শ্রীকৃষ্ণেতে।
রমণ করুক মোর মন হরষেতে॥
ভক্তবাৎসল্যের ভরে, সারথির বেশ ধরে',
বিষম সমরক্ষেত্রে, পরম কারণ,
অশ্বখুরোত্থিত ধূলি মস্তকভূষণ।
কুন্তল ধূসর তায়, দুলি দুলি শোভা পায়,
শ্রমজাত স্বেদবিন্দু বদন কমলে,
ছিন্ন ভিন্ন দেহ, মোর তীক্ষ্ণশরজালে।
দেহক্ষতে হইয়াছে কবচের শোভা,
সে অপূর্ব্ব রূপ মোর অতিমনোলোভা॥

সত্যের পূজা।

অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত পা নাড়িতে নাড়িতে শিশু একবার টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিশু ভাবিয়াছিল দৌড়িয়া একেবারে অনেক দূর চলিয়া যাইবে। এমনতো হইয়াই থাকে! শিশু নিজের শক্তির পরিমাণ জানে না তাই সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। যাউক না পড়িয়া! সবুর কর, আবার সে উঠিবে, আবার দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিবে, সামান্য দূর যাইয়া আবার পড়িয়া যাইবে। এমনি করিয়া অনেকবার পড়িতে পড়িতে তবে সে হাঁটিতে শিখিবে। অনেকবার আছাড় না খাইয়া কেহ কখন হাঁটিতে শেখে নাই। যখন নিজের পায়ে ভর করিয়া হাঁটিয়া চলিতে হইবেই, যখন চিরকাল পরের কোলে চড়িয়া চলিবে না, আর যখন অনেকবার আছাড় না খাইলে হাঁটিতে শেখা যায় না, তখন আছাড় খাওয়াকে ভয় কর কেন?

শিশু যখন খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সদর্পে ও সবেগে দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সকলেই হাততালি দিয়া শিশুকে উৎসাহিত করিল। সকলেই যেন শিশুর আনন্দে আনন্দিত! কিন্তু ঠিক তাহা নহে। এই সকল হিতৈষী বন্ধুদের দলে অনেক রকমের লোক ছিল। শিশুর আনন্দে আনন্দ, শিশুর মঙ্গলে মঙ্গলবোধ কাহারও কাহারও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ হিতৈষী বন্ধু নিজেদের জন্য স্বর্ণ-সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক দিন অনেক দিকে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, অনেকেরই হিতৈষী হইয়াছেন, অপরের হিতৈষী হওয়াই তাঁহাদের ব্যবসায়, কিন্তু স্বরূপতঃ তাঁহারা আত্মহিতৈষীর দল।

শিশু যখন দৌড়িতেছিল, তাহার গাত্রের দু একখণ্ড স্বর্ণ-অলঙ্কার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে ছিল, সত্যই যাঁহারা হিতৈষী তাঁহাদের সেদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু স্বর্ণ-সঞ্চয়ের আশায় যাহারা আসিয়াছিল তাহারা অপরের অগোচরে গোপনে সেগুলিকে আত্মসাৎ করিতেছিল।

হঠাৎ শিশু আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। যাহারা স্বরূপে আত্মহিতৈষী অথচ শিশুর হিতৈষী সাজিয়া তাহার শক্তি বিকাশে উৎসাহের করতালি দিতেছিল, তাহাদের অনেকেই কিছু কিছু স্বর্ণকণা লইয়া সরিয়া পড়িল, ভাবিল এখানে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন অন্যদিকে অন্য উপায়ে অদৃষ্ট পরীক্ষার চেষ্টা করা যাউক।

শিশু আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে পায়ে বড় লাগিয়াছে, তবে নিরাশ হইবার কারণ নাই, ঔষধ লইয়া আইস শিশুর জ্ঞান আছে, একটু পরে পা সারিয়া যাইবে আবার শিশু উঠিবে।

কপট বন্ধুদিগের মধ্যে একদল তখনও বসিয়াছিল। লোক ঠকাইবার ব্যবসায়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা খুব বেশী। তাহাদের দলও খুব বড়। তাহারা এখন কি করিতেছে আপনারা কি জানেন? আপনারা তাহা জানেন না। আপনাদের চক্ষু আছে, দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ভাবেন না যে, তাই ত বুঝিতে পারেন না। ঐ দেখুন তাহারা শিশুর মুখে আফিং এর জল দিতেছে, ঐ দেখুন তাহারা ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহিতেছে। হায় হায় শিশু কি ঘুমাইয়া পড়িবে, হায় আমাদের শিশু! এত বড় বংশের প্রদীপ তুমি, আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল তুমি, কোন্ শুভলগ্নে তুমি জন্মিয়াছ আমরা তাহা জানি না, এতদিন তুমি কোন্ গোপনে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলে তাহাও আমরা জানি নাই.

সুন্দর হাসিতে আমাদের নিরাশার গভীর আঁধার নিমেশের জন্য দূর হইয়াছিল, তোমার উৎসাহময় আধ আধ কথায় আমাদের প্রাণের মধ্যে আশার মোহিনী রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছিল! তুমি কি আবার ঘুমাইবে? তোমার ঘুম যে বড় ভয়ানক ঘুম! অনেক সাধনার ফলে, আমাদের বড় সৌভাগ্যের বলে তুমি জাগিয়াছ, আবার যদি তুমি ঘুমাইয়া পড়, তাহা হইলে আরতো আশা নাই।

তোমার ঘুম পাড়াইবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ ও আয়োজন, কি হয় বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় বা তুমি ঘুমাইয়া পড়। ওগো তোমরা কপটের দল, ওগো দোহাই তোমাদের, আর অমন করিয়া আফিংএর জল খাওয়াইওনা, ওগো আর অমন করিয়া ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহিওনা। তীব্র সত্যের উত্তপ্ত আলোকের মধ্যে শিশুকে জাগিয়া থাকিতে দাও, বেদনা অনুভব করিতে দাও। এই বেদনার অনুভূতির মধ্যেই যে জীবনের পুষ্টি। শিশুর সামান্য দু একখান স্বর্ণ অলঙ্কারের লোভে সর্ব্বনাশ করিও না, তাহাকে মহানিদ্রার দিকে ভুলাইয়া লইয়া যাইও না। ওগো, তোমরা কি জাননা যে এই শিশু হীরকবন্দরে যাইয়া আমাদের সকলের জন্য হীরক আনিয়া দিবে, এতদিন ধরিয়া যে হীরকের কথা কেবল শুনিয়াছি, কেবল ভাবিয়াছি, এই শিশু যখন সবল হইবে তখন সেই তাহা আনিয়া দিবে। হায় তবুও তোমরা শুনিবে না। দাঁড়াও প্রতিবাসীগণকে ডাকি! ওগো প্রতিবাসীগণ, একবার আসিয়া আমাদের সকলের একমাত্র ভরসার স্থল শিশুটিকে এই কপট বন্ধুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে, একবার দল বাঁধিয়া এইদিকে এস। কেহই আসিল না। কপটীরা তাহাদেরও বুঝি ঘুম পাড়াইয়াছে, যাহাদের ঘুম পাড়াইতে পারে নাই, তাহাদের বশীভূত করিয়াছে। এখন উপায় কি? এ সর্ব্বনাশের কথা কাহাকে বলিব? কে ভাবিতে চায়, কে বুঝিতে চায়, কে সত্য চায়!

সত্যের মূর্ত্তি বীভৎস। কিন্তু তবুও সে সত্য, তাহার সম্মুখেত দাঁড়াইতে হইবে। কারণ সত্য ছাড়া গতি নাই। মিথ্যার মূর্ত্তি বেশ সুন্দর, তাহার কথাও খুব মিষ্ট, হাসিও খুব সুন্দর, কিন্তু সে যে আমাদের শত্রু। ওগো তোমরা ভয় পাইও না। সত্যের মূর্ত্তি বীভৎস বলিয়া মিথ্যার চরণ-ছায়ায় আরামে শুইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিও না।

সুন্দর দেহে বিষময় ক্ষত হইয়াছে, ওগো তোমাদের কাতরে মিনতি করিয়া বলিতেছি সুদৃশ্য বস্ত্রে তাহা আবরণ করিয়া উঁচু গলায় বলিও না কিছুই হয় নাই। এমনি করিয়া আবরণ করিয়া করিয়া, এমনি করিয়া লোককে ঠকাইতে গিয়া যে

নিজেকে বঞ্চনা করিতেছ, ক্ষত যে ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া যাইতেছে, মৃত্যু যে আসন্ন, ওগো দোহাই তোমাদের, সত্যের দিকে চাও! আবরণ খুলিয়া ক্ষত বাহির করিয়া ফেল, ক্ষত হইয়াছে স্বীকার কর। লজ্জা কি? সকলেরই এমন ক্ষত হয়। লোকের নিন্দা বা প্রশংসার জন্য ব্যাকুল হইও না, সুস্থ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার লাভ নাই, সুস্থ হওয়াই প্রয়োজন। সূর্য্য উঠিয়াছে, বায়ু বহিতেছে, উহার মধ্যে সকল রকম রোগের বীজ বিনাশ করিবার শক্তি নিহিত আছে। হয়ত আবরণ খুলিয়া প্রকাশ্যে সূর্য্যালোকে ও বায়ু প্রবাহে অসিলেই ক্ষত শুকাইয়া যাইবে আবার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য পাইবে। যদি তাহাতেও না যায়, অনেক চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা এদিক ওদিক, চারিদিকে বেড়াইতেছেন! তাঁহাদের জানিতে দাও, কাহার নিকট কি ঔষধ আছে কে জানে! ক্ষত খুলিয়া রাখো, চিকিৎসক আসিবে, ঔষধ আসিবে। লুকাইয়া রাখিলে বিনাশ, অবশ্যম্ভাবী বিনাশ।

সত্যরূপে বিশ্বেশ্বর, তোমার মহিমার ছটার মধ্যে একবার আসিয়া আমাদের পুরোদেশে প্রকাশিত হও। আমাদের অন্তঃপুরের গুপ্ত অন্ধকার যে সমস্ত পূতিগন্ধ গোপনে পালন করিয়া অলক্ষিতে আমাদের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে আমাদের সাহস দাও, তাহা দূর করিতে আমাদের প্রবৃত্তি দাও।

বজ্রহস্তে হে দানবারি! তুমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হও! তোমার বিক্রমে তাহারা পর্য্যুদস্ত হউক, যাহারা মিথ্যার ব্যবসায়ী, যাহারা অহিফেন-বিষ জর্জ্জরিত রোগীকে ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনাইয়া মহানিদ্রায় তাহাকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বর্ণালঙ্কার আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রেমময়, আনন্দ স্বরূপ! তোমার অনুরাগভরা ঢল ঢল নয়নযুগল আমাদের জ্যোতিহীন নয়নের উপর স্থাপন কর। আমরা তোমার দৃষ্টিতে অন্তর ও বাহির পবিত্র করিয়া মানুষকে যেন আর ঘৃণা না করি। সমাজের বিচারক হইয়া যেন বৈষম্য না ঘটাই। একই পাপে দুইজন পতিত একজন দুর্ব্বল একজন সবল, দুর্ব্বলকে পদে ঠেলিয়া যেন সবলের পদে মস্তক বিক্রয় না করি। যেন উভয়কেই প্রেম নেত্রে দেখিতে পারি। আমাদের প্রেম-দৃষ্টির প্রভাবে যেন উভয়েরই অন্তরের সুপ্ত নারায়ণ জাগিয়া উঠেন।

কপটীর সংসর্গ হইতে আমাদের রক্ষা কর, যাহারা কপটী তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি দাও তাহারা যেন সত্যের সেবক হইয়া তোমার নিত্যদাসের অভিমান লাভ করে।

যে শিশু পড়িয়া গিয়াছে, তুমি কি তাহাকে জাগাইবে না? তুমি যে পূর্ণ-জাগরণ তুমি সকলেরই ঘুম ভাঙ্গাইবে আমরা যে এই আশা বুকে করিয়া কত সম্বৎসর দিনরাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। তুমি জাগাইবে! হে নিরঞ্জন, তোমার জয় হউক!

বৈষ্ণব-মহাসম্মিলন।

(৪)

যে সময়ে এই মহা-মহোৎসবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই সময়ে বৈষ্ণব-সমাজ বহুবিস্তৃত হয় নাই। তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাবল্যে তখনও বৈষ্ণব সমাজ টলমল করিতেছিল। বৈষ্ণবগণ তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেছিলেন। খড়দহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কণ্টকনগর, এক চক্রা, আকাইহাট বৈষ্ণবগণের "পাট" ছিল। শ্যামানন্দ উৎকলে যাইয়া উৎকলের বৈষ্ণবগণকে, আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত উৎকলের অনেক বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় কাঞ্চনগড়িয়া বা কাঞ্চন নগরে সে সময়ে ছোট খাট একটী বৈষ্ণব সমাজ বা পাঠ ছিল। যে সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য খেতুরি আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে পথে এই গ্রামে আসিয়া তিনি দুইদিবস অবস্থিতির পর :—

"দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদ প্রধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান্‌॥
দুই ভাই শিষ্য হৈল পিতার নিদেশে।
পরম পণ্ডিত মত্ত সঙ্কীর্ত্তন রসে॥" (নরোত্তম-বিলাস)

আচার্য্য ঠাকুর এই দুই জনকে শিষ্য করিয়া ভুধরে যান। ভুধরের কোনও বৈষ্ণবের নাম আমরা পাই নাই। এই তালিকা হইতে দেখিতে পাই, এই সময়ে বৈষ্ণব সমাজ প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অদ্বৈত-সম্প্রদায় ও নিত্যানন্দ সম্প্রদায়। অদ্বৈত-সম্প্রদায় আবার দুই ভাগে বিভক্ত। সীতা-ঠাকুরাণীর একদল ও অদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান অচ্যুতানন্দের

ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া আপন আপন দীক্ষাগুরুর পদানুসরণ করিতেছিল। এই সকল বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন বৈষ্ণবদলকে একত্র করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এই জন্য নরোত্তম ঠাকুর উল্লিখিত গ্রামে গ্রামে যাইয়া তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জাহ্নবী ঠাকুরাণীর, এই সময়ে, প্রভাব বৈষ্ণব সমাজে অপ্রতিহত ছিল। সকলেই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি ও পূজা করিতেন। জাহ্নবী ঠাকুরাণী খেতুরি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলে সহসা দৈববাণী হইল, সেই বাণী বলিতে লাগিল :—

"পরম গভীরনাদে কহে বার বার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার ॥
নিজগণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীন।
নিরন্তর আমি যে দোঁহার প্রেমাধীন ॥
খেতরি গ্রামেতে গণসহ সঙ্কীর্ত্তণে।
করিব নর্ত্তন দেখিবে সর্ব্বজনে ॥
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিবে সর্ব্বলোক।
না রহিবে কাহার কোন দুঃখ শোক ॥
সর্ব্ব সিদ্ধি হৈবে তথা তোমার গমনে।
সভে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে।
খেতুরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন।" (নরোত্তম-বিলাস)

আমরা সদাসর্ব্বদা যে বিষয়ের ধ্যান করি, সদাসর্ব্বদা যে বস্তুলাভের জন্য তন্ময়প্রাণ হইয়া সেই জ্ঞানে বিভোর হই, তখন আমাদের বাহ্য জ্ঞান লোপ পায়। আর বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে না। সেই সময় আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া জগত-ব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত করিয়া আমাদের আত্মাকে তপোসিদ্ধির সংবাদে পুলকিত করে। দার্শনিক ইহাকে ঋষি-স্বপ্নের অধিক বলিতে পারেন না, হিন্দু ইহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ বলিয়া আপনার অস্তিত্বে আর বিশ্বাস করেন না। এই প্রকার দৈববাণী অহর্নিশি সাধকের হৃদয়ে হইতেছে, যাঁহার কর্ণ আছে তিনিই কেবল এই দৈববাণী শুনিতে পাইতেছেন। সংসার আমোদ হিল্লোলে বাসনার প্রবল

গ্রাহ্য হইতেছে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান আমাদের গ্রাহ্য নয়। আমরা দৈববাণী বিশ্বাস করিব কি করিয়া। জগতের কবি শেক্ষপিয়র দেখাইয়াছেন মানবের আত্মা মৃত্যুর পরও স্বীয় শক্তিতে কার্য্য করিয়া থাকে। বিপ্লব-বাদীরা সিজারকে হত্যা করিলেও তাঁহার শক্তির নিধন সাধন করিতে পারে নাই। সিজারের আত্মশক্তি তাঁহার দেহত্যাগের পর রক্তবীজের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রোম সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বিপ্লব-বাদীরা সে তেজে ভস্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যলীলায় ভক্তমন বিমোহিত করিয়া ভক্তকে দৈববাণীরূপে বলিয়া দিতেছেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। খেতুরির এই মহাসম্মিলনে তাঁহারই প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে—"না রহিবে কাহারও কোন দুঃখ শোক" ভক্ত এ আহ্বান কি ঠেলিতে পারে? সাধক কি এ সাধনা ভুলিতে পারে? অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এই অভিন্ন সম্বন্ধ আছে বলিয়া জগৎসংসার আজও চলিতেছে তাই মানব মর হইয়াও অমর। আমরা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যে নিত্য সম্বন্ধ সে ধ্যান ধারণা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানকেই জীবনের সার সর্ব্বস্ব করিয়া অতীতের মহিমাময় ভাব হইতে বিয়োজিত হইয়া উন্নতি, উন্নতি করিয়া আত্মহারা হইয়াছি। দুঃখকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। ধ্যানচক্ষু অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানচক্ষু দেখিবে কি?

অতীত কালের মহা মহা বৈষ্ণবগণ, খেতুরির মহোৎসবে গণসহ বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণবগণ সহ মিশিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। জাহ্নবী ঠাকুরাণী, উৎসবান্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন যাইবেন এই সংবাদ তাড়িতবার্ত্তার মত দেশময় প্রচার হইয়া বৈষ্ণবগণকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। জাহ্নবী ঠাকুরাণী, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, অম্বিকা, আকাইহাট, কণ্টকনগরাদি হইয়া, নিখিল বৈষ্ণব-সমাজ সহ গোপালপুর রাজ্যের রাজধানী খেতুরিতে প্রবেশ করেন। প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ কতক পথ দোলায়, কতক পথ নৌকায়, আসিয়াছিলেন। পদ্মানদীর এক পারে "বুধরি" গ্রাম অপর পারে "খেতুরি"। পদ্মা পার হইতে এক দিবস কাল সময় লাগিয়াছিল। সেকালের লোকের দৈববাণীর প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। বলিতে গেলে খেতুরির মহোৎসব এই মহামহিমান্বিতা বাণীরই ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। তিনি যেখানে যেখানে যাইয়া বৈষ্ণবগণকে তাঁহার

তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। ভারত ইতিহাসে প্রেমভক্তিতে, রমণীর সমাজের উপর আধিপত্যের কথা কমই পাঠ করিয়াছি। পতি-ভক্তিতে স্নেহ, মমতা, দয়া, পরদুঃখকাতরতায় ভারত-ললনা অতুলনীয়া। ক্রীতদাস উদ্ধারিণী ইংরেজ-রমণী স্প্রিল বা কারাক্লেশ নিবারিণী নাইটেনগেল্ ভারত রমণীর উপচীকির্ষার আলেখ্য হইতে পারে, জন অব আর্ক বীরবীর্য্যে পাশ্চত্যভূমি স্তম্ভিত করিতে পারে কিন্তু রমণী ঐশ্বর্য্যাভাবে তাঁহাদিগকে এক জাতীয়া বলা যাইতে পারে না। কৃপাণ করে অশ্বপৃষ্ঠে ভারত-ললনাকে বিপক্ষের সম্মুখে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিজয়শ্রী লাভ করিতে দেখিয়াছি, আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অম্লান বদনে জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছি, পরপুত্র রক্ষার জন্য আপন আত্মজকে কৃতান্ত কবলে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বয়ের তর্ক-যুদ্ধের মধ্যস্থ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রেমবন্যায় সমগ্র মানব সমাজকে ভাসাইয়া, জননীর স্নেহে মহাশক্তির প্রভাবে মানব হৃদয়ের প্রেমভক্তির রত্নসিংহাসন পাতিয়া লোক-শিক্ষার পথ একেবারে উন্মুক্ত করিতে আমরা দেখি নাই। এই কার্য্যে একমাত্র হিন্দু ললনাই বরণীয়া। এই জন্য আজও হিন্দু সমাজ, শত সহস্রের বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাত প্রতিহত করিয়া অটল অচল হিমাদ্রির মত আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে কালে তীর্থদর্শনাদি কার্য্য একটি দুষ্কর ব্যাপার ছিল। একাকী কাহারও তীর্থাদি দর্শন কার্য্য সমাধা করা সাধ্য ছিল না। একে দুর্গম দীর্ঘ পথ, তাহার উপর দস্যু আদির ভয়। একাকী কেহ এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইত। সকলেই সুযোগ প্রয়াসী হইয়া থাকিত। দেশের গণ্য-মান্য লোক তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলে অনেকেই তাঁহাদের সঙ্গ লইত। দৈববাণীর অনুজ্ঞায় জাহ্নবী ঠাকুরাণী তীর্থ পর্যাটনে বাহির হইবেন। এই শুভ মুহুর্ত্তে জাহ্নবী-ঈশ্বরী প্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন যে খেতুরের উৎসবান্তে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার সন্দর্শনাশায় উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহার পথপানে চাহিয়াছিল, গৌড়ের ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা তাঁহার সঙ্গে তীর্থ দর্শনে যাইতে পারে। পরমাহ্লাদে বহু প্রেমিক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। উত্তররঙ্গের গ্রাম জাহ্নবী ঈশ্বরীর পদার্পণে ধন্য হইয়াছিল। এই সংসারের যত কিছু মনোমদ, যত কিছু প্রীতিপ্রদ যত কিছু সুন্দর সকলই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া ভাবের

সেবাব্রতে নিযুক্ত হইয়া, আপন আপন স্বভাবধর্ম্মের বিকাশ করিয়া থাকে। অসংখ্য বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মার্থী নরোত্তমের সাধু সংকল্পের সাহায্যার্থী হইয়া খেতুরে এক মহারাজসূয় যজ্ঞের অবতারণা করিয়াছিলেন। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর সহ সমুদয় বৈষ্ণব সমাজকে উৎসব স্থানে খেতুরে উপস্থিত করিয়া আমাদের জন্য সেকালের একটী সম্পূর্ণ প্রতিনিধির তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অতীতের বিস্মৃতির গর্ভ হইতে আমরা অতীতের সেদৃশ্য কবির ভাষায় কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এখানে দেখাইতেছি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি অভিন্ন সম্বন্ধ ;—

(১)

খড়দহ ;—তথায় ছিলেন কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
সূর্য্যদাস সারকেল জেষ্ঠ ভ্রাতা তার॥
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারী চৈতন্য জ্ঞান দাস মনোহর॥
কমলাকর পিপলাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধবাচার্য্য যার চেষ্টা সুবিদিত॥
নৃসিংহ চৈতন্যদাস কানাঞি শঙ্কর॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর।
শ্রীমীন কেতন রামদাস মহাশয়॥
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময়।

* * * * *

ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরদাস।
করিল গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস॥

* * * * *

রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥ ইত্যাদি

(২)

খড়দহ হইতে সকলে অম্বিকা আসিলেন তথায়
জাহ্নবী-ঈশ্বরী হৃদয় চৈতন্যেরে।
কহিলেন সকল প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে

শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস।
হেনকালে গণ সহ আইলা প্রভুপাশ॥
শ্রীচৈতন্যদাস আদি স্থির কৈলা মনে।
খেতরি যাইব শ্রীউৎসব দরশনে॥ ইত্যাদি

(৩)

অম্বিকা হইতে সকলে শান্তিপুরে আসিলেন তথায়
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জ্জর দেহ-ধারণ সংশয়॥
শ্রীসীতা মাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হবে প্রভাতে গমন॥

(৪)

শান্তিপুর হইতে সকলে নবদ্বীপ আসিলেন তথায় :—
শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে মাধবাচার্য্যাদি প্রতি॥

অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপালময়।
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয়॥
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন॥ ইত্যাদি

(৫)

নবদ্বীপ হইতে সকলে আকাইহাট আসিলেন :—
আইলা আকাই হাট কৃষ্ণদাসের ঘরে॥
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।
আপনা মানয় ধন্য আনি নিজ বাসে॥ ইত্যাদি

(৬)

তথা হইতে কণ্টক নগরে :—
প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া।

তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দন গণ সাথ।
শিবানন্দ সহ আইলা মিশ্র বাণী নাথ ॥
বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য।
নর্ত্তক গোপালজিতা মিশ্র বিপ্রবর্য্য ॥
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনয়নানন্দ মিত্র মঙ্গল বৈষ্ণব ॥
আইলেন ঐছে বহু প্রভু প্রিয়গণ।
পরস্পর হৈল অদ্ভুত মিলন ॥

এই শেষোক্ত বৈষ্ণবগণের নিবাস বনবিষ্ণুপুর। রাজা বীর হাম্বিরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের সহিত ইঁহারা কণ্টকনগরে আসিয়াছিলেন। তথা হইতে খেতুরি গমন করেন।

উৎকল হইতে শ্যামানন্দের সহিত নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়াছিলেন ;—

শ্রীবাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥
চট্টরাজ রামকৃষ্ণ মুকুন্দাদি সনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিব কোন জনে ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সবে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥

এই সব বৈষ্ণবগণ শুধু উৎসব দেখিতে বা আনন্দ করিতে আইসেন নাই। সকলেই সাধ্যানুযায়ী উৎসবের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে করিয়া আনিয়া ;—

এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সবে সর্ব্বাংশে উত্তম ॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে।
তাহা রাখাইলেন গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে ॥

দেশ বিদেশ হইতে সুধী ভক্তগণ আপন আপন সাধ্য-মত উপচার সঙ্গে লইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর এই জাতীয় মহা-সম্মিলনের প্রতিনিধি-স্বরূপ উত্তর বঙ্গের একজন রাজার আহ্বানে জাহ্নবী-ঈশ্বরীর আকর্ষণে খেতুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসী হিন্দুর এই প্রথম জাতীয় সম্মিলনে, ব্রাহ্মণ,

উজ্জীবিত হইয়া, প্রাণের আবেগে, প্রেমের আমন্ত্রণে, ভক্তির মহিমায় এক মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রেমের যে মহাসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, আমরা আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাহার ক্ষীণ রেখা টানিতে অসমর্থ হইয়া বলিতেছি "এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক সিংহাসন।"

সকল বৈষ্ণবের শুভাগমন হইলে রাজা সন্তোষ দত্ত তাঁহাদের যথোপযুক্ত বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম, তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কবি নরহরি বিনা আড়ম্বরে অল্প কথায় তাহা নিম্নলিখিত মতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

গণ সহ ঈশ্বরীর বাসা হৈল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা॥
রঘুনাথ আচার্য্যের বাসাঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের বাসা যেইখানে।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে যথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত ব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত রায়॥
শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে॥
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদির ঘরে।
সমর্পিলা রাজকৃষ্ণ কুমুদ আদিরে।
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বাসাস্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে॥
আর আর বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা॥
সর্ব্বত্র যাইয়া সবে করি পরিহার।

এইরূপে সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে হিন্দুর প্রাচীন প্রথানুসারে রাজা সন্তোষদত্ত সকলকে সভায় বরণ করিলেন। এ বরণ আর কিছুই নহে সকলকে বস্ত্র দান। সকল মোহান্তগণ সন্তোষচিত্তে "বরণ" গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। ডোর-কৌপিন-সর্ব্বস্ব বিষয় বৈরাগ্যশালী ভোগ-বিলাসশূন্য প্রেমভক্তি-দাতৃগণের এই পট্টবস্ত্র পরিধান কেশব ভারতীর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া আমরা মনে করি। এই খানেই আমরা দেখিতে পাই অলক্ষ্যে ভোগ-বিলাসের শিখা ধীরে ধীরে বৈষ্ণব-সমাজে জ্বলিতেছে। ভক্তের "প্রভু" ভক্তি তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে। সেই জন্য কবি বলিয়াছেন;—

সোণার বিগ্রহ করি পূজ এক দিন।
সেওরে পরশ দোষে হয়রে মলিন॥

যে দেশে সাধকের সাধনায় দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে, যে দেশের মন্ত্রশক্তি মহিমা-হীন হইয়া শব্দ উচ্চারণেই শেষ হইয়াছে, যে দেশের ভক্তগণ আপনার প্রবৃত্তি উপাস্য দেবতায় অর্পণ করিয়া চিত্তের বিরাম লাভ করিয়া থাকে, সে দেশের লোকের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সেই দেশ কেবলমাত্র তান্ত্রিকের সাধনার উর্ব্বর ক্ষেত্র।

যে মন্দিরে ষড়বিগ্রহ স্থাপন হইবে তাহার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এই মহাধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মোহান্তগণ যাবতীয় ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ সহ সেই সভায় যাইয়া উৎসবের দিনে উপবেশন করিলেন। সে দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি। চ্যুত-মুকুল-সঙ্কুল পাপিয়া-কোকিল-কুলআরাবিত বঙ্গে পূর্ণ-বসন্ত বিরাজমান। আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না পুলকিতা যামিনী, মানবের মনে আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। সেই সময়ে শুভ মুহূর্ত্তে মহাসম্মিলন আরম্ভ হইল। কবি সরল ভাষায় তাহার কেমন একখানি সম্পূর্ণ ছবি আঁকিয়া আমাদের চক্ষের সাম্নে ধরিয়া দেখাইতেছেন;—

শ্রীমন্দিরের অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্ব্ব প্রকারেতে সুশোভিত॥
চন্দ্রাতপ তলে অতি অপূর্ব্ব আসন।
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমোহান্তগণ॥
বসিলেন শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যেখানে।

স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল ফল আদি বেষ্টিত আম্রশাখা॥
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে।
সব দেখিয়া গেলা আচার্য্যের স্থানে॥
শ্রীআচার্য্য সর্ব্ব মোহান্তেরে নিবেদিতে।
সবে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গনেতে আসনেতে॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ।
পরস্পর বাক্য সুধা করে বরিষণ॥

প্রথম দিন ভাগবতগণ সভাধিষ্টিত হওয়ার পর ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ যে যে গ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন তাহারই প্রচার কার্য্য হইয়াছিল। চৈতন্য চরিতামৃতের যশো সৌরভে সকলেই আমোদিত হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দিন চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই দিন বাঙ্গালা ভাষার কবিতা প্রমাণ স্বরূপ সংস্কৃত কবিগণের কবিতায় স্থান পাইয়াছিল। আর বাঙ্গালা কাব্যের সংস্কৃত টীকা এই দিনে সমাজে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এইরূপে প্রথম অধিবেশনের দিনে পবিত্র গ্রন্থাদি প্রচার কার্য্য শেষ হয়। অপবিত্র যার তার লেখা, গ্রন্থ, ভক্ত বৈষ্ণবের পাঠ্য নয় ইহাই সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। এই সাধু নীতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গ্রন্থ সমাজে প্রচারিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

দ্বিতীয় দিনের সভার অধিবেশনে পূজা পদ্ধতির বিচার করিয়া বৈষ্ণব মোহান্তগণ স্থির করিলেন ;—

"শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
হইবে সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে॥ (নরোত্তম বিলাস)

পূজার নিয়ম ও ক্রমাদি স্থির হইবার পর বিগ্রহের নামকরণ হইল। ভক্তগণ সকলে একবাক্যে বলিলেন,

"শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥"

অতঃপর গোস্বামী মোহান্তগণ শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিলে ষড় বিগ্রহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। জগতের সকল অমঙ্গল দূর করিয়া উৎসাহ ও ভক্তির গভীর নিনাদে ভক্তগণ হরিবোল, হরিবোল! ধ্বনি

স্বর্গীয় সৌরভ ও শান্তি আনয়ন করিলেন। স্বর্গ হইতে ভগবান যেন ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সচ্চিদানন্দরূপে ভক্তের আহ্বানে দেখা দিলেন। খেতুরে আনন্দ সাগরে ঢেউ উঠিয়া জগত সংসার প্লাবিত করিল! অতি পাষণ্ডেরও মন গলিয়া গেল। যাহারা কৌতুক দেখিতে ও প্রেমের সিংহাসন ঠাট্টা তামাসার বিদ্রুপে উড়াইয়া দিতে আসিয়াছিল তাহারাও সে দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া মূর্চ্ছা গেল। জগত প্রেম-ভক্তির জয়-ঘোষণা করিল। কবি গাইয়াছেন চির-প্রবাহিণী ভয়াবহা পদ্মা নদীও আপনার স্রোত শ্লথ করিয়া সে দৃশ্য অচল হইয়া দর্শন করিয়াছিল। প্রেমে মাতোয়ারা মোহান্তগণের অনুমতি পাইয়া তাঁহার কৃত "গড়াণহাটী" কীর্ত্তন তরঙ্গে দিক-সকল প্লাবন করিবার মানসে,

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে।

তখন দেবীদাস, গোকুলদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি দৈবকণ্ঠ গায়কগণ ও সুমধুর বাদকগণ সহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কবি নরহরি দেবিদাসের গীতবাদ্যের প্রশংসা করিয়াছেন;—

হেন প্রেমময় কভু না শুনিনু।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিনু॥
নরোত্তম কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাড়ে বারেবার॥
কি অদ্ভুত ভঙ্গী প্রকাশয় গানে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি উহার ভেদ জানে॥
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
এই হেতু পূর্ব্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ॥

[নরোত্তম বিলাস।

বিগ্রহ স্থাপনের পর বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইল। কাহাকেও অগ্র পশ্চাৎ সম্মান প্রদর্শন করা হইল না। মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞকালে অগ্রে যুগাবতারের পূজা হওয়ায় সেই অসংখ্য নৃপসাগর সংক্ষোভিত হইয়া বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। দেবব্রত ভীষ্মের অসীম সহিষ্ণুতা তার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই বৈষ্ণব রাজসূয়ে সে প্রকার কোনও বিভ্রাট সংঘটিত হয় নাই। আমন্ত্রণকারীরা সভামধ্যে—

পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীমালাচন্দন ।
স্বর্ণ মোহান্তের পাশে কৈলা সমর্পণ ॥
সভে প্রেমাবেশে পরস্পর উল্লাসিত ।
শ্রীমালা চন্দনে সবে হৈলা বিভূষিত ॥
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন ।
জয় ! জয় ! ধ্বনি করিলেন সর্ব্বজন ॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল ।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল ॥ [নরোত্তম বিলাস

সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে দৈববাণীর কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই মহা মহোৎসবে শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া, ভক্তগণের সহিত মিশিয়া প্রেমমদে মাতিয়া নর্ত্তন করিয়াছিলেন। আবার যখন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন, সকলে মহাশোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন। কবি নরহরি ইতিহাস লিখিয়াছেন, কাব্য লেখেন নাই। তাঁহার সময় গদ্যে কাব্য লিখিবার প্রথা থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি পদ্যে লিখিতেন না। কিন্তু এই সংকীর্ত্তন ব্যাপারে মৃত-ব্যক্তিগণকে অতীতের নিলয় হইতে আনিয়া সংগীত তরঙ্গে সুর মিলাইয়া যে নৃত্য করাইয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষে অতি অস্বাভাবিক হইলেও প্রাচীন লোকের নিকট অবিশ্বাস্য ছিল না। ভারত পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস বিধবা কুরুললনাগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণের নিমিত্ত কুরুবীরগণের ছায়াময়ী মূর্ত্তি কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের জন্য দেখাইয়া আপনার অলোকসামান্য যোগ-বলের ও ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবি নরহরি বেদব্যাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এক নবীন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নিকট আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অগ্রসর হইতে পারে না। দার্শনিক আজও সে তত্ত্বের সন্ধান পান নাই। আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদগণ সেই তত্ত্বছায়া আলোড়ন করিতেছেন মাত্র।

শুক্ল-পঞ্চমী হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুনী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই মহা-সম্মিলন হইয়াছিল। এই মহাধিবেশনে কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

১। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও গ্রন্থের প্রচার। ২। নব নব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা
৩। তীর্থ ভ্রমণাদি।

প্রথম প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রচারক রূপে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম দাস, বারেন্দ্রভূমে, রাঢ়দেশে ও উৎকলে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা অধ্যাপকের আসন পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণ্যে প্রচার করাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে জাহ্নবী ঠাকুরাণী আপনার শিষ্যাদিসহ তীর্থাদি ভ্রমণে বহির্গত হন। তীর্থ-দর্শনাভিলাষে শত শত ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকেও এইভাবে তীর্থ-দর্শনাদি করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবসর এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়ীয় গোস্বামীগণ ব্রজধামে প্রাধান্য লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহাদের স্বদেশ-সেবা-ব্রত উদ্‌যাপনের ফল-স্বরূপ বঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল।

তীর্থ ভ্রমণাদি পরিসমাপ্তির পর শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী খড়দহ গ্রামে শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য মহামহাবৈষ্ণবগণ খেতুরের মত বোরাকুলী গ্রামে একত্র হইয়া মহামহোৎসবে মাতিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনে নিখিল পুণ্যাত্মা বৈষ্ণবগণের সম্মিলনে মনপ্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়া বৈষ্ণব-ইতিহাসের কবি নরহরিদাস চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সংসার তপোবনে পরিণত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আজ দাস উপাধি গ্রহণে বা ব্যবহারে আমরা লজ্জিত হই। দাস উপাধির সহিত যেন আজ হীনতা বা নীচতা উকিঝুকি মারিয়া আমাদের নৈতিক বলের ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সে বিনয়, সে সৌজন্য আর যেন আমাদের মধ্যে নাই। লোকঋণ পরিশোধার্থে আমরা মানব সমাজের দাস। এ মহা-শিক্ষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দাস শব্দ যোগে আমাদের দীর্ঘতা ব্যাকরণের পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা কৃত্রিম সম্মানের পক্ষপাতী হইয়া আত্মসম্মান হারাইয়াছি। সুতরাং "দাস" উপাধি ধারণে আমরা এখন লজ্জিত। এককালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র দাস উপাধি গ্রহণে আত্মগৌরবে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া দাস্যভাবে বিভোর হইয়া সংসারে প্রেম-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। আজ আমরা আত্মদাস হইয়াছি, সে জন্য বশ্যতার চিহ্ন দাস শব্দকে নামের একদেশ করিতে চাহি না। দাস্য বৃত্তিতে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নামের শেষে খাঁ ভাদুড়ী, বসু মজুমদার, ঘোষ চৌধুরী কৌলিক যোগ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছি। মহামতি এডমণ্ডবার্ক

বিলাতি সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন (Landed Gentry) ভূম্যধিকারী জমিদার সম্প্রদায়। আমাদের দেশে ইহার অভাব নাই।

এই ভাবে পদ্মাবতীর উত্তর তীরে গোপালপুর রাজ্যের রাজধানী খেতুর গ্রামে বৈষ্ণব মহাসম্মিলন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ইহাই প্রথম জাতীয় সম্মিলন। এই মহাধিবেশনের ফলে, বঙ্গদেশে শিক্ষা দীক্ষার স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, এই সময় হইতে জ্ঞান ও সাধনা জাতি-গত সম্পত্তি না হইয়া মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলে বাঙ্গালী জাতির জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সর্ব্ব-প্রথম ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসম্মিলন হইয়াছিল।

এই মহোৎসবান্তে রাজা সন্তোষ দত্ত আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সম্মান প্রদর্শন জন্য নানাবিধ সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। কবি সেই সকল সামগ্রীর এই বর্ণনা করিয়াছেন :—

এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈলা আয়োজন।
তাম্বুল আদি সহ বাটা অতি বিচক্ষণ॥
থাল বাটী ঝাড়ী আদি অপূর্ব্ব গঠন।
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্টবস্ত্রাদি আসন॥
এ সকল প্রত্যেক দিলেন মোহান্তরে।
এই হেতু পৃথক পৃথক সজ্জা করে॥

এতদ্ব্যতীত মোহান্তগণের সঙ্গে যে সকল ভক্ত বা অনুচরগণ আসিয়াছিলেন তাহাদিগের প্রত্যেককে "অপূর্ব্ব বস্ত্র ও মুদ্রাদি" দিয়াছিলেন। এইরূপে বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে উৎসব ভঙ্গ হইল। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের চরম উন্নতির দিন। আবার এই সময়েই বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির স্রোতঃ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বিশাল স্রোতে বিলীন হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার ব্যাভিচার বৈষ্ণব নামে পরিচিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণব নামে ঘৃণা ও লজ্জার রেখা টানিয়া পরিচিত হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল।

এই মহাসম্মিলনের যে সমাজ সেই সমাজের বৈষ্ণবগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে ইহার তারিখ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। রাজা মানসিংহ সে সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। কবি মুকুন্দরাম তাঁহার "চণ্ডী" কাব্যের সুর ভাঁজিয়া নব তালে বঙ্গদেশ মোহিত করিতেছিলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে

বাঙ্গালার এই ঐতিহাসিক তারিখের নব পর্য্যায় আরব্ধ হইয়াছিল। এই উৎসবকে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের পর পক্ষব্যাপী একটী মেলা খেতুরে বসিয়া আজও জীবিত রাখিয়াছে। এই মেলা ঠাকুর নরোত্তমের তিরোধানের পর হইতে হইতেছে। উত্তরবঙ্গের যাবতীয় বৈষ্ণবগণ এই মেলায় যোগ দিয়া থাকেন। খেতুরের অপর নাম এখন "প্রেমতলী"। উৎসবান্তে যেদিন বৈষ্ণবগণ তরণী আরোহণে ভাসিতে ভাসিতে বুধরী অভিমুখে রওনা হইয়া যান সেইদিন গোপালপুররাজ্যের আবাল-বৃদ্ধবনিতা কাঁদিয়াছিল। ভক্ত প্রেমাশ্রু-বিগলিত নেত্রে দীর্ঘশ্বাসে বলিয়াছিল আজ হইতে খেতুরী আঁধার হইল। পদ্মাবতী উত্তর বঙ্গ হইতে তরী পূর্ণ করিয়া বুধরীতে উজান প্রবাহিতা হইলেন। বৈষম্যের ঘোর অন্ধকার বিভীষিকা মূর্ত্তিতে উত্তর বঙ্গ গ্রাস করিল। কবি ভারতের জাতীয় তীর্থস্থানগুলির স্মৃতি লোপ পাইতে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে দেশের কর্ণে কর্ণে গাইতেছেন :—

"সে মেরাথন থার্ম্মপলী'
হয়েছে শ্মশান স্থলী,
গিরীশ আঁধারে তার পোহাইছে রাতি।
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি॥" [হেমচন্দ্র]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম প্রতিষ্ঠা

সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥

বেশী বাড়াবাড়ি করিলে দর্পহারী মধুসূদন তাহা সহিতে পারেন না। ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। এরূপ অধিকারী-ভেদে ধর্ম্ম-সাধন-প্রণালী জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, প্রত্যেক বর্ণের জন্য প্রতি আশ্রমের জন্য ধর্ম্মানুশীলন পৃথক; যথাশাস্ত্র সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইলে এই বিধানে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কথা নাই। কিন্তু ঐ যে পরম রমণীয় রাজ-প্রাসাদ দেখিতেছ, উহার মৃত্তিকান্তর হইতে সৌধচূড়া পর্য্যন্ত প্রতি অংশই প্রতি অংশের পরিপোষণে নিযুক্ত আছে। কাহার কিছুমাত্র ব্যভিচার

হইলে, ভিত্তি হইতে বা প্রাচীর হইতে কোন ক্ষুদ্র অংশ বিপর্য্যস্ত হইলে, সুরম্য হর্ম্ম্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। কেহই ধ্বংশ হইতে রাজ-প্রাসাদকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কালধর্ম্মে কষিতকাঞ্চনেও মলিনতা জন্মে; পরম সুস্বাদু ক্ষীরসর নবনী টকিয়া যায়, সেইজন্য সকল বিষয়েই সংস্কার প্রয়োজন হয়। যখন গুণের বিচার উঠিয়া গিয়া বর্ণ-বিভাগ বংশগত হইয়া পাকা গভীর মধ্যে যাইয়া পড়িল, যখন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম বস্তুটাকে ন্যাস না ভাবিয়া একেবারে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করিয়া তাঁহার যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, যখন ব্রাহ্মণেতর জাতি চিরদিনের মত হিন্দুধর্ম্মের উচ্চাধিকার কেন মধ্যাধিকার হইতেও জবরদস্তীর সহিত বিতাড়িত হইতে লাগিলেন—যখন শূদ্রাদিকে ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে দূরে, অতিদূরে রাখিয়াও ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট নহেন, নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, শূদ্রের সহিত ব্যবহার দূরে থাকুক তাহাদের মুখ-দর্শনও সন্নাসী ব্রাহ্মণগণের নিষিদ্ধ বলিয়া পাকা আইন হইয়া গেল —ফলকথা যখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বস্তু ছাড়িয়া কেবলমাত্র খোসা লইয়া আসর জমকাইয়া বসিয়া রহিলেন, সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া সমাজ মধ্যে ভীষণ তোলপাড় উপস্থিত করিলেন। তিনি নিজে বৈদিক ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ্ অসাধারণ পণ্ডিত। জগতে যাঁহার পাণ্ডিত্যের সমকক্ষতা ছিল না—"মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।

হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাই যথা॥"

শাস্ত্র বিচারে সকলেই পরাস্ত হইয়া যাঁহাকে "বাদী সিংহ" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত-কেশরী হিন্দুর শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন—ক্ষীরসমুদ্র হইতে অপূর্ব্ব নবনীত উদ্ধার হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথমেই বৃহন্নারদীয় পুরাণের সেই সর্ব্বসার শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিমাই পণ্ডিত ঢক্কা নির্ঘোষে প্রচার করিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অকস্মাৎ প্রচণ্ড দামামাধ্বনি হওয়ায় স্থবির হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ককেশ মন্ত্রীগুলি কিছু সচকিত হইলেন। হরিনাম অনাদি, হিন্দু রাজত্বে চিরদিনই আছেন, কিন্তু কর্দ্দম-বিজড়িত-কোহিনুরকে এতদিন বড় কেহ মর্য্যাদা করেন নাই—তাই জহুরী আসিয়া রত্ন চিনাইয়া দিলেন। অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ঠিক আবির্ভাবের কালে এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে এই হরিনাম প্রচার বিশেষ ভাবে আরব্ধ

হইয়াছে, কিন্তু তাহাও বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রবর্ত্তিত বলিয়াছেন— "হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ"। হরিদাস ঠাকুরই নাম মহিমা প্রচারের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব প্রথম পাত্র। তিনি মহাপ্রভুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে এই মহামহিমান্বিত নাম প্রচার করিতেছেন; তজ্জন্য অষ্ট বজ্র একত্র হইয়া যবন হরিদাসকে অমানুষিক নির্য্যাতন করিয়াছেন। হরিদাস সুদৃঢ়ব্রত, হরিদাস অকুতোভয়ে প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন। বেত্রাঘাতে রক্তগঙ্গা বহিয়া গিয়াছে, দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে, তবুও নামনিষ্ঠ হরিদাস হরিনাম ছাড়েন নাই, বরং আরো দৃঢ়তার সহিত সদর্পে বলিয়াছেন—"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ। তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম।" এইরূপে কত নির্য্যাতনে সহস্র ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হরিনামের বিজয় নিশান উড্ডীন হইল। জগৎ স্তম্ভিত হইল, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা একটু বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু কোট ছাড়িলেন না; সুদক্ষ ওস্তাদ অধ্যক্ষ বুঝিলেন এখনও আশানুরূপ ফল ধরে নাই, দর্শকগণ বিমুগ্ধ হন নাই—তাই আবার সেই রঙ্গমঞ্চেই সেই খেলোয়ারের দ্বারা আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিলেন। উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে আমুয়া পরগণার রাজা মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনের পণ্ডিত-সভায় সেই যবন হরিদাস আদরে উপস্থাপিত হইলেন :--

অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ চৈঃ চঃ

হরিনামের অপূর্ব্ব মহিমা, অত্যদ্ভুত ক্রিয়া! যে যবনকে দেখিলেই হিন্দুকে স্নান করিতে হয়, সেই যবন আজ নাম-ভূষণে বিভূষিত হওয়ায় রাজ-সভায় সাদরে গৃহীত হইলেন। অভ্যুত্থান করিয়া স্বয়ং রাজা পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চমকিত হইলেন। অপূর্ব্ব কাকতালীয় সংযোগ হইল। হরিনাম-ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে নামের ফলে পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভ ইহাই স্থিরীকৃত হইল। হরিদাস মূর্ত্তিমান নামসাধন। তাঁহার মুখে হরিনাম মহিমা শুনিতে রাজার মন হইল। বিনীত হরিদাস বলিলেন "শাস্ত্র—সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরাই উত্তম জানেন, নাম মহিমা আমি কিছুই জানি না, তবে শুনিয়াছি মুক্তি বা পাপক্ষয় নামাভাস হইতেই হয়; নামের ফল হইতেছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ। "হরিদাস কহে— নামের এই দুই ফল নহে।

নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥ চৈঃ চঃ

তখন আর সহ্য হইল না, যবনের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা, তাহাতে আবার ছোট মুখে বড় কথা। ইহা ব্রাহ্মণেরা সহিতে পারিলেন না, গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বলিলেন ভাবুকের সিদ্ধান্তে সেই মুক্তি অতি নগন্য, অতি তুচ্ছ বলিয়া সাব্যস্থ হইল। কলির শেষে যাহা হইবার কথা এখনই তাহা পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইল। হিন্দুর দুর্দ্দশার আর বাকী নাই। আজ কিনা ম্লেচ্ছ আসিয়া পণ্ডিত সভায় আচার্য্য হইয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের অভিমান পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। পণ্ডিত সভায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপেক্ষিত হইল। ভক্ত হরিদাস লাঞ্ছিত হইলেন। ভক্তের অবমাননা ভগবান্ সহিলেন না। ভক্তের অপমানের ফলে শুনিতে পাই 'সেই গোপাল' চক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠ হইল। তাঁহার নাক খসিয়া পড়িল। শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর দুঃখিত হইলেন, সজ্জনেরা সচকিত হইলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা বড় একটা টলিলেন না। তাঁহারা আরো তারস্বরে জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মের দোহাই দিতে লাগিলেন।

যবনের শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য আজ দিগ্বিজয়ী-জয়ী গৌরসিংহ মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে আহ্বান করিলেন।

প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার বিচার করে আমার সহিত॥ চৈঃ ভাঃ

নিমাই পণ্ডিত ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন জীবের অবস্থা ও শক্তি অনুসারে যুগে যুগে পৃথক ধর্ম্ম সাধন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষোত্তমে যাইবার জন্য যে স্থলপথ পিতামহের আমল হইতে বিহিত আছে, তাহা এখন আর অবলম্বনীয় নহে এখন রেলপথে সহজে সকলে যাইতে পারিবে। সত্য ত্রেতাদি যুগে যে জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগাদি ছিল তাহা কলিতে দুর্ব্বল জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে, সেই জন্য কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্মসাধন হরিনাম।

কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥ শ্রীচরিতামৃত

সত্যযুগে জ্ঞানীগণ ধ্যান যোগ দ্বারা যে ফললাভ করিয়াছেন, ত্রেতাযুগে কর্ম্মযোগাবলম্বনে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে কলিতে হরিসংকীর্ত্তনে নাচিয়া গাহিয়া তাহাই লভ্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিশিষ্ট প্রমাণ—

বিষ্ণুপুরাণে— ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে— কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনেরা মাত্রা চড়াইয়া প্রচার করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ফলশ্রুতি যথেষ্ট বলা হয় নাই। যাহা আগম নিগমে পুরাণেতিহাসে বিবৃত হয় নাই, কোন যুগে কোন অবতারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই, সেই বেদগোপ্য অনর্পিতরত্ন হরিনাম মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব ক্ষেত্রে ধাঁন ছিটাইবার ন্যায় যোগ্যাযোগ্য অবিচারে অপামর সাধারণকে যাচিয়া যাচিয়া বিলাইলেন—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতাং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে! তদিহ ভক্তিরত্নক্ষিতৌ
শচীসুত! ময়ি প্রভো। কুরুমুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥

ঐ ক্ষিপন্ শব্দ দেখিয়া কোন সুরসিক ভক্ত বলেন ব্রাহ্মণেরা অন্য কোন জাতিকে ধর্ম্মরাজ্যের নিকটে যাইতে দেন নাই বলিয়া বুঝি দয়ার্দ্র প্রভু এইরূপে তাহার শিক্ষা দিলেন।

এইত গেল শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর কথা আবার এই নামরসে নিমগ্ন অন্যতম মহাপুরুষ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন নাম সাধনের মত সহজ সাধন আর জগতে নাই, বিষ্ণুস্মরণেও পাপ তাপ দূর হয় কিন্তু দুর্নিগ্রহ মনকে শান্ত করিতে বহু আয়াসের প্রয়োজন। নাম সাধন অনায়াস-লভ্য অথচ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

অত্যচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে
ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রেন কীর্ত্তনন্তু ততো বরং॥

ঐ সুরে সুর মিলাইয়া অতি বৃদ্ধ সাধক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন নামকীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট কিছুই নহে।

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খদ্যোতক সম॥ চৈঃ চঃ

কেবল কতকগুলি শাস্ত্র বচন প্রসব করিয়া নিমাই পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন না। জগজ্জীবের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন—

"কেহ দুঃখে কেহ সুখে করে সুখভোগ!
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যাবে ভবরোগ॥

নিরীহ জীবের এহেন দুর্গতি দেখিয়া শচীনন্দন আর রসে ডুবিয়া থাকিতে পারিলেন না —জীবোদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল, সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ হইল। তিনি হরিনাম মহামন্ত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে হইয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ চৈঃ চঃ

এ প্রচার কেবল ব্যাখ্যা বক্তৃতা দ্বারা নহে "আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" নদিয়া বিহারী নিমাই পণ্ডিত সঙ্কীর্ত্তন বিহারী হইলেন। হরি ওঁ রাম নাম ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভরিয়া গেল, যেমন প্রেমময়ের বাঁশরী বাজিয়া উঠিল অমনি চারিদিক হইতে মকরন্দ লোভে ভক্ত ভৃঙ্গাবলী ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিল।

কলির জীবের দুর্গতি দেখিয়া দয়াল ঠাকুরের দুনয়নে গঙ্গা যমুনা ধারা বহিল, সেই প্রেম ধারায় নদে শান্তিপুর ভাসিয়া গেল। সময় বুঝিয়া প্রেমময় মূরতি দ্বিতীয় মহাপুরুষ আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদের দক্ষিণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রেমসিন্ধুতে তরঙ্গাবর্ত্ত উঠিতে লাগিল।

প্রেমসিন্ধু গোরা রায়　　　নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারি পাশে।

নবদ্বীপের নূতন শ্রী হইল, জ্ঞান কর্ম্মের শুষ্ক মরুভূমি এখন প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্য সুরসিক ভক্ত ইহার কিরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন দেখুন—

প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
নদীনালা সব আসি হৈলা এক ঠাঞি॥
পরিপূর্ণ ভেল—বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা॥
সঙ্কীর্ত্তন রূপে ঢেউ-তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
প্রেমের ভাণ্ডারী প্রভু দয়াল নিতাই।
সর্ব্বজীবে কৈল দয়া ভিন্ন ভেদ নাই॥

সমগ্র গৌড়মণ্ডল টলমলিয়া হইয়া উঠিল। ঘাটে বাটে হাটে বাজারে এই অভিনব প্রেমের হাটের গল্প চলিতে লাগিল। যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখী তাঁহারা বুঝিলেন এইবার পতিতোর্দ্ধারণ লীলা আরম্ভ হইল—

"সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥"

তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না আর যাহারা বহির্মুখী তাহাদের যন্ত্রণা বোধ হইল। জালা হইল বেশী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের।—নিমাই পণ্ডিত হতে দেশটা উৎসন্ন হইল, ধর্ম্মকর্ম্ম রসাতলে গেল, জাতি বিচার ধর্ম্ম বিচার যাইয়া এবে একাকার হইল সর্ব্বনাশের কিছু বাঁকি রহিল না" "যত ছিল ধানু বুনে, সব হল কীর্ত্তনে কাচি ভেঙ্গে গড়াল করতাল।" কোটিকল্প সাধনে, কঠোর তপশ্চরণে যে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, ভাবুকের দল নাচিয়া গাহিয়া আর আছাড় খাইয়া সেই ভগবান্‌কে পাইবে! সব চেয়ে বেশী রাগ হইল—অদ্বৈত নাড়ার উপর সেইই হইতেছে ইহার 'সূত্রধার মূল কাঠি; আর রাগ হইল শ্রীবাসিয়ার উপর—তাহার বাড়ীতেই সব আড্ডা।

"কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
যত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে॥"

অদ্বৈতচন্দ্রের বিশেষ কিছু কেহ করিতে পারিল না; অত্যাচার আরম্ভ হইল বেচারী শ্রীবাসের উপর। শ্রীবাসের নামে নানা কুৎসা রটিল, তাঁহার সমাজ বন্ধ হইল, তাঁহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ভাসাইবার যুক্তি হইল, তাঁহার দরজায় দুর্বৃত্তেরা মদ্য মাংস দিয়া কালীপূজা করিল। শ্রীবাস কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

এদিকে পতিতপাবনাবতার ক্রমে স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও প্রকাশ্যভাবে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন—তিনি তারস্বরে জানাইলেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তাহা কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥ শ্রীচরিতামৃত।

— আরো প্রচার করিলেন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনভক্তি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে কোন বিধি নিষেধ বা জাতি ধর্ম্মের ভেদাভেদ নাই ইহাতে সবারই সমান অধিকারী।

সর্ব্বজন দেশকাল দশাতে ব্যাপ্তি যার'।
সাধনভক্তি চারি বিচারের পার ॥ চৈঃ চঃ।

এই প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন দুইজন সন্ন্যাসী একজন ব্রাহ্মণ অবধূত নিত্যানন্দ। অন্যজন সেই সর্ব্বজন পরিচিত যবন হরিদাস। আদেশ হইল জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া জাতি ধর্ম্ম অবিচারে নাম বিলাইবে—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ চৈঃ ভা।

প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীনামযজ্ঞে এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আজন্মউপেক্ষিত ব্রাহ্মণেতর জাতি দলে দলে আসিয়া জুটিল। প্রতি ঘরে ঘরে খোল করতালের তরঙ্গ উঠিল,—"হরিও রাম" নামে নগর ভরিয়া গেল।

"হরিও রাম রাম হরি ও নাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥" চৈঃ ভাঃ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অস্থির হইয়া পড়িলেন নিমাই একেবারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছেন। নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের মুখে হরিনাম প্রচার। ইহাতেই তাঁহাদের অন্তর্জ্বালা দ্বিগুণিত হইল।

'ধর্ম্ম কর্ম্ম বেদবিধি গেল রসাতল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥ চৈঃ ভাঃ।

তাঁহারা অজস্র গালি পাড়িতে লাগিলেন কিন্তু শাস্ত্র বিচারে কেহই অগ্রসর হইলেন না। নিমাই ভুরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া দেখাইলেন—"হরিভক্তি হইল আসল বস্তু, হরিভক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালাধম, আর হরিভক্তি থাকিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাই হিন্দুর শাস্ত্র।

"প্রভু বলে তপ জপে না করিহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল॥"
চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুক্তা দরবিন্দ নাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ॥

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল তাহাতে নঁদে শান্তিপুরের কেন সমগ্র

বঙ্গদেশের লোক স্তম্ভিত হইল। বুঝি হিমাদ্রিশেখর ভাঙ্গিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেও লোকে এত বিস্মিত হইত না।

কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত॥ চৈতন্য ভাগবত।

পাঠক এই দুই জনের পরিচয় কি শুনিতে চাহেন—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুইজন।
ডাকাতি চুরি মদ্য মাংস করয়ে ভোজন॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরাই।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায়"

সর্ব্বজন পরিত্যক্ত মহাপাতকী মহাদুর্ব্বৃত্ত মাতোয়াল জগাই মাধাই—দয়াল নিতাইয়ের কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের হরিনামের হিল্লোলে পড়িয়া গেল আর মহাপাতকী মহাদস্যু একেবারে শিষ্টশান্ত প্রেমিক ভক্ত হইয়া পড়িল। অই যে দীনহীন কাঙ্গাল দুইজন গঙ্গাঘাটে বসিয়া অবিরাম হরিনাম করিতেছেন আর নয়নজলে ঝুরিতেছেন; ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া সকলের চরণ ধুলি লইতেছেন আর কাতর প্রাণে কৃতাপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন উহাঁরাই কি সেই মহাপাতকী ব্রহ্মদৈত্য জগাই মাধাই!

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥
লোক দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান্।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরনাম॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈমু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ চৈতন্যভাগবত।

অনুতাপানলে মাধাই ছটফট করিতেছেন মাধাইয়ের কাতর ক্রন্দনে কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না সকলেই কাঁদিতেছেন আর অদ্ভুতকর্ম্মা নিমাই পণ্ডিতকে ধন্য ধন্য করিতেছেন—

"মাধাইর ক্রন্দনে কান্দেন সর্ব্বজন।
নিমাই পণ্ডিত ধন্য করেন কীর্ত্তন॥

কলঙ্কিত লৌহ কোন্ মন্ত্রবলে মুহূর্ত্তে কষিত কাঞ্চন হইয়া গিয়াছে। হরিনামের অপূর্ব্ব মহিমা! নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক ক্ষমতা কোন সাধন নাই ভজন নাই, যাগ যজ্ঞ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, পুরশ্চরণ নাই—মুহূর্ত্তে নরকের কীট গোলকের পার্ষদ হইয়া গেল!

আপামর সাধারণ নরনারী সকলে সমস্বরে গাইল—
"জয়রে জয়রে জয় শ্রীশচীনন্দন ভুবন মঙ্গল অবতার।"

শ্রীনাম মহিমা অন্য সকলে বুঝিলে কি হইবে যাহারা বুঝিলে জগৎ বুঝিবে তাহারা বুঝে কই!

জ্ঞান-গর্ব্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী তখনও টলিল না। পরন্তু দিনে দিনে বেশী বাড়াবাড়ি দেখিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিধর্ম্মী যবনরাজের আশ্রয় লইলেন। কাজি উচ্চ কীর্ত্তনের বাদী হইল, নিরীহ নাগরিয়ার খোল ভাঙ্গিয়া দিল, করতাল কাড়িয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু এ অত্যাচার এক দিনের বেশী চলিল না। প্রভু-শক্তির নিকট সব বাধাই ফুৎকারে উড়িয়া গেল। পর দিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিপুল বাহিনী সাজাইয়া খোলকরতাল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া কাজী-বিজয়ে চলিলেন। সঙ্ঘের মধ্যে "অপরূপ মূরতি সুঠাম, তাহে শোভে মালতীর দাম। করুণা নয়নে প্রেম ঝরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা মুখে স্ফুরে॥"

এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া কাজীর মন ফিরিয়া গেল, কাজির মুখেও হরিনাম নৃত্য করিতে লাগিল। কাজি অবাধ কীর্ত্তনের আলি হুকুম প্রচার করিলেন। হরিনামের বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিল। রক্ষণশীলদের সব আশাই ফুরাইল। বিরুদ্ধবাদীরা প্রথমে ভাবিয়াছিল জগা মাধার হাতে পড়িলে ঠাকুরের সব ঠাকুরালী ঘুচিয়া যাইবে, মুটকি প্রহারে সব ভাবকালি ছুটিয়া যাইবে; কিন্তু সেই সব হইল বটে তবে ভাগ্যক্রমে ফল উল্টা হইল। নিমায়ের ঠাকুরালি না কমিয়া আরো বাড়িয়া গেল। শেষে মুসলমান রাজাকে উত্তেজিত করিয়া হরিনাম দমনের অন্তিম চেষ্টা হইল তাহাতেও বিপরীত ফল ফলিল। চারিদিকে ঘোষণা পড়িয়া গেল—

প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥

কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ হইল না, মদ-মাৎসর্য্য সুবুদ্ধি বিকৃতি করিয়া দিল পণ্ডিত পড়ুয়া কর্ম্মী ধর্ম্মী সকলেই পূর্ব্ববৎ দূরে দূরে রহিলেন, আর নিমাই পণ্ডিতের ঠাকুরালি দেখিয়া জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন।

তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত ॥
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইল কেমনে। চৈঃ ভাঃ

মদ-মাৎসর্য্য-পরায়ণ জীব কিছুতেই খাটো হইতে চায় না। স্বচক্ষে অদ্ভুত শক্তি দেখিলেও তাহা উড়াইয়া দেয়। "বস্তা পচা পুরাণো শাস্ত্র ও ভাবুকের সিদ্ধান্ত বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পণ্ডিত মহলে স্থান পাইল না তাঁহারা শঙ্করের মায়াবাদ ভাষ্য ধরিয়া আর অদ্বিতীয় বেদান্ত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নিন্দুকের নিন্দাস্রোত পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

অবাধ্য দুর্ব্বিনীত পুত্রের জন্য পিতার ভাবনা বেশী হয়, এবং লাঞ্ছনাও যথেষ্ট সহিতে হয়। নিমাই বিশ্বম্ভর নাম ধরিয়াছেন—প্রেমে বিশ্ববাসী সকলকেই কৃতার্থ করিতে হইবে নচেৎ নামের সার্থকতা হইবে না। তাই প্রেমময় প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্ধ, খঞ্জ, পাপীতাপী বালক বৃদ্ধ সকলেই প্রেমবন্যায় ডুবিল কেবল কুতার্কিক পণ্ডিত ও পড়ুয়াগণ গর্ব্ব-পর্ব্বতশিখরে বসিয়া রহিলেন। প্রেমবন্যা তাঁহাদিগকে ছুঁইতেও পারিল না। নিমাই পণ্ডিত পুনরপি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বুঝাইলেন কলিকালের দুর্ব্বল জীব কঠোর ভজন সাধন জপ তপ পারিবে না, ভক্তিযোগই একমাত্র অবলম্বনীয়, সটান হইয়া কৃষ্ণচরণে পড়িয়া অকপট মনে ডাকিলেই কৃষ্ণ-কৃপায় মহাপাতক বিদূরিত হইবে, কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হইবে। এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যা'বে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে। প্রচুর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দেখাইলেন

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা ॥

তীব্রা শুদ্ধা ভক্তিতে আমি যেরূপ বশীভূত হই, হে উদ্ধব, যোগ বল সাংখ্য বল বেদ বল আর জপ তপ বল কিছুতেই আমাকে সেরূপ বাধ্য করিতে পারে না।

কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। কুতার্কিক পণ্ডিত পড়ুয়াগণ কেহই সে কথায় কান দিলেন না, তাঁহারা প্রভুকে চিনিলেন না, বরং দল বাঁধিয়া (তাই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর স্তবে দেখিতে পাই প্রভুর একটী বিশেষণ হইয়াছে অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজন দুর্ব্বোধ") প্রভুকে কলির "বরাহ অবতার" "নৃসিংহ অবতার" ইত্যাদি বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিদ্বেষের ভাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। দয়াময় প্রভু আর পারিলেন না এই দুর্বৃত্ত অহঙ্কারীদের

উদ্ধার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রাণের দোসর, লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দের ডাক্ পড়িল। গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আনন্দ রসময় মূর্ত্তি আজ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে, সুখ দুঃখের সাথী নিতাইচাঁদকে দেখিয়া অট্টঅট্ট হাসিয়া বলিলেন—

করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে॥ চৈ ভাঃ

অবাধে কৃপা করিতে আসিলাম, মায়া-মুগ্ধ জীব সে কৃপা লইতে পারিল না তাহাই এখন তাহাদের অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হইল।" নিতাই দেখিলেন কালোমেঘ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়াছে, আর বারণ মানিবে না। শীঘ্রই বর্ষণ আরম্ভ হইবে। প্রভু পূর্ব্ববৎ হাসিয়া আবার বলিলেন "মায়ের মনের দিকে তাকাইয়া পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য ভাবিয়া গৃহে থাকিয়া আর চলিল না

দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥

নিতাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আজ অবসান, কল্যই আমি সন্ন্যাসী সাজিব।"

তখন মেঘমন্দ্রস্বরে আবার বলিলেন—

জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥

নিতাই আকুমার সন্ন্যাসী, তের বৎসরেই সন্ন্যাসী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়াছেন, গৃহ-সুখের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতে তাঁহার সন্ন্যাসী-হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কিন্তু তিনি ঠাকুরকে ভাল করিয়া চিনিয়াছেন; তিনি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহা ধরিবেন তাহা নিশ্চয় করিবেন সেখানে কোন মমতার দোহাই চলিবে না, বিশেষতঃ তিনিও বুঝিতেছেন যে স্বয়ং ভগবান্ হইলে কি হইবে গৃহীকে জ্ঞানগর্ব্বিত পণ্ডিতেরা বা চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীরা কিছুতেই মাথা নোয়াইবে না, অথচ মায়াবাদরূপ কঠিন রোগ সেইখানে থাকিল। নিতাই বেশী উচ্চবাচ্য না করিয়া বলিলেন "আমি আর তোমায় কি যুক্তি দিব তুমি সর্ব্বজ্ঞ ইচ্ছাময় তুমি যাহা করিবে, তাহাই হিতকর হইবে। নিত্যানন্দের সায় পাইয়া প্রভুর হৃদয়ভার কথঞ্চিৎ কমিল। পরদিন ভক্তের মর্ম্মভেদী কাটোয়ার লীলা আরম্ভ হইল, আনন্দোচ্ছ্বাস-মুখরিত নবদ্বীপে শোকের রোল উঠিল। নবদ্বীপচন্দ্রকে হারাইয়া নববিধবার ন্যায় নবদ্বীপ একেবারে শ্রীহীন হইলেন। সুরধুনীর আর সে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্যগীত নাই, এখন বিরহের কাতর ক্রন্দনে

দেশ ভাসাইতেছেন। শচী, বিষ্ণুপ্রিয়াও গৌরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দের কথা ত আর বলিবার নহে, তাঁহাদের প্রাণগৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গিয়াছে শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে। নিন্দুক বিদ্বেষীগণের হৃদয়ে বিষম ধাক্কা বাজিল; তাঁহারা এরূপ পরহিতব্রত মহাকৃষ্ণপ্রেমিক মহাপুরুষকে কত না নিন্দা করিয়াছেন, কত গালিমন্দ দিয়াছেন, তাঁহাকে নিজেদের মত কামক্রীড়ামৃগ মনে করিয়া কত না অপরাধ করিয়াছেন! যেমন ওদিকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগেরও চৈতন্য হইল, তাঁহারা অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। অনেকে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া 'নবদ্বীপ চাঁদকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিলেন কিন্তু তখন হাত ছাড়াইয়া গিয়াছে নবদ্বীপচাঁদ জগচ্চন্দ্র হইয়াছেন, জগৎ জুড়িয়া নদীয়া করিয়া বসিয়াছেন।

কৃষ্ণ-প্রেমের হিল্লোলে পড়িয়া ভক্তরূপী ভগবান্ প্রথমে "কাঁহা মোর প্রাণ-নাথ মুরলী বদন" বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন; সাত দিন সাত রাত্রি ঘুরিলেন, পথ পাইলেন না, ভক্তবৃন্দের ভক্তির আকর্ষণে নিতাইয়ের চক্রান্তে পড়িয়া নবীন সন্ন্যাসী ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তুমুল নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। হারানো মাণিক মিলিয়াছে শুনিয়া নবদ্বীপ ভাসিয়া শান্তিপুরে আসিল। যাঁহারা অনুতাপানলে জ্বলিতেছিলেন তাঁহারাও সন্ন্যাসী প্রভুর চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন "প্রভো তোমায় চিনি নাই কত অপরাধ করিয়াছি আমাদের গতি কি হইবে।" দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া নবীন সন্ন্যাসী নবদ্বীপ বাসীর সম্মুখে বাহির হইলেন, দরদর ধারে প্রভুর পরিসর হিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সে নয়ন ধারা দুঃখের কি ক্ষোভের নহে, আনন্দের। প্রভুর সেই দীন হীন কাঙ্গাল মুরতি দর্শনে পাষাণ গলিয়া গেল, তাঁহাদের সেই হেম কিরণিয়া শচীর দুলালিয়াকে আর চিনিবার যো নাই। কুন্দ-মল্লিকা পরিসেবিত সেই মনোহর চাঁচর চিকুর আর নাই, গলায় আর সে ভক্ত-ভৃঙ্গ পাগল করা মালতীর মালা নাই, নদেবাসির প্রাণ-সরস প্রাণ গোরাচাঁদের ডোর কৌপিন-ধৃত সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ আউলইয়া গেল। তদুপরি প্রভুর দৈন্য বচন শুনিয়া কেহ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সকলে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, প্রভু কাতর কণ্ঠে বলিলেন "ভাই সব, বন্ধু সব না জানিয়া কত সময়ে কত অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিও' আমি সন্ন্যাসী ভিখারী আমায় সকলে কৃপা করিয়া বিদায় কালে একটি ভিক্ষা দেও; ভাই

দিনাচা বাংলা বিয়াকী বাচ

কর যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥

পাষণ্ডীরাও আর পারিল না তাহাদের বজ্র-হৃদয়ও গলিয়া গেল, আর্ত্তনাদে শান্তিপুর অশান্তিপুর হইয়া উঠিল। ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া সকলে তাহাদের প্রাণ নিমাইয়ের সঙ্গে যাইতে চায়, গৌর-ছাড়া নদীয়ায় আর তাহারা ফিরিবে না তাই প্রভু সনির্ব্বন্ধে তাহাদের করে ধরিয়া বলিলেন

নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমন
(কিন্তু) ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
(তবেই) পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে মিলন ॥

প্রচ্ছন্ন প্রভু কৌশলে বলিলেন—আমায় তোমরা কি এখনও চিনিতে পার নাই, আমিই সেই "অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌরঃ।" সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞ কর, আমায় ঘরে বসিয়াই পাইবে। ইহা নিশ্চয় সুনিশ্চয় জানিবে। আমরা দেখিয়াছি নদীয়া বিহারীর এই শেষ বিদায় কালে গৌড়বাসীদিগের এবং কুমতি তার্কিক পণ্ডিত-গণের এই মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন শ্রীচৈতন্যদেব কখনও ভুলিতে পারেন নাই; তাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন দিব্যোন্মাদে মত্ত তখনও গম্ভীরার মধ্যে নিভৃতে নিতাইকে পাইয়া হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেছিলেন

সঙ্কীর্ত্তন প্রেম রসে, ডুবাইও গৌড়দেশে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে।
কুমতি তার্কিক জন, অধম পড়ুয়াগণ
কেহ যেন বঞ্চিত না হয় ॥"

কি অপূর্ব্ব জীব হিতৈষণা! কি অহৈতুকী করুণা!!

এইরূপে নবদ্বীপ বিজয় হইয়া গেল। গৌরাঙ্গ লীলাভিনয়ের পট পরিবর্ত্তন হইল, পুরুষোত্তম লীলা আরম্ভ হইল, মায়াবাদ ঘুচাইতে প্রভু সহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া সার্ব্বভৌম বিজয়ে চলিলেন।

শ্রীবামাচরণ বসু।

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন কথা। (২)

আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা।

আনন্দচন্দ্র ক্রমে যেন কেমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন নবদ্বীপ দাসকে অকিঞ্চিৎকর ঘৃণ্য ভিক্ষুকের পরিবর্ত্তে সুশিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া

দেখিতে লাগিলেন। ভৃত্য তুলসী পত্র লইয়া আসিল, নবদ্বীপদাস তাহার নিকট হইতে তুলসী পত্র লইয়া মুড়ির পাত্রে দিয়া বলিল "জয় নিতাই খাও, আমি মূর্খ, তন্ত্র জানিনা মন্ত্র জানিনা আমার নিবেদন গ্রহণ কর" বলিয়া মুড়ির পাত্রটী ভূমে রাখিয়া দিলেন। আনন্দচন্দ্র আলবোলার নলটী মুখে দিয়া ধীরে ধীরে টানিতেছেন আর অতি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। নবদ্বীপদাস তাহা দেখিয়া বলিলেন "কি দাদা আমার পাগলামি দেখে হাসছ? আনন্দ "না না"।

নবদ্বীপ,—"না না কেন মনে কি হচ্ছে বলইনা"।

আনন্দ। "আচ্ছা তোমারা কি যখনই কিছু খাও তখন তা তোমাদের ভগবানকে নিবেদন করে খাও?"

নবদ্বীপ। হাঁ, আমার গুরুদেবের আজ্ঞা তাই, সেই আজ্ঞা পালনের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি মাত্র"।

আনন্দ। "এরূপ করিবার প্রয়োজন কি"?

নবদ্বীপ। তোমরা সুশিক্ষিত সুসভ্য, সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, তোমাদের সুসভ্য ফিরিঙ্গি গুরুদের নিকট হইতে তোমরা সেটা বেশ অভ্যাস করেছ; আজ কাল তাই সাংসারিক প্রত্যেক বিষয়ে এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্র, পরিবার চাকর বাকরের নিকট হ'তে কোন সাহায্য পেলেই অমনি হাতে হাতে (thank you) 'থেঙ্ক ইউ' বলে নিজেকে কৃতজ্ঞতা পাশ হ'তে মুক্ত করে তোমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ। আর আমরা যে দয়াময়ের দয়াতে মাতৃগর্ভে আহার পেয়েছিলাম, যাঁর অপরিসীম কৃপায় ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই মাতৃস্তনের অমৃতের আধার আমাদের পুষ্টি সাধন করেছিল, তারপর প্রতিদিন জীবনের কতপ্রকার উত্থান পতনের মধ্যে নিরন্তর যাঁর কৃপায় এদেহ ধারণ কর্ত্তে সমর্থ হয়েছি, যিনি আমাদের প্রতিদিন ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, শীতে রৌদ্র, গ্রীষ্মে বাতাস যোগান, তাঁর প্রতি প্রতিদিন তাঁর প্রদত্ত আহারের সময় একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি বিশেষ বর্ব্বরতা আর পগলামি? ভাই একটু ভেবে দেখ, আজ ক'দিন আমি তোমার নিকট দুটি মুড়ি খেতে চাচ্চি, তুমি কি তা দিতে পেরেছিলে? আমরা মনে করি তোমার মত একজন লোক অনায়াসে একজনকে দুটি মুড়ি দিতে পারে, এতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়, সে না দিলে তুমি কোন্ ছার, এই ভারতের সম্রাজ্ঞীরও সে ক্ষমতা নাই। আজ সে দিয়েছে তাই তাঁকে স্মরণ ক'রে তাঁর প্রদত্ত এই দয়ার দান তাঁর প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করা কি মানুষ মাত্রেরি কর্ত্তব্য নয়।

আনন্দ। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারই কি তোমাদের ভগবানকে ভোগ দেওয়ার এক মাত্র উদ্দেশ্য?

নবদ্বীপ। দেখ, কোন বিষয় জান্‌তে বা বুঝতে হ'লে সে বিষয়টা তুমি গ্রহণ কর না কর তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু একটু স্থির চিত্তে সে বিষয়টীর মর্ম্ম গ্রহণ করা মানুষের কর্ত্তব্য। কি রকম, আমি বুঝিয়ে বলি। কোন ধর্ম্মের মত সম্বন্ধে আমি যদি কিছু জান্‌তে চাই বা বুঝতে চাই তাহ'লে প্রথম থেকেই যদি সে বিষয়ে আমি অশ্রদ্ধাবান হই ও সেটা কিছু নয়, মনে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে বসে থাকি তাহ'লে সে ধর্ম্ম মতে যতই সত্য থাক না কেন, সে মত যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, আমাদের ঐ আত্মম্ভরিতা, ঐ সকল অনর্থের শ্রেষ্ঠ অনর্থ অহঙ্কার সব নষ্ট করে। আমরা যদি আমাদের অহঙ্কারের উচ্চমঞ্চ হ'তে নেমে বস্‌তে পারি তা হ'লে এ সংসারের সকল বিষয় থেকেই আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা করতে, গ্রহণ করতে, ও আনন্দ পেতে পারি। তা' ত আমরা করি না। আমরা কেউ বিদ্যার অহঙ্কারে, কেউ ধনের অহঙ্কারে, কেউ পদমর্য্যাদার অহঙ্কারে, কেউ রূপের অহঙ্কারে, কেউ অজ্ঞানতার অহঙ্কারে, কেউ জ্ঞানের অহঙ্কারে, কেউ সাধনের অহঙ্কারে, এইরূপ নানা অহঙ্কারে মেতে মাতাল হ'য়ে অন্ধ হয়ে নিরন্তর ত্রিতাপে জ্বলে মরি। এই মনে কর, আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী আমার কাছে কেউ যদি যিশু খৃষ্টের ধর্ম্মের কথা বা কোরাণের ধর্ম্মের কথা বল্‌তে আসে, তা হলে আগে হ'তেই ও বিষয় আমি কিছু না জেনে শুনেই সব জান্তা হয়ে ব'সে তাদের সব কথাই অগ্রাহ্য করি ও মনে মনে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে মুসলমান ও খৃষ্টান-ধর্ম্ম অতি জঘন্য,হেয় ব'লে তাদের কোন কথাই শোনবার মত না শুনি, তাহলে কি প্রকৃতই ও দুইটী ধর্ম্ম জঘন্য ও হেয় হয়, না প্রকৃত পক্ষে ঐ ধর্ম্মমত শুনিয়া সত্যতার সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হয়? ক্ষতি প্রকৃত পক্ষে আমার——আমি ওটী ধর্ম্ম মত থেকে যা শিখিতে পারতাম, ও দুটী ধর্ম্মের যে বিষয়গুলি আমার নিজের পথের সহায়তা করতো—তা আর হলো না। প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি আমার। এ ক্ষতির কারণ আমার নিজের অহঙ্কার আর অবিশ্বাস। তাই বলছিলাম যদি কোন বিষয় জানবার বা বোঝবার আবশ্যক হয়, তাহ'লে অহঙ্কারের মঞ্চ থেকে নেমে মনটাকে একটু নরম না করলে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি প্রকৃত তুমি জানতে বা বুঝতে চাও তা'হলে তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হও বা না হও তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু একটু শুদ্ধ চিত্তে অর্থাৎ অবজ্ঞাহীন, অহঙ্কার হীন ও সরলতার সহিত বুঝতে

চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে। ভারতের সনাতন ধর্ম্মের উপর বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু আলোচনা করেছ? শাস্ত্রাদি কিছু পড়েছ? অন্ততঃ টাকা রোজগারের জন্য আইন ব্যবসায় যেরূপ আলোচনা করেছ তাও কি করেছ? যদি বড় বেশী পড়ে থাক, কতকগুলি বিজাতীয় পণ্ডিতের আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত পড়ে হৃদয়টাকে শূন্য করে বসে আছ। আর সেই বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের ভারতের সর্ব্বমঙ্গলদায়ী সর্ব্ব শুভঙ্করী বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা-শূন্য হ'য়ে আহারে বিচারে, ব্যবহারে আচারে বিকৃত ভাবাপন্ন হয়ে কেবল আত্মসুখের জন্য নিরন্তর এ সংসারটা বিধ্বংস করে বেড়াই।

আনন্দ। কথাটা বড় মিথ্যা নয়। আচ্ছা আমি সাধ্যমত চেষ্টায় সরল অন্তঃকরণে তোমার কথা বুঝতে চেষ্টা করব। ভগবানকে ভোগ দেওয়ার কারণ কি বল?

নব। অন্য কারণ তুমি কি বিশ্বাস করবে?

আনন্দ। বিশ্বাস যোগ্য কথা হলে কেন বিশ্বাস করবনা?

নব। কার বিশ্বাস যোগ্য?

আনন্দ। আমার!

নব। তুমি কে?

আনন্দ। আমি মানুষ।

নব। এই টুকু বল্লেই কি তুমি কে সব বলা হল? বেশ বুঝে বল।

আনন্দ। এর আর বোঝা বুঝি কি? আমি মানুষ ছাড়া আর কি?

নব। মানুষ ত বটই. কিন্তু মানুষ বল্লে তুমি কি বোঝ তাই আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি। মানুষের কি সূত্র, এই যাকে তোমাদের ইংরাজিতে definition বলে তাই বল দেখি।

আনন্দ। মানুষের definition।

নব। তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত তাতে আবার আইন ব্যবসায়ী, প্রতিদিন কত আইনের definition ধরে বড় বড় বক্তৃতা করে বড় বড় জজ ম্যাজিষ্টেটের মাথা ঘুরাইয়া দেও আর তুমি নিজে যার তার definition টা বলতে এত ভাবছ।

আনন্দ। আমি এসব বিষয় বড় আলোচনা করিনা, আচ্ছা তুমি বল শুনি।

হচ্ছে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আর মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মহৎ এই চব্বিশটী তত্ত্বে আমরা গঠিত, কেমন নয়, বল দেখি?

আনন্দ। আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলতে হবে।

নব। বেশ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক কিনা বাক্য, পানি, হাত, পাদ পা, পায়ু, আর উপস্থ—গুহ্য ও গীজ তার পর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

আনন্দ। হাঁ এত বোধ হয়।

নব। তার পর পঞ্চ ভূত যাকে elements বলে, ক্ষিতি মাটী, অপ জল, তেজ অগ্নি, মরুৎ বাতাস, ব্যোম আকাশ, তার পর হ'লো পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই পঞ্চ ভুতের গুণ, কেমন বুঝেছ?

আনন্দ। হাঁ।

নব। তার পর মন; মন হচ্ছে আমাদের সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক জ্ঞান আর বুদ্ধি হচ্ছে নিরাপাত্মক জ্ঞান আর অহঙ্কার হচ্ছে অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞান; এই যে জ্ঞান দ্বারা তুমি আমি বলে থাকি, "আমি অমুক কাজ কচ্ছি, আমি যাচ্ছি আমার বাড়ী, আমার টাকা"; তার পর মহৎ এই চব্বিশ তত্ত্ব।

আনন্দ। মহৎটা কি?

নব। যা বলা যায় না, বোঝান যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। দেখান যায় না দেখা যায়, আস্বাদন করান যায় না, করা যায়।

আনন্দ। সে আবার কি?

নব। যাকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান বলে তাই।

আনন্দ। ঐটেত গোলের কথা, যার কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই; যেটা বলা যায় না, বোঝান যায় না, দেখান যায় না সেটা বিশ্বাস করি কি করে?

নব। সেটা ঠিক কথা। আচ্ছা তুমি যখন খুব অঘোরে নিদ্রা যাও যাকে সুষুপ্ত অবস্থা বলে সে সময় তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কোনটীরই কার্য্য থাকে না, অথচ তুমি থাক, তোমার জ্ঞান থাকে যে জ্ঞান মন নয়, বুদ্ধি নয়, অহঙ্কার নয়, কারণ তখন তোমায় গাল দিলে বা তোমার প্রশংসা করলে তুমি বোঝনা, তোমার কোন ক্রিয়া হয় না, তোমাকে সে সময় যদি সাপে বা বাঘে ধরতে আসে, তুমি তোমার বুদ্ধি শক্তির দ্বারা তোমার বাঁচবার

চেষ্টা করতে পার না, আর তোমার অহং জ্ঞানও থাকে না, অথচ তুমি আছ ; তোমার জ্ঞান আছে, এ জ্ঞান কোন জ্ঞান বল দেখি ?

আনন্দ। তখন যে আমার কোনরূপ জ্ঞান থাকে তার প্রমাণ কি ?

নব। যদি জ্ঞান থাকেনা, তাহ'লে তুমি সেই সুষুপ্তি অবস্থা থেকে জেগে উঠ কি করে ?

আনন্দ। সেই জ্ঞানই কি মহৎ ?

নব। না, ঠিক তা নয় ; সেই জ্ঞানকে শাস্ত্রে চৈতন্য বলে। এই চৈতন্য জ্ঞান নিত্য বস্তু ; এর কখনও ব্যয় হয় না যেমন জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যে সমস্ত জ্ঞান থাকে সুষুপ্ত অবস্থায় তা থাকে না কেবল এই একমাত্র চৈতন্য থাকে, নাশ নাই, অতএব এ জ্ঞান চৈতন্য ও নিত্য অর্থাৎ সত্য আর ইহাই আনন্দ ; যারা এই সৎ ও চিৎ কে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারাই একে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব'লে উপলব্ধি করবেন। এই মহৎ কি তা মানুষের ভাষা ব্যক্ত করতে পারে না, একজন আর একজনকে বোঝাতে পারেনা, ইহা বলা যায়না—অব্যক্ত ; এ বোঝান যায় না কিন্তু বোঝা যায়, দেখান যায় না, দেখা যায়, আস্বাদন করান যায় না, আস্বাদন করা যায়। মানুষের ভাষায় এর সম্বন্ধে যতদূর ব্যক্ত করা যায়, তা বোধ হয় একমাত্র ভারতের আর্য্য ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্রে ক'রে গেছেন, তুমি গায়ত্রী মন্ত্র জান ?

আনন্দ। না।

নব। আমি মূর্খ, আমার এ সব বিষয় ব'লবার অধিকার নাই। তারপর তোমার মত একজন শিক্ষিত যে বাল্যকাল থেকে পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব, আচার, ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাকে এ সব বোঝান আমার কর্ম্ম নয় ; তবে আমি আমার গুরুদেবের নিকট যা শুনেচি তা বল্লে যদি তোমার তৃপ্তি হয় ব'লতে পারি।

আনন্দ। তা'ত বলবে ; কিন্তু তা শোন্‌বার আগে আমায় আর একটি কথা বল্‌তে হবে। আপনারা পাশ্চাত্য বা ইংরাজী ভাষা, ভাব, আচার, ব্যবহারকে এত ঘৃণা করেন কেন ?

নব। কে বল্লে আমরা ঘৃণা করি ? আমার কথার ভাবে যদি তোমার সেরূপ ধারণা হ'য়ে থাকে তাহ'লে আমি বোধ হয় আমার নিজের মনের ভাব ও ভাষা ঠিক ব্যক্ত করতে পারি নাই। আমরা ইংরাজকে বা পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব প্রভৃতিকে ঘৃণা করি'না। আমার গুরুদেবের শিক্ষা ও আদেশ তা'নয়। তিনি বলেন [illegible]

আর আমাদের ঘৃণা ক'রবার কিছুই নাই। আর তাচ্ছিল্য করবার বস্তু জগৎ প্রকাশে কিছুই নাই। সমস্তই ভগবৎ-প্রকাশ। আমরা যদি কাউকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করি তাহ'লে আমাদের অধর্ম্ম হয়।

আনন্দ। তবে তুমি আমাকে, আমার আচার ব্যবহারকে ঘৃণা কর কেন?

ন। তোমাকে বা তোমার আচার ব্যবহারকে যদি ঘৃণা করি তাহ'লে কি তোমার বাড়ী যেচে খেতে আসি?

আ। তুমি আমায় ঘৃণা কর না?

ন। আমারতো বিশ্বাস তাই, অন্ততঃ ঘৃণা না করবার সাধ্যমত চেষ্টা করি।

আ। তোমার কথায় অনেক সময় ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটা কটাক্ষ আছে বলে বোধ হয়।

ন। সে কটাক্ষ ইংরাজী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি নয়। প্রকৃত কথা ভগবৎ কৃপায় সকলেই আপনাপন উপযুক্ত ও উপযোগী ক্ষেত্রে প্রকাশিত। যে যেখানে জন্মেছে, সেখানের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম তার উপযোগী ও মঙ্গল-প্রদ। কিন্তু আমরা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞানের অহঙ্কারে মোহিত হয়ে সেই স্থানীয় আচার ধর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া একটা উন্নতির কল্পনা করে অপরের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যে গ্রহণ করি সেটা বড়ই দুঃখের বিষয় ও অবনতির হেতু। আর যাঁরা তা কর্ত্তে বলেন তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত।

আ। তুমি কি বল্‌তে চাও যে ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের কিছু মাত্র মঙ্গল প্রদ নয়?

ন। জগৎ সংসারের সমস্তই মঙ্গল প্রদ কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগ মঙ্গল প্রদ নয়। দেখ, আমি একে মূর্খ, তারপর আমার এ সব বিষয় বল্‌বার অধিকারই নাই তারপর আবার তোমার মত একজন শিক্ষিত লোক যে বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য ভাব ও আচার ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী, তাকে এ সব বোঝানো আমার কর্ম্ম নয় তবে আমি আমার গুরুদেবের নিকট যা শুনেচি ও বুঝেচি তাই বল্‌তে পারি তাতে যদি তোমার তৃপ্তি হয়।

আ। তৃপ্তি হবে কি না, তা আগে কেমন করে বল্‌ব। তুমি বল আগে, শুনি।

ন। ভগবানকে নিবেদন ক'রে আহার করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বোঝার পূর্ব্বে আমরা যে আহার করি এই আহারের উদ্দেশ্য কি বুঝে দেখা যাক্‌ আচ্ছা তুমি বল দেখি আহারের উদ্দেশ্য কি?

আ। আহারের উদ্দেশ্য দেহের পুষ্টি সাধন।

ন। শুধু কি দেহের পুষ্টি সাধন, মনের কি আধ্যাত্মিক শক্তির বর্দ্ধনও কি নয়?

আ। আহারের সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক আছে বলে বোধ হয় না।

না না হবারি কথা। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিছু বলে না ও বলিতে পারে না। আমরা আজকাল আর্য্য বা হিন্দু বলে পরিচয় দিই কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আর হিন্দুয়ানী কিছুমাত্র নেই। আমরা সব ইউরোপীয়ের শিষ্য হয়ে পড়েছি। আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন যা বলায় তাই আমাদের শিরোধার্য্য। আমরা আমাদের ঘরের নিজেদের শাস্ত্র দর্শন কিছুমাত্র দেখি না বা অনুশীলন করি না। আমাদের ভারতবর্ষীয়দের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দশা এখন চোখ্ থাক্‌তে কানা, কাণ থাক্‌তে কালা, আমরা এখন পরের চোখে দেখি পরের কানে শুনি। তাই আজ অহঙ্কারে, তুমি বলে ফেল্লে আহারের সঙ্গে মনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। তোমাদের ইউরোপীয় বিজ্ঞানে জড়ের জড় ক্রিয়ারই আলোচনা দেখা যায়, জড়ে জড়াতীত ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা কর্ব্বার শক্তি এখন তার হয়নি। মনে করো না আমার কথাগুলো অলীক। এই দেখ তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান কোন্ দ্রব্য আহার করলে শরীরের কোন্ উপাদান ক্ষয় হয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ না হোক্ কিছু পরিমাণে বল্‌তে পারে। কিন্তু কোন্ দ্রব্য আহার কর্‌লে ক্রোধ বৃদ্ধি হয় আবার কোন্ দ্রব্য আহার কর্‌লে কাম ক্রোধ প্রশমিত হয় তা' কিছুই বলতে পারে না ও বলে না। কিন্তু আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আর্য্যঋষিরা এ সব বিষয়ে বিশেষরূপে বিচার করে গেছেন। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান আর্য্যঋষিদিগের দূরদৃষ্টি মানব হিত-কারিতার সম্বন্ধে তুলনায় অতি শৈশব হইলেও দেহ ও মন যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ তা' নির্ণয় ক'রেছে; সে বিষয় বোধ হয় কেহই অবিশ্বাস কর্‌বেন না। কেমন না?

আন। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে।

নব। মূলে তা যদি থাকে তা হ'লে যার দ্বারা দেহের পুষ্টি হয় তা'দ্বারা মনেরও পুষ্টি হবে না কেন?

আন। বেশ, স্বীকার কর্‌লেম হয়, তাতে কি হয়েচে?

নব। ভাল, এখন বল দেখি দেহের পুষ্টি ও মনের পুষ্টি বল্‌লে আমরা কি বুঝি?

আন। দেহের পুষ্টি বল্‌লে দেহ সবল, সুস্থ, নীরোগ বুঝায়। আর মনের পুষ্টি বল্লে মনের শান্ত অবস্থা বুঝায়।

নব। মনের শান্ত অবস্থা কাকে ব'লে?

আন। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট রিপুর তাড়নাহীন অবস্থা।

নব। অন্য উদ্দেশ্য যা', তা' কি তোমার মত শিক্ষিত লোক বাল্যকাল থেকে যে পাশ্চাত্য ভাষা—পাশ্চাত্য ভাব আচার ব্যবহারে শিক্ষিত দীক্ষিত তাকে বোঝান যাবে, না সে বুঝবে ও বিশ্বাস করবে?

আন। যুক্তি সঙ্গত কথা হ'লে কেন বিশ্বাস করব না বা বুঝ্‌বো না?

নব। আচ্ছা, বল দেখি মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি?

আন। Eat, drink, and be merry—খাও দাও আর মজা কর।

নব। তুমি কি বল আহার, বিহার, মৈথুন মানব জীবনের উদ্দেশ্য?

আন। তা'ছাড়া আর কি।

নব। বেশ তাহ'লে মানব জীবনে ও পশুজীবনে পার্থক্য কি?

আন। পশুদের আহার, বিহার, মৈথুন সব সীমাবদ্ধ। তা'দের ইচ্ছাশক্তির কোনরূপ বিকাশ দেখা যায় না; মানুষ আপন ইচ্ছানুরূপ সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ।

নব। ভাল, তা' যেন হ'লো। এখন বল দেখি এই যে আহার বিহার মৈথুন ব'ল্লে এই আহার বিহার মৈথুনটাও কি জীবনে ভাল ক'রে বুঝে দেখেছ?

আন। ও আবার বুঝব কি? ওতে বোঝাবার কি আছে?

নব। আছে বৈ কি; তুমি আহার কর কেন?

আন। ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শরীর পালনের জন্য।

নব। ক্ষুধা নিবৃত্তি ত যেমন তেমন যা' তা' খেলেই হ'তে পারে। তবে তুমি কেন কালিয়া, পোলাও, সন্দেশ রসগোল্লার এত অনুরাগী?

আন। ওটা অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুরূপ। ভাল খেতে বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা কিন্তু অবস্থায় কুলায় না বা সংগ্রহ হয় না ব'লেই লোকে যা' তা' খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

নব। তা হ'লে আহারটা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয় তার সঙ্গে আর একটা প্রবৃত্তির যোগ আছে যার জন্য মানুষ ভাল খেতে চায়, সে প্রবৃত্তিটা কি?

আন। সেটা কি প্রবৃত্তি বলা যায়। সেটা বোধ হয় সুখলাভের প্রবৃত্তি।

নব। শাস্ত্রে যাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলে অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের চিত্ত-রঞ্জন হয়। কেমন না?

আন। হাঁ, তা' বই কি!

নব। তুমি আগে ব'লেছিলে আহার, বিহার, মৈথুন মানবজীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু এখন কথা এই দাঁড়াল যে ঐ আহার বিহারের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন হওয়া চাই।

আন। তাত নিশ্চয়ই! আমরা যা' করি সকলি সুখ পাবার জন্য।

নব। বেশ, বেশ, তা হ'লে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আহার বিহার নয়—আহার বিহারের সঙ্গে সুখ পাওয়া চাই। প্রথম দর্শনে দুই ব'লে মনে হয় বটে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে ঠিক তা বোধ হয় না। আনন্দলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য অন্য সব উপায় বা অবলম্বন মাত্র, আজ যদি তোমায় কটক থেকে কল্‌কাতা যেতে হয় তা হলে তোমার বিষয় কলিকাতা, কিন্তু রেলগাড়ি চড়ে যেতে হবে বলে তাকেও তুমি তোমার বিষয় বল্‌তে পার না; রেলগাড়ি উপায় বা অবলম্বন। রেলগাড়িকে অবলম্বন করে তুমি তোমার বিষয় যে কল্‌কাতা তা পেতে পার, কেমন না?

আন। তাত ঠিক।

নব। তবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বা বিষয় আনন্দ; আহার বিহার বা মৈথুন নয়। ক্রমশঃ

নিত্যানন্দ দাস।

মাতৃলাভ

দুখের আগার তাহে ঋণভার পিতামাতা কেহ নাই;
বিধবা ভগিনী, ভায়ের রমণী, আর তারা দুটী ভাই।
বিনায়ক যবে, অতি শিশু সবে, তখন গিয়াছে মাতা,
দ্বাদশ বছরে পিতা গেছে মরে, মানুষ করেছে ভ্রাতা।
পিতার আদর পেয়েছে সে তবু, কিছুতো পুরেছে আশ,
মায়ের মুখখানি সুধাভরা বাণী মনে জাগে বারমাস।
মা বলে কাঁদিলে পিতা নেছে কোলে, আদর করেছে ভায়ে,

দুই ক্রোশ দূরে শ্রীনিবাসপুরে, মায়ের জনম গেহ ;
সেথা হতে শত জ্যোছনার মত, ঝরিছে তাঁহার স্নেহ।
মাতৃকুলের দূর অতীতের শুধু পড়ে আছে ভূমি,
শেষ সম্বল তাঁদের কেবল চরণ-চিহ্ন-চুমি।
পৃথক্ করিয়া মায়েরে ভাবিতে আর কিছু নাহি তার,
তাই মাঝে মাঝে ছুটে আসে সে যে গৌরী নদীর ধার।
মনে হয় তার জননী আবার বাগ্র দুবাহু মেলি ;—
কোলে টেনে লয়, আঁখি মুছি কয় —"বাছা কি ফিরিয়া এলি।"

"সরোবর জল করে ছল ছল, সোপানে চিহ্ন আঁকা,
ঘন বন ছায় ঐ দেখা যায়, পথটা চলেছে বাঁকা।
সিক্ত বসনে, যেতে গৃহ পানে উষারে করিয়ে স্নান,
ওই নীলজলে মাগো কুতুহলে কত না করেছ স্নান,
সেফালির তলে পাতিয়া আঁচলে কুড়ায়েছ কত ফুল,
চরণ চিহ্ন এখনো রয়েছে আলো করি তরুমূল।
ওই গৃহকোণে বসি একমনে জ্বেলেছ সাঁঝের দীপ,
দূর বন হ'তে ভাসিয়া এসেছে স্নিগ্ধ বকুল-নীপ।

"মোর মনে হয়, সারা বনময় বাতাস উতলি চলে,
বরষার রাতি শয্যাটি পাতি আমারে লয়েছ কোলে।
ঝর ঝর ঝর কুটীরের পর ঝরিছে জলের ধারা,
বিদ্যুৎ ভরা কালো কালো মেঘ গরজে পাগল পারা।
চমকি জননী শুনেছি অমনি কার অভয় বাণী !
তখন কি তুমি মোর মুখ চুমি বক্ষে লওনি টানি ?"
—ক্ষিপ্র চরণ রক্ত তপন উঠিত অস্ত-রথে
চেতনা লভিয়া বিনায়ক তবে ফিরিত গৃহের পথে।

একদা বিনায় বিটপির ছায় ফিরিতে গৃহের মাঝে
শুনিল বিষাদে মহাজন সাথে দাদা চলে গেছে সাঁঝে।
আশঙ্কা শত বিভীষিকা মত ব্যাকুল বক্ষ ভরি
রহিল জাগিয়া কঠিন হইয়া সমস্ত বিভাবরী।

প্রভাতে যখন মন্দ পবন, শুভ্র-স্নিগ্ধ-ছবি,
পূর্ব্ব গগনে কনক বরণে উদিল শান্ত রবি,
শিথিল চরণ শুষ্ক বদন বিনায়ক দেখা দিল,
ঝিনমিল আঁখি কি বেদনা মাখি বিনায়কে নেহারিল।

কণ্ঠ ধরিয়া কহিল কাঁদিয়া করুণ মুখানি চুমি,—
"নিজ হাতে আসি এসেছি বেচিয়া মায়ের জনম ভূমি।
ধনীর দুয়ারে রহি অনাহারে সহিয়াছি অপমান,
মনে অবিরাম জপিয়াছি নাম 'অনাথের ভগবান'।
আর্তো কিছুই ছিলনাক ভাই, জানতো মোদের দিন
যাছিল বেচিয়া এসেছি শুধিয়া দারুণ কঠিন ঋণ।
অশ্রু মুছিয়া কহিল বিনায়—"তার কি করিবে তুমি ?
আরতো কিছুই ছিলনাক ভাই বিনা সে স্বরণ ভূমি।"

নমো নমো নমঃ পবিত্র মম সবশোক-তাপহরা
স্বরগের ধন মায়ের ভবন সকল তীর্থভরা।
তোমার চরণ, প্রিয় পরিজন, সব সুখ দুখ ছাড়ি
চলিনু আজিকে যদি কোন দিন তোমারে ফিরাতে পারি।"
তব কোলে যেতে আজ কোন মতে নাহি মোর অধিকার,
দূর হতে তাই ওপদ স্মরিয়া নমিতেছি বারবার।
রেখ মা স্মরণে যদি ও চরণে আর না ফিরিতে পারি।"
—বিনায়ক চলে প্রবাসের পথে মুছিয়া নয়ন বারি।

দৈন্যের দায় তারা ব্যথা পায় এই কথা মনে স্মরি,
বহু দুঃখ সয়ে একমন হয়ে কর্ম্মে নিল সে বরি।
"এস, এস, এস, অতুল অর্থ, ভাণ্ডার মাঝে তুমি।
তোমার অভাবে বিকায়ে গিয়াছে মায়ের জনম ভূমি।
তোমারি পূজায় সারাদিন যায় করগো করুণা দান,
ছিলেনাক বলে সবে অবহেলে করিয়াছে অপমান।"
—করিয়া মমতা তুষ্ট দেবতা চাহিলা ভক্তপরে ;

যেখানে তখন ছিল,ঝাউবন পবনে করিত খেলা,
আজিকে সেখানে উঠেছে সৌধ অম্বর করি হেলা।
সরসীবিতানে সেফালি যেখানে ঝরিত আপন মনে,
সেখানে এখন মুগ্ধ নয়ন হেরি নন্দন বনে।
যেথায় সবার,অবারিত দ্বার সেথায় প্রহরী বসি
হেরি এই সব বিনায়ক শিরে আকাশ পড়িল খসি,
তিতি আঁখিনীরে কহিল.যে ধীরে "এতদিনে হলি পর!
তুই যদি মাগো ভুলে গেলি মোরে কোথায় আমার ঘর?

মহাজনে গিয়া সব নিবেদিয়া বিনায়ক কহে বাণী
"দয়া করে প্রভু, যদি ফিরে দাও জননীর ভিটেখানি।"
মহাজন কন, "বৃথায় রোদন, অনুরোধ করা মিছে,
অনেক অর্থ করিয়াছি ব্যয় তোমার জমির পিছে।"
বিনায়ক বলে জুড়ি করতলে—"সব টাকা আমি দিব,
যা আছে আমার সব তুমি লও; শুধু জমিটুকু নিব।"
শুনি মহাজন মহারাগে কন্ "হয়েছ নবাব ঘোর,
দূর হয়ে যাও, কিনিবারে চাও বাগান বাড়ীটি মোর?"

বিফল জনম বিফল করম বিফলে জীবন গেল,
সাধনার ধন মায়ের ভবন আর নাহি ফিরে এল!
অগাধ অর্থ তারা তো ব্যর্থ, অক্ষম তারা হীন;
আমার দৈন্য ঘুচাতে নারিল এতই তাহারা দীন।
এবার হইতে কায়মন প্রাণে করিব তাহারি সেবা
গ্রাস হ'তে তার মায়েরে আমার ফিরে দিতে পারে যেবা।
এই মনে করি সারা রা'ত ধরি জাগি সে শয্যাপর
সবাই যখন ঘুমে অচেতন ত্যজিল আপন ঘর।

তৈল অভাবে শরীর রুক্ষ, অন্ন অভাবে ক্ষীণ,
অভাগা বিনায় পথে পথে ধায় অবিরাম নিশিদিন!
যারে দেখে তারে করিয়া মিনতি কাতরে কাঁদিয়া কয়
—"কেমন করিয়া হারাধন বল পুনঃ আপনার হয়।"

কেহ বলে—"আরে পাগল যে এটা, থানায় ধরিয়া দেহ.
"বুঝি বড় দুখে হারায়েছে জ্ঞান" করুণায় কহে কেহ
শেষে একদিন শান্ত নবীন সন্ন্যাসী সনে দেখা,
কহিলেন তিনি—"এস মোর সাথে, সব ফিরে দিব সখা।"

গৌরীর তীরে বসিয়া কুটীরে সন্ন্যাসী গাহে গান—
"জয় জয় জয় শঙ্কর শিব ভক্তের ভগবান।
অক্ষম দীন সাধনা বিহীন কি গাহিব তব লীলা,
তৃষ্ণার তরে চেয়েছে যে বারি তারে সুধা এনে দিলা।
সকলের সাধ পুরায়ে হে নাথ, ভিখারী হয়েছ তুমি।
স্মরিয়া তোমারে কেঁদেছে যে, তারে বুকে লহ মুখচুমি।
প্রাণের জ্বালায় ডেকেছি তোমায়—দাও মার ভিটা খানি;
মার কোলে মোরে ফিরায়ে দিয়েছ, শুনায়েছ তাঁরি বাণী।

প্রতি নারী মাঝে সন্ন্যাসী আজি আপন মায়েরে হেরে,
অনাথ আতুরে বুকে টেনে ল'য়ে যেখানে সেখানে ফেরে।
হেরি নন্দনে মায়ের বদনে হাসিটী যখন ফুটে,
সন্ন্যাসী আজি আঁখিজলে ভাসি মা বলিয়া সেথা লুটে।
সন্তান কোলে মাতা যদি চলে সন্ন্যাসী চেয়ে রয়,
পুলকের সনে স্থির দুনয়নে অবিরাম ধারা বয়।
পথের পথিক সুধায় তাহারে কি করিছ বসে একা?
সন্ন্যাসী কহে "এতদিনে ভাই পেয়েছি মায়ের দেখা"।

শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

৮ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দ রায় সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিলেন। "পড়শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। অর্থাৎ যে সাধন দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন পুরুষার্থ সাধিত হয়, সেই পুরুষার্থ বিষয় বল। কিন্তু সামান্য কথায় বলিলে হইবে না। শাস্ত্র যুক্তি সমর্থন

করিয়া বলিতে হইবে। "রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়" শ্রীরাম রায় বলিলেন, জীব স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। কারণ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ শতজন্মভিঃপুমান্" এই শ্লোক দ্বারা স্বধর্ম্ম একবার মাত্র যাজন করিলে'হইবে না, তাহাতে পরিনিষ্ঠিতান্তঃ-করণ হওয়া চাই—কিন্তু, প্রভুর প্রশ্নমত শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর করিলেন না, কারণ একবারে চরম নিষ্পত্তি করিলে, প্রেম ভক্তির মাধুর্য্য ও উচ্চতা প্রকাশ হয় না এই জন্য সোপানানুসারে সিদ্ধান্ত 'করিতেছেন। অনেক সোপান পার হইয়া পরে অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিতে হয় এই জন্য জগৎবাসী জীবকে সেই ভক্তি হর্ম্ম্যের সুরম্য সোপান দেখাইতেছেন। বেদ শাস্ত্র যেমন কর্ম্ম উপদেশ করিয়া উপনিষন্মার্গে কর্ম্ম খণ্ডন করিলেন সেইরূপ বৈষয়িক কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পথের নশ্বরতা দেখাইয়া ভক্তি পথকে দৃঢ় করিতেছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিতেও আছে। যাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম নাই সে, 'ত' জড় তবে কি ভক্তিদেবী জড়রূপা, এই সিদ্ধান্তে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলিতেছেন, "অন্যাভিলাষিতা শূণ্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"। আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিলে আমরা দেখিতে পাই প্রথমতঃ সামান্য বৈষয়িক জ্ঞান কর্ম্ম লোপ করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণানুশীলন রূপ জ্ঞান কর্ম্মের অস্তিত্ব দেখাইতেছেন। কারণ যদি আমার জ্ঞানকর্ম্ম রহিল না, তবে আমি কি লইয়া শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিব। কারণ এই সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্লোক বলিতেছেন জীব অহঙ্কারাস্পদ, জ্ঞান কর্ম্মের দ্বারা প্রেমভক্তি সুখ পাইবে না,প্রেমভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞান কর্ম্ম যখন তোমার জ্ঞান কর্ম্মাশ্রিত অহঙ্কার তত্ত্বকে জীর্ণ করিয়া দিয়া তাহা হইতে সার নির্য্যাস অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস এইটী আর্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া দিবেন তখন তোমার আমি আমার ইত্যাকার অসদভিমান থাকিবে না, (যথা কাপিলেয়ে)—

"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধে গরীয়সী
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ মনলোযথা"

অর্থাৎ স্বার্থ শূণ্য ভক্তির বিক্রম দেখাইতেছেন যেমন আমরা ক্ষুধা হইলে অন্নাদি ভক্ষণ করি, কিন্তু কি করিয়া আমরা অন্নাদি জীর্ণ করিব বা আমাদের পাকস্থালীতে অন্নাদি জীর্ণ হইবে তাহা ভাবনা না করিলেও জঠরাগ্নি যেমন সেই অন্নাদি পাক করিয়া তাহা হইতে সারাংশ লইয়া আমাদের দেহ গঠন (ক্ষয় পূরণ) করেন, এবং অসারাংশ বাহির করেন; সেইরূপ প্রেমভক্তিরূপ অনল আমাদের দেহের, ভুক্ত অহঙ্কার যাহা আমারা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছি তাহাকে জীর্ণ করিয়া তাহা হইলে সার ভাগ আমি কৃষ্ণদাস এইটী লইয়া আমাদের ভিতর একটি দেহ গঠণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন। তবে অন্নংভক্ষণ করিলে যেমন বিলম্বে পরিপাক হয় সেইরূপ এই দেহও বিলম্বে গঠন হইয়া থাকে যদি উদরের ভিতর অগ্নি না থাকে তাহা হইলে বাহিরে জাল দিলে যেমন অন্নাদি পাক হয় না সেইরূপ প্রেমভক্তিরূপ অনল ব্যতীত এই অহঙ্কার কোষ জীর্ণ হইবার উপায় নাই প্রেমভক্তির গঠিত দেহটিকে আমরা সিদ্ধ দেহ বলিয়া থাকি। প্রভু সাধ্য কি বলিলেন শ্রীরামানন্দ রায় তদুত্তরে সাধন বলিলেন। এই বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক পাঠ করিলেন, শ্লোকটী এই—

"বর্ণাশ্রমাচার বতা পুরুষেণ পরঃপুমান্"
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থানান্যস্তত্তোষ কারণম্।

অন্বয়—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্ বিষ্ণু আরাধ্যতে। তত্তোষ কারণম্ অন্যঃ পন্থান"। বেদরূপে ভগবানই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন অতএব এই ধর্ম্ম পালন করিলে, বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ইহা হইতে তাঁহার সন্তোষের উপায় আর নাই। প্রভু যেমন অসাধ্য শ্রীরাধাপ্রেমকে সাধ্য রূপে নির্ণয় করিতে বলিলেন, শ্রীরামরায়ও তেমনি সাধনটী বলিলেন, ভক্ত ভিন্ন ভগবানকে আয়ত্ত করিতে কেহ সক্ষম হয় না কারণ শ্রীরাধাপ্রেম প্রভুর সাধ্য হইতে পারে, কারণ রাধাঋণ শোধ করিয়া সাধ্যের আস্বাদ করিবার জন্য তাঁহার ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুরই প্রেম ভক্তি প্রভুর সাধ্য হইতে পারে কিন্তু ভক্তের পক্ষে সাধনাকারে তাঁহার প্রকাশ এই জন্য শ্রীরামরায় সাধ্যটীকে সাধনাকারে বলিলেন। কারণ এই শ্লোকটীতে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের উক্তিতে শ্রীরামরায়ও প্রকৃতই বলিয়াছেন। যথা—"বর্ণাশ্রমাচারবতা কপট সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বিনা) প্রকৃতের সন্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ ইতিবচনাৎ" সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞ প্রকটয়িতুম্ স্বীয় প্রিয়াঙ্গপ্রতিময়া নিজাঙ্গম্ আবৃত্য যো পুরুষ অবতীর্ণঃ তদাশ্রয়েণ পরপুমান্ কৃষ্ণ আরাধ্যতে। তৎতোষ কারণং অন্যঃ (শ্রীচৈতন্যা-শ্রয়াদন্যঃ অপরঃন)॥

অর্থাৎ যিনি কপট-সন্ন্যাসীর বেশে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ প্রচার করিয়া, আপনি ভিন্ন আপনাকে 'কে' প্রকাশ করিবে, এই জন্য নিজেকে ধরা দিয়া জীবের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে জানিলে বা আশ্রয় করিলে জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।' কিন্তু এখন, প্রভুও ভক্তকে যেমন বাহ্য কথা লইয়া আলোচনা করিয়া শেষে অন্তরের কথা খুলিয়া দিবেন আমরাও সেইরূপ কতক আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শ্রীরামানন্দ রায় কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি বলিলেন বস্তুত এইটী প্রকৃত ভক্তি নহে, আরোপ-সিদ্ধা, অর্থাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির আকারে প্রকাশ-বিশিষ্টা ভক্তি। তবে এইটী যাজনা করিতে করিতে যদি কখন সাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে কর্ম্মক্ষয়ে নির্ম্মলা ভক্তির প্রকাশ হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-যাজীর সদ্‌গুরু লাভেরও উপায় আছে কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা নাই এই জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু এইটীকে বাহ্য করিলেন। কারণ আমরা জগতে দুই শ্রেণী লোক দেখিতে পাই, কেহ জাত-শ্রদ্ধ কেহ বা অজাত-শ্রদ্ধ। শ্রীরামানন্দ রায় এই বিধানটী অজাত-শ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা নাই তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কারণ যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাজনায় শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ ক্রম সোপান দ্বারায় সাধু সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ করেন। এই জন্য শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে ৪র্থ লহরীর একাদশ শ্লোক বলিতেছেন।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

প্রথমে জীবের শ্রদ্ধা না হইলে 'ত' সাধু সঙ্গ হয় না তবে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাটী মূলে কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ। এই জন্য মুচুকুন্দ রাজর্ষি বলিয়াছিলেন, অগ্রে ভবক্ষয় তবে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ যেন অগ্রে সংসার ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যদি সংসার ক্ষয় হইল তবে ত নির্ম্মল চিত্তে শ্রদ্ধা হইতে পারে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সূর্য্য উদিত হইবার সময় যেমন অগ্রে অরুণবর্ণ তৎপরে জ্যোতিষ্মান্ হন, সাধুসঙ্গও সেইরূপ অগ্রে কৃষ্ণকৃপারূপ শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করিয়া পরে অবতীর্ণ হন।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার"

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ।

যাত্রী।

বেঁধে রেখে মোর কাপড় চোপড
গুছিয়ে ঘরের কাজ,
বসে আছি আজ পথের ধারেতে
ধরে যাত্রীর সাজ!
কাজ কর্ম্ম যত ঘরের আমার
এসেছি গো আমি সেরে,
বসে আছি তাই সাথীর আশায়
বিজন পথের ধারে!
আস্‌চে যাচ্ছে যাত্রী কত গো
ঘুর্‌তেছে নিশি দিন,
কর্ম্মে কর্ম্মে আবদ্ধ চরণ
গতি হয়েছে গো ক্ষীণ!
অজানা অচেনা পথটী আমার
যাই গো কেমন করে,
সম্মুখে ওই আকাশের গায়
আঁধার আস্‌চে ঘিরে!
ওগো যাত্রী আমি, বেরিয়ে এসেছি
সারি সংসার কাজ,
সাথিটী আমার জুটিয়ে দাওনা
প্রাণে দিওনা লাজ!
দিনের আলোক সাঁঝের আঁধার
মিশ্‌তেছে ওই ধীরে—
দুকূল ভরা ছুট্‌ছে নদী; আমি
যাই গো কেমনে পারে!
কাল বোশেখের উঠ্‌তেছে ঝড়
নিভ্‌লো সাঁঝের বাতি,
একা আমি ওগো নিরাশ্রয়ে আজ,
কেমনে কাটাই রাতি!

দিওনা গো দুঃখ দিওনা দিওনা,
দিওনা গো তুমি আর,
দুঃখের পশরা বয়ে বয়ে মোর
দেহ কঙ্কাল-সার !"
পথটী তোমার দেখিয়ে দাওনা
আমি যে তোমার যাত্রী !
পথের ধারে বসে বসে আর
কাটাতে পারি না রাত্রি !

শ্রীসনৎকুমার সেনগুপ্ত ।

সাহিত্যসেবা

আমরা গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করি, শিখিবার জন্য, কিন্তু সাহিত্য পাঠ করি শুধু শিখিবার জন্য নহে আনন্দের জন্য। মানুষ স্বভাব-ধর্ম্মবশতঃ মানুষের কাছে মনের ও প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া এবং মানুষের মনের ও প্রাণের কথা শুনিয়া, সুখ ও শান্তি পাইয়া থাকে। এই জন্যই সাহিত্য পাঠ করিতে আমাদের খুব ভাল লাগে, কারণ মানবের জীবন, মনের চিন্তা, হৃদয়ের ভাব, সুখদুঃখবোধ ইত্যাদি লইয়াই সাহিত্য। আবার সাহিত্যের উন্নত চিন্তা ও ভাব সমূহ সাহিত্য-সেবীর চিন্তা ও ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। একারণ সাহিত্যকে মনের মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য বলা যাইতে পারে। অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিলে মহাপুষ্টিকর দ্রব্যও হিতকর না হইয়া বরং অহিতকর হইতে পারে, কিন্তু পরিতোষের সহিত যাহা কিছু গৃহীত হয় তাহা মহদুপকার সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে সাহিত্যচর্চ্চাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য, নিজের ও জাতির উন্নতির জন্য শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে জীবনে মাধুর্য্য ও আনন্দ এবং মনে প্রশস্তভাব ও উদারতা না থাকিলে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাণশূন্য দেহের ন্যায় শ্রীবিহীন হইয়া থাকে। সাহিত্য সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয়

জীবনে প্রাণশক্তি, আনন্দ ও মাধুর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার মধ্যে সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। বাস্তবিকই সাহিত্যের উন্নতি অবনতি এবং জাতীয় উত্থান পতন যে সাধারণতঃ যুগপৎ হইয়া থাকে, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। একের অবস্থার উপর অন্যের অবস্থা নির্ভর করিতেছে। যখন কোন জাতি উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে এবং তাহার প্রাণে নিত্য নবোৎসাহ নবোদ্দীপনা ও নবানন্দ আইসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যও পরিপুষ্ট হইতে থাকে; এবং জাতীয় উন্নতির উচ্চতম অবস্থায় সাহিত্যও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। আবার যখনই জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই অধঃপতিত জাতির ঘুমঘোর কাটিয়া যায় এবং সমস্ত দেশে প্রাণচঞ্চলতা ও কর্ম্মকোলাহল পরিলক্ষিত হয়। অবনতির সময়ও ঠিক ঐরূপ। জাতি ও সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতিত হইতে থাকে। জাতীয়-জীবন ও সাহিত্য পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, এক হইতে অন্যকে পৃথক করা যায় না। আমরা অধঃপতিত হইয়া আধুনিক সভ্যজাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়া আছি, অতএব আমাদের সকলকেই সাহিত্য সাধনা করিতে হইবে। আজকাল আমরা সাহিত্য সাধনা করিতেছি বটে কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় কতিপয় প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী ব্যতীত আর কাহারও সাহিত্যচর্চ্চায় বিশেষ কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আমরা অলস ও শ্রমবিমুখ; কিন্তু যশঃপ্রার্থী। সেই জন্য আমরা অল্পায়াসে যশঃপ্রাপ্তির জন্য সতত চেষ্টিত। আমরা গবেষণা ও তুলনামূলক (critical or comparative study) অধ্যয়নের কষ্টস্বীকার করিতে চাহি না;—নিজের বিশুদ্ধ মৌলিক চিন্তার উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিয়া সাধারণ্যে লেখক বা কবি নামে পরিচিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের কোন কাজ হয় না। কারণ দুই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে এত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এত বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর দিনে গবেষণার সহায়তা অবলম্বন না করিলে, তুলনা বা সমালোচনামূলক অধ্যয়ন না করিলে, ব্যক্তি বিশেষের মৌলিক চিন্তা জগৎকে প্রায়ই নূতন কিছু দিতে পারে না, কেবল পুরাতন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি মাত্র করিয়া থাকে। এইরূপ মৌলিক চিন্তা দ্বারা বিশেষ ফলোদয় না হইলেও একেবারে যে কিছু হয় না এরূপ বলা যায় না;

কারণ লেখকের চিন্তাশক্তি অন্ততঃ কিছু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিত্বের ছাঁচে ঢালায় পুরাতন বিষয়ও নূতন দেখায় ও প্রীতিদায়ক হয়। কিন্তু আর এক দল "ভুঁইফোড়" লেখক আছেন, যাঁহারা সাহিত্যের উপর কতকগুলি অপদার্থের বোঝা চাপইয়া তাহার উন্নতির গতি মন্দীভূত করিয়া দিতেছেন তাঁহারা হইতেছেন কতকগুলি বাজে মাসিক পত্রিকার লেখকগণ। নিত্য নূতন নূতন মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে——সেই সব পাঠ করিলে তৎসম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেরই কাগজ বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সে সব পত্রিকার লেখকগণের না আছে মৌলিক চিন্তা, না আছে কোন প্রয়োজনীয় বা উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা,—তাঁহারা কেবল অন্যের অনুকরণ দ্বারা ভালবাসার গল্প লিখিয়া মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনুকরণের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা বা কৌশল থাকিলে নকল সহজে ধরা পড়িতে পারেনা ও তাহার ভিতর দিয়া আসলের স্বাদ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এসব মাসিকের গল্প গুলিতে শুধু বাহিরের অনুকরণ, সুতরাং সেই সমস্ত অসারতাপূর্ণ ও স্থূলরুচি ব্যতীত মার্জ্জিত রুচির পক্ষে উপভোগের একেবারে অযোগ্য। অনেকে অনায়াসে লেখক নামে খ্যাত হইবার নিমিত্ত পুরাতত্ত্ববিদ্ সাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন আজকাল বঙ্গদেশে য়্যান্টিকেয়ারিয়ানের (পুরতত্ত্ববেত্তার) ছড়াছড়ি। ইংরাজি সাহিত্যে পুরাতত্ত্বালোচনার হুজুগের সময় Chatterton ও Macpherson প্রভৃতির দ্বারা যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে জালিয়াতি হইয়াছিল, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যেও সেইরূপ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক জালিয়াতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কার্য্যোপলক্ষে কোন স্থানে বেড়াইয়া আসিলেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া মাসিকে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিলে দৃষ্ট স্থান সমূহকে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতির দ্বারা বিজড়িত না করিলেই নয়। তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক অঘটন ঘটাইতে, যাহা যথার্থতঃ নাই তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। কেহ বা গ্রামের নাম হইতে, কেহ বা কোন ঠাকুরমার গল্প হইতে উর্ব্বরা কল্পনা শক্তির সাহায্যে গুরুতর ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বীয় জন্মভূমি বা বাসস্থানের প্রতি সঙ্কীর্ণ অনুরাগ বশতঃ স্বগ্রামকেই বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বল্লালসেন প্রভৃতির লীলা ভূমি রূপে প্রমাণিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইসব প্রাচীন তথ্যানুসন্ধানকারীদিগের নিকট ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র,

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ হার মানিয়া গিয়াছেন। যাহারা বিদ্যাবুদ্ধিগবেষণা সম্বন্ধে তাঁহাদের পদরেণুরও যোগ্য নহে তাহারা তাঁহাদের ভুল বাহির করিতে এবং সমালোচনার সময় তাঁহাদের প্রতি শিষ্টাচার বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। তাই আজকাল অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা আজগুবি গল্প-সমূহে পরিপূর্ণ। প্রগাঢ় চিন্তা পূর্ব্বক আলোচনা অপেক্ষা কোন কিছু বর্ণনা, অল্পচিন্তা ও সহজভাষায় হইতে পারে। সুতরাং দিন দিন আজগুবি ঐতিহাসিক গল্পের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। নবীন লেখকগণর এই সমস্ত প্রেমের গল্প ও স্বকপোল কল্পিত প্রত্নতাত্ত্বলোচনার দ্বারা সাহিত্যের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হয় না এবং ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনগঠনের কোনই সহায়তা হইতে পারে না। কেবল, পাঠকগণের রুচিবিকার ও চিন্তা শক্তির খর্ব্বতা সংসাধিত হইয়া থাকে। উপন্যাসের গল্পে আয়েষা, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, প্রতাপ, ওসমান ও নগেন্দ্রের সৃষ্টি করিতে পারিলে পরিবার ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রূপজমোহ, অপূর্ণ ভোগাকাঙ্ক্ষা ও বিরহের হা-হুতাশপূর্ণ প্রেমের গল্প সমূহ কেবল যুবকের রুচিবিকার উৎপাদন ও ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লালসা-বৃদ্ধি করিয়া চরিত্র-বল-সঞ্চয়ের পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়া থাকে। আবার, বিবিধ-ভাষা-জ্ঞান-সমন্বিত হইয়া প্রত্নতত্ত্বের আলেচনার দ্বারা বর্ত্তমান যুগকে অতীতের সভ্যতা ও জ্ঞান-রত্ন উপহার স্বরূপ দিতে পারিলে শুধু জাতিবিশেষ কেন, সমগ্র মানবজাতির মহাকল্যাণ সাধন করা যায়। কিন্তু আজগুবি প্রত্নতত্ত্ব শুধু গুলিখুরী গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, ইতিহাসের মর্য্যাদা লঘু করিয়া থাকে। অতএব সাহিত্য-চর্চ্চায় শ্রদ্ধা, সত্যপরায়ণতা ও মহদুদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। সাহিত্যসেবকের একটী অতি গুরুতর ও পবিত্র কর্ত্তব্য মনে না করিলে, সাহিত্য-চর্চ্চায় অসত্য ও মেকির প্রশ্রয় দিলে এবং উচ্চ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, কোন লেখক বা পাঠকের দ্বারা সাহিত্যের কোন রূপ উন্নতি ও সাহিত্য-চর্চ্চার কোনরূপ সফলতা হইতে পারেনা। সাহিত্য-চর্চ্চার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিবিধ চিন্তা ও ভাবলহরী-সমন্বিতব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশ ও প্রস্ফুটন দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং বিশ্বমানবের সহিত যোগস্থাপনই সাহিত্য সেবার চরম লক্ষ্য। তাহা হইলে পুরাতন ও নূতন এবং স্বদেশ ও বিদেশের মিলন প্রয়োজন। জাতীয়-জীবনের স্রোত যে ধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে,

তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন পন্থাবলম্বন করিলে প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি হইতে পারেনা এবং জীবনীশক্তির হ্রাস ঘটিয়া থাকে। আবার আধুনিক সভ্যতার খরস্রোতের সহিত না মিশিলে পুরাতন স্রোত মন্দীভূত হইবে। সুতরাং গন্তব্য-স্থানে পৌছিতে তাহার বহুবিলম্ব হইবে এবং হয় তো জাতি সমষ্টি-সাগরে তাহার অস্তিত্বের কোন্ চিহ্নও বিদ্যমান থাকিবেনা। অতএব সাহিত্য-সেবককে স্বজাতির পুরাতন ও নূতন সভ্যতা; চিন্তা ও ভাব আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাচীন ও নব্য উভয় প্রকারের জাতীয় সাহিত্য ঐকান্তিক অনুরাগ ও যত্ন সহকারে গবেষণা ও তুলনা-মূলক অধ্যয়ন করিতে হইবে; এবং যতদূর সম্ভব, অধ্যয়ন ও গবেষণা দ্বারা সভ্য জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য হইতে স্বজাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের জন্য সুন্দর চিন্তা ও ভাব রূপ বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ গবেষণা ও তুলনা-মূলক অধ্যয়নের দ্বারা স্বজাতীয় ও বিজাতীয় চিন্তা ও ভাব সমূহ নিজস্ব করিয়া লইয়া স্বীয় মৌলিক চিন্তা ও ভাবের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনাদিরূপে জাতীয় সাহিত্যকে নবোপঢৌকন প্রদান করাই প্রকৃত সাহিত্য-সেবা।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

ভাগবত ধর্ম্ম।

সমুচ্চয়বাদ (১)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকারে মানব পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করে। তত্ত্বের উপলব্ধির সহিত বাস্তব-জীবনের আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিশ্বাস যখন সত্য, তখন তাহা কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং এই ত্রিবিধ প্রকাশের তত্ত্বের দিক রাখিয়া দিয়া আমরা যদ্যপি বাস্তব-জীবনের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ভগবদুপাসনা কিরূপ তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিব।

ব্রহ্মের যে সংজ্ঞা শ্রীজীবগোস্বামীর মতানুসারে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রবাহ, এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের স্রোত, আমাদের এই দেহ ইন্দ্রিয় মন, এ সকলের দ্বারা পরমার্থ-সত্য যে ব্রহ্ম বস্তু, তিনি

লক্ষণান্বিত হইলেও তিনি এ সকলের অতীত, অর্থাৎ যখন তিনি আছেন তখন এ সকল আদৌ নাই। এ সকল আছে বলিয়া যে আমাদের মনে হইতেছে তাহা ভ্রান্তি-বিজড়িত। অতএব হে মানব! যদি তত্ত্ব চাও, যদি জ্ঞান চাও, যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও, তাহা হইলে প্রাণপণ যত্নে এসকল পরিত্যাগ কর। অবশ্য একেবারে পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব, এই জন্য কর্ম্ম করিতে থাক, কিন্তু কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে, এই লক্ষ্য যেন ধ্রুবতারার ন্যায় সর্ব্বদা জীবনতরণীর পুরোদেশে বিদ্যমান থাকে। কর্ম্মের নাশ করিয়া নৈষ্কর্ম্যে যাইতে হইবে ইহাই জীবনের আদর্শ।

ইহাই জ্ঞানীর কথা, ইহাই ব্রহ্ম-উপাসকের কথা। এ কথা সত্য, ইহার প্রতিবাদ কেহই করেন নাই। মতভেদ কেবল নৈষ্কর্ম্যের স্বরূপ লইয়া। কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই নৈষ্কর্ম্য হয় না, কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারিলে কর্ম্মই যোগ হয়, এই কর্ম্মযোগই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য, কর্ম্মত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্য হয় না। ইহাই সমুচ্চয়বাদ। এই সমুচ্চয়বাদ বেশ ভাল করিয়া না বুঝিলে ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সুতরাং আর একটু ভাল করিয়া এই সমুচ্চয়বাদ আলোচনা করা যাউক।

এই জগতের প্রতি চাহিয়া দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ইহাই সহজ কর্ম্ম বা প্রাকৃত কর্ম্ম। ক্ষুধার তাড়নায় শিশু খাদ্য অন্বেষণ করে, রাঙ্গা জিনিস দেখিলেই ধরিতে যায়। তখন তাহার জ্ঞান নাই। তখন সে বিষের বাটি হাতে পাইলে যদি মিষ্ট বোধ হয় তাহাই খাইয়া ফেলিবে, সুন্দর বিষধর সর্প দেখিলে তাহাই ধরিতে যাইবে। এই যে স্বাভাবিক কর্ম্মাসক্তি ইহা হইতে জ্ঞান আরম্ভ হয়। শ্রেয়ঃ ও প্রেয় ইহার মধ্যে প্রভেদ আছে, প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিতে হইবে এই চিন্তা মানব-শিশুর অন্তরে জাগ্রত হয়। এই ভাব জাগাইবার জন্য মানবের নিজের অভিজ্ঞতাই মুখ্যতঃ কার্য্য করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, পিতা মাতা শাস্ত্র গুরু প্রভৃতির উপদেশ সাহায্য করে। এই প্রকারে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, তাহার পর জ্ঞান হইতে ভক্তি। জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ নিরূপিত হইতে থাকে এবং হৃদয়ও ক্রমশঃ সেই পরমার্থ বস্তুর প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়। ইহাই হইল প্রথম স্তর। তাহার পর ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম। এই যে শেষের কর্ম্ম ইহার নাম নিবৃত্ত কর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধন-ভক্তি। মতান্তরে

ইহাও বলিতে পারা যায় কর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে ভক্তি। এই যে দ্বিতীয় স্তরের কর্ম্ম ইহাই সাধন-ভক্তি। শব্দগুলির অর্থ উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা কেবল শব্দ লইয়াই বিরোধ করেন, অর্থাৎ সূক্ষ্ম-চিন্তায় একেবারে যাঁহারা অপ্রবিষ্ট হইয়াও তত্ত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা বলিবেন কর্ম্ম হইতে ভক্তি কিরূপ? তাঁহারা কয়েক মাস পূর্ব্বে ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা পুনরায় পড়িয়া লইবেন। তাহা ছাড়া সাধন-ভক্তির তত্ত্বালোচনাতেও ইহা সহজে প্রতীত হইবে। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ প্রভৃতি কর্ম্ম নহে, সাধন ভক্তি। কিন্তু একদল লোক তাহাকে কর্ম্ম বলিবেন। ইহা কর্ম্ম কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, আত্মতৃপ্তির জন্য বা আত্মপুষ্টির জন্য যে কর্ম্ম করা যায় বা শাস্ত্রের শাসনে, লাভের প্রত্যাশায় বা কোনরূপ ভয়ের তাড়নায় যে কর্ম্ম করা যায় ইহা সে পর্য্যায়ের কর্ম্ম নহে, কিন্তু একটা উচ্চতর অর্থে কর্ম্ম। এই রহস্যটুকুই যে গীতার প্রাণ তাহা আমরা ক্রমশঃ বিশদ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ কেবল আমোদের দেশে নহে সকল দেশেরই চিন্তাশীল সাধু ও সুধীগণের মধ্যে চিরদিন উত্থিত হইয়াছে। এই বিরোধের সমাধান বা সমন্বয়ের যে চেষ্টা, উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা তাহার নাম সমুচ্চয়বাদ। এক হিসাবে ভগবদ্গীতা এই সমুচ্চয়বাদের পরাকাষ্ঠা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতার টীকায় ইহা অস্বীকার করিয়াও একরূপ স্পষ্টভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা তাঁহার টীকা উদ্ধার করিয়া ক্রমশঃ দেখাইতেছি। গীতা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া পরাভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত এই সমুচ্চয়-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ গীতার বীজই শ্রীমদ্ভাগবতে মহামহীরূহে পরিণত। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাহা সফল, শ্রীচৈতন্য লীলায় সেই অমৃতফল অযাচিত হইয়াও উত্তম অধম নির্ব্বিশেষে বিতরণ। এই তত্ত্বটুকু যেন আমরা কখনই বিস্মৃত না হই।

জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ সংক্ষেপে এই। দুইরকম প্রকৃতির লোক জগতে বিদ্যমান। একদল লোক সংসারে খুব খাটিতে চায়, বড় বড় কার্য্য করিতে চায়। গৃহে গৃহস্থ, গৃহস্থের যাবতীয় ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিয়া বৃহৎ পরিবার প্রতিষ্ঠা করে, আত্মীয় ও আশ্রিত জনের ভরণ পোষণ করে, নানা উপায়ে সমাজের ও জগতের সেবা করে। যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করে। ব্রাহ্মণ হইলে যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত্তত্রাণ, শত্রুজয়, রাজ্যশাসনাদি, বৈশ্য হইয়া

কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি এবং শূদ্র হইয়া শ্রদ্ধাবিশ ভাবে পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম করে, ইহলোকে যশস্বী হইয়া পরলোকেও সুখী হইবার প্রত্যাশায় দেহত্যাগ করে। এই একদল লোক। সেকালের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আজকাল ঠিক থাকুক বা না থাকুক, সমাজের ব্যবস্থা ও সংস্থান বিবিধ কারণের ঘাত প্রতিঘাতে স্বতই বিপর্য্যস্ত বা পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, এপ্রকারের লোক জগতে চিরকাল আছে ও থাকিবে, কেবল ভারতবর্ষে নহে,—সকল দেশেই থাকিবে কারণ ভিতরে মানব প্রকৃতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। এ সকল লোক, বড় বেশী ভাবিতে চায় না, কারণ তাহারা কিছু চঞ্চল, এবং কিছু বহির্ম্মুখী। তাহারা যে লোক মন্দ তাহা নহে, তবে তাঁহারা ধ্যান-নিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন বরং অনেকস্থলে একরূপ তাহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন অতিরিক্ত ধ্যান-নিষ্ঠা মানবকে অলস করিয়া দেয়, প্রত্যক্ষ হইতে সরাইয়া এক অজ্ঞাত ও 'বোধ হয়' অজ্ঞেয় অপ্রত্যক্ষের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখে। এই একদল, ইহাদের নাম দেওয়া যাউক 'চরমপন্থী' কর্ম্মী, The followers of the extreme view of sansationalistic hedonism ইহারা যে মন্দ লোক তাহা নহেন। তবে সময়ে সময়ে তাহার পরিণতি খারাপ হয় তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যানের সাহায্যে ক্রমে দেখাইব।

আর একদল চরমপন্থী জ্ঞানী। তাঁহারা বলেন এই মৃত্যুর সংসারে, মানব যে সুখান্বেষণ করিতেছে ইহা তাহার অবিদ্যার ফল। মোহাচ্ছন্ন জীব! কর্ম্মের এই উত্তেজনা পরিত্যাগ কর, অন্তর্মুখী হও, সৎ কি অসৎ কি, দেহ কি, ইন্দ্রিয় কি, মন কি বুদ্ধি কি এই সব, বিচার কর। তত্ত্বসমূহের সহিত পরিচিত হও তাহা হইলে বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্য হইতে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযত হইবে। তখন কেবল মনে হইবে, এই সংসার দারুন বন্ধন, ইহা পরিত্যাগ করাই লাভ। এমনি করিয়া ধ্যান-নিষ্ঠা আশ্রয় কর। সুখ দুঃখের অতীত, ত্রিগুণের পরপারে 'চিদানন্দরূপ আমি' তাহাই অনুভব হইবে। ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাই মুক্তি। কর্ম্ম কেবল বন্ধন, যে পরিত্যাগ করিবে সেই বাঁচিবে যে আশ্রয় করিবে সেই মরিবে। অতএব কর্ম্মপাশ ছেদন কর। ইংরাজী ভাষায় ইহাদের Followers of the Extreme view of Idealistic Asceticism বলে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ বা বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সহিত উপনিষদ ও আরণ্যক অংশের সহিত বিরোধে ইহার সূত্রপাত। বেদের সংহিতা অংশে ইহার সমন্বয় ছিল। সমুচ্চয়বাদই আদি ও শেষ। পরবর্ত্তী কালে

জৈমিনি ও বাদরায়ণ এই দুই মত লইয়া উপস্থিত। গীতায় তাহার সমন্বয়। ভাগবত দক্ষের সহিত শিবের বিরোধে ও দক্ষযজ্ঞ নাশে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে দক্ষযজ্ঞের আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব। পূর্ব্বেই বলা হইল বেদের সংহিতায় সমন্বয় ছিল। মূল ভুলিলেই বিরোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই সমন্বয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পরমহংস সংহিতা বা সাত্বত সংহিতা। আরও বিশদরূপে এই সমুচ্চয়-বাদ আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

বেদের সংহিতা অংশ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্গীতায় এই সমুচ্চয়বাদ। ভগবতদ্গীতার পূর্ব্বেও সমুচ্চয়বাদের অতীব সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশোপনিষৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্তর্গত। এই ঈশোপনিষদে সমুচ্চয়বাদের বিশেষ আলোচনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে এই ঈশোপনিষৎ গ্রন্থ একরূপ আনুপূর্ব্বিক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে স্মরণীয়। আমরা সর্ব্বাগ্রে এই ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধার করিতেছি।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥"

যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আবার যাঁহারা বিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে বিদ্যার ফল একরূপ আর অবিদ্যার ফল অন্যরূপ। যাঁহারা এসম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন এই প্রকারের ধীর

ব্যক্তিগণের নিকট আমরা অন্যরূপ শুনিয়াছি যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে একই সময়ে জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আবার যাঁহারা সম্ভূতিতে রত তাঁহারা আরও অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন সম্ভবের উপাসনার ফল একরূপ আর অসম্ভবের উপসনার ফল অন্যরূপ। যাঁহারা এসম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন এ প্রকারের ধীর ব্যক্তিগণের নিকট আমরা নিম্নরূপ শুনিয়াছি। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এই উভয়কে একই সময়ে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভূতির দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ সেবাশ্রমের

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য বিবরণীর ভূমিকা স্বরূপে ইহার সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন ব্যবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক। ইংরাজী ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন হইতে ১৯১৩ সালের ২৩ সে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রথম বৎসরের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই অন্তিম-কালের অভিপ্রায় অনুসারে সেবাশ্রমের ভার যাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই নূতন লোক। সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সময়ে, সকল সময়ে নবদ্বীপে থাকিয়া যাঁহারা আশ্রমের কার্য্যাদি দেখিতেন তাঁহারা অনেকেই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; এই সকল কারণে দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। যাহা হউক, খাতা পত্র সমুদয় বিশেষ ভাবে আলোচনা ও পরীক্ষা করার পর এই বিবরণী প্রকাশ করা যাইতেছে। তথাপি এই কার্য্য বিবরণীতে ত্রুটী থাকার সম্ভাবনা: এজন্য আমরা আশ্রমের সুহৃদ ও সহানুভূতি-কারকগণের নিকট

মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।' পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে আশ্রমের বৎসর আরম্ভের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান পরিচালকগণ বিবেচনা করেন যে ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এইবারে ইংরাজী ১৯১৩ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯১৭ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বৎসর বলিয়া হিসাবের সুবিধার জন্য ধরা গেল। ভবিষ্যতে ইংরাজী হিসাব অনুসারে ডিসেম্বর মাসে বর্ষ শেষ হইবে।

বর্ত্তমান পরিচালকগণ

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহার নবদ্বীপের সম্পত্তি সমূহের যে উইল করেন তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি অর্থাৎ সমাজ বাড়ী ও সেবাশ্রমের বাড়ী, সমাজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের দেবোত্তর করিয়া নিম্নলিখিত সাত জনকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, সলিসিটার, কলিকাতা।

" শরৎচন্দ্র সিংহ জমিদার, রাইপুর, বীরভূম।
" মাণিক লাল মল্লিক, ব্যবসায়ী, কলিকাতা
" কুলদা প্রসাদ মল্লিক, কলিকাতা
" রামদাস বাবাজী, কলিকাতা
" তারাপ্রসন্ন বাক্‌চি, জমিদার, নবদ্বীপ,
" গোপীকৃষ্ণ চন্দ, বি, এ, হেডমাষ্টার নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল।

এই সাত জন ট্রাষ্টির মধ্যে সকলের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় হিসাব পরিদর্শক ও শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয় সম্পাদকের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাছাড়া নিম্নলিখিত ভদ্র লোকগণ আশ্রমের জন্য কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারি সেন }
শ্রীযুক্ত সুধাময় চট্টোপাধ্যায় } সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় (খড়দহ) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক

নবদ্বীপে থাকিয়া আশ্রম পরিচালনা করেন। বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠাতা। নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের ইচ্ছানুক্রমে এই সেবাশ্রমের কার্য্যভার যাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মহৎ কার্য্যের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং তাঁহার এই কীর্ত্তি যাহাতে স্থায়ীত্বলাভ করিয়া ইহার দ্বারা দেশের যে সুমহান্ কার্য্য হইতেছে তাহা সাধন করিতে পারে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ভগবানের কৃপা ও প্রথম হইতে যাঁহারা সেবাশ্রমকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের ও দেশবাসী সকলের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া সেবাশ্রমের দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য বিবরণী জনসমাজে প্রচার করা হইল।

১৯১৩ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমের কার্য্য-বিবরণী

বাহিরের রোগী—(Cutdoor Patients)

অলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৪৬৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩৮৩ জন বাহিরের রোগী আর ৮৬ জনকে আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ইহা ছাড়া সর্ব্বসমেত ৩৬ জন কলেরা রোগীকে ঔষধ পথ্য দিয়া তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে রাখিয়া আশ্রমের সেবকগণের দ্বারায় শুশ্রূষা করা হয়।

আশ্রমের রক্ষিত রোগী—(Indoor Patients)

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ৮৬ জন রোগী হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৫২ জন পুরুষ ৩৪ জন স্ত্রীলোক ; এই সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন কলেরা রোগী। গত মাঘ মাসে গানের সময় এই ২৭ জন রোগী নবদ্বীপের পথে একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিল, তথা হইতে তাহাদিগকে কুড়াইয়া লইয়া আশ্রমে রাখা হয়। এই ২৭ জনের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হয়, ৯ জন আরোগ্য লাভ করে। আশ্রমে রক্ষিত রোগীর অবশিষ্ট ৪৯ জনের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়, ৩৬ জন আরোগ্য লাভ করে।

কলেরা রোগী।

৩৬ জন কলেরা রোগীকে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে রাখিয়া ঔষধ পথ্য দ্বারায় তাহাদের চিকিৎসা করা হয়। আশ্রমের সেবকগণ তাহাদের নিকট

থাকিয়া শুশ্রূষা করে। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক। ইহারা সকলেই বিদেশী যাত্রী—বিদেশ হইতে যোগ-স্নান প্রভৃতি উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়, ২০ জন আরোগ্য লাভ করেন।

বৃদ্ধ, আতুর, অনাথ, অক্ষম ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ

আলোচ্য বর্ষে এই প্রকারের ৫ জন লোককে সংবৎসর আশ্রমে রাখিয়া অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি দেওয়া হয়। ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়, দুইজন এখনও আশ্রমে আছেন।

শিশু অনুসন্ধান।

খালিসপুর নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত মহিমা চরণ দাস নামক একব্যক্তির একটী ৪ বৎসর বালিকা হারাইয়া যায়। বহু যাত্রীর সমাগমের মধ্যে আশ্রমের সেবকগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া বালিকাটীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

শ্রীধাম নবদ্বীপে অনেক দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তির মৃত দেহ পড়িয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রম হইতে এই প্রকার ৪৮ জনের অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া যথারীতি হইয়াছে।

শিক্ষা।

৩ জন অনাথ বালককে আশ্রমে রাখিয়া তাহাদের সমগ্র ভার বহন করা যাইতেছে। ইহা ছাড়া একটী বালককে তাহার বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হইয়াছে।

মাতৃ মন্দির।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রসবের ব্যবস্থার জন্য ও সদ্যজাত পরিত্যক্ত শিশুগণকে রক্ষা করিবার জন্য সেবাশ্রমের এই বিভাগ ১৯১৩ সালের এপ্রেল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্যের জন্য নবদ্বীপে বৃহৎ ধর্ম্মশালা মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া ভাড়া দিয়া লওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব সমেত ১৪ জন প্রসূতিকে আশ্রয় দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৪ জন মৃত সন্তান প্রসব করে দুইটী শিশু জন্মমাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হয়! ৮টি শিশুকে এখন রক্ষা করা হইতেছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত	৪১।৵৫	সেবাশ্রম ও মাতৃ মন্দিরের সকলের খোরাকী বাবত	৬৭৪।০
মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান	১২৭৫৷৫	পাচক ও ভৃত্যের বেতন	১৪৬৲
	১৩১৭।৵১০		

জমা——————

খরচ——————

ঔষধের মূল্য——————৩৭৲

চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক ক্রয়—১৮৲

রোগী, ছাত্র, সেবকগণের বস্ত্র খরিদ——————৪৮৲

বাসন খরিদ——————১০৲

মাতৃ মন্দিরের ধাতৃদের বেতন——৬৫৲

মাতৃ মন্দিরের বাড়ী ভাড়া——২৫৲

মাতৃ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার আনুসঙ্গিক ভার ও একজন মেয়ে ডাক্তারের বেতন——————৩০৫৲

কলিকাতার চাউল সংগ্রহ ও তাহা প্রেরণ ও একজন আদায় কারী সরকারের বেতন——————১০০৲

গৃহ সংস্কার——————৪৬৷৶

যাতায়ত খরচা ও রোগী লইয়া যাওয়া আসার খরচ——————৩২৲

মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ১০০ শত লোহার হাঁড়ি——————৫৬৷

খাট আলমারী প্রভৃতি——————৪৫৲

মৃত দেহের সংকার ব্যয়——৪০৲

ধোপা নাপিত——————১৬৲

কাগজ পত্র টিকিট—প্রভৃতি——২৫৲

লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ——২৭৲

সমগ্র ব্যয় ১৮৮৮৷৹

দেনা ৫৯১৷৵১৹

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ
হিসাব পরিদর্শক।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।
সম্পাদক।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। (৩)

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজ পরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু॥ (৪)

অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ তোমার চরণে।
জাগ্রত রহুক রতি সদা মোর মনে॥

সারথীর বেশে তুমি, অর্জ্জুনের কথা শুনি
সৈন্যদল মধ্যে রথ করিয়া স্থাপন।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইলে সৈন্যগণ॥
"হে পার্থ, হে ধনঞ্জয়, হের অই শত্রুচয়,
অই ভীষ্ম, অই দ্রোণ অই কর্ণ আদি
দেখাইলে যত যত বীরেন্দ্র বিরোধী।"
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তব, যত যত সৈন্য সব,
সকলেরি পরমায়ু করিলে হরণ
সকলের হয়ে' গেল প্রারব্ধ খণ্ডন।
অর্জ্জুন সমর-জয়ী তোমার কৃপায়,
পার্থসখে রতি হোক্, তব রাঙ্গা পায়।

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া
যশ্চরণরতিঃ পরমস্য মেহস্তু তস্য॥

কেবল শত্রুর আয়ু করনি হরণ,
অর্জ্জুনেরো করিয়াছ অবিদ্যা নাশন।

শক্রসৈন্যমুখে দূরে, ভীষ্মদ্রোণাদিরে হেরে,
অর্জ্জুনের চিত্তে হৈল বিষাদ-সঞ্চার,
ভাবিলা স্বজন বধ করিবনা আর ॥
তেয়াগিয়া ধনুঃশর, বসিলেন রথোপর,
শোকেতে কাতর চিত্ত অবসাদ-ময়।
"যুদ্ধ করিব না" এইরূপ বাক্য কয় ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ বীর ধনঞ্জয়।
সত্যের ন্যায়ের যোগ্য সেনাপতি হয় ॥
পড়ি অবিদ্যার হাতে, ভ্রষ্ট হয় ধর্ম্মপথে,
এইজন্য আত্মবিদ্যা দান করি তারে
পরিত্রাণ করিয়াছ অজ্ঞান-আঁধারে ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে জয়' বিনাশি অরাতি-চয়,
কিন্তু পাছে জয় রাজ্য করি উপার্জ্জন,
অহঙ্কারে স্ফীত হয় অর্জ্জুনের মন,
এই জন্য গীতাশাস্ত্র, অবিদ্যার অমোঘাস্ত্র,
যুদ্ধের প্রাক্কালে দিলে দেব দয়াময়,
শিখাইলে এ জীবন আপনার নয়।
একমাত্র নারায়ণ, জগতের কর্ত্তা হন,
যাহা কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছায় তাঁহার,
স্বধর্ম্মপালন কর চাহি পদে তাঁর,
নিজ লাভালাভ নয়, নহে নিজ জয়াজয়,
একমাত্র শ্রীহরির চরণ কমল
কর জীবনের লক্ষ্য একান্ত সম্বল।
এইরূপে কর্ম্মযোগ করিতে আশ্রয়,
শিখাইলে অর্জ্জুনেরে তুমি দয়াময় ॥
পরমার্থ বস্তু তুমি, তুমি অখিলের স্বামী,
এইরূপে লীলা তুমি কর সম্পাদন,
তোমার চরণে রতি হোক্ অনুক্ষণ ॥
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।

ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥

যে কৃপা আমার প্রতি করিলে প্রকাশ,
বর্ণিবার সাধ্য কারো নাহি শ্রীনিবাস।
শুনেছিনু সাধুপাশে, অপার করুণাবশে,
আপনা হইতে তুমি বাড়াও ভক্তেরে,
প্রত্যক্ষ বুঝিনু তাহা এ মহাসমরে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এই মহা-যুদ্ধস্থলে
করিবেনা কোন অস্ত্র স্বহস্তে ধারণ
নিরস্ত্র-সাহায্য-মাত্র করিবে সাধন ॥
তব বলে বলীয়ান, আমি স্থির করিলাম,
তোমায় ধরাব অস্ত্র প্রতিজ্ঞা আমার
স্বপ্রতিজ্ঞা তুমি দেব কৈলে পরিহার।
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা, সত্য করিবারে তাহা,
অকস্মাৎ রথ হৈতে নামি ভূমি' পরে
চক্রকরে বধিবারে আসিলে আমারে।
করিবরে বাঁধিবারে, সিংহ ধায় যে প্রকারে,
সেই মত বিক্রমেতে হইলে ধাবিত
ক্রোধে যেন নরনাট্য হইলা বিস্মৃত।
তোমার উদর মাঝে, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড রাজে
তাহার ভারেতে ধরা হইল কম্পিত
উত্তরীয় বাস পথে হইল স্খলিত।
বিষম সমর ভূমে, অস্ত্রজাল বরিষণে
যে সময় ধরা-বক্ষ হয় রক্তময়,
তোমার ভীষণ মূর্ত্তি হেরি সে সময়।
ভীষণ সে মূরতিতে, দেখিলাম বিস্ময়েতে
ভক্তবৎসলতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান,
নিজে খর্ব্ব হয়ে রাখ আশ্রিতের মান ॥

বাঙ্গালা-সাহিত্যে দাশরথি রায়।*

বাঙ্গালা দেশে ৺দাশরথি রায় নিতান্ত অবিদিত নহেন, তিনি যে কেবল বাঙ্গালা সহিত্যানুরাগীর নিকট পরিচিত, তাহা নহে; বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ অপেক্ষা বরং ইতরসাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাকে ভালরূপে জানেন। তাঁহার জীবনকালে পশ্চিমবঙ্গে, এমন স্থান ছিল না যেখানে যাত্রা প্রভৃতি সঙ্গীতের উৎসবে দাশরথি রায়ের আহ্বান না হইত। সেও অনেক দিনের কথা নহে; কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালার নানা নগর উপনগরও পল্লীতে আহূত হইয়া স্বীয় রচনাচাতুর্য্যে নিরক্ষর কৃষক হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। দাশরথি রায় চল্‌তি কথায় "দাশুরায়" বলিয়া অভিহিত এবং সেই নামেই সুপরিচিত॥ ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমান জেলায় কাল্‌না মহকুমার অন্তঃপাতী পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত পিলা নামক পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে দাশরথি অবস্থান করিতেন। দাশু রায় সন ১২১২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৬৪ সালে কার্ত্তিক মাসে ৫২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। দাশু রায় ইউনিভার্সিটির শিক্ষা পান নাই, আজকাল্‌ যাহাকে, উচ্চশিক্ষা বলা হয়, রায় মহাশয়ের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না; তৎকাল প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রেও অধ্যাপকগণের ন্যায় অধিকার লাভ করেন নাই; গ্রাম্য, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষাই তাঁহার জ্ঞানজ্যোতি উন্মেষিত করিয়াছিল; সে কালের গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতেও আজ কালের পাঠশালার ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হইত না। তখন বর্ণ পরিচয় করিয়া কলা পাঠ, নামতা ও কড়া গণ্ডার ডাক অভ্যাস করিয়া শুভঙ্করীর বাজার হিসাব ও কালিকষা এবং সর্ব্বশেষে দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদা ও জমিদারী মহাজনী-খাতা ও আমিনী কাগজ প্রস্তুত করা ছাত্রগণের যথেষ্ট শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। ঐ সমস্ত বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইলেই দশে ও দেশে ছাত্রের প্রশংসাবাদ প্রচার করিত। যে ছাত্র তক্‌রারী জমাখরচ, রেওয়া ও রোকরের কৈফিয়ৎ লিখিতে শিখিত, এখনকার গণিতের উচ্চ উপাধিধারী অপেক্ষা তাহার প্রতিপত্তি অধিক হইত। দাশরথি রায় এই প্রকার শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঠশালার শেষ শিক্ষার বিষয় পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

* কাঁথি সারস্বত সম্মিলনীর সাধারণ সভার সপ্তম অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

তৎকালে এখনকার মত নাটক নভেল বা ইংরাজী ছাঁচের ঢালা কাব্য তদানীন্তন প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণও ভাবের ঘোরে রায়মহাশয়কে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেন। তাঁহার রচিত গানগুলি তানলয়ে গীত হইলে রসের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে, ভাবাবেশে শ্রোতৃগণ অবশ হইয়া যান। তাঁহার রচনার বিশেষ বৈচিত্র্য এই যে, উহা শ্রবণ করিলে নিরক্ষর ইতর ব্যক্তি হইতে প্রবীণ পণ্ডিতগণ সমভাবে পুলকিত হইয়া থাকেন।

দাশুরায়ের রচনাকে কাব্য বলিবার কারণ আছে; আলঙ্কারিকগণ কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ জন্য বলেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" ছন্দোবদ্ধ হউক আর না হউক ভাষার পারিপাট্য থাকুক আর না থাকুক, সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যমূলক হউক আর নাই হউক, যে বাক্যে শ্রোতার হৃদয়ে রসের সঞ্চার করিয়া দেয় তাহাই কাব্য। দাশুরায় স্বয়ং সুরসিক, তাঁহার রচনা রসপ্রবাহে পরিপ্লাবিত; অধিকন্তু তাঁহার বাক্যাবলী ছন্দোবদ্ধ, তাঁহার ভাষা ললিত গঠিত, তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় তন্ত্র স্মৃতি পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সম্মত। দাশু-রায়ের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে পাঠক শোকে অধীর হইবেন, পরক্ষণেই হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। কখন উৎসাহ, কখন বিস্ময়, কখনও বা ভগবদ্ভক্তির শান্তিময় ভাবে পাঠক তন্ময় হইয়া উঠিবেন।

আলঙ্কারিকগণের মতে সামান্য, ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গভেদে কাব্য ত্রিবিধ, দাশরথির রচনায় এই তিন শ্রেণীরই কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম—(সামান্য) যাহাতে একটী মাত্র (বাচ্য) অর্থের প্রতীতি হয়।

ব্রাহ্মণ বন্দনা

প্রণমামি দ্বিজবর   দ্বিজরূপে পীতাম্বর
অভেদ-আত্মা বিরাজেন ভূতলে।
আরাধিলে দ্বিজবরে   কিনা হয় দ্বিজ-বরে
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥ ১

যেখানেতে দ্বিজবিশ্রাম,   স্বগ্রামেতে স্বর্গধাম
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়।
হরি লন যার জ্ঞান হরি   সেই ত গৃহ পরিহরি
হরি দেখতে বৃন্দাবনে যায় ॥ ২

শিবমুখে সর্ব্বদাবানী   সদা শুনেন সর্ব্বানী
সর্ব্ব তীর্থ ব্রাহ্মণ চরণে।

এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হ'য়েছেন বীজ ইহাতে
সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল দ্বিজ বিনে ॥"৩

দ্বিতীয় (ধ্বনি) যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের অধিক চমৎকারিত্ব।

কলঙ্ক ভঞ্জন।

(বৈদ্য বেশে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

ধনি ! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার
বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা ! করকি কৌতুক,
আমারই সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারিযুগে আমার আয়োজন হয়,
একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়,
কে'বা তুল্য মম গুণে॥
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার,
তাইতে আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণে তার কি থাকে অধিকার ?
সদা আমায় ডাকে যেজনে॥
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর,
আমারি জানিবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নর.
কেবল আমারি স্থানে॥
সংসার কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগ্য
এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য
বাসনা বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক,
ঘুচাই তার যতনে॥

তৃতীয়—(গুণী ভূত ব্যঙ্গ) যাহাতে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব। "সংসার কুপথ্য.................................যতনে।"

অথবা ইতিহাসের প্রচলন ছিল না ; তখন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য বালকগণকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও তজ্জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইত ; তৎকালে বয়োজ্যেষ্ঠগণ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সরস রচনা পাঠ করিয়া জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান করিতেন। তখন ঈদৃশ শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল কারণ দুরূহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সাহিত্য ও শাস্ত্রাধ্যয়ন শত জনের মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটিত কিনা সন্দেহ। তখন পল্লীগ্রামে ইংরেজী শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

দাশরথি পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম বয়সে সাকাই নীল কুটীতে একজন সামান্য মুহুরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন কাজ করেন ; কিন্তু মসীজীবিতা তাঁহার উপার্জ্জনের অনুকূল বৃত্তিনহে, এজন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভাবী প্রতিভা বিস্তারের সূত্রস্বরূপ গীত রচনায় ব্যাপৃত হয়েন, তখন হইতে গীত-বাদ্য ব্যবসায়ে জীবিকা উপার্জ্জনের সংকল্প তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়। তৎকালে কবির গানের যথেষ্ট আদর ছিল। তাহাতে বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা ও রচনা চাতুর্য্য প্রকাশের ও বিশেষ অবসর ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমের সম্ভাবনাও থাকিত। দাশুরায় কাব্যামোদ উপভোগ সহ অর্থোপার্জ্জনের সুগম পন্থা কবির গান চালাইবার অভিলাষে কথা কবিওয়ালীর দলে গাথনদার হইলেন এবং কিছুকাল কবির লড়াইয়ে বিভোর হইয়া থকার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কবির গানেই দাশু রায়ের কাব্য প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহে, এই জন্য তাঁহার ভাগ্যে বিধিলিপি অন্য ব্যবস্থা ঘটাইয়া দিল। কবিরদলে অধিকাংশই ইতর লোক এবং চপলচরিত্র ইতরজাতীয়া গায়িকা, দলের অধিকারিণী থাকিত। গাথনদার দলের জীবনস্বরূপ সুতরাং তাহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অধিকারিণীগণও তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত।

কবির গাওনায় দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরস্পর চাপান ও উত্তর দ্বারা অভিনয়ের অবতারণা করিয়া গীত বাদ্যের অনুশীলন করা হইত। উভয় দলের কথার তকরার ক্রমে গালাগালী কটুকাটব্যও চলিতে থাকিত। দাশুরায়ের ভাগ্যেও শেষে তাহাই ঘটিয়াছিল। দাশু রায়

সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াছেন শুনিয়া তাহার মাতুল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েন, মাতা ও দারুণ মনকষ্ট অনুভব করেন। তাঁহাদিগের চক্ষে জলধারা পতিত হইতে দেখিয়া দাশু রায়ের কবিগানের অনুরাগ দূর হইল। তিনি সেই দিনই কবির দল ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কাব্যালোচনা অব্যাহত পরিচালন জন্য কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু লইয়া এক অভিনব সঙ্গীত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। এই সঙ্গীত সম্প্রদায়ের জন্যই তাঁহার কাব্যরচনা এবং তাহাতেই তাঁহার কবি-প্রতিভা সুপ্রকাশিত। দাশু রায় জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত দল চালাইয়া অলৌকিক কীর্ত্তিস্থাপন ও শ্রোতৃজনগণকে মোহিত করিয়া ছিলেন। দাশরথির দলে তাঁহার ভ্রাতা তিন কড়ি রায় ও সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বিশেষ কৃতিব্যক্তি ছিলেন। দাশুরায় বলিয়া ছিলেন—আমি যদি ছড়া কাড়ি, তিনকড়ি রায় যদি বাজায়, আর সন্ন্যাসী যদি গায় তা হলে দেশে টাকা রাখিনা।" প্রকৃত প্রস্তাবে দাশরথির অকুণ্ঠিত প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

দাশরথি রায় সম্বন্ধে কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্যিক অনমুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অযথা। রায় মহাশয়ের রচনা বিশ্লেষ না করিয়া ভাসা ভাসা দেখিয়া যাঁহারা অভিমত প্রকাশে প্রস্তুত তাঁহারাই দাশু রায়ের কাব্যে অপ্রকৃত দোষারোপ করিতে পারেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ নিচয় কাব্যাংশে যে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য তৎসম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দাশু রায়ের কাব্যে ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের ঔদার্য্য, অর্থের গাম্ভীর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দাশু রায়ের ভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক্ রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন তিনি যত্ন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" দাশুরায়ের কাব্য পাঁচালী নামে অভিহিত এবং এ শ্রেণীর কাব্যের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা।

পাঁচালীর দুইটী অংশ—ছড়া ও গান। ছড়া সাধারণতঃ মিশ্র পয়ারও স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ছড়ার আবৃত্তিও অভিনব—কাব্য পাঠের সাধারণ পদ্ধতিতে আবৃত্তি করা হয় না, সুরে আবৃত্ত করাই প্রচলিত পদ্ধতি; তাহাতে শ্রুতি মাধুর্য্য বর্দ্ধিত ও ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। দাশুরায়ের মুখে ছড়ার আবৃত্তি শুনিয়া নবদ্বীপ ভাটপাড়া প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানের

রাবণ বধ

রাক্ষস কামিনীগণ ফল দেখাইয়া হনুমানকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলে হনুমানের উক্তি ঃ—

"আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ কল্পতরু মূলেরই,
যে ফল বাঞ্ছা করি সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই ও ফল গ্রাহক নই,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥"

দাশুরায় বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৬০ খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া লোক সমাজে প্রচারিত আছে। তাঁহার বিপুল কবিতা গ্রন্থের সমগ্র আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব, এজন্য তিনটী স্থান হইতে তিনটী অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রচনার কবিত্ব আলোচনা করা হইল; ফলতঃ তাঁহার রচনার বহুস্থানে এইরূপ কাব্যকলা প্রকাশ পাইয়াছে।

দাশুরায়ের সামান্য কাব্যও অসাধারণ কবিত্ব পরিপূর্ণ, বাক্যছটায় ও অর্থ গাম্ভীর্য্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার যোগ্য; তন্মধ্যে ভাবের ঐকান্তিকতাও যথেষ্ট রহিয়াছে, তাঁহার সামান্য কাব্য মধ্যেও রসের পূর্ণসঞ্চার উপলব্ধি হইয়া থাকে। উদাহরণ জন্য আমরা ব্রাহ্মণ বন্দনা হইতে উদ্ধৃত সামান্য কাব্যাংশের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতেছি সামান্য ত্রিপদী ছন্দে গঠিত তিনটী শ্লোক মধ্যে কি অমূল্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে। কবি বলিয়াছেন "অভেদ আত্মা"; অর্থাৎ মর্ত্ত্যভূমে পরাৎপর পরমপুরুষের মূর্ত্ত্যভাব। সংযতেন্দ্রিয় সর্ব্বপরিগ্রহপরিহীন, সম্যকদর্শী, শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপী বিষ্ণুর স্থূলপ্রকাশ; ব্রাহ্মণ জীবনে পরমাত্মার উদাসীন পুরুষভাব বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে "বিপ্রো মানবরূপীচ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ" বেদপারগ বিপ্রমানবরূপী দেবদেব জনার্দ্দন। কবি পৃথিবীকে "কর্ম্মভূমি" এবং দ্বিজকে বীজ বলিয়াছেন। অনাদি কর্ম্ম সংস্কারে সূক্ষ্মদেহী চৈতন্যরূপী-জীব প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ জন্য স্থূলদেহগ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে স্থূলভূত-বিনির্ম্মিত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইতে হয়, তিনি পূর্ব্বার্জ্জিত

কর্ম্মাত্মিকা প্রকৃতির অধীন হইয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এজন্য পৃথিবী কর্ম্মভূমি। ব্রাহ্মণগণ অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রার্থপ্রচার দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করেন এবং জীব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবদ্দর্শনের উপায় বিধান করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি নিবৃত্তিরূপ অমৃতফলের সাত্বিক কর্ম্মরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ। পৃথিবীকে ভূমি এবং ব্রাহ্মণকে বীজ বলায় ভূমির সহিত বীজের সম্বন্ধ সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে দাশরথি এইখানে সামান্য দুই চারিটি বাঙ্গালা কথায় উপনিষদের গুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। চিন্তাশীল ভাবুক ব্যতীত দাশরথির এই বাক্যের আন্তরতত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কবি ব্রাহ্মণের মহিমা প্রচার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদের চতুর্ব্বর্গের দায়িত্ব এবং তদীয় সেবায় তীর্থ ফলপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া ভাবের কি অলৌকিক ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রদান করে শুনিলে ফলাকাঙ্ক্ষী সাধকের উৎসাহে ব্রাহ্মণ আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব, এজন্য উৎসাহ-ভাব, ব্রাহ্মণের বাসগ্রাম স্বর্গ বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে আনুরক্তির প্রকাশে অনুরাগ ভাব এবং তাঁহাকে অব্যক্ত পুরুষের ব্যক্তমূর্ত্তি জ্ঞানে সমভাবের উদ্দীপনা ঘটে, একটি কাব্যাংশের কয়েক পংক্তি মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্র সুসিদ্ধ নয়টি ভাবের তিনটি প্রধান ভাব সুচারুরূপে স্ফুরিত হইয়াছে এবং কবি ভক্তির নিষ্ঠা আলোচনা করিয়া সুমধুর শান্তরসের প্রবল প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন। দাশরথি রায়ের রচনা মধ্যে বাক্যালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রায় মহাশয়ের সময়ে রচনার শ্রুতিমধুরতা প্রতি লোকে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিত, এজন্য অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনুপ্রাস ব্যবহার তাৎকালিক কবিগণের একটি বৈশিষ্য। দাশরথির পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি এবং সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্ত, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী এবং আধুনিক সময়ের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়ও অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রুচি অনুসারে ইংরাজীনবিশ সাহিত্যিকগণ অনুপ্রাসের উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস অনুপ্রাসের খাতিরে শব্দ যোজনা করিতে ভাবের হানি ঘটিয়া থাকে, অর্থের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়; কিন্তু শব্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের ও অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা কবির প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের এই কথা মানিয়া লইয়া যদি অনুপ্রাসের ফুয়ারা মধ্যে ভাবের

তরঙ্গ, অর্থের মধুর ধারার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অনুপ্রাসের ব্যবহারে দোষারোপ চলিতে পারে না। দাশরথির অনুপ্রাসের মধ্যে শব্দের সুসম্মিলনে মধুর বীণার ঝঙ্কার সহ ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ ভাব ও রসের সুমধুর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং রায় মহাশয়ের কবিতা অনুপ্রাস বহুল হইলেও দোষশূন্য; উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতেছে—

"এ যাতনা আর সহেনা, জননি, জগদম্বে।
দিয়ে চরণ, দুখ হরণ, যদি কর অবিলম্বে॥
হের শ্যামা, হের রমা, হের উমা, হের অম্বে।
হের করুণা নয়নে, যেমন,—হের মা হেরম্বে॥
বিশ্ববিপদবারিনী, সুর-সঙ্কট-হারিনী,—
হয়েছ তারিণি, নাশ করিয়ে নিশুম্ভে;
এ সংসারো, নাশ করো, যেমন নাশ জল-বিম্বে।
দাশরথির দুখ নাশিবে, আর কত বিলম্বে॥"

এই কবিতার প্রত্যেক চরণে এক বা ততোধিক অনুপ্রাস রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে রসের বা ভাবের কোনও হানি হয় নাই; এই কবিতার প্রত্যেক পদে ভক্তের ভগবচ্ছরণতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ভক্তির পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। বিপন্ন সন্তান ভয়ে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া মাতার অঞ্চল মধ্যে লুকাইবার অভিপ্রায়ে যেমন মা মা শব্দে মায়ের নিকট ছুটিয়া যায়, ভক্ত কবির ভাষায় ভবানীর বরপুত্র দশগ্রীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর আতঙ্কে ভয় বিহ্বল-চিত্তে পুনরাবৃত্তিনাশিনী জগজ্জননী নিস্তারিনীকে মা মা শব্দে আহ্বান করিতেছেন; একদিকে ভক্তি তরঙ্গায়িত প্রীতিরস, অন্যদিকে ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের গতাগতি ভীতির নিবিড় মোহোদ্দীপক ভয়ানক রস। কি অভিনব সম্মিলন! জলবিম্ব যেমন জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, কেবল বায়ু সংযোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণিক অবস্থানের পর অনন্ত জলরাশিতে মিলাইয়া যায় তদ্রূপ বিচিত্র রচনাময় সংসার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের মায়া বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক বিকার, জগদম্বা উপাধির উপরতি ঘটাইলেই চৈতন্য বিশ্বজীব অনন্ত চৈতন্য রাশিতে মিলিয়া যায়; এই ঔপনিষদিক পরম সত্য ঘোষনা মুখে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তত্ত্বাসাদন প্রকটিত রহিয়াছে। পরার্থ তত্ত্বজ্ঞান রূপ আলম্বন বিভাব ও জগজ্জননীর সাক্ষাৎকার রূপ অনুভাবের উদ্দীপনায় শান্তরসের

প্রবল প্রবাহ ছুটিয়াছে। দাশরথির এই কাব্য প্রীতি, ভয়ানক ও শান্তরসের ত্রিধারা সঙ্গমে পবিত্র ত্রিবেনী; সুরসিক ভক্ত সাধকই এই মহাতীর্থ যুক্তবেনীর অপার মহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। দাশরথির এই কবিতা গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্যের একটী শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

আমরা রায় মহাশয়ের অনুপ্রাস মধ্যে ভাবনির্ঝরিণীর শীত শীকর রস প্রবাহের পরিচয় জন্য অন্য একটী উদাহরণ দিতেছি।

লঙ্কাধিপতি রাবণের পরমার্থ স্বরূপ রামচন্দ্রের দর্শনে দিব্যজ্ঞান জন্মিলে তিনি আত্মনিবেদনচ্ছলে ভগবানের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন—

"দীনের দিন গত কিন্তু হে রাম
তব চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়
দাও হে চরণ, হ'লাম চরণে শরণাগত।
সৎসঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়া সতত
তোমায় শত শত মন্দ, বল্লাম হে রামচন্দ্র
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম! স্বগুণ প্রকাশো
গুণহীন জ্ঞানহীন-দোষ নাশ,
সুগুণে তারিলে কি পৌরষ
সে তো স্বগুণে পাবে সুপথো,—
জননী-জঠর-কঠোর যন্ত্রনা আর দিবে হে রাম! কত?
ওহে দশরথাত্মজ, দাশরথি ঘুচাও দাশরথির গতায়াত॥"

এখানেও কবি প্রীতি ও শান্তরসের সহিত জঠর-যাতনা-ভীতি সমুদিত ভয়ানক রস ধারার পুণ্য সঙ্গম সংঘটিত করিয়াছেন। কি উৎকট আত্মগ্লানি! কি ঐকান্তিক নির্ভরতা!! কি হৃদয়গ্রাহিনী মুক্তি প্রার্থনা! সাধকের অনুরক্ত হৃদয়ই এ ভাবের যথার্থ অধিকারী।

অন্য একটী উদাহরণ দ্বারা দাশরথির রচনায় অনুপ্রাস-ছটা মধ্যে শোক-ভাব প্রবাহে করুণ রসের প্রবল বন্যার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে লঙ্কেশ্বর জীবন ত্যাগ করিলে রক্ষোরাণী মন্দোদরী বিলাপ করিতেছেন—

"কি করিলে হে কান্ত, অবলার প্রাণকান্ত
হয় না কান্ত! এ প্রাণ অন্তবিনে।

হে নাথ কর্ত্তা কনক রাজ্যে আজ যে সে লয় ধরা শয্যে,
তোমার ভার্য্যা ধৈর্য্য হয় কেমনে॥
যম করে হে দাসত্ব এমন আধিপত্য
স্বর্গ মর্ত্ত মাঝে কারো দেখিনে।
ইন্দ্র আদি ঠাকুরাণী হ'য়ে তোমার রাণী
আজ যে কাঙ্গালিনী ভুবনে॥
সেই যে নবীন জটাধারী বিপিন-বিহারী
সব হারালে তাঁয় খানুজ্ঞানে।
যার পদাভিলাষী ঈশান শ্মশান বাসী
ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে॥
কিছুই মান্‌লে না হে নাথো! শুনেছিলে তাতো;
—পাষাণ মানবী সেই রাম চরণে॥

পতি বিয়োগ বিধুরা বিধবার মর্ম্ম স্পর্শীভাব এই কবিতার পদে পদে স্ফুরিত রহিয়াছে; ইহার শুদ্ধ আবৃত্তি বা তান লয়ে গীত হইলে শ্রোতৃগণের হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হইয়া যায়, চক্ষে দর বিগলিত ধারায় বাষ্পবারি পতিত হইতে থাকে। দাশরথি নব রসে সুরসিক, তাই তাঁহার কাব্যে এত রসোচ্ছাস; ফলতঃ বাক্যালঙ্কার মধ্যে অর্থালঙ্কার সাজাইতে দাশরথি সিদ্ধহস্ত।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ দাশরথির রচনায় বিরক্ত হইবার আর এক কারণ এই যে, তাঁহার কাব্যে বহুবিধ ব্যাকরণ দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ ত্রুটী সুধীগণের নিকট মার্জ্জনীয়। দাশরথি গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্য বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন মাত্র তৎকালে বাঙ্গলা ভাষায় কোনও ব্যাকরণ ছিল না এবং কোনও বাঙ্গলা ভাষাপাঠক সংস্কৃত হইতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি ছিল না। দাশুরায় যে পরিমাণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রন্থ রচনা অসম্ভব, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা বলে তিনি সামান্য করিয়াও মধুর রচনা করিয়া গিয়াছেন! কৃত্তিবাস কাশীরামদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণও এ দোষে দুষ্ট; আধুনিক কবি মধুসূদনের রচনাতেও ব্যাকরণ উপেক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কবিগণ ভাবের ভাবুক, ভাব প্রকাশেই আত্মহারা, এজন্য ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন না। সর্ব্ব-দেশীয় কবি মধ্যেই ব্যাকরণের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কবিকুল-শিরোমণি ভারতীর বরপুত্র কালিদাস পর্য্যন্ত ব্যাকরণ-দোষ ঘটাইয়াছেন। আদি কবি

মহর্ষি বাল্মিকীও ব্যাকরণ দোষে দোষী, পণ্ডিতগণ তাহা আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া আপত্তির নিরাশ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ কবির ব্যাকরণ দোষ ধরেন না, সেইজন্য বলিয়াছেন "নিরঙ্কুশা কবয়ঃ।"

দাশরথির রচনায় বাৎসল্য ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত আগমনী পালায় কন্যা-বিয়োগে মাতার করুণরসোদ্দীপক বৎসলভাব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। গিরিরাজ মহিষী মেনকা বলিতেছেন—"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম যে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল ;—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো॥"

স্নেহময়ী জননী কন্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া স্বপনে দেখিলেন কন্যা আসিয়াছে—অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে কন্যার অদর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া স্বামীকে স্বপনের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কন্যাগত প্রাণা জননীর এই বাৎসল্য ভাবপূর্ণ বিরহজনিত করুণ রসের প্রবাহ ভাবুকের চিত্ত আকুল করিয়া তুলে।

আলঙ্কারিকের চক্ষে এই কবিতাটী অতি মনোহর ইহাতে অলঙ্কার রস ও ধ্বনির সুন্দর সমাবেশ রহিয়াছে। শেষ পংক্তিটীতে গিরিরাজকে প্রকারান্তরে পাষাণ বলিয়া অভিপ্রায়প্রকাশ পাওয়ায় "অপ্রস্তুত প্রশংসা" ধ্বনির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "চৈতন্যরূপিনী" পদে শ্লেষের পরিচয় পাওয়া যায় এক অর্থে স্বাপ্ন্যসংজ্ঞারূপিনী অন্য অর্থে চিন্ময়ী, ইহাতে দাশরথির মনো-বিজ্ঞান তত্ত্বেও অধিকার ছিল দেখা যাইতেছে, অষ্টম ও নবম পংক্তিতে তিনটী 'মায়া' শব্দ তিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—প্রথমটীর অর্থ ছলনা, দ্বিতীয়টীর অর্থ স্নেহ এবং তৃতীয়টীর অর্থ ঐশীশক্তি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

যাহাকে ব্রহ্মের প্রকৃতি বা বিভাব বলা হইয়াছে। দাশরথির এই কবিতায় করুণ রসের উৎস ছুটিয়াছে—কন্যাবিয়োগবিধুরা মাতা আলম্বন, স্বপ্নে দর্শন উদ্দীপন, মাকে মা বলিয়া সম্বোধন ("চৈতনকরিয়ে") অনুভাব, পরক্ষণেই অদর্শন ব্যভিচারী ভাব, এবং কন্যাসমাগমসুখ (বৎসলতা) স্থায়ীভাব। এক-মাত্র কবিতা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলেই দাশরথিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সকলেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দাশরথি বৎসলতামূলে কেবল করুণ রসের অবতারণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রীতির চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কিত করিবার জন্য স্বীয় রচনায় শান্ত রসেরও প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন। বালিকা কন্যা শিশু পুত্রের জননী হইয়া বহু দিনান্তে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া পিতৃগৃহে আসিলে বাৎসল্যাদ্রহৃদয় পিতা মাতা বালিকার ক্রোড়ে শিশু দেখিয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন কবি গণেশ-জননী মূর্ত্তির বর্ণনায় তাহার উন্মেষ করিয়াছেন।

"বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে
হেরি গণেশ-জননীরূপ রাণী ভাসেন নয়ন জলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরিবালিকা সেই তারা
পদতলে বালক ভানু বালক-চন্দ্রধরা
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে।
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে—
দাশরথি কহিছে রাণি, দুই তুল্য দরশন
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম রূপ গজানন,
ব্রহ্ম কোলে ব্রহ্ম ছেলে, বসেছে মা বলে॥

কন্যা স্বামী গৃহে দারিদ্র্য বশতঃ কষ্ট পাইতেছে শুনিলে মাতার শোক পারাবার উথলিয়া উঠে তখন যদি সংবাদ পান যে, জামাতার অবস্থা ফিরিয়াছে, কন্যা স্বচ্ছলতায় স্বচ্ছন্দে আছেন মাতার স্নেহ পরবশ চিত্তে কিছুতেই প্রত্যয় হয় না; কন্যাকে সালঙ্কারা, সাভরণা আসিতে দেখিয়াও মাতার সন্দিহান চিত্তে নানা তর্কের উদয় হয়। অভিমানে কন্যাকে দুঃখিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার সাংসারিক উন্নতির কথা প্রকৃত কিনা প্রবল অনুসন্ধিৎসা সহকারে প্রশ্ন করেন। প্রত্যেক দিন গৃহস্থের গৃহে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দাশরথি উমার

আগমনে মেনকার উক্তিতে সেই সেই কন্যাবাৎসল্য ও মাতৃ স্নেহের উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।—

"কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী,
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী—
বল, মা হ'তে প্রাণ উমা—
কার কাছে এত মা, হয়েছ আদরিণী
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম;
উমা গো, আবার আজি শুনিলাম
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম—
ভবের ভয় নাশিনী॥
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম
দুখে দুখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা, তোর দুখহরা নাম;
আমি ত জানি দুঃখিনী—
সদানন্দের ঘরে অন্ন শূন্য সদা,
কে তোর নামটী রেখেছে অন্নদা,
দাশরথি দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব-ভয়-হারিণী॥"

কন্যা কিছু দিন পিতৃগৃহে থাকিয়া পুনরায় স্বামী গৃহে যাইবার কালে তাঁহাকে বিদায় দিতে মাতার প্রাণের ব্যাকুলতা দাশরথি তাঁহার কাশীখণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন।—

"ওগো প্রাণ উমা,
মাকে কোন্ প্রাণে মা, বল্‌লি আমায় বিদায় দেমা।
পারি প্রাণকে বিদায় দিতে তোয় নারি পাঠাতে
প্রাণ উমার কাছে কি প্রাণের উপমা॥
সে দিন করে কত রোদন, হরের ঘরের বেদন
তুই যে আমায় কত জানালি মা—
তাকি নাই মা, মনে, হেরি নয়নে তোর ত্রিনয়নে
সে ভাব ভুলেছ ভুলেছ হরমনোরমা॥"

আমরা দাশরথি রায়ের এই সমস্ত কাব্য অনুশীলন দ্বারা দেখিতেছি

দাশরথির রচনায় কাব্যের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। দাশরথির রচনা পাঠ করিলে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া পাঠককে পুলকে বিস্মিত হইতে হয়; ফলতঃ দাশরথির প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ও কবিজনোচিত। রায় মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় অনেক অভিনব তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা দৃষ্টান্তবহুল বলিয়া অনেকে দোষারোপ করিয়া বলেন কবি আবেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, দৃষ্টান্তগুলির সুসঙ্গতি দেখিয়া কিন্তু কবির উক্ত অসংযততা পরিহার করা আবশ্যক মনে হয় না। দাশুরায়ের দৃষ্টান্ত শ্রেণী দীর্ঘ হইলেও তাহাতে এমন মাধুর্য্য আছে যে শ্রোতা বা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি, ব্রজে কৃষ্ণ রাখাল ছিলেন, মথুরায় গিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া নূতন ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শ্রীমতীদূতী বৃন্দার সম্মানলাভের আশা নাই, কারণ নূতন ধনীর নিকট মানীর মান থাকে না; এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় নূতন বস্তুর দোষ বর্ণনা করিয়াছেন।—

"ছলে কয় বৃন্দা ধনি   কৃষ্ণ তুমি নূতন ধনী
তাইতে উচিত বলতে হয় ভয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান   কভু রয় না মানীর মান
নূতন কিছু প্রশংসিত নয়॥
নূতন চা'লে অনিষ্ট   নূতন রাজ্যে শাসন কষ্ট
নূতন ভার্য্যা পতির বশ হয় না।
নূতন বয়সে ধরে না জপ   নূতন জ্বরে ধরে কফ
নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না॥
গুণ করে না নূতন সিদ্ধি   নূতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি
নূতন বালকে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা   নূতন বৈরাগী মুখচোরা
সদর হ'তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥
নূতন শোক প্রাণনাশক   নূতন বৈদ্য ভয়ানক
নূতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রহে না॥

এখানে দাশরথি কি মধুর ভাষায় একান্ত সত্যগুলি দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। দাশরথির রচনায় মালোপমা অলঙ্কার স্থলে উপমাগুলির

সংখ্যাধিক্য থাকিলেও ভাষার লালিত্যে এবং রসের মাধুর্য্যে তাহা পাঠকের অতৃপ্তিকর নহে উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতেছে। তিনি মেনকায় উক্তিতে সন্তানের মমতার মহার্হত্ব প্রদর্শনে অনেকগুলি মহার্হ উপমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—

"শশীর তুল্যরূপ নাই কাশীর তুল্য ধাম।
প্রেমের তুল্য সুখ নাই রামের তুল্য নাম॥
রোগের তুল্য শত্রু নাই যোগের তুল্য বল।
ভক্তির তুল্য ধন নাই মুক্তির তুল্য ফল॥
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই গঙ্গার তুল্য জল।
বিপ্র তুল্য জাতি নাই সর্প তুল্য খল॥
পবন তুল্য গমন নাই বারণ তুল্য দাপ।
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই হরণ তুল্য পাপ॥
গরুড় তুল্য পক্ষী নাই শুকের তুল্য মুনি।
বখিল তুল্য অধম নাই কোকিল তুল্য ধ্বনি॥
স্বর্ণতুল্য ধাতু নাই কর্ণ তুল্য দাতা।
ইষ্ট তুল্য দেবতা নাই কৃষ্ণ তুল্য কথা॥
তরী তুল্য বাহন নাই করী তুল্য দণ্ড।
মানব তুল্য জন্ম নাই প্রণব তুল্য মন্ত্র॥
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই সুজন তুল্য জন।
দৈন্যতুল্য বিপদ নাই পুণ্য তুল্য ধন॥
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই শঙ্খ তুল্য নাদ।
মরণ তুল্য গালি নাই চোরের তুল্য বাদ॥
অবশ তুল্য অসুখ নাই পীযুষ তুল্য রস।
মায়ের তুল্য আপন নাই দাতার তুল্য যশ॥
শঠ তুল্য কুজন নাই বট তুল্য ছায়া।
সাত্ত্বিক তুল্য কর্ম্ম নাই কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
তেমনি সন্তানের তুল্য মায়া নাই মা মহামায়া॥

কবির এই উপমা শ্রেণী অতি বিস্তৃত এজন্য তাঁহাকে অসংযত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু রচনা পারিপাট্য অতিশয় ললিত কিছু মাত্র শ্রুতিকটুতা জন্মে নাই, উপমার বস্তুগুলির সহিত উপমেয়ের শ্রেষ্ঠত্বাংশের সাদৃশ্যও এত হৃদয়গ্রাহী

যে উহাতে পাঠক বা শ্রোতার বিরক্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। উপমাবাক্য প্রকটিত বিষয়গুলিও একান্ত সত্য এবং কবির অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর গবেষণার পরিচায়ক।

দাশরথির কাব্য পাঁচালী, শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র নানাশ্রেণীর শ্রোতা উহার গীত শ্রবণ করিয়া থাকে; সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করা পাঁচালী রচয়িতার এক প্রধান উদ্দেশ্য, এজন্যও তাঁহাকে নানা ভাবের সংযোগ করিতে হইয়াছে সুতরাং মার্জ্জিতধী সুধীর নিকট যাহা দুই একটী শব্দে প্রকাশিত হইলে কাব্যের গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইত, সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তির জন্য তাহা বিস্তারিত করিতে হইয়াছে, সুতরাং দাশরথির রচনায় উপমানশ্রেণীর দৈর্ঘ্য দেখিয়া তাঁহাকে অসংযত ভাবুক বা ইতর শ্রেণীর কবি বলিয়া উচ্চহাস করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

দাদা।

বাহিরের ঘরে আমি পড়িতেছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছুটী হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমি আমার সকাল সন্ধ্যায় বই লইয়া বসার অভ্যাস ভঙ্গ করি নাই। ক্রমে দাদা ঘরের মধ্যে আসিয়া একখান চেয়ারে বসিলেন। গোপন কোন পরামর্শের প্রয়োজন আছে বুঝিয়া আমিও বই বন্ধ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম; কিন্তু কোন পরামর্শের অবতারণা না করিয়া দাদা বলিলেন— তুই পড়না, বই বন্ধ করলি কেন? আমি বেশ বসে আছি।

দাদাকে বিলক্ষণ চিনিতাম তাই বলিলাম 'আমার পড়া হ'য়ে গিয়েছে। আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না। তুমি এসেছ বেশ হয়েছে একটু গল্প-টল্প করা যাক বলিয়া আমি তাঁহাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

'কেন? এত সকালেই পড়া হয়ে গেল যে আজ? শরীর ভাল আছে ত তোর?' বলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন এইত সবে ৯টা বেজেছে। এখনি শুতে যাচ্ছিস নাকি?

সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া আমি বলিলাম—আজ দাদা আমরা একটা নূতন কিছু করেছি। ৫।৬ জনে মিলে আমরা আজ ফেরি ষ্টীমারে শিবপুর পর্য্যন্ত ৫।৬ বার যাতায়াত করেছি। দিব্যি দক্ষিনে বাতাসে বইছিল—এমন আনন্দ

অনেক দিন পাইনি। যদি তুমি সঙ্গে থাকতে দাদা—তোমার কথাই বার বার আমার মনে হচ্ছিল কেবল। ভাল কথা তোমার চেহারাটাত আজ তেমন ভাল দেখাচ্চে না। কেন বল দেখি?

"'তোদের মত নূতন কিছু আমি আজ করিনি—পুরানো এক ঘেয়ে ভাবেই জীবন চলেছে আমার। তাবলে আমার কিছু হয়নি এটাও ঠিক। নিজের মনে আনন্দ ছাপিয়ে উঠেছে তোমার, আমার মনে ত তার আভাব নেই তাই আমার চেহারা আজ কেমন কেমন ঠেক্‌ছে তোমার। সত্য কথা আমি বেশ আছি; কিছুই হয় নি আমার। হাসিবার ভঙ্গিতে দাদা এই উত্তর করিলেন।

'আর কিছু না হোক একটা ভাবনা তোমার মনে চেপে রয়েছে বলে বোধ হচ্চে তোমারে দেখে। তুমি না বল্লেও আমি—

"নাঃ তেমন ভাবনা বিশেষ কিছু নয়। তবে একটা মুস্কিলে পড়েছি।"

'ঠিক ধরেছি কিনা?'

"না—না—না—তেমন মুস্কিলই বা কি এমন।" সুধীররা সব খাওয়াবার জন্য ধরেছে এই যা। কি কর্ব্ব তাই পরামর্শ করতে এলাম তোর কাছে। কি করা যায় বল দেখি।'

'ওঃ এইই। এর জন্য আবার ভাবনাটা কিসের? তারা এ বলবেই এত জানা কথা। তুমি ফিলসফিতে ফাষ্টক্লাশ পাবে আর তারা দুটো সন্দেশ পাবে না?

'পাওয়া ত উচিৎ। কিন্তু সেইত ভাবনা।

'তার আর ভাবনাটা' কি? একদিন সকলকে নিমন্ত্রন করে খাইয়ে দাও তোমায় ত তোমার বন্ধুরা বলতেই পারে আমাকে পর্য্যন্ত বলছিল সে দিন—

'কি বলছিল তোকে—

'সে সব কথা থাক্—পরে হবে। আপাতত বাবাকে বলে এর একটা ব্যবস্থা করে আসি—ব'স তুমি বলিয়া আমি গমনোদ্যত হইলে দাদা আমার হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন এত তাড়াতাড়ি কিসের? কথাটা ভাল করে ভেবে দেখা যাক আগে।

'ভাববার কি আছে এতে—এত সোজা কথা। বস তুমি এই আমি এলাম বলে' বলিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

৫।৭ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি দাদা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া

আছেন। উৎসুক ভাবে আমার দিকে চাহিতেই আমি বলিলাম যে যা বলেছি তাই বাবার কোন অমত নাই। তিনি বরং বল্লেন এই আসছে রবিবারেই কাজটা সেরে ফেলতে। শুভস্য শীঘ্রম্। কি—বল?

'তা বটে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি—

'তাড়াতাড়ি কিসের, আজ সবে বুধবার—রবিবারের এখন ও ৩।৪ দিন দেরী। কোন ভাবনা নেই—সব ঠিক হবে। অন্য আপত্তি নেইত তোমার?

'তা নেই কিন্তু বাবা ত কিছু মনে করেননি?

'কি মনে করবেন আবার? কথাটা পাড়তেই তিনি বল্লেন সেত ঠিক কথা। একবার ত বন্ধুদের আহ্বান করে আমোদ আহ্লাদ করা দরকার।

তবে রবিবারেই ভাল। কি বলিস?

'আমি ত ব'লবই। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? বস— ঠিক ঠাক করা যাক একসঙ্গে।

'সে তোর উপর ভার থাকল বলিয়া দাদা চলিয়া গেলেন।

* * * *

রাত্রে খাওয়ান হইয়া গিয়াছে। সকালে বাহিরের ঘরে আমি বসিয়াছিলাম। সম্মুখে খবরের কাগজ খোলা থাকিলেও আমার মন গত রাত্রের ঘটনাবলীর আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিল। আহারাদির ব্যবস্থা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা ছিল না—ভাল হইলে সকলের পাতেই এত করিয়া পড়িয়া থাকিত না। কিন্তু এই যে ভাল হয় নাই সে প্রধানতঃ দাদারই গাফিলিতে। তাঁহার উপর যে যে কাজের ভার ছিল সব গুলিতেই গলদ বাহির হইয়াছে। তিনি তার করিতে দেরী না করিলে শিলং হইতে কমলা লেবু নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছিতে পারিত—তাহা হইলে আর ছানার পোলাও করিতে হইত না। দেশের সন্দেশ খেয়ে সকলে তারিফ করলে কিন্তু দাদার কথামত যে সন্দেশের আ'ঢালা ব্যবস্থা না থাকায় ভদ্রলোকের কাছে শেষে প্রায় অপ্রস্তুত হতে হল। চপটা খেতে মন্দ হয়নি, কাটলেটটা দাদা চেখে বল্লেন 'বেশ কিন্তু কেউ সেটা চেয়ে খেলে না। কারিটাতে নুন বেশী হয়ে গিয়েছিল। গল্‌দা চিংড়ি গুলা যাই ছিল তাই মান রক্ষা।

চিন্তাস্রোতে বাধাদিয়া বাহিরের বারান্দা হইতে দাদা ডাকিলেন—শরৎ একবার এদিকে আয় ত। বারান্দায় আসিলে দাদা অদূরে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম একটী মলিন জীর্ণচীর পরিহিতা

কঙ্কালসার বৃদ্ধা রাস্তার উপরিস্থিত স্তূপিকৃত আবর্জ্জনার রাশি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পোলাওয়ের ভাত খাইতেছে।

কল্পনায় একটী বিদ্যুদোজ্জ্বল বিচিত্র খাদ্যসম্ভার সুরভিত কৌতুক হাস্য মুখরিত রম্য ভোজনশালার বিলাস চিত্র আমার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উভয় চিত্রের বিসদৃশতায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

হঠাৎ দাদার মুখে চাহিয়া দেখি সহানুভূতির বেদনায় তাঁহার নয়নযুগল সজল হইয়া আসিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া বেহারাকে ডাকিয়া ভিখারিনীর পর্য্যাপ্ত আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অসিলাম। ফিরিয়া দেখি দাদা তখনও সেই রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।

একাবলী।

অভিসম্পাৎ।

একদা বৈকুণ্ঠভবনে লক্ষ্মীদেবী সহ জনার্দ্দন একাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে অমিতপ্রভ পরম রূপবান সৌম্যমূর্ত্তি সূর্য্যপুত্র রেবন্ত ভগবর্দ্দশনাকাঙ্ক্ষী হইয়া উচ্চৈশ্রবারোহণে তথায় গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে দীপ্তিমান ভাস্করপুত্রকে অবলোকন করিতে করিতে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি সাগরসম্ভুত সেই মনোহরমূর্ত্তি নিজ সহোদর হয়শ্রেষ্ঠের উপর নিপতিত হইল। বহুদিবস পরে পরম সুন্দর অশ্ববরকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মীদেবী অতীব বিস্মিত ও স্তব্ধনেত্র হইলেন। তিনি অনিমেষলোচনে একাগ্র মনে তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে বিষ্ণুও সেই অশ্বারূঢ় ভাস্কর পুত্রকে অবলোকন করিয়া প্রণয় সহকারে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবি! দ্বিতীয় মন্মথকান্তি এ কোন ব্যক্তি ত্রিভুবন বিমোহিত করিয়া আগমন করিতেছেন বলিতে পার? লক্ষ্মীদেবী তদ্গতচিত্তে সহোদর অশ্বকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এজন্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক বারংবার জিজ্ঞাসিতা হইয়াও উত্তরদানে বিমুখ হইয়াছিলেন। একারণ জগৎযোনি হরি কমলার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাইলেন তিনি অনন্যমনে পরম প্রেমসহকারে অশ্ববরকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। বিষ্ণু তাহাকে তৎপ্রতি আসক্তা ও অতীব মোহিতচিত্তা দেখিয়া ক্রোধসহকারে কহিলেন, "সুলোচনে! তুমি কি দেখিতেছ? অশ্ব

দর্শনে তোমার চিত্ত এরূপ মোহিত হইয়াছে যে আমা কর্তৃক বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর প্রদান করিলে না। এই অবমাননার জন্য আমি তোমাকে এই অভিসম্পাৎ করিতেছি যে "তোমার চিত্ত যখন সর্ব্বত্রই রমণ করে, তখন তুমি রমা নামে ও চিত্তের চঞ্চলতা হেতু চঞ্চলা নামে অভিহিত হইবে, আর তুমি মৎসন্নিধানে অবস্থান করিয়াও অশ্বদর্শনে এতাদৃশ মোহিতা হইয়াছ, তখন অতি দারুণ মর্ত্ত্যলোকে তুমি অশ্বিনীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবে।

জনার্দ্দনের মুখবিনির্গত এই অভিসম্পাত বাণী শ্রবণ করিয়া রমা দেবী সাতিশয় ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় পতির চরণযুগলধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "হে দেব জগন্নাথ, হে কেশব আপনি যে করুণার আকর; অতএব হে গোবিন্দ! অল্পমাত্র অপরাধে কি জন্য আপনি আমাকে এরূপ দুরূহ শাপ প্রদান করিলেন? প্রভো! আমি কখনই ত আপনার এবংবিধ-ক্রোধ দেখি নাই! আমার প্রতি আপনার যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহা কি আমার ভাগ্যদোষে অদ্য বিলুপ্ত হইল? হে নাথ! শত্রুর প্রতিই বজ্র নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, সুহৃদজনের প্রতি কদাচ তাহা উপযুক্ত নহে। হে দেব। আমি সর্ব্বদাই আপনার বরদানের যোগ্যপাত্রী, অদ্য কেন আপনার শাপযোগ্যা করিলেন। ইন্দ্রের যেমন ইন্দ্রানী ভবেশের যেমন ভবানী আমিও তদ্রূপ আপনার প্রণয়িনী ভার্য্যা এই ভাবিয়া গরবিনী ছিলাম। অদ্য আমি ঘোটকীরূপে অবতীর্ণ হইলে জগতীতলে আর আমার সম্ভ্রম কোথায় রহিল। হে গোবিন্দ, আমি আপনার অদর্শনে বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? তদপেক্ষা আমি অদ্য আপনার সমক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

জনার্দ্দন প্রিয়তমার এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! স্নেহ কখন বিলুপ্ত হইতে পারে না। তুমি একাগ্রমনে অশ্বদর্শনে নিযুক্ত ছিলে আমিও সেই সময় তোমাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাই নাই ইহাই তৎকৃত অবমাননা বোধে আমার ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল এবং ক্রোধোদয় ফলেই এই অভিসম্পাৎ। অতএব যাহা ঘটিবার তাহার সংঘটন হইয়াছে, এক্ষণে গতানুশোচনায় কোন ফল নাই। অবশ্য ইহা হইতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, নতুবা মাদৃশ জনের ক্রোধ সহসা কেন আবির্ভূত হইল?

জনার্দ্দনের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কমলা দেবী পুনরায় করজোড়ে

কহিলেন "হে দেবেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রভো! কবে আবার আমি ভবদীয় সান্নিধ্য লাভ করিব ?"

লক্ষ্মীদেবীর মুখবিনির্গত বাক্যগুলি শেষ হইতে না হইতেই দেবর্ষি নারদ আগমন পূর্ব্বক উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। পরে লক্ষ্মীদেবীকে একান্ত অবসন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন "মাতঃ! বহুদিবস পরে আপনাদিগের চরণ দর্শনে আগমন করিলাম, কিন্তু আপনাকে অবসন্না দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, ইহার কারণ কি মাতঃ।

নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া লক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "নারদ! সূর্য্যপুত্র রেবন্ত উচ্চৈঃশ্রবারূঢ় হইয়া আগমন করিতেছিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত সুতরাং আমার সহোদর। আমি একাগ্রমনে তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলাম, ইত্যবকাশে রমাপতি আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত দিলেন যে আমি যেমন তাঁহার নিকট থাকিয়াও ঘোটকের প্রতি নিবিষ্টচিত্তা হইয়াছিলাম তেমনি ঘোটকী-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি শাপ বিমোচনের জন্য উহার পদধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তাহাতে উনি কর্ণপাতও করিতেছেন না। নারদ! আমার উপায় কি হইবে? তুমি একটু ভগবানকে আমার জন্য অনুরোধ কর।"

ভগবান মধুসূদন নারদের নিকট লক্ষ্মী দেবী কথিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়াই কহিলেন, "দেখ নারদ! তুমিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী, তুমিও বিবেচনা করিয়া বল মাদৃশ ব্যক্তির অকস্মাৎ ঈদৃশ ক্রোধোদ্রেক কেন হইল। অবশ্য ইহা হইতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমি প্রিয়াকে এই বিষয় লইয়া গতানুশোচনা করিতে নিষেধ করিলেও উহার হৃদয় প্রবোধ মানিতেছে না। অতএব তুমি একটু উহাকে প্রবোধ দান কর।"

প্রত্যুৎপন্নমতি দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সারগর্ভ বাক্যের উত্তরদান করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আপনার বাক্য কখন অযথা হইতে পারে না। ভবাদৃশ ব্যক্তির ক্রোধ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হইয়া থাকে। তথাপি পিতঃ! স্ত্রীলোক স্বভাবতই কোমলস্বভাবা, তাহার উপর আমার মাতা ত একান্ত পতিগতপ্রাণা। উনি আপনার বিরহসহনে একান্ত অসমর্থা। যিনি শয়নে স্বপনে, কেবল আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনার পদসেবা যাঁহার চিরব্রত, সেই কোমলমতি মা আমার কেমন করিয়া আপনার দর্শন

ও পদসেবা বিচ্যুতা হইয়া জীবনাতিপাত ক
আপনার পদধারণ পূর্ব্বক মিনতি করিতেছি, তাঁহার শাপমোচনোপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাপিত করুন। দেব আমি সর্ব্বথা আপনার অনুরক্ত, আমার বীণাও আপনার গুণগান ব্যতিরেকে আর কোনরূপ ঝঙ্কারদানে বিমুখ।" এই বলিয়া নারদ বীণাসহকারে হরিগুণ-গানে বিভোর হইলেন—

সুললিত রাজিত চন্দনতিলকম্।
তেজোময় রবি মণ্ডল সদৃশম্॥
ভ্রূযুগল রতিপতি কার্ম্মুকযুক্তম্।
প্রেমজলাবলি মুদিত নেত্রম্॥
করকমলেন চ বাদিত যন্ত্রম্।
রসনা ব্রজপতি ভাগবত তন্ত্রম্।
ইতি নামাঙ্কিত সর্ব্ব শরীরম্
সিঞ্চিত লোচন পুষ্করনীরম্॥

নারদের সেই তানলয় সুসঙ্গত, ভ্রমরগুঞ্জনবিনিন্দিত বীণাধ্বনি সহকারে মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া দেব হৃষিকেশ প্রসন্ন হইলেন। তখন তিনি দেবর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নারদ! আমি তোমার জননীকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া অভিসম্পাত করি নাই। যাহা হউক তোমার জননীর শাপমুক্তির উপায় এই নির্দ্ধারণ করিলাম যে তিনি মর্ত্ত্যে অবস্থানকালে মৎ-সদৃশ সুন্দর পুত্রোৎপাদন করিলে শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে আমার সহিত বিরাজমানা হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জনার্দ্দন কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া লক্ষ্মীদেবী ঘোটকীবেশধারণ পূর্ব্বক গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থান প্রয়াগতীর্থে বহুকাল যাপন করিলেন। হৃষিকেশ প্রসন্ন না হইলে তাঁহার পুত্রোৎপাদনের কোনই সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া বড়ই বিষন্না হইলেন। হৃষিকেশের বিরহে তিনি দিন দিন ক্ষীণকলেবরা হইতে লাগিলেন। কোথায় তিনি সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠের বিভবাদি উপভোগ করিতেন, আর কোথায় এই প্রয়াগতীর্থে বনভূমিপ্রদেশে নির্জ্জনে বসতি। পৃথিবীস্থ সকল পদার্থই তাঁহার কষ্টের কারণ হইল। গঙ্গা যমুনা মিলিত হইয়া যে সুমধুর কুলকুল নিনাদে

প্রবাহিত হইত তাহা তাঁহার নিকট বজ্রনিনাদ বলিয়া বোধ হইত। পৃথিবীর বায়ু তাঁহার নিকট ঘনীভূত ও শ্বাসরোধকারী বলিয়া প্রতীতি হইত। সুবিস্তৃত বনভূমি মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন না। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই ভাগীরথী ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থির দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব মিলন দর্শন করিতেন। কালিন্দীর কৃষ্ণজল তাঁহার নিকট বিষ্ণুদেহ বলিয়া জ্ঞান হইত ও ভাগীরথীর শ্বেত জল দেবাদিদেব মহাদেবের দেহ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সম্যক্ ধারণা হইয়াছিল যে, এই ভীষণ প্রান্তর মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিদানার্থে হরিহর একীভূত হইয়া এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। অনুক্ষণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি হৃষিকেশের সম্মিলনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি নতজানু কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

হে দেব, কমলাকান্ত দেব হৃষিকেশ !
কতকাল এই ভাবে একাকী নির্জ্জনে
যাপিব জীবন হেথা, চিরদাসী তব
সেবা করি তব পদ যাপিয়াছে দিন ?
লক্ষ্মীপতি বলে তুমি মাধব নামেতে
বিদিত জগতে, সেই লক্ষ্মীহীন হয়ে
কেমনে যাপিছ দিন, একাকী বৈকুণ্ঠে ?
ভকতবৎসল নাম কোথা গেল এবে ?
যেই গুণে প্রহ্লাদেরে অভয় দানিয়া
(হিরণ্যকশিপু পিতা দুর্জ্জয় দানব)
তাহার শাসন হতে তারিলা তাহারে।
ডেকেছিলা ধ্রুব তোমা ভক্তি সহকারে
নাশিলে বালক দুঃখ অবতরি মর্ত্ত্যে।
আমি যে তোমার দাসী, দিবানিশি তোমা
অনুক্ষণ ডাকিতেছি, হয় না কি দয়া ?
অসীম করুণা তব থাকিতে মাধব !
দাসীপ্রতি হয় না কি করুণা সঞ্চার ?
যে জন তোমার পদ হৃদয়ে ধরিয়া
নিশিদিন পূজা করে, তাহারে ছাড়িয়া

কেমনে করিছ বাস একাকী বৈকুণ্ঠে ?
শাপের উদ্ধার কথা তুমিই ত দেব !
বলিয়া দিয়াছ মোরে, এস শীঘ্র নাথ !
তুমি না করিলে দয়া শাপ মুক্তি মম
কভু না সম্ভবে আর, কি আর বলিব।

কমলা কমলাকান্তের নামগ্রহণ মাত্র হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিলেন। অনন্তর সুমধুর বীণাধ্বনি শ্রবণান্তর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন দেবর্ষি নারদ আসিতেছেন। নারদ নিকটবর্ত্তী হইলে কমলা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "নারদ! আমার এই বনবাসে যে তোমাকে দর্শন করিব, তাহা আমার আশা ছিল না। তুমি যে মনে করে তোমার অভাগী জননী দর্শনে আগমন করিয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই কৃতার্থ হইলাম।

কমলার স্নেহোদিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, "জননি! আপনি বৈকুণ্ঠভবন ত্যাগ করা অবধি আমি আর সে নির্জ্জন অন্ধকারপুরীতে গমন করি নাই। আপনি বৈকুণ্ঠের আলোক, আপনার বিহনে বৈকুণ্ঠ এক্ষণে অন্ধকারময়। সেই শ্রীহীন বৈকুণ্ঠে জগন্নাথ একাকী বিষাদজড়িত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। মা! যেখানে আপনি, সেইখানেই ঐশ্বর্য্য, ধন, ও ধান্য। বসুন্ধরা দেবী আপনার পদকমল বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়াছেন।

জনার্দ্দনবিরহে ব্যথিতচিত্ত কমলা অনন্তর নারদের নিকটপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "নারদ! আমার উপায় কি হইবে? আর কতকাল আমি এই ঘোটকীরূপ ধারণ পূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিয়া জীবন ধারণ করিব? নিরঞ্জন প্রসন্ন না হইলেও আমার পুত্রোৎপত্তির কোন উপায় নাই।" জননীর কাতর বচন শ্রবণ করিয়া নারদ তাঁহাকে এই পরামর্শ দান করিলেন যে "আপনি এমন তীর্থস্থানে অবস্থান করিতেছেন, এই তীর্থস্থানে স্নান করিয়া আপনি প্রতিদিন আশুতোষের ধ্যাননিরতা হউন। তিনি প্রসন্ন হইলে অচিরেই আপনার কষ্টের অবসান হইবে।"

নারদ প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী দেবীর মনোবেগ নারায়ণবিরহে এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পুনরায় নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবাদিদেবের স্তবে মগ্ন হইলেন—

ত্রিপুর বিনাশন পাতক তারণ
ফণিকুলভূষণ মঙ্গল কারণ
দক্ষমদানব মন্থনকারী
ভবভয় সংহর কালনিবারি।
নরকঙ্কাল বিভূষিত দেহ
ভকতজনে পরিণদ্ধ সিনেহ
শিরসি তরঙ্গিত পাবন গঙ্গা
কলকল সঙ্কুলদমল তরঙ্গা।
জলনিধি-মথন সমুত্থিত গরলে
হৈল মহার্ত্ত সুরাসুর সকলে
গরল পিয়া প্রভু সৃষ্টি সমস্তে
ত্রাণ করহ তুমি দেব নমস্তে।
অসুর বিনাশী প্রমত্ত করালী
নৃমুণ্ডহস্তা মস্তকমালী
ভীষণ হাস্যে স্তম্ভিত সৃষ্টি
ভীম বপু প্রভে অন্ধিত দৃষ্টি
নর্ত্তিল ভীমা বিশ্বসবিত্রী
পদভর কম্পিত আর্ত্তধরিত্রী
ধরি প্রভু প্রলয় পদাম্বুজবক্ষে
মুছিলে অশ্রু জগজ্জন চক্ষে
ভৈরব বিকট প্রমথ সহচারী
অনল ললাট সৃজনলয়কারী
প্রলয় বিষাণ বিরাজিত হস্তে
ত্রিশূল ধারণ রুদ্র নমস্তে

বিষাদজড়িতা কমলার হৃদয়োত্থিত স্তব শ্রবণ মাত্রই দেবাদিদেব ঘোটক-রূপধারিণী লক্ষ্মীদেবীর সকাশে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর সম্ভ্রমসূচক বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন। "হে সর্ব্বকল্যাণ-ময়ি জগন্মাতঃ! আপনি আবার কি নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কি জন্যই বা আপনি ঘোটকীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন জ্ঞাপন করুন।

ত্রিলোকপতি মহাদেবের ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কমলাসনা

কমলাদেবী তাঁহাকে ঘোটকীরূপ ধারণের কারণ অবগত করাইয়া কি প্রকারেই বা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন তাহাও বর্ণন করিলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন "প্রভো! যাহাতে আমি নিরঞ্জনের এই অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভ করি তাহার উপায় বিধান পূর্ব্বক কমলার চরিতার্থতা করুন।"

মহা। দেবি! আপনার পতিই ত সর্ব্বলোকের বিধানকর্ত্তা ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। অতএব আপনি সেই জগৎপতি হরিকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার স্তব করিতেছেন? বিশেষতঃ পতিই রমণীদিগের একমাত্র পরম দেবতা। পতিশুশ্রূষাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতনধর্ম্ম। পতি যেরূপই হউন, আপনার কল্যাণকামনা থাকিলে একমনে তাঁহারই সেবা করা উচিত। অধিকন্তু আপনার পতি ভগবান নারায়ণ, সকলেরই সেব্য ও সর্ব্বকামনাপূরণে যোগ্য; অতএব হে সিন্ধুজে আপনি সেই দেবদেবেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার ধ্যানপরায়ণা হইয়াছেন?

লক্ষ্মী। হে দেব মহেশ্বর! আপনি আশু সন্তুষ্ট হন বলিয়া আশুতোষ নামে বিদিত এবং সর্ব্বকল্যাণময় বলিয়াই শিব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব হে দয়ানিধে। যাহাতে আমি পতির অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভ করি তাহার উপায় বিধান করুন।

লক্ষ্মীদেবীর এতাদৃশ সদর্থযুক্ত বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশুতোষ পুনরপি কহিলেন, "দেবি! দেবদেবেশ্বর আপনাকে অভিসম্পাত করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে আপনার পুত্রোৎপত্তি হইলে পুনরায় বৈকুণ্ঠে তৎসকাশে গমন করিবেন।' আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই ভজনা করুন।"

তখন বীণাবিনিন্দিতস্বরে মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "দেব! পতিসহবাস ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে না। নারায়ণ ত নিরপরাধিনী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মহৃদয়ে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব হে দেব শঙ্কর! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকেই মর্ত্তে প্রেরণ করিবেন। হরিহর এক আত্মা, আমি তাঁহারই নিকট শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং আপনার অনুরোধ তিনি কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর বাক্যে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে

পৃথুশ্রোণি! আপনি সুস্থা হউন। আমি আপনার তপস্যায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি আপনি অচিরেই পতিসম্মিলনলাভ করিবেন। জগদীশ্বর হরি আমার অনুরোধে আপনার কামনা পূরণার্থে অবিলম্বে অশ্বরূপে এইস্থানে আগমন করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

দীধিতি

তরণী ছুটিছে পবনে,
রঘুনাথ আর নিমাই একদা
ফিরিছেন নিজ ভবনে।
দুইধারে কত মন্দির, বন,
শিলাময় ঘাট, পুষ্পকানন,
আকাশ গঙ্গা লোহিত বরণ
রবি পশ্চিম গগনে।
নিমাই হেরিছে জাহ্নবীশোভা
প্রশান্ত হাসি অধরে!
আঁখি দুটী থির অনিমেষ প্রায়,
চারু কুন্তল বাতাসে উড়ায়,
বাম বাহু তাঁর রঘুনাথ গায়
পুঁথি একখানি অপরে।
শুধালেন রঘু—"কিসের এ পুঁথি
'দর্শন কিবা পানিনি?"
কহেন নিমাই—"করিয়া যতন
ন্যায়ের বারিধি করি মন্থন,
লিখেছি দীধিতি গ্রন্থ নূতন,
ভাল কি মন্দ জানিনি।
"পড় দেখি শুনি" কহে রঘুনাথ
কৌতুক জাগে সঘন।

খুলিয়া গ্রন্থ পড়েন নিমাই,
পাণ্ডিত্যের কোথা সীমা নাই,
এমন ভাষ্য আর কোন ঠাঁই
　　হয়নিক লিখা কখন।
পাঠ করি শেষ নিমাই বারেক
　　চাহে রঘুনাথ বদনে!
বিস্মিত হেরি পাংশু সে মুখ;
"হৃদয়বন্ধু, কিসের অসুখ,
ভ্রম দেখি কিছু হয়েছ বিমুখ?"
— কহিলা কাতর বচনে।
"অতি অপূর্ব্ব, অতি সুন্দর,
　　ধন্য তোমার লেখনী!"
নিশ্বাস ফেলি রঘু বলে—"ভাই,
গ্রন্থের তব তুলনা যে নাই!
চন্দ্র কিরণে সত্য, নিমাই,
　　পূর্ণ করেছ ধরণী!
নিমাই কিন্তু ভুলিতে পারেনি
　　শুষ্ক সে মুখখানি।
কহিলেন তাই—"বল ভাই বল,
কেন মুখ তব বিমলিন হ'ল
কেনবা জড়ায়ে আসিল সরল
　　সুকণ্ঠ তব বাণী?"
নিরুপায় হয়ে বলে রঘুনাথ—
　　তুচ্ছ সে কথা ভাই,
আপনি ভাষ্য লিখেছি যে খানি
ভেবেছিনু তাহা সবে লবে মানি;
এতদিনে তব প্রতিভার বাণী
　　গর্ব্ব করেছে ছাই!
নিমায়ের দুটী উৎপল আঁখি
　　সলিলে উঠিল ভরিয়া।

মলিন হইল সহাস আনন,
কহিলা-"মিত্র বিপদবারণ;
কত না দুঃখ দিছি অকারণ,
ক্ষমিও করুণা করিয়া।
বন্ধু আমার. জয়ী হও তুমি,
যশস্বী হও জগতে!
সার্থক হোক্ লেখনী তোমার,
দেশে দেশে হোক্ তব জয়কার,
আজি হতে এই দীধিতির আর
চিহ্ন রবেনা মরতে।
চোখের নিমেষে গ্রন্থ নিমাই
ফেলে তরঙ্গ মাঝারে।
"কর কি কর কি" বলি রঘুনাথ
ঝাঁপ দিতে যায় পুস্তক সাথ
ধরিলা নিমাই মেলি দুটী হাত,
ডুবে গেল পুঁথি পাথারে!
কত যে তথ্য, কত মীমাংসা
নীরবে মিলাল অতলে।
উছসি উঠিল জাহ্নবী জল,
পুলকে পবন বহে চঞ্চল,
ফুটে অক্ষয় শোভা পরিমল
নিমাই অশ্রু-কমলে!

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ভাগবত-ধর্ম্ম।

সমুচ্চয়বাদ (২)

ঈশোপনিষৎ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিকের ভাষায় সমুচ্চয়বাদ এইরূপ। দুটি জিনিস একটির নাম বিশেষ, আর একটির নাম ভূমা বা সর্ব্ব। এই দুইটির সম্বন্ধ কি? বিশেষের মধ্যেই সর্ব্ব আছেন

এবং সর্ব্বের মধ্যেই বিশেষ আছেন, অখণ্ড জ্ঞানদৃষ্টিতে এইটি দেখিতে হইবে ইহাই সাধনা। উদাহরণ লওয়া যাউক, আমার পুত্র তাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ভগবান "সর্ব্বজীবঃ" তাঁহাকে অর্থাৎ নিখিল বিশ্বকে ভাল-বাসিতে হইবে। আমি পুত্রকে ভালবাসি, তাহার হিতসাধনায় সতত ব্যস্ত সুতরাং আমি আর কি করিয়া বিশ্বকে ভালবাসিব; আমার যদি পুত্র না থাকিত তাহা হইলে বিশ্বকে ভাল বাসিতাম। এ কথা যিনি বলেন তিনি ঈশোপনিষদের ভাষায় অবিদ্যা বা অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি অন্ধকারে যাইবেন। আর একজন বলিতেছেন আমি বিশ্বকে ভালবাসিতে চাই অতএব আমি আর পুত্রকে, ভ্রাতাকে, মাতাকে, পরিবারকে বা দেশকে কি কি করিয়া ভালবাসিব? একথা যিনি বলেন তিনি বিদ্যার বা সম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি আরও বেশী অন্ধকারে যাইবেন। সমুচ্চয়বাদী বলেন পুত্রকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল যখন এই পুত্রের মধ্যে আমি সেই বিশ্বজনীনকে পাই, বিশ্বজনীনকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল যখন এই ভালবাসায় আমার পুত্র আমার স্নেহাস্পদ হয়। বিশেষকে অবহেলা করিয়া যিনি সর্ব্বকে পাইতে চাহেন, তিনি কল্পনাকে পাইতেছেন; আবার যিনি সর্ব্বকে অবহেলা করিয়া বিশেষকে পাইব বলিয়া ছুটিয়াছেন তিনিও কল্পনা-কেই পাইবেন। একদিকে শূন্য আর একদিকে কাম। ইহার সমন্বয় যাহা তাহারই নাম সমুচ্চয়বাদ।

দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে একটি জ্ঞানের বা তত্ত্বের দিক আর একটি ভাবের বা প্রেমের দিক দুইটীই সমুচ্চয়বাদ। ভগবদ্গীতার উপ-দেশ শ্রবণের পর অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান যখন দিব্যদৃষ্টি দিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে অর্জ্জুনের যখন সত্যদর্শন ঘটিল তখন তিনি কি দেখিলেন?

গীতা বলিতেছেন,

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥"

সেই সময়ে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন দেখিলেন, জগৎ যাহা আমাদের নিকট দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অনেকভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয় তাহা এক ও অখণ্ড এবং তাহা দেবদেবের শরীরে অবস্থিত। অর্থাৎ

তিনি খণ্ডকে বা বিশেষকে দেখিলেন কিন্তু খণ্ডরূপে বা বিশেষরূপে নহে অখণ্ড ঐক্যের বা ভূমার মধ্যে। ইহারই নাম সম্যক্ দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন এইরূপ যিনি দেখেন তিনিই উত্তম ভক্ত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

শ্রীধরস্বামীর টীকানুযায়ী এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ। যিনি ব্রহ্মভাবের দ্বারায় সকলভূতে নিজের সমন্বয় দেখেন এবং ব্রহ্মরূপ আত্ম-অধিষ্ঠানে সকল ভূতকে দেখেন তিনি উত্তম ভক্ত। শ্রীধরস্বামী আরও সরল করিয়া বুঝাইলেন যে তন্ত্রে আছে "আত্মত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরি" অতএব আত্মা যে হরি তাঁহাকে সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মশকাদিতেও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান ও নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যবানরূপে দেখেনমা দে, তারতম্য দেখেন না। আবার আত্মায় অর্থাৎ হরিতে ভূতসকলকে দেখেন। সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ ভগবত্তা দেখেন।

এই গেল জ্ঞানের দিক। এইবার ভাব বা প্রেমের দিকে আলোচনা করা যাইতেছে। কুন্তীদেবী শ্রীভগবানকে বলিলেন পাণ্ডবগণে ও যাদবগণে এই যে আমার দৃঢ় স্নেহপাশ ইহা ছেদন করিয়া দাও। এই কথা বলিয়াই কুন্তীদেবী ভাবিলেন কৃষ্ণও যে যাদব। তাই বলিলেন

"ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ। তুমি স্নেহপাশ ছিঁড়িতে চাও, তবে কি ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার স্পৃহা জন্মিয়াছে, তবে কি আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ তাহাও ছিন্ন করিতে চাও? কুন্তীদেবী বলিতেছেন না না, হে মধুপতে! তোমাতে আমার অনবচ্ছিন্না প্রীতি নিরন্তর বিদ্যমান থাকুক। এখন তুমি ও তোমার ভক্ত অভিন্ন তাহা আমি জানি, সুতরাং তোমার প্রতি প্রীতি দ্বারা পাণ্ডব ও যাদবগণ যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের প্রতিও প্রীতি সাধিত হইবে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে পূর্ব্বে আমি যাদব ও পাণ্ডবগণকে ভাল বাসিতাম। আমার আত্মীয় ও পুত্র, আমার সহিত তাহাদের দৈহিক সম্বন্ধ আছে এই জন্য তাহাদের ভাল বাসিতাম, এখনও তাহাদের ভালবাসিব কিন্তু এভাবে নহে। এখন ভালবাসিব তাহারা তোমার ভক্ত বলিয়া

অর্থাৎ এতদিন আমি তাহাদের ভাল বাসিতাম বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ভালবাসার মধ্য দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার এই দেহকেই ভাল বাসিতাম. এখনও ভালবাসিব কিন্তু এই ভালবাসার মধ্য দিয়া আমার দেহকে নহে, হে মধুপতে হে আনন্দময় এই ভালবাসার মধ্য দিয়া তোমাকেই ভালবাসিব। হে সর্ব্ব! আমার যাবতীয় প্রেমের মধ্যে তোমার প্রতি আমার যে পরমপ্রেম তাহাই সফল হইবে। আমার প্রীতি তোমাকে ভালবাসাতে কোন প্রতিবন্ধক অনুভব করিবে না। গঙ্গা যেমন সাগরে মিশিয়া যাবতীয় নদনদীর সহিত স্থায়ীভাবে ও সত্য করিয়া মিশিয়া যান সেইরূপ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই জগৎকে, এ জীবনকে একদল লোক ভগবদারাধনার প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেন আর একদল প্রতিবন্ধক মনে করেন না বরং উপায় মনে করেন, এই দ্বিতীয়দল সমুচ্চয়বাদী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশোপনিষদের সমুচ্চয়বাদ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকগুলি আলোচনা করিতেছি।

প্রথম মনু, তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব। তিনি শতরূপার পতি। তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য সস্ত্রীক বনে প্রবেশ করেন। তিনি সুনন্দা নদীর তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শতবৎসর দুশ্চর তপস্যা করিতে বিস্মিতের ন্যায় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যং।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥
যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য নরিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবতঃ॥
ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরোনান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদযস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ॥
স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে॥

অথাগ্রে ঋষয়ঃ কর্ম্মাণীহন্তে কর্ম্মহেতবে।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রয়োঽনীহাং প্রপদ্যতে॥
ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তং॥
তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতং।
নৄণ্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্মসংস্থিতং প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনং

৮ম স্ক-১ম অধ্যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমরা একদিকে যেমন সমুচ্চয়বাদের যাহা আদর্শ তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইব, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত উপাস্যপরমেশ্বরের যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও জানিতে পারিব (The conception of God according to the Bhagabata.)

শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই। চিদাত্মা কর্ত্তৃক বিশ্ব চেতন হয়, বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করে না, কারণ তিনি স্বতঃ চেতন। জীব যখন নিদ্রিত, তখন যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকেন, কি আশ্চর্য্য ইনি (জীব) তাঁহাকে জানেন না, কিন্তু তিনি ইহাকে জানেন। ১

আত্মা বা ঈশ্বরকর্ত্তৃক সত্তা ও চৈতন্যের দ্বারা এই জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভোগ করিবে। অথবা ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া বা ঈশ্বরার্পণরূপ ভোগ করিবে। আপনার নিমিত্ত কাহারই বা ধন আছে যে তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে। ২

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু কোন লোক অথবা কাহারও চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি চক্ষুরাদির অবিষয়। তিনি প্রমাতা কোন প্রমাণ তাঁহাকে সপ্রমাণ করিতে পারে না। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী অসঙ্গ সেই ঈশ্বরেরই ভজনা কর। ৩

তাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির নাই, বিশ্বের আদি অন্ত প্রভৃতি তাঁহা হইতেই হয়, বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ তিনি সত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ৪

সেই ঈশ স্বয়ং, সত্য, স্বপ্রকাশ এবং নির্ব্বিকার, তাঁহার শরীর এই বিশ্ব

তাঁহার নাম বহুতর তিনি আত্মমায়া দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন। অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যাহেতু ঐ মায়াত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ই আছেন। ৫

পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর ঈহমান অর্থাৎ কর্ম্মান্বিত হইয়াও যখন অনীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সেইরূপ ঋষিগণও নৈস্কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করেন। ৬

• অনেকে বলেন যে কর্ম্মবন্ধন। কর্ম্মের দ্বারায় কর্ম্মকারী পুরুষ অবগুণ্ঠিত হইয়া কোষকার কীটের মত বদ্ধ হন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা ভগবান ঈশ্বর চেষ্টা বা কর্ম্ম করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে আশক্ত নহেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবৃত্তি করেন তাঁহারাও আত্মলাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন, আসক্ত হইবেন না। ৭

তাহা হইলে শ্রীভগবান কেমন (ক) নিজবর্ত্ম সংস্থিত—রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা অবতারানুরূপ নিজবর্ত্মে সম্যকরূপে অবস্থিত, (খ) কর্ম্মাচরণ রত (গ) নিরহঙ্কৃত জগৎ সৃষ্ট্যাদি করিয়াও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য (ঘ) বুধ (ঙ) নিরাশী (চ) পূর্ণ (ছ) অন্যকর্ত্তৃক নিযুক্ত নহেন (জ) কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু এই অপরকে শিক্ষা দিতে চাহেন, (ঝ) প্রভূ ঞ) অখিল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ৮

আমাদের উপাস্য শ্রীভগবান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলিলেন, ভগবদ্গীতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। এই জন্য আমরা গীতার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য আরও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গীতা সমুচ্চয়বাদই প্রচার করিয়াছেন, আরও বলা হইয়াছে যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার এই রহস্যটুকু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন যে কেহ কেহ বলেন যে গীতাশাস্ত্রে সকল আশ্রমীর পক্ষেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীগণের জন্য এরূপ কথা বলা হয় নাই। আমরা এস্থলে ইহার বিশেষ আলোচনা করিলাম না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম স্কন্ধের টীকা আলোচনায় মনে হয় শঙ্করাচার্য্য সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করেন। তিনি এই মাত্র বলেন যে যাহার মূলে কাম ও কর্তৃত্বাভিমান নাই, তাহা কর্ম্মই নহে।

ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই রাজর্ষি জনক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহার লক্ষ্য লোকসংগ্রহ। কেবল রাজর্ষি জনক কেন ভগবান নিজেও বিশ্বকল্যাণের

জন্য কর্ম্মরত। গীতায় যাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল সেই অর্জ্জুনও গীতার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেন।

গীতার যাহা আদর্শ আমরা তাহা সহজে এই প্রকারে বুঝিতে পারি। জগতে মানুষ যত বড় হইতেছে তাহার দায়ীত্ব বা ভার তত বাড়িতেছে। অনেকে মনে করে যে যত বড় হইতেছি তত অধিকার বাড়িতেছে, অধিকার বাড়িতেছে ইহা সত্য, কিন্তু অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়িতেছে। যে মানব অধিকারের দিকে যায় সে নিতান্ত প্রাকৃত মানব, নিতান্ত হীন জীবন যাপন করিতেছে। যিনি প্রকৃত মানুষ তিনি এই দায়িত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অধিকার বা উচ্চপদের সহিত যখন দায়িত্ব বাড়িয়া যাইতেছে তখন যাঁহার অসীম অধিকার বা উচ্চতম পদ তাঁহার দায়িত্ব বা ভারও অসীম। ভগবান ঠিক তাহাই তাঁহার দায়িত্বের সীমা নাই। সুতরাং যাঁহাকে ভগবানের পথে চলিতে হইবে তাঁহার দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না। বেশী বেশী দায়িত্বের ভার আনন্দের সহিত বহন করিতে হইবে। এই যে আদর্শ, শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই আদর্শে উন্নীত করিলেন। ইহাই গীতার সাধনা। প্রথমে বলিয়াছিলেন স্বধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া, সাংসারিক কীর্ত্তির প্রতি চাহিয়া যুদ্ধ কর, কিন্তু এই মন্ত্র যখন খাটিল না তখন যাবতীয় তত্ত্বকথা উপদেশ করিয়া এই নিষ্কাম-কর্ম্মের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। অধর্ম্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা নর, আমাদের প্রত্যেকেই সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া এই সংসার-কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি, নারায়ণ আমাদের প্রত্যেকেরই সারথী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। বিশ্বনাথ নিজে বিশ্বসেবার ভার লইয়াছেন, বিশ্বসেবার ভার এড়াইতে যাহারা ব্যস্ত তাহারা বিশ্বনাথের নাম লইবার অধিকারী নহে।

সমুচ্চয়বাদেই লীলাবাদ ও প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ ও খ্রীষ্টধর্ম্ম।

হিন্দুসমাজের মুখপত্র হইতে আজকাল দাবী করেন এমন একখানি মাসিকে কোন হিন্দু "অধিকারী" বিলাতী "টাইমস্" পত্রিকার খৃষ্টান লেখকের যুক্তি বলে ও নিজের বিকৃত ব্যাখার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে রবিবাবু খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত আছেন। এবং লেখক অপূর্ব্ব যুক্তিবলে

ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে "নোবেল কমিটীর কার্ত্তারা যশেরথ-ধূপ বিকাশ দেখিলেই সদ্যঃসদ্যঃ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন, কবির বা কাব্যের বিচার তাঁহারা বড় একটা করেন না।"

সাধারণতঃ ধর্ম্মের দুটী দিক আছে একটী লোকাচারের দিক আর একটী তার সত্যের দিক। এই সত্যের দিকই হচ্ছে নিত্যদিক এবং এই দিক হইতে দেখিলে সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই এক সনাতন সত্যের উপলব্ধি হয়। এই সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যখন পড়ে তখন সে সমস্ত দেশাচার ও লোকাচারের অমর্য্যাদা না করিয়াও তাহার উপরে উঠিতে সক্ষম হয়; তখন সে পরম্পরাগত সংস্কারের মধ্যে থাকায় ধার্ম্মিকতার যে একটা অভিমান আছে সেই অভিমানের মধ্যে নিজেকে তুষ্ট রাখিতে পারে না। হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ত্ত আবেগে বিশ্বজগত তাঁহার নিকট আপন হইয়া উঠে। এক এক যুগে এক এক মহাপুরুষ আসিয়া সেই যুগোচিত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেও খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাহার প্রকৃত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মেও সেইরূপ হইয়াছিল। তাহার প্রকৃত সত্যের দিকে এত দিন পরে দুই এক জনের দৃষ্টি পড়িতেছে

Christianity has been the accepted religion of Europe for something like thirteen centuries, yet the fact is, as we are beginning to realise that at no time during the whole of that long period has the real essense of Christianity, the truths and ideals for which Christ distinctly stood, been so much as perceived by Europe. As a matter of fact, the West is only just attaining the spiritual altitude whence the real nature of Christs teachings can be perceived (W. Wellock M. Review Sep. 1914.) অর্থাৎ প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম য়ুরোপে প্রচারিত হইলেও উহার প্রকৃত সত্য ও আদর্শের প্রতি য়ুরোপের দৃষ্টি সবেমাত্র পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

খৃষ্টানধর্ম্মের এই নব জাগরণের দিনে "men have been tired of the merely intellectual pastime called thinking" বিলাতবাসী চিন্তা নামক মানসীক ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, মনস্তত্ত্ব বা ফিলজফিতে তাহাদের অরুচি ধরিয়াছিল, এই সময়ে বিলাতবাসী শুনিল—

The East had always calmly assumed that wisdom was an altitude of the soul, not an activity of the brain.

প্রাচ্যগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞান ও মনীষাও মেধাপ্রসূত নহে, উহা আত্মার ভাব বিশেষ। এই সিদ্ধান্তটা বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজের ভাল লাগিয়াছিল, তাহারা ভারতের বেদ উপনিষদের পরিচয় গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল।

Thus was Rabindranath Tagore's welcome prepared." এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল।" প্রবুদ্ধ খ্রীষ্টান সমাজ যখন বেদান্ত উপনিষদের পরিচয় পাইতে ব্যস্ত তখন "গীতাঞ্জলির পাদ্যর্ঘে" খৃষ্টান ধর্ম্ম বোঝাই করিয়া লইয়া যাইয়া রবিবাবু নোবেল পুরস্কার বহন করিয়া লইয়া আসিলেন। অপূর্ব্ব যুক্তি!!!

আসল কথা হইতেছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত উপনিষদের বাণী লইয়াই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যকে ভারতবর্ষের বাণীই শুনাইয়াছিলেন। যেখানে ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিতে চায়, ব্যবসায়ীরা চাষাদের ঘৃণা করিয়া দূরে রাখিয়াছে, সেখানে গিয়া ভারতবর্ষের বাণী শুনাইলেন

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ খাট্‌চে বারমাস।"

যেখানে Church খৃষ্টকে দূরে ফেলিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিতেছে। যেখানে প্রত্যেক পাদরী এক একজন খৃষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, সেখানে গিয়া যখন গম্ভীর স্বরে গাহিলেন "তুমি যে আছ এ কথা কবে, জীবন মাঝে সহজ হবে, আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সকল কাজে" "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" তখন পাশ্চাত্যের মস্তকও ভারতবর্ষের কাছে আপনা হইতে নত হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য যে অভ্যর্থনা রবীন্দ্রবাবুকে দিয়াছিল তাহা রবীন্দ্র বাবুকে দিয়াছিল না বলিয়া ভারতবর্ষের বাণীকে দিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষ যে বাণী পাঠাইয়াছিল, তাহা ত লোকাচার বা দেশাচারের বাণী নয় তাহা সত্যের বাণী, তাহা নিত্য। সে বাণীর মধ্যে সকল দেশের সকল সমাজের সত্যই আছে, কারণ তাহা সকল দেশের সকল সমাজের। কোন খৃষ্টান ধর্ম্মের লোক যদি তাহার মধ্যে আপন ধর্ম্মের সত্য দেখিতে পায় তাহা হইলে

ভারতবর্ষ খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না।

প্রবুদ্ধ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় য়ুনিটেরিয়ানরাই (unitarian) রবীন্দ্র বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাহারাই বিলাতবাসী সাধারণের সহিত রবীন্দ্রবাবুর পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভ করিবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে কবির পুস্তকের কোন মূল্য নাই বা নোবেল কমিটীর কর্ত্তারা বিনা বিচারেই পুরস্কার দিয়াছেন এ কথা বলিলে কেবলমাত্র মিথ্যা বলা হয় না, ভারতবর্ষকেও অপমান করা হয় কারণ এই পুস্তক ভারতবর্ষের বাণীকেই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এইবার আমরা লেখকের তর্জ্জমার একটু নমুনা দিব। "টাইমসের লেখক গোড়াতেই বলিতেছেন—

"The appearance of Rabindra nath Tagore in contemporary English letters is a very significant thing. Although the popularity that caught him up in a flame(a popularity unfaillingly registered by the Nobel committee is likely to fade as rapidly as it was aroused,yet it is, inspite of all its depressing accompaniments, a significant response to a new attitude towards life."

অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যুদয় বিশেষ লক্ষের বিষয়—অবধানতার সহিত বিচার করিবার বিষয়। যদিও যে যশের জ্বালামালায় সমুজ্জ্বল হইয়া তিনি লোকলোচনের গোচরীভুত হইয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ অচিরে নির্ব্বাপিত হইতে পারে,—শুষ্ক তালপত্রের অগ্নিজ্বালার মতন উহা যেমন সদ্যঃ সদ্যঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনই সদ্যঃ সদ্যঃ নিভিয়া যাইতে পারে,—তথাপি এই অসুবিধা সত্ত্বেও, সহসা জাত খ্যাতির এই আপাত মনোহর ও পরিণাম বিরস ব্যাপার সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতবাসীর এই অনুরাগ মানবজীবনের প্রতি একটা নবভাবের দ্যোতক বলিলেও বলা যায়।"

"সহসা জাত খ্যাতির এই আপাত মনোহর ও পরিণাম বিরস" বাক্য গুলিতে লেখক মহাশয় কি আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে চাহেন? নতুবা মূলের সহিত ত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। "It is"

আজকাল কি বাংলা ভাষায় "বলিলেও বলা যায়" এইরূপ অনিশ্চিত ভাব প্রকাশ করিতেছে? "তালপত্রে অগ্নিজ্বালার 'সহিত লেখকের গাত্রজ্বালা অনেকটা প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু মূল ইংরাজির ভাব প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এইত গেল তর্জ্জমা, ইহার উপর আবার "মল্লিনাথ" আছে ঃ—

"টাইম্‌সের লেখক একটু চাপা রসিক তিনি লক্ষণার আড়ালে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একটী খ-ধুপ বা হাউইয়ের মতন জ্বলিয়া আকাশে উঠিয়াছেন বটে, ঐ হাউইয়ের মতন অচিরে নিভিয়া যাইবেন। নোবেল কমিটীর কর্ত্তারা যশের খ-ধূপ বিকাশ দেখিলেই সদ্যঃ সদ্যঃ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন, কবির বা কাব্যের বিচার তাহারা বড় একটা করেন না। বিলাতবাসী যে রবীন্দ্রনাথের আদর করিয়াছেন, কেবল রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ হইয়া করেন নাই; মানবজীবনটাকে তাহারা একটা নূতন দিক দিয়া দেখিতে শিখিতেছেন; ভাগ্যবশে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকের পথ বাহিয়া বিলাতে আসিয়া উপস্থিত হন; ফলে রুচি পরিবর্ত্তন জন্য সুখ্যাতির বোঝাটা তাঁহারই ঘাড়ে চাপান হইয়াছে।" কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! বৃদ্ধ বয়সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে এতটা ভিতরে প্রবেশ করা যায়! নোবেল কমিটীর কর্ত্তারা যে বিনা বিচারে পুরস্কার প্রদান করেন এ সত্য লেখক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন কোথা হইতে? নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সমস্ত সাহিত্য পুস্তকই ত আজ পর্য্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। এই নিয়ম কি কেবল তবে বাঙালী কবির জন্যই হইল? নোবেল কমিটীর কর্ত্তারা সাহেব বটে কিন্তু মোসাহের নয় যে একটুখানি পানীয়ের লোভে খোসামুদী স্বরূপ পুরস্কারের বোঝাটা ঘাড়ে চাপিয়ে কবির টেবিলে এসে সবাই জড় হবে। বিলাতবাসীরা সুখ্যাতির বোঝাটা কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের নবাবিষ্কৃত ভাবের পথ বহিয়া রবীন্দ্রবাবু যেমন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন অমনি তাহারা নির্ব্বিচারে বোঝাটা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল! বিলাতবাসীদের নূতন ভাবের পথ বেদান্ত উপনিষদের পথ। সেই পথ বাহিয়া এ পর্য্যন্ত আরও অনেকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু সে সময় বোধ হয় সুখ্যাতির বোঝাটার চাপে তাহাদের ঘাড়ে ব্যথা হয় নাই নতুবা সেটা তাহাদের ঘাড়েই 'পড়িতে পারিত! গুণের আদর যদি না করিল তবে—Rabindra

Nath Tagore is and remains a significant figure" এ কথাটীর অর্থ কি ?

বিলাতবাসীরা সত্যের দিক দিয়া মানবজীবনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সত্যের বাণী বহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের আবরণে খৃষ্টানী মাত্র। রবীন্দ্রনাথ একজন ব্রাহ্ম। অতএব তাঁহার মধ্যে এই খ্রীষ্টানী ভাব। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রবল প্রচার বন্ধ করিবার জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের লোকাচারের মধ্যেও অনেক খ্রীষ্টানী ভাব আছে অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্টানী নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতই হিন্দুধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম এ কথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। রাজা রামমোহনরায়ের সময়ে আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে কতকগুলা "খ্রীষ্টানী ভাব" সমাজে প্রচারিত হওয়া সমাজ রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজা হৃদয় দিয়া যাহা অনুভব করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহা প্রচলিত হিন্দু-সমাজের সহিত সম্পূর্ণ একমত হয় নাই বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ তাহার মধ্যে খ্রীষ্টানীর গন্ধ পাইতেছেন। কিন্তু লোকাচারগুলিই ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষত্ব নয়, এক অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই যাহা একান্ত হিন্দু বেদান্ত প্রতিপাদিত উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান কথা। মন্দিরে উপাসনা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলা বাহ্যিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখিয়া বা ঐ ধর্ম্মমতের কতকগুলি ভণ্ডের কার্য্য দেখিয়া কোন ধর্ম্মের বিচার করা যুক্তি সঙ্গত নয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটী মনোভাবের উপর স্থাপিত আছে ; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। হিন্দুর বেদান্তধর্ম্ম এই তিন ছাড়া আর কি নূতন কথা প্রচার করিবে ? বেশী দিনের কথা নয় চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও এই বাঙলা দেশেই শ্রীচৈতন্য বাঙালীর দ্বারে দ্বারে এই কথা প্রচার করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন যে বেদান্তে এই তিন বার্ত্তাই প্রধান। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের বাক্যের মধ্যে খ্রীষ্টানধর্ম্মের বার্ত্তা পাইয়া ইংরাজ বলিতেছে "Here was one of a Company that turned even more earnestly to Christianity than to the Upanishad, but in the Spirit of the Upanishad. তখন আমাদের লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা গর্ব্বিত হইবার কারণই কি বেশী নয় ? ইহার দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না, যে আমরা আমাদের ধর্ম্মটা

এতদিন পরে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি? রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন ধর্ম্মের বিশেষ সম্পত্তি নয়। তাহা সত্য। যাহা নিত্য সত্য তাহা চিরদিনই সমস্ত সমাজের মনীষীগনের দ্বারা পূজিত। ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে তাহাদের বেদান্ত উপনিষদ নিত্য সত্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক সমাজই তাহাকে তাহাদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া গৌরব করিতে পারে। জাতীয় জীবনের প্রতি, দেশের প্রতি, আপনার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর কোন দেশে, সমাজে বা ধর্ম্মে কোন একটা নূতন সত্য দেখিলেই, তাহাকে আপনার প্রমাণ করিয়া লইতে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পরের কোন দ্রব্য লইয়া কেহ আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া বড় হইতে পারে না। পরের কোন ভাল জিনিষ দেখিলেই তাহাকে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টাই সজীবতার লক্ষণ। আজ সমস্ত খ্রীষ্টান সমাজ যখন প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তখন বিলাতবাসীরা যে উপনিষদের ধর্ম্মকে সুন্দর বলিয়া জানিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা বুঝিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরব অনুভব করা উচিত। ইউরোপে কোন সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যেমন বলিয়া উঠি "ঠিক ভারতবর্ষের মত" অর্থাৎ সতীত্ব বলিয়া জিনিষটা যেন একেবারে ভারতবর্ষেরই জিনিষ আর কোথাও তাহার অনুকরণ ভিন্ন আর কিছু থাকিতে পারে না সেইরূপ খ্রীষ্টান জগত আজ বেদান্তের সত্যের প্রতি নিমেষকাল বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিয়াছে "ঠিক আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম কেবল বেদান্তের ছাপ মারা।" ইহাতে চমকাইয়া উঠিবার মত কিছুই নাই বা সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান হইয়া গেল ভাবিয়া লম্ফঝম্ফের বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। "আপসে বড় অধিকারী" মহাশয় কি মনে করেন যে হিন্দুসমাজের এখনও সেই দিন আছে যে তাহাকে খ্রীষ্টান জুজুর ভয় দেখাইয়া সমস্ত সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন! গলাবাজীর জোরে সমাজের অধিকারী হইয়া যাহারা আজ ধর্ম্মপ্রচারের নামে দেশে ঘোর অধর্ম্মের প্রচার করিয়া সমাজকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন লেখক কি মনে করেন দেশ আজও তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পায় নাই? হিন্দুসমাজের "অধিকারী" মহাশয় খ্রীষ্টান জুজুর ভয় দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ আকর্ষনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেশের লোক পাইয়াছে। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের

লোক নহেন তিনি যে আমাদের দেশের লোক, তিনি যে দেশের গৌরব একথা লোকে বুঝিয়াছে; তাহাকে হীন করিতে যাইলে এখন নিজেরই হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিলাতবাসীরা তাহাকে কিছুদিন পরে হয়ত এত বেশী সম্মান নাও করিতে পারে কারণ সেখানকার সাধারণে তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন না এবং অনেকের দেশাত্মবোধও বিদেশীর প্রতি এই সম্মানদানে আঘাৎ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু ভারতবাসী অন্তত বঙ্গবাসী তাহাকে কখনও অসম্মান করিবে না।

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন-কথা (৩)

আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত হউক বা না হউক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুবর্ত্তীগণের ধর্ম্মান্দোলন বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশের একটি প্রধান ঘটনা। যাহাকে একেবারে খাঁটি দেশী ঘটনা বলা যায় ইহা সেই প্রকারের একটি ঘটনা। অর্থাৎ ইহার প্রভাব বঙ্গ, উৎকল এবং কিয়ৎ-পরিমাণে বিহারের ও পল্লীসমাজে সহস্র সহস্র নহে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর সংসার তাপদগ্ধ হৃদয়ে, সেই চারিশত বর্ষপূর্ব্বের 'শ্রীপ্রেম হেমাচল' শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ও তাঁহার সহচর, পতিতের বন্ধু শ্রীনিত্যানন্দের শান্তিময়ী বাণীর মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত করিতেছে। বিরাম-বিহীন পরিশ্রম এবং অতুলনীয় সরলতা ও দীনতা আশ্রয় করিয়া শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় গ্রামে গ্রামে নাম ও প্রেম বিতরণ করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই কার্য্য কয়েকশত বর্ষ মধ্যে ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধা-রমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের পদাঙ্ক চিহ্নের অনুবর্ত্তী হইয়া এই জনসেবার কার্য্যকে তাহার উদার নিষ্কামতায় উত্তোলন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের কার্য্যের ইহা একদিক। ইহার নাম "নামে রুচি"। আর এক কার্য্য যিনি করিয়াছেন তাঁহার নাম নিত্যানন্দ দাস। এই কার্য্যের নাম "জীবে দয়া"। তিনি এখন স্থূল দেহে নাই, কিন্তু খুব প্রত্যক্ষ ভাবে

আছেন। তৃতীয় কার্য্য যিনি করেন তাঁহার নাম সকলের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলে তিনি লজ্জিতা হইবেন। তাঁহাকে অনেকেই জানেন, যাঁহারা না জানেন শ্রীনবদ্বীপধামে গেলে তাঁহার অবগুণ্ঠন দেখিতে পাইবেন, তাঁহার কার্য্য "বৈষ্ণব সেবন"।

এই তিনটি কার্য্য একটি মহৎ কার্য্যের তিনটি দিক্‌মাত্র, একেবারে অভিন্ন। এই মহৎ কার্য্যের এখনও অঙ্কুরাবস্থা। দেশের ভবিষ্যত যাঁহারা সত্য ভাবেন তাঁহারা যদি এই কার্য্যের সন্ধান না রাখিয়া থাকেন তাহা হইলে "আমরা বাঙ্গালী" ইহা বলিবার তাঁহাদের অধিকার নাই: রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে নব্যবঙ্গ জন্মিয়াছে ইহা না বলিয়া যদি বলা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ইহার জন্ম, এবং রাজার সময় ইহার উপনয়ন, তাহা হইলে কেবল যে সত্য কথা বলা হয় তাহা নহে, আমাদের এই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতি দাঁড়াইবার জন্য একটি দৃঢ় ও প্রশস্ত স্থান পাইতে পারে এবং পূর্ব্বে যাহাকে "খাঁটি দেশী" বলিলাম তাহার সহিত "মেকি দেশী"র যোগসূত্র, যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহা বেশ সহজে জুড়িয়া দেওয়া যায়। দেশ সেই দিকেই চলিয়াছে।

শ্রীল শিশিরকুমার শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ শ্রীল কেদারনাথ প্রভৃতি যে সমস্ত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীর আনন্দ-সংবাদ প্রচারিত হয় শ্রীল রাধারমণ ও তাঁহাদের একজন—One of the Reproclaimers: যাহাকে বৈষ্ণব-সাধারণ (Vaishnava mass) বলা যায়, বাঙ্গালা হিন্দুর শতকরা ৯০ জন যাহার মধ্যে, শ্রীল রাধারমণের যোগ তাহাদের সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার পৈতৃক ব্যবসায়, এবং যাঁহারা সুসাধ্য ব্যবসায়রূপে, বা সুলভে খ্যাতি লাভের প্রত্যাশায় এই পথ লইয়াছেন তাঁহাদের হিসাবের বাহিরে রাখিলাম। কারণ ইহার মধ্যে প্রথম দল চিরদিনই পূজনীয় ও প্রণম্য, তাঁহারাও যথেষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তবে ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে এবং তাঁহাদের উপর এই কার্য্যের প্রধান ভার চিরদিনই ন্যস্ত আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে কেবল হিসাবের নহে সংস্পর্শের বাহিরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীল রাধারমণের কথা, যাহাকে আমরা অহঙ্কার করিয়া সাহিত্যের 'ভদ্রপল্লী' বলি তথায় বিশেষভাবে রক্ষা করা দরকার। দেশ তাহা চাহিতেছে। এ জন্য উপকরণ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টাও হইতেছে। ইহার প্রথম উপকরণ নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের রচনা। তাঁহার রচনার খাতা কয়েকখানি পাওয়া

গিয়াছে। তিনি লিখিয়া ছাপাইব বলিয়া লেখেন নাই, যখন যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন, কাজেই লেখাগুলি শৃঙ্খলা হীন। কখন কালীতে কখন বা পেন্সিলে লিখিয়াছেন। একটি প্রসঙ্গ কিছু দূর কালীতে লেখার পর বোধ হয় কিছুদিন আর সে খাতায় লেখেন নাই। ঠিক তাহার পরে পেন্সিলে অন্য এক প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। আবার অনেক সময়ে তিনি হয়ত অসংলগ্ন কাগজে লিখিয়া অন্যকে দিয়া খাতায় নকল করাইয়াছেন। সুতরাং এই লেখায় সকল স্থানে প্রসঙ্গসমাপ্তি বা সংলগ্নতা আশা করা যায় না। ভাদ্র মাসের কাগজে যেটুকু বাহির করা হইয়াছে তাহার এক স্থলে (২৯১ পৃষ্ঠার প্রথমে) আনন্দচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারই কি তোমাদের ভগবানকে ভোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য?" এই প্রশ্নের উত্তরে নবদ্বীপ যাহা বলিলেন তাহা এই প্রশ্নের উত্তর নহে। যাহা হউক খাতার অন্য স্থানে এই প্রশ্নের যাহা উত্তর তাহা রহিয়াছে। খাতার এই দুই স্থানই কালিতে লিখিত মধ্যের পাতাগুলি পেন্সিলে। এবারে আমরা ঐ প্রশ্নের উত্তর টুকুই প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্ন হইয়াছে নবদ্বীপ দাস কে, এবং রাধারমণ জীবন কথায় তাঁহার প্রসঙ্গই বা কেন? নবদ্বীপ দাস সম্বন্ধে আমরা এই টুকু মাত্র জানি যে তিনি শ্রীশ্রীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার আদিবাস শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল। তিনি ধর্ম্মহীন বড় লোক এবং কুক্রিয়াসক্ত লোকের নিকট যাইতেন, প্রথমে তাহাদের চিত্ত কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি বাবাজী মহাশয়ের নিকট তাহাদের লইয়া আসিতেন। এই প্রকারে কত লোকের যে তিনি মতি ফিরাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। বাবাজী মহাশয়ের তিরো-ভাবের পূর্ব্বেই নবদ্বীপ দাস অপ্রকট হন, বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন "আমার ডান হাত গেল"।

আনন্দচন্দ্র মিত্র কটকে ওকালতি করিতেন। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন ও ঘোরতর সংসারী ছিলেন। নবদ্বীপ দাসের কৃপায় শেষ জীবনে ভগবদ প্রেমাস্বাদন করিতে করিতে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার কথপোকথনে শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর উদার মতের পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং বাবাজীর আদেশে নবদ্বীপ দাস যে কি উপায়ে বিষয়াসক্ত সংসারীদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেন তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

নব—কৃতজ্ঞতা স্বীকার ছাড়া আর আমাদের উপায় কি? আমার যেন

বোধ হয় কৃতজ্ঞতাটাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। মানুষ যখন প্রকৃত মানুষ হয় তখনি কৃতজ্ঞ হ'তে পারে। আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানুষকে প্রকৃত কৃতজ্ঞ হ'তে শেখায়। আমি প্রকৃত কৃতজ্ঞ হ'তে পারি নাই, হ'বার চেষ্টা কর্চ্চি। গুরু কৃপায় যেদিন তা হ'ব সেই দিন আমার মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে।

আন—কৃতজ্ঞ হওয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এ যে নূতন কথা ব'লে বোধ হয়।

ন—নূতন কথা কেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় সমস্ত উপাসনা প্রণালী মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দিচ্চে। হিন্দুর উপাসনা, খৃষ্টানের প্রার্থনা, মুসলমানের নমাজ সকলই কৃতজ্ঞতা-স্বীকার। মানুষ যেদিন মানুষ হয়, মানুষের যেদিন সকল বৃত্তি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেদিন মানুষ আপনাকে বোঝে আপনার ক্ষুদ্রত্ব বোঝে, তার অহঙ্কার চূর্ণ হয়, সে আকুল প্রাণে বিশ্বনিয়ন্তার চরণে আপনাকে সমর্পণ কোরে কৃতজ্ঞ হয়ে পরিত্রাণ পায় বা মুক্ত হয়।

আ—যে তোমার বিশ্বনিয়ন্তাকে স্বীকার করে না সে কার কাছে কৃতজ্ঞ হবে?

ন—তুমি ভগবান স্বীকার না করতে পার, কিন্তু বোধ হয় কারো নিকট উপকার প্রাপ্ত হ'লে সে উপকার অস্বীকার কর না।

আ—না তা কেন করব?

ন—তোমার চারিদিক একবার চেয়ে দেখ দেখি এ বিশ্বসংসারে কার কাছ থেকে তুমি নিরন্তর তোমার জীবনে উপকার পাচ্ছ না? চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা কি তোমার জীবন যাত্রার সহায় নয়? এত প্রত্যক্ষ এদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়?

আ—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, অগ্নি মৃত্তিকা এদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থ কি?

নব—কৃতজ্ঞতার অর্থ কি?

আন—উপকার স্বীকার।

নব—কেবলই কি স্বীকার মাত্র, আর কিছু নয়?

আন—আবার কি।

নব—এক সময়ে একজন খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছিল। তুমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলে, তাহার পর সে খুব বড়লোক হল। এমন সময়ে একদিন তুমি তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে। দরজায় দ্বারোয়ান তোমায়

ঢুকতে দিল না। তুমি কোন গতিকে তার কাছে খবর দিলে যে তুমি এসেছ, সে শুনে বলে পাঠালে যে হাঁ আমি বুঝেছি সে বেটা আমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, তা তাকে বল আমার এখন তার সঙ্গে দেখা করবার সময় নাই। এ তো স্বীকার করলে যে তুমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ কিন্তু একে কি তুমি কৃতজ্ঞতা বল?

আন—উপকারের প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতা।

নব—তুমি তো কোন উপকার প্রার্থী হয়ে তার কাছে যাও নাই। তুমি দেখ্তে গেছ যে যাকে তুমি কত কষ্ট করে মানুষ করেছ সে এখন কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তার এই সুখটুকু দেখাই তোমার উদ্দেশ্য ও আনন্দ।

আন—তবে কৃতজ্ঞতা কাকে বলেন?

নব—উপকার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্বীকার না হ'লে কৃতজ্ঞতা হয় না।

আন—চন্দ্র, সূর্য্য, জল ও বায়ু এদের কাছে কৃতজ্ঞ হব কি করে?

নব—এদের কাছে তুমি উপকৃত এটা বোঝ বা স্বীকার কর?

আন—হাঁ, তা স্বীকার করি বই কি।

নব—তা যদি স্বীকার কর তা হ'লে এদের নিকট কৃতজ্ঞ কি করে হতে হবে তা আমাদের বেদে দেখিয়ে গিয়াছে। কিন্তু এখন সেই বেদকে কোন কোন মহাত্মা চাষার গান বলে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তা এদের দোষ নয় এ ভারতের অদৃষ্টের দোষ।

আন—তুমি মুড়ি খাবে না?

নব—হাঁ খাব বই কি......বলিয়া নবদ্বীপ দাস আনন্দ চিত্তে মুড়ির পাত্রটী লইয়া খাইতে লাগিলেন। দুই চারি মুঠা খাইয়া নিজের চাদরে মুড়িগুলি ঢালিয়া লইয়া "আজ যাই" বলিয়াই উঠিলেন। আনন্দচন্দ্র উঠিয়া বলিলেন আবার কবে আসিবেন? আমার সব কথা পরিষ্কার হল না।

(ক্রমশঃ)

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

আমরা বিগত বর্ষ 'বীরভূমি'তে (৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ৬৯২ পৃঃ) এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া প্রাচীন মহাজন বিরচিত অপ্রকাশিত পদাবলী প্রচার করিবার সূচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অদ্বিতীয় প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস কৃত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত করিলাম।

এ যাবৎ চণ্ডীদাস কবির যতগুলি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অনেক গুলি পদ এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুথির মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত কেবলমাত্র চণ্ডীদাস কবির পদাবলীর সংগ্রহ গ্রন্থ আমরা পাঁচ ছয় খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌতুকের কথা, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থখানি, (অনুমান তিন শত বৎসরের প্রাচীন) বীরভূমের সন্নিকট লম্বোদরপুর গ্রামের এক রজক বাটীতে সংগৃহীত হইয়াছে। অপর পুঁথিগুলি বীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয় পুঁথিগুলি খণ্ডিত, সমগ্র প্রাপ্ত হই নাই। ২২৫নং পুঁথিতে ?৪টি, ১০৯৮ নং পুঁথিতে ১৬টি, ১০৬৬ নং পুঁথিতে ১২১টি, ১৫ নং পুঁথিতে ২টি, ১০১২ নং পুঁথিতে ১টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডীদাস কবির বহু সংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ পদাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধারণে অচিরে প্রকাশিত হইবে। এই পদাবলীগুলি তদতিরিক্ত হইলে সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

চণ্ডীদাস কবির বিস্তৃত জীবনী, ৩য় বর্ষ "বীরভূমিতে (পৃঃ ৩৮৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

['রতন'-লাইব্রেরী পুঁথি নং ১০৬৬-অন্যূন তিনশত বৎসরেরপ্রাচীন
পুঁথি—প্রাপ্তিস্থান—রজকবাটী, লম্বোদরপুর-বীরভূম]

(১)

"অথ প্রিয়াণাং পূর্ব্বরাগঃ"

শ্যামের কিরণ শরন হিরণ
ছটার কিবা সে ছবি।
হেন মনে হয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি যাঞা ধাকৃ ॥ধ্রুঃ
তরুণ মুরলি করিলে পাগলি
রহিতে নারিনু ঘরে।
সভার বলিয়া বিদায় হইয়া
নাম কি করিবে গো অব পরে ॥
ধরম করম দুরে তেয়াগিনু
মনেতে লাগিল যে।
চণ্ডীদাসেতে ভণে আপন পরাণে
বুঝিয়া করিবে যে ॥ ৯।২১

(২)

"কলহান্তরিতা"

সই, কি আর বলিব লোকেরে।
অনেক পুণ্য ফলে সে হেন বন্ধুয়া
আনি মিলায়ল মোরে ॥
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলাম ঘাটে।
আগিনার জলে বন্ধুয়া তিতিলে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

নহি স্বতন্তর　　গুরু জনার ডর
বিলম্বে বাহির হইনু।
আহা মরি মরি　　সঙ্কেত করিয়া
কতবা যন্ত্রণা দিনু॥
বন্ধুর পিরিতি　　আদর দেখিয়া
মোর মন যেবা করে।
কলঙ্কের ডালি　　মাথায় করিয়া
আনল ভেজাব ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ আমার দুঃখের দুঃখী
চণ্ডীদাসে কয়　　কানুর পিরীতি
শুনিয়া জগত সুখী॥　২।৩৬

(৩)

অথ দান। বড়ারি॥

নিসেদ নীলজ্ঞ বনমালি।
রাখালে কি ভেটে চন্দ্রাবলী॥
হেম ঘট দেখিয়া পাথারে।
সে রাধার মন সাত পাঁচ করে॥
মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥
সাপের মাথা ফণি জ্বলে।
বড়ু করে বাশুলী বরে॥　১।৪১

(৪)

"অথ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা"

সুজনে কুজনে　　যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তরের বেদন　　যে জন জানয়
সকল বাঁটিয়া দি॥
সই, কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিঞা　　সকলি ছাড়িলাম
সে কেনে বাসএ পর॥ ধ্রু

কানুর পীরিতি　　কহিতে কহিতে
পাঁজর ধসিয়া পুড়িয়া মুখ।
বিচার করিয়া　　যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাসে কয়　　শুনলো সুন্দরি
একথা বুঝিবে পাছে।
পরাণ বন্ধু সনে　　পীরিতি করিঞা
কেবা কোথা ভাল আছে॥৯।১০৭

(৫)

"অথ অনুরাগ"

উথাসে রোপিল　　গাছ সে হইল
......সময়।
কানুর পিরীতি　　বাহিরে সরল
অন্তরে গরলময়॥
সই, কেন মিঠ সে ইক্ষুর গুড়।
পরের বচনে　　রাখিনু বদনে
খাইনু আপন মুড়॥ ধ্রু
চাহিতে চাহিতে　　লাগিল জিভাতে
পহিলে লাগল মিঠ।
মোদক আনিয়া　　ভিয়ান করিয়া
তবে সে লাগল মিঠ॥
মসলা আনিনু　　আগুনে চড়ানু
বিসরি আপন ভাব।
চণ্ডীদাসের হিয়া　　পিরীতি করিয়া
কেবা কোথা পায় যশ॥ ৪৭।৮৭

(৬)

বলে বালা বলে কেন গৃহ গুরু জন।
ছাড়িতে নারিব আমি শ্যাম চিকন
ধন॥

সেরূপ লাবণ্য মোর হিয়ায় লাগিয়াছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটিয়া যায় পাছে ॥
সেই এত ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতনে থাকি নাহি জাগি দিবা
নিশি ॥
আলসে আইসে যদি দুটি আঁখি।
শয়ন করিয়া থাকি গো একাকী ॥
এমন পিয়ারে ছাড়িতে যেবা বলে।
তোমরা বলিলে তবে খাইব গরলে ॥
কালারূপে নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
যে বলে বলুক লোকে সকল গোকুলে ॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি নীর নিরবহি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাই এমতি চাই বটে।
সুজনে পিরীতি হইলে কভু নাহি টুটে ॥
৩২।৭৮

(৭)

সজনি আলো মোর সই।
তিলেক দাড়াঞা শুনিয়া যাও
শ্যামের বাঁশরী দুখ কই ॥ ধ্রু
কানুর বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সববস হরি নৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পাগলি
কেন বা এমন কৈল ॥
এমতি ব্যাভার না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন বা বধিলে
বেকত করিলে কেনে ॥
দোষ পরিহর বাঁশীটি সুস্বর
সো হয় তাহার দাসী।

চণ্ডীদাসের ভনে সন্দেহ মোর মনে
কালার সরবস বাঁশী ॥ ৩৪।৭৫
[খণ্ডিত পুঁথি প্রাপ্তি স্থান ঐ]

(৮)

বসিয়া যগতিপুরে, পড়ুয়া পড়ন পুড়ে
হেন কালে এক, রসের নায়র,
দরশন দিল মোরে ॥
সে যে চাহিল আমার পানে ;
তায় হানিল মদন বানে,
সেই হৈতে মন, করে উচাটন,
ধৈরজ না মানে প্রাণে ॥
সে রসের পুতলি বালা,
তায় মদন মোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে,
করএ বিবিধ খেলা ॥
পাপ ভয় করি মনে,
তারে ছাড়িতে চাহিয়ে মেনে।
বাড়িল মদন, করিল রমণ,
আপন রমণি সনে ॥
সে জগত জননী উমা
রাখিতে নারিল আমা।
দেখিঞা সে রূপ, নবীন পিরীতি,
জাতি কুলে দিল সীমা ॥
যত মনে করি বাধা
তবু রজক রমণী সাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, নবীন পিরীতে,
জীয়ন্তে হইলাম মরা ॥

(৯)

তার পর দিনে দেবি আরাধনে
বসিলাম যতন করি।

অয়িশুভ দিনে দেবী পরসন্ন
আঙ্গিনায় পেখনু গোরী॥
হরে মন চলি গেল কেন।
দখিঞা সে রূপ নবীন পিরীতি স্মরণ
স্মর লইলা যেন॥
শুন শুন দেবী তোমা আনি সেবি
বিফল হইল মোর।
পুণ্য ধর্ম্ম গেল মোক্ষাদি সকল
চরণ না প্যালাম তোর॥
দেবী কহে পুন শুনহ বচন
বিরোধ না বাস তুমি।
বহু ভাগ্যের উদয়ে স্বভাব যোগ বলে
জানি আমি॥
জনম সফল জরা মৃত্যু গেল
ঘুচিল যতেক দায়।
হরি হর ব্রহ্মা ...দিক কথা
ধেয়ানে নাহিক পায়॥
পিরীতি রতনে করিবে যতন
আমার বচন মানি
ভয় শুদ্ধরতি স্বরূপেতে স্থিতি
প্রেম অনুসারি গুনি॥
ইহা বৈ আর নাহি সারাধার
জানিবে জগত মাঝে।
আমি হেন কত দেব দেবী গেলে
কে করে তোমার কাজে॥
চণ্ডীদাসে কয় এই সত্য হয়
স্বভাব স্বরূপ দেহা।
বাশুলি বচনে সত্য জানি মনে
ধোবিনী সঙ্গতি নেহা॥

(১০)

দুরতি দুর সে প্রেমরতি পুসে
এক......রস ভঙ্গ।
এমতি যানিঞা রসিক দেখিঞা
করিবে সে নারি সঙ্গ॥
রসিক জানত রসের চাতুরী
সেই সে তাহার সোণায় সোহাগা যেন।
রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি
মিশাইঞা আছে তেল॥
না দেখিতে মরি দেখিলে কি করি
হিয়ায় হিয়ায় থব।
আপনা বেচিঞা তাহারে কিনিব
লোকাপেক্ষা নাহি নিব॥
লোক কুবচন গুরুর গঞ্জন
......মানিলাম বিষে।
চণ্ডীদাসে বলে গোপত না হলে
পরকীয়া হবে কিসে॥

(১১)

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাবে রাখিবে
একথা কহিতে ভয়॥
অনলেতে ঘৃত যদি হয় স্থিত
তাহার তুলনা সেই।
ক্রোট্যে কোন জন আছএ এমন
যাজন করেছে সেই॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইঞা পুরুষ আচরে
করিবে সে নারির সঙ্গ॥

উলটাঞা রতি অতি বিপরীতি
প্রেমরতি অতি লয়।
চণ্ডীদাসে কয় দেহ রতি নয়
বিন্দুপাত নাহি হয় ॥

(১২)

কামের স্বরূপ নাহিক ইহাতে
রাগের স্বরূপে রয়।
একান্ত করিয়া প্রকৃতি হইঞা
মানুষ জন্মাবেশ হয় ॥
নিষ্কাম হইয়া রাধারতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহরতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥
রাগের সাধন প্রেম রতি গুণ
দেহরতি নাহি রবে।
পুন ইহা হঞে অন্য অন্য মনে
তবে সে নাহিক পাবে ॥
চৈত্র রূপার নিগূঢ় করণ
এই সে কহিলাম সার।
চণ্ডীদাসে কয় কামানুগা নয়
যেন সে করাত ধার ॥

(১৩)

মেঘের বিদ্যুৎ চান্দের উদিত
বাম করে যেবা ধরে।
তোমার আমার রসের চাতুরী
আভাষে বুঝিতে পারে ॥
আভাষ বুঝিলে সর্ব্বজলনিধি
বৎসপদ হইল পার ॥
মানুষ মুরতি হিঙ্গোল আকৃতি
অরুণ বরণ আঁখি।
দাড়িম্ব কুসুম বরণ সুষম
যেন সৌদামিনী পাখী ॥
জবাতর পাখী জবাপুষ্পে থাকি
ভিন্নভেদ নাহি হয়।
একটি করএ গমনাগমন
সাধন নাহিক পায় ॥
রক্তপদ্ম পর রক্তবর্ণ ঘর
রক্তবর্ণ পঞ্চসখী।

* * *

হিঙ্গোল রাগের মানুষ ভজন
হিঙ্গোল স্থানের সেবা।
কিবা নরনারী গন্ধর্ব্ব কিন্নরী
কিবা দেবী আর দেবা ॥
কিবা মৃগ পাখী কিবা বৃক্ষ ঝাকি
কিবা কীট জলচর।
হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হলে
হিঙ্গোল বরণ তার ॥
হিঙ্গোল রাগেতে কহে চণ্ডীদাস
হিঙ্গোল পাখীর ঠাই।
হিঙ্গোল রাগেতে যে জনা ভজিবে
সে জনা মানুষ পাই ॥

অপর একখানি চণ্ডীদাস পদাবলীর খণ্ডিত পুঁথিতে 'চৌদ্দভুবনে ভুবন তিন' ইত্যাদি পদটির টীকায় কয়েক স্থলে ব্যাখ্যা লিখিত আছে। পাঠক বর্গের নিকট ব্যাখা সমেত সেই পদটির এই স্থলে একটি অনুলিপি প্রদত্ত হইল—

(১৪)

চৌদ্দভুবনে ভুবন তিন।
সপ্তম আখর তাহাতে চিন ॥২
দুইটি আখর সদত স্থিতি।
তিনিটি পরসে উপজে রতি ॥৪
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটি আখর পাঁচের পর ॥৬
কনক আসন আছয়ে তাথে।
মনসিজ রাজ বৈসয়ে তাতে ॥৮
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে ॥১০
তাপিত জন সে আনন্দ পায়।
শীতভীত জন দূরে পলায় ॥১২
পঞ্চরস আদি একত্র মিলি।
যে যার স্বভাবে আনন্দ কেলি ॥১৫
অষ্টম আখর করয়ে যবে।
কনক আসন জানিবে তবে ॥১৬
পঞ্চরস আদি অনুবাদ হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥১৮

টীকা ১২ ভুবন তিন—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল; সপ্ত আখর—স্বকীয়া পরকীয়া; ৩-৪ দুইটি আখর—প্রেম; তিনটি পীরিতি; ৫-৬ নির্জ্জনকানন—ভক্তহৃদয় মন্দির; দুইটি আখর—পদ্ম; পাঁচের পর—পঞ্চমন ৭-৮ কনক আসন—পদ্মের ডাঁটা; মনসিজরাজ—পরমাত্মা ৯-১০ শীতল—পদ্ম আসন শীতল। ১৪-১৬ অষ্টমআখর—প্রেম, ভাব, রস, রতি।

রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে বীরভূমবাসী ৮ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৮ জাউলাল মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের প্রতিপাদিত অর্থ যথাক্রমে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

(ক) চৌদ্দভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল; ভুবন তিন—ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা; সপ্ত আখর—রাধারমণ কুঞ্জ; দুইটি আখর—রাধা; তিনটি আখর রমণ, নির্জ্জন কানন ইত্যাদি—রাধারমণ পরে কুঞ্জ; অষ্টম আখর—'স্থ' অর্থাৎ 'রাধারমণ কুঞ্জস্থ'

(খ) চৌদ্দ ভুবন—সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল,—ভুলোক ভুবর্লোক; স্বর্লোক, মহল্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, এই, সপ্তস্বর্গ; অতল চিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল ভুবন তিন গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন; মনসিজরাজ অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এইরূপ ভাবের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

চতুর্দ্দশ ভুবন—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় যথা—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ওচারি অন্তরেন্দ্রিয়; ভুবন তিন—ভাব, কান্তি ও বিলাস; দুইটি আখর—ভাব; তিনটি আখর—বিলাস, নির্জ্জন কানন ইত্যাদি-

পঞ্চভূত আত্মার পর, বা কান্তি ও বিলাসের পর দুটি আখর "ভাব"; কনক আসন—ষটচক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্ন বেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহ বিরাজ করেন; পঞ্চরস—শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; অষ্টম আখর —"জ্ঞ" ভাব কান্তি ও বিলাস এর পর 'জ্ঞ' অর্থাৎ ভাব কান্তি বিলাসজ্ঞ পঞ্চরস ইত্যাদি মধুর বা শৃঙ্গার রসই সর্ব্ব প্রধান রস।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

করুণা।

ধূলার মাঝারে রচি' দীন শয্যাখানি
আমি ত ঘুমায়েছিনু, জীর্ণচীর টানি
অলস দেহের' পরে। কোন্ শুভক্ষণে
তুমি আসি দাঁড়াইলে প্রশান্ত আননে
মহিমামণ্ডিতমূর্ত্তি, সর্ব্বগ্লানিহরা,
নির্ম্মল নয়ন দুটী করুণায় ভরা,
পবিত্র সুন্দর বেশে। শান্ত স্নিগ্ধ করে
মুছে দিলে ধূলিচিহ্ন, মন্ত্র দিলে পড়ে,
শিখালে সেবার ব্রত; তাই দেব আজি,
আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠে উঠিয়াছে বাজি
তোমারি স্নেহের গান! হে গুরু আমার!
তুমি ঘুচায়েছ মোর লজ্জা দীনতার,
তাই আজি স্পর্দ্ধা মোর; তাই বারে বারে
ক্ষুদ্র পূজা লয়ে আসি মন্দিরের দ্বারে
যুড়িয়া অঞ্জলি।
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা
কণ্ঠে ভরি' উঠে মোর বসিয়া একেলা
হেন গীত, হেন বাণী, যার শোভা হাসি
কিছুদিন সকরুণ বেড়াইবে ভাসি,
নয়নে আনিবে জল; নির্ম্মল প্রভাতে
জ্যোৎস্নামাখা রজনীর বিদায়ের সাথে
যদি কভু গেঁথে আনি হেন মালাগাছি
সুরভি কুসুমে, গন্ধ যার রবে বাঁচি
প্রভাত সমীরে, হে গুরু আমার!
সেত গো তোমারি দয়া, করুণা তোমার।

শ্রীগিরিজাভূষণ দেচৌধুরী।

বীরভূমি ।

যথন ভারত শৈলশিয়রে প্রথম জাগিল দীপ্ত রবি,
তথনও কি তুমি ছিলে বীরমাতা শত বীরশিশু বক্ষে লভি ?
যথন ভারত-গৌরবগিরি অম্বর চুমি শুভ্র শির,
তুমি কি তথনও রত্নমুকুটা বক্ষে ধরিয়া লক্ষ বীর ?
ভারতপুত্র ক্ষত্র যথন চমকিল ধরা বীর্য্যে তার,
তথন তোমার বীরপদভরে কম্পিত ছিল শক্তি কার ?
নাচিল যথন ভারত সাগর বীরের রক্তে রক্তময়,
ছিল কি তথন অজয় প্রান্তে রুধির কীর্ত্তি চিহ্নচয় ?
শোণিত বহ্নি মসীতে এ নামে লিখিলে কখন কীর্ত্তি তব,
আজিও গর্ব্বে ভাতিছে ললাটে গৌরবময় নিত্য নব ?

রক্তনদীর উপকূলে কবে কে রাখিয়া দিল ভক্তি মূল,
ফুল্ল ফুলের কাননে কুঞ্জে ভরিয়া উঠিল পুণ্য কূল ?
নীরবে বসিল সে মহাতীর্থে যোগানুরক্ত ভক্তচয়,
সাধন তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রকাশিল পথ মুক্তিময় ;
কোমল গভীর শতেক কণ্ঠে গাহিল উচ্চে সত্য নাম,
দ্বিশত পদ্মহস্ত উঠিয়া পরশিল দূরে দিব্য ধাম ;
অযুত আত্মা আসিল ছুটিয়া গাহিতে তাদের মোক্ষ গান,
লক্ষ চরণ পুলকে নাচিয়া তুলিল তাদের হর্ষ তান ;
ভক্ত বীরের ভক্তিতে কবে লিখিলে এনামে কীর্ত্তি তব,
আজিও গর্ব্বে ভাতিছে ললাটে গৌরবময় নিত্যনব ?

কে ভাসায়ে দিল ভক্তি-কানন পাগল প্রেমের বন্যাঘায় ?
ভাসিয়া চলিল শতেক আকুল-মুগ্ধ বিভোর আত্মা তায় ;
কোন অসীমের আশায় ছুটিল লভিবারে কোন সিন্ধুকোল,
লক্ষ্য বিহীন উদাস সকলে তুলিল কি এক স্তব্ধ রোল ;

কত গতিহীন পল্বলবারি মিশায়ে প্রেমের গঙ্গাধারে,
আসিয়া পড়িল কোন আশাতীত অন্ত বিহীন শান্ত পারে ;
শান্তি লভিল শীতল সলিলে কত পাপতাপদগ্ধ মন,
আত্মহারা সে মিলন সাগরে পুলকে ভাসিল বিশ্বজন ;
প্রেম সাগরের অমৃতে কবে লিখিলে এ নামে কীর্ত্তিতব,
আজিও গর্ব্বে ভাতিছে ললাটে গৌরবময় নিত্য নব ?

কে শুথায়ে দিল সুধার সাগর, কে করিয়া দিল ভস্ম সব ?
শুষ্ক প্রেমের তটিনীর কূলে কে জাগায়ে দিল আর্ত্তরব ;
কোন সমাধিতে মিশায়ে ে ল সে ক্ষত্রবীরের রক্তধার,
ফুটিবে না কি সে কানন কুঞ্জে ভক্তি কুসুম ফুল্ল আর ?
সাধক কোথায় ? ভক্ত কোথায় ? শুধু নিমেষের স্বপ্ন এ কি ?
শুষ্ক সকলি, নীরব সকলি কেবল শ্মশান ভস্ম দেখি !
কোথা তাপসের সাধনকুঞ্জ কোথা দেবালয় পুণ্যময় ?
কোন অতীতের গুপ্ত গহ্বরে পলকে সকলি লুপ্ত হয় ?
শ্মশান ভস্মে জননি ! কখন লিখিবে এ নামে কীর্ত্তি তব,
আবার কখন ভাতিবে গর্ব্বে গৌরবময় নিত্যনব ?

ভোলানাথ সেন ।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব । (৪)

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ
ক্ষতজপরিপ্লুত অততায়িনো মে ।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥

আমায় বধিতে হাস্য-মুখে যে সময়,
সমাগত হইলেন হরি দয়াময় ;

সে সময় সুশাণিত, মোর তীক্ষ্ণ শরাহত,
বিধ্বস্ত-কবচ তাঁর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
শ্যামকায়ে রক্ত-ধারা ঝরে ঝর ঝর॥

স্বহস্তে বধিতে মোরে, অগ্রসর ক্রোধভরে,
সে মূর্ত্তি তোমার হরি করি দরশন
অপার আনন্দে আমি হইনু মগন॥

দেখিয়া সে কার্য্য তব, সাধারণ জন সব,
অর্জ্জুনের পক্ষপাতী ভাবিল তোমারে,
আমি বুঝিলাম কৃপা আমারি উপরে॥

কুরুক্ষেত্র মহারণে, দেখিলাম এ নয়নে,
হে মুকুন্দ, যে অপূর্ব্ব তোমার মূরতি,
সে মূর্ত্তি হউক মোর চিরন্তন গতি।
যুগে যুগে নরকুল ভাবি সে প্রকাশ
লভিবে চরণ তব ওহে শ্রীনিবাস॥

মানবে সংগ্রাম করে, হত হয় পরস্পরে,
রক্তে কলুষিত করে আনন্দের ধাম,
ক্ষুদ্র স্বার্থ লালসায় পূর্ণ তার প্রাণ।

মানুষ তোমায় ভুলে, হিংসার আগুণ জ্বেলে,
তোমার প্রেমের বিধি করয়ে লঙ্ঘন,
তুমি কিন্তু অকরুণ নহ কদাচন॥

মানবের প্রতি তবু, উদাসীন নহ কভু,
সমরেতে হও তুমি সত্যের সহায়,
যুদ্ধ ক্লেশ সহ্য কর প্রসন্ন হিয়ায়।

মানুষ মানুষ' পরে, তীক্ষ্ণ অস্ত্রপাত করে,
বহায় রক্তের গঙ্গা মানুষের দেহে,
জানেনা এ অস্ত্র-জ্বালা কোন্ জন সহে॥

মানুষের অত্যাচার, নিজ দেহে অনিবার,
সহ্য কর তুমি হরি প্রসন্ন অন্তরে,
তবু নিত্য কৃপা কর মানব নিকরে।
মানব সৃজন করে যথা হলাহল
সে যুদ্ধ-স্থলেও তুমি ভকতবৎসল ॥

হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী।

(প্রতিবাদ)

ইউরোপের যুদ্ধ ও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী।

গত আশ্বিনের "প্রবাসীতে" শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু-সমাজেব বাণী",—এই গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার দূরদর্শিতার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইয়াছি। কেননা শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন যে চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে, এই প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী, দুর্ভাগ্য বশতঃ ইউরোপে আজ কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে, সম্পাদক মহাশয়, যে মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধের অনুকূল নহে, প্রতিকূল। হিন্দু-সমাজের যে ছবি, প্রবন্ধ-লেথক আঁকিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অস্বীকার না করিলেও,—সন্দেহ করিয়াছেন। প্রবন্ধের আলোচ্য অনেকগুলি মতের এক দেশদর্শিতাও মন্তব্যে বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধ লেথক বলেন পাশ্চাত্য দেশে এখন হিন্দু-সমাজের আদর্শ ও গঠন প্রণালীকে অনুসরণ করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। সম্পাদক মহাশয় বলেন, ইহা ভ্রম! হিন্দুর "বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদের কাছে ঘেঁসা দূরে থাক, যে যে দেশে জন্ম বা

বংশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ছিল, আভিজাত্য ছিল, তাহা হইতে সেরূপ বিভাগ ও আভিজাত্য উঠিয়া যাইতেছে।" প্রবন্ধ লেখক বলেন,—ইউরোপে "অর্থ আছে ভোগবিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব, মঙ্গল।" সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"এ কথা স্বীকার করা যায় না।" ভোগ ইউরোপও যেমন করিতে চায়, আধুনিক হিন্দুও তেমনি চায়; তবে শক্তিমান ইউরোপ ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারে; অক্ষম হিন্দু পারে না। পার্থক্য বাসনায় নহে, শক্তিতে। প্রবন্ধ লেখক বলেন প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রতিযোগীতা সমগ্র সমাজব্যাপী ছিল না, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী; অন্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগীতা ছিল না।" সম্পাদক মহাশয় একেবারে মনুসংহিতা খুলিয়া দেখাইতেছেন যে ব্রাহ্মণেরা তখন মাংসবিক্রেতা সুদজীবী তৈলবিক্রেতা,—শূদ্রের ভৃত্য এমন কি জুয়ার আডডাধারীরও প্রতিযোগীতা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

কাল পিয়ার্সনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ লেখক হিন্দু সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics) সম্বন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্পাদক মহাশয় উক্ত কার্লপিয়ার্সনকেই সাক্ষী করিয়া ঠিক তাহার উল্টা সিদ্ধান্তে আসিবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক "বর্ণ ধর্ম্মের ভিত্তি অধিকার ভেদ" ঘোষণা করিয়া শেষে বলিতেছেন "জন্মিবা মাত্র কোন্ শিশুর কিরূপ গুণ হইবে, তাহা আমরা জানি।" সম্পাদক মহাশয় বলেন, মানুষের পক্ষে এরূপ স্পর্দ্ধা আস্পর্দ্ধা মাত্র। "জন্মগত শ্রেণী বিভাগ বিশ্বাস করা, বড়াই করা, তাহার বৈজ্ঞানিক সমর্থন করা, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর নাই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা সুতরাং দেখিতে পাইলাম, প্রবন্ধের প্রধান প্রধান মত গুলিই সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভ্রমাত্মক বলিয়া অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রবন্ধের মূল কথাটি কি ?

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর রাধাকমলের প্রবন্ধের আলোচিত মত গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সমালোচনা না করিয়া, তাঁহার এই বহু তত্ত্ব পূর্ণ প্রবন্ধটির মূল কথাটি আমাদের শ্রদ্ধার সহিত ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেন না এই প্রবন্ধের মূল কথাটি কেবল মাত্র একটি ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল নহে, ইহা দেশের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল, ভাবুক ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীকে পাইয়া বসিয়াছে। এই আদর্শকে কর্ম্মে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য নানাদিক হইতে নানা-

ভাবে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বলিতে কি দেশের মধ্যে যা কিছু উদ্যম ও চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে, তাহা বেশীর ভাগ এই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এই আদর্শের দায়ীত্ব বুঝিয়া ইহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

"বিশ্বসভ্যতায় হিন্দু-সমাজের বাণী।" এর মূল কথাটি এই যে বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আমরা যে শুধু কাঙালের মত ভিক্ষা মাগিয়া জীবন কাটাইব তাহা হইবে না। আমাদেরও সমাজের গোড়ায় এমন একটা তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহাকে আমরা উদ্‌ঘাটন করিয়া বিশ্বসভ্যতার সম্মুখে ধরিতে পারিলেই বিশ্বসভ্যতা তাহা দ্বারা নিশ্চিত অনুপ্রাণিত হইবে। ইউরোপ তাহার সমাজ গঠনে, হিন্দু-সমাজের বাণী অনুসরণ করিবে। বন্ধুবর রাধাকমলের মতে করিবে না, ইউরোপে এই অনুসরণ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা আর কেবলি ভিক্ষা করিব না, দান করিব।

ভিক্ষা করিব না, দান করিব।

বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দু-সমাজ আর ভিক্ষা করিবে না, দান করিবে। চিন্তায় ভাবপ্রবণতায় ও কর্ম্মে যাহারা বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি দেশের মধ্যে ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে, নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের দল মোটামুটী এইরূপ একটা ভাব বা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর রাধাকমল এই দলের। তাঁহার প্রবন্ধের মূল কথাটিও তাঁহার নিজের নয় দলের।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে এই আদর্শটি কোথা হইতে আসিল? দেশের অতি অগ্রসর দলের একশ্রেণীর দেশ সেবকের চিন্তাকে ইহা কি করিয়া পাইয়া বসিল? গত উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধী যে শক্তি সমূহের সংঘর্ষণ হইয়া গিয়াছে, এই আদর্শটি যে কেবল মাত্র সেই সংঘর্ষণশীল সামাজিক শক্তি সমূহের ঘাত প্রতিঘাত হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা নয়। ইহা একটি বিশেষ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহার দার্শনিক ভিত্তি।

হার্ব্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) সমাজের ক্রমবিকাশের যে পদ্ধতি, ও যে দুইটি মাত্র স্তর বা সোপানের কথা বলিয়াছেন, এবং হেগেল (Hegel) বিভিন্নজাতি সমূহের প্রকৃতিগত ও আদর্শগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়া, সমগ্র

মানব সভ্যতাকে সরল রেখার মত একটানা একটা বৈচিত্র্যহীন গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে যাইয়াই সমাজ-বিজ্ঞানের এই নূতন দার্শনিক ভিত্তির সম্যক্ আবিস্কার হইয়াছে। এই আবিষ্কার শুধু ইউরোপে হয় নাই, বঙ্গদেশেও হইয়াছে। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিংশশতাব্দীর সমাজ বিজ্ঞানের এই নূতন দার্শনিক ভিত্তির কথা, রোম নগরীতে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। ইহারা বলেন প্রত্যেক জাতির অন্তর্নিহিত একটী বিশেষত্ব আছে (Ethonic varieties), অন্য সভ্যতা দ্বারা সেই বিশেষত্ব পর্য্যুদস্ত যাহাতে না হয়, এবং অন্যান্য সভ্যতার সম্মুখে যাহাতে সেই বিশেষত্বকে গৌরব দান করা যায়, প্রত্যেক জাতিরই তাহা কর্ত্তব্য, তাহাই 'মিসন'। কাজেই বিশ্বসভ্যতাকে হিন্দু সমাজের বাণী শুনাইতে হইবে।

ইহা প্রতিক্রিয়ার ফল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসর বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে একটি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। ডিরোজিও (Henry vivian Derozio) ১৮২৮ খৃঃ হিন্দুকলেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। নব্য বঙ্গের প্রথম নেতৃবৃন্দের Derozioই প্রকৃত দীক্ষা গুরু। কিন্তু তাঁহার ছাত্রবৃন্দ স্বাধীনতার নামে, বাক্যে ও কার্য্যে যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীনের দল ঘোর কলির আগমন আশঙ্কা করিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ ১৮৩২ খৃঃ—খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। "Athenium" নামে মাসিক ইংরাজী পত্রিকার প্রধান কার্য্যই ছিল হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক লিখিলেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"—"যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুতে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম।" রসিককৃষ্ণ মল্লিক সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষি দিতে গিয়া—গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বলায়, বলিয়া উঠিলেন—"I do not believe in the Sacredness of the Ganges"—"আমি গঙ্গা মানি না।" ডিরোজিওর (Derozio) "Academic Association" বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের ইতিবৃত্তে একটি অতি প্রধান ঘটনা। কেন না, বিপ্লবকালের নানারূপ অবশম্ভাবী উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও এই এসোসিয়েসনের মধ্য দিয়াই তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বিশ্ব সভ্যতার বাণী শুনিতে পাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে Voltaire যেরূপ স্বাধীন চিন্তার উন্মেষের জন্য ভীষণ উদ্যম করিয়াছিলেন—ঊনবিংশ শতাব্দীতে

Derozio ও অনেকটা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পক্ষে সেইরূপ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত Roman Catholic ফরাসী সমাজের সহিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও, অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পুরোহিতের নিষেধ বিধি ও অসার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা বিজড়িত এই উভয় সমাজেই স্বাধীন চিন্তাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়াই প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এবং উভয় দেশেই বিপ্লব কালে একরূপ প্রচলিত ধর্ম্মে ও ক্রিয়াকাণ্ডে অবিশ্বাস, এমন কি সাধারণভাবে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তবে ফরাসীদেশে বিপ্লব জয় যুক্ত হইয়া ফরাসী জাতিকে বিশ্ব সভ্যতার বাণী শুনাইয়া সজীব ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। পরন্তু Derszioর অকাল মৃত্যুতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বর্জ্জন শক্তির অভাবে, Derozioর বিপ্লব জয়যুক্ত হইতে পারে নাই। বিশ্ব সভ্যতার বাণী সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ ভাল করিয়া শুনিতেই পায় নাই।

ফরাসী সমাজ যেমন বিশ্ব সভ্যতার বাণী শুনিয়া, তার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তবে বিশ্ব সভ্যতাকে ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্র তন্ত্রের মূল বা বিশেষ কথাটি শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই। আমরা ফরাসী সমাজের মত হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বিশ্ব সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কাজেই হিন্দুসমাজ বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা ফরাসী সমাজের মত, সঞ্জীবিত ও উদ্বোধিত হইতে পারে নাই। Modern Age বা বর্ত্তমান যুগ বলিয়া যে পদার্থটি বিশ্ব সভ্যতায় আসিয়া লীলা করিতেছে—বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে আজ পর্য্যন্তও কচিৎ কোন ভাগ্যবান তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হন। সুতরাং বিশ্ব সভ্যতার বাণী গ্রহণ করিবার সময় যেমন আমরা আবেগের আতিশয্যে খৃষ্টান হইতে গিয়াছিলাম, Hinduismকে 'hate' করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা হিন্দুসমাজের জীবনী শক্তিকে সম্যক্ পরিপুষ্ট করিতে পারি নাই, প্রতিক্রিয়ার ফলে তেমনি আমরা আজ বিশ্ব সভ্যতার কাছে পাশ্চাত্যের সুপ্রজনন বিদ্যার (Eugenics.) উপর জন্মগত জাতিভেদকে তুলিয়া ধরিয়া, হিন্দু সমাজের বাণী বলিয়া উপস্থিত হইতেছি। যেমন গ্রহণের অক্ষমতা, তেমনি দানের লঘুতা। ফরাসী সমাজের মত প্রাণ খুলিয়া বিশ্ব সভ্যতাকে গ্রহণও করিতে পারি নাই, ফরাসীজাতির মত বজ্র নির্ঘোষে Liberty Equality ও Fraternityর মহাবাণী ও বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে ঘোষণা করিতে পারিলাম না। বন্ধুবর রাধাকমল কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে Eugenics (?) এই নাম শুনিয়াই বিশ্বসভ্যতা হিন্দু-সমাজের জন্মগত জাতিভেদ গ্রহণ করিবে।

কে দান করিতে পারে ?

বিশ্বসভ্যতায় এখন Modern Age বা বর্ত্তমান যুগ বলিয়া একটা জিনিষ আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বসভ্যতার কাছে এখন কিছু লইয়া উপস্থিত হইতে হইলে, বর্ত্তমান যুগের মধ্য দিয়া তবে তাহার কাছে যাইতে হইবে। নতুবা বিশ্বসভ্যতা আসিয়া পড়িল বর্ত্তমান যুগে, আর আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম মধ্য যুগে, সেখান হইতে বিশ্বসভ্যতার নাগাল পাইব কি করিয়া? হিন্দু-সমাজকে যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে না আনিয়াছেন, তাঁহারা আজ বিশ্বসভ্যতার দ্বারে হিন্দু-সমাজের বাণী লইয়া যাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু অকৃতকার্য্যতা সুনিশ্চিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং পাশ্চাত্য ও অস্মদ্দেশে তাঁহার বক্তৃতা-গুলি বিশ্বসভ্যতায় হিন্দু-সমাজের একটা বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দানের পূর্ব্বে স্বামীজীকে কি পরিমাণে বিশ্বসভ্যতার বাণী হজম করিতে হইয়াছে, তাহা কি বন্ধুবর রাধাকমল ভাবিয়া দেখিয়াছেন; শুদ্র নরেন্দ্রনাথ দত্তকে বেদান্তের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ হইবার পূর্ব্বে চিন্তায় ও কার্য্যে কতকটা Modern age বর্ত্তমান যুগের একজন মানুষ হইতে হইয়াছে তাহা কি তিনি চিন্তা করিয়াছেন? বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের বড়াই করিবার লোক অনেক, কিন্তু হিন্দু-সমাজের কুসংস্কারের উপর তাঁহার ভাষণ আগ্নেয়গিরির গৈরিক-স্রাব কয়জন অনুসরণ করিতে সক্ষম?

এ যুগে রাজারামমোহনই সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বসভ্যতার নিকট হিন্দুসমাজের বাণীকে বহন করেন। অবশ্য রাজার কার্য্য ইহা অপেক্ষাও অন্যান্য দিকে আরো ব্যাপক ও গুরুতর দায়ীত্বে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এই রাজা বিশ্বসভ্যতাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী কি আজ ৮১ বৎসরের মধ্যেও সম্যক্ বুঝিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "Asia's message to Europe" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে এই বাঙ্গালী হিন্দু বিশ্ব-সভ্যতার দুয়ারে হিন্দু-সমাজ এবং সেই সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্য ভূমির কি মহাবাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দু-সমাজের বাণীর স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া গিয়াছেন—"We want not annihilation—Let all sects retain their distinctive

peculiarities, and yet let them unite in fraternal alliance.' "our faith and our Experiences" নামক বক্তৃতায় খৃষ্টান পাদরীদের বহিরাক্রমণ হইতে হিন্দু-ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন—"Gentlemen, was the God of our forefathers a mere metaphysical abstraction * * * nothing but thin air or a romantic fancy? I emphatically say, No. * * * They did not dream, they saw. They imagined not, but they handled the great spirit. * * Ye venerable rishis and devotees of ancient India! at your holy feet Modern India lays her humble tribute of gratitude for this priceless legacy." আবার তিনি বলিতেছেন—"In India more than in any other country, in the Hindu scriptures, more than in any other scriptures, have attributes of the Spiritual Divinity been elaborately and minutely depicted."

কিন্তু হিন্দু-সমাজের এই বাণী ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে বিশ্বসভ্যতার নিকট তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি?—"As the son of God, I love thee O, Jesus, but as the world's universal atonement. I love thee more."

বিশ্বসভ্যতাকে গ্রহণ না করিয়া,—বিশ্বসভ্যতাকে কিছুই দেওয়া যায় না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ,—ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দু-সমাজের কোন কোন বাণীকে বহন করিয়াছেন,—তাঁহারা প্রত্যেকেই এই বিশ্বসভ্যতার মধ্যে আগে জন্মলাভ করিয়া দ্বিজ হইয়া পরে এই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

কিন্তু সম্প্রতি এই দাতৃ-শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন একটি ভাব যেন অলক্ষিতে আসিয়া পড়িয়াছে—যে আমরা কেবলি দিব—কিছুই লইব না,—কেননা—"মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য" (!!) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত এ, কে, কুমার স্বামীর মধ্যে এই রকম একটা ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দু-সভ্যতা বা Art—পাশ্চাত্য কোন কিছুর দ্বারা পরিপুষ্ট বা বিকাশ লাভ করিতে পারে ইহা তিনি ভাবিতেই পারেন না। তাঁহার মতে উভয় দেশের আদর্শ এত

বিভিন্ন যে তাহাদের সংমিশ্রণ অর্থেই একের দ্বারা অন্যের বিনাশ। Perhaps such an addition would be impossible in so far as virtues may be mutually exclusive."—The message of the East—32. তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন—"You will be Judged, not by what you sucessfully assimilate, but by what you contribute to the culture and civilisation of humanity."—p-37.

ভাবপ্রবণতামূলক স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যে [National Idealism, or Idealistic Nationalism ?] আমরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল স্বদেশ-প্রেমিকদের এই সমস্ত উক্তির অসারতা খুঁজিবার অবকাশ পাই না। শ্রদ্ধেয় কুমার স্বামীর এই মত আমরা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করি। ইহা যে কেবল একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত তাহাই নয়; ইহা দেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে উন্নতির স্রোতকে বাধা দিয়া—বিষম কুফল প্রসব করিতেছে। এবং ইহার তীব্র প্রতিবাদ অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে যাহারাই হিন্দু-সমাজের বাণীকে বহন করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছেন—তাঁহারাই বিশ্বসভ্যতাকে সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ রূপে হজম (sucessfully assimilate) করিয়া লইয়াছেন। দান (contribute) করিতে হইবে কাহাকে? বিশ্বসভ্যতাকে। সুতরাং বিশ্বসভ্যতার কি অভাব তাহাত আগে বুঝিতে হইবে—সেজন্য বিশ্বসভ্যতার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইতে হইবে? নতুবা—বিশ্বমানব সভ্যতার কোন্ স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কি খুঁজিতেছে—তাহা না বুঝিয়া,—মধ্যযুগের পঙ্গু আমি—আজ হঠাৎ টিকির মধ্যে electricityর তত্ত্ব লইয়া, আর Engenics বিদ্যার স্কন্ধে জন্মগত জাতিভেদটাকে চাপাইয়া দিয়া, বিশ্বসভ্যতার দিকে দান করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলে খুব আশঙ্কা হয়—বিশ্বসভ্যতার হস্ত স্পর্শে আমাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যথা লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে। বিশ্বসভ্যতার নিকট অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহে, গৌরী দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি—কেননা তাহাতে সতীত্ব ধর্ম্ম বেশী রক্ষা পায়। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিয়া—যদি বিবাহিতা না হয়, তবে সে সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবে না। এই আশঙ্কা ও যুক্তির উপর বাল্যবিবাহকে দাঁড় করাইয়া;—অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ বন্ধ করিতেছি,—কেননা—বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য উচ্চতর আদর্শ। সেখানে সতীত্ব ধর্ম্ম আপনিই রক্ষিত হইবে;—কেননা তাঁহারা যে

বিধবা। বরং যুক্তি বলিবে যে কুমারীদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থে যে স্বার্থ আছে—বিধবাদের তাও নাই। স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আদর্শের খাতিরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে আর আপন ইচ্ছায় যে কুমারী ব্রহ্মচর্য্য পালনে কৃতসংকল্প তাঁহাকে বাধ্য করিয়া,—যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে (অবশ্য প্রতিযোগিতা জাতির গণ্ডীর মধ্যেই থাকিবে (?) বিবাহ না দিলেই জাতি যাইবে। হিন্দু সমাজের এই সমস্ত বাণী বিশ্বসভ্যতার নিকট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ঢাকিয়া যাহারা লইয়া যাইবার জন্য আজ পথে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হউন। এরূপ করিলে জগতের নিকট হইতে তাঁহারা হিন্দুর জন্য অমর্য্যাদা লইয়া ফিরিবেন,—কোনই সন্দেহ নাই। কেননা বিশ্বসভ্যতা, বিজ্ঞান জিনিষটাকে সমাজই হউক আর পদার্থই হউক, বেশ ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছে,—টিকিতে electricityর স্বপ্ন দেখে নাই।

আর যদি আমার পক্ষে অপরের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হওয়া দোষের হয়, অসম্ভব হয়, তবে কি করিয়া কুমার-স্বামী আশা করেন যে তাঁহার সভ্যতার দান (Contribution) অপর সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে। মা ইচ্ছা করেন, তাহার কন্যা জামতার নিকট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাউক, কিন্তু তার নিজের পুত্রবধূ পুত্রের নিকট তদ্রূপ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিলে খুব অন্যায় হইয়া পড়ে। যুক্তিত কোন্ ঠেস্ হইয়া এই উপসংহারে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

সেবা না অধিকার ?

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রাধাকমল বলিতেছেন "হিন্দু অধিকার জানেনা—কর্ত্তব্য জানে। পাশ্চাত্য—কর্ত্তব্য জানেনা, অধিকার জানে।" এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত কিছুদিন হইতে শুনিতেছি বটে। কিন্তু এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায়ই বস্তুতন্ত্রহীনতারূপ একটা—শূন্যতা উপলব্ধি হয়। যাহা হউক যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কথাটা সত্য,—তথাপি সংরক্ষণ অপেক্ষা আমরা ইহার সংস্কারের পক্ষপাতী। হিন্দুসমাজের বাণী লিখিতে যাইয়াও বন্ধুবর শূদ্রকে বর্ণের তালিকা হইতে নির্ব্বাসন দিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন, হিন্দু-সমাজে উপজাতির সঙ্কট,—নারীজাতির শিক্ষা ও অধিকার,—মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি (বিশ্বসভ্যতার আগে!) বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের বাণী—ইহার কোন কথারই উল্লেখ নাই,—কেননা এসব ত "অধিকারের" কথা,—পাশ্চাত্যের

কথা,—অহিন্দু, ও কাজেই অশ্রদ্ধার কথা! কাজেই তিনি একেবারে দরিদ্রকে নারায়ণ গড়িয়া তাহার সেবার কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কেননা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—দরিদ্র হচ্ছেন নারায়ণ, আর নারায়ণের প্রতি সেবাই "কর্ত্তব্য।" সুতরাং আমরা 'অধিকারের' কোন কথা না তুলিয়া, (তাহাতে অনেক গণ্ড-গোলের সম্ভাবনা?) শুদ্ধ মাত্র "কর্ত্তব্য" বোধে দরিদ্রকে সেবা করিতে লাগিয়া যাই।

কিন্তু কর্ত্তব্য ও অধিকার যে একই জিনিষের দুই দিক্। ইহা ত দুইটি বিভিন্ন পদার্থ নয় যে একটি হিন্দু লইয়াছে—আর একটি পাশ্চাত্যের ভাগ্যে পড়িয়াছে। যেখানে কর্ত্তব্য আছে—সেইখানেই অধিকার বিদ্যমান। দরিদ্রের প্রতি সেবা যদি সমাজের 'কর্ত্তব্য' হয়, তবে এই সেবা পাইবার জন্য সমাজের উপর দরিদ্রের একটা 'অধিকারও' আছে। হইতে পারে পাশ্চাত্য এই সেবার উচ্চতম আদর্শে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেখানকার দরিদ্রেরা তাই তাহাদের অধিকারের উপর আজ অত্যধিক জোর দিতেছে। বন্ধুবর রাধা-কমল যে ইহাকে একটা পরম অকল্যাণ বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা অমূলক। কালে এই অধিকারের দাবীই সেবাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু আমরা যে দরিদ্রের অধিকারকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া একেবারে অস্পৃশ্যকে হঠাৎ নারায়ণ জ্ঞানে (সমাজের পক্ষে এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন সম্ভব কি?) সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম এই সেবা কি—'নারায়ণ' লইবেন? কাল যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি—আজ একেবারে তাহাকে সেবা!

আমার আশঙ্কা হয়—অধিকারবাদের মধ্য দিয়া না গেলে, এই সেবা-বাদ—কোনরূপ স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না। আমাদের সেবা কি দরিদ্রকে তাঁহার অধিকারের বোধ জাগাইয়া দিবে? দরিদ্রের অধিকারের বোধ জাগিলে কি আমরা তাঁহাকে বিবেকানন্দের নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে পারিব?

মোট কথা—অধিকারবাদে হাঙ্গামা অনেক,—বন্ধুবর—তাহা সম্যক বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ডিঙাইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমরা ভাবি তাকি সম্ভব?

যে দরিদ্রকে তুমি সেবা করিবে—স্বাস্থ্য দিবে—মনুষ্যত্ব দিবে,—হয়ত তাহার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে না, তাহার কন্যার সহিত তোমার পুত্রের

বিবাহ দিবে না। (Hindu Engenies আছে কিনা!) ইহা হইবে না। আজ দরিদ্র পঙ্গু ও অজ্ঞ। তোমার বৈদান্তিক সেবাকে সে দয়া বলিয়াই গ্রহণ করিবে। তুমি হয়ত সেবা করিয়াই মুক্তি পাইলে, কিন্তু দরিদ্রকেও ত মুক্তি লাভ করিতে হইবে। যাহার অধিকারের বোধ জন্মে নাই, তার পক্ষে সেবা গ্রহণের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম বুঝা কি সম্ভব ? এই সমস্ত অজ্ঞ অস্পৃশ্য তথা-কথিত নীচ জাতি,—এই সমস্ত দরিদ্রকে তাঁহাদের "জন্মগত—"মনুষ্যত্বের অধিকার বোধ" দিতে হইবে। দুর্ভিক্ষে অন্নমুষ্টি ছড়াইয়া—তোমার উদ্ধার হইতে পারে,—দরিদ্রের পেটও ভরিতে পারে—কিন্তু দরিদ্র শুধু তাহার পেট নয়, দরিদ্রেরও আত্মা আছে,—এবং তাঁহার আত্মায় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহার আত্মার ক্ষুধাকে জাগাইতে হইবে। আমরা সমাজের পক্ষে দরিদ্রের প্রতি সেবা অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগে সমাজের উপর —তথাকথিত নীচ ও দরিদ্রজাতিদের অধিকার উপলব্ধির প্রয়োজনই বেশী অনুভব করি। আজ তুমি একজন মহাপুরুষের কথায় সেবা করিতে আরম্ভ করিলে—কাল আবার অন্য মহা-পুরুষের কথায় দরিদ্রকে লাথি মারিবে।

কিন্তু দরিদ্র যদি তাহার অধিকার খুঁজিয়া পায় তবে সহসা এমনটি হইবে না। যাহা নীচ ও দরিদ্র জাতির পক্ষে,—নারী জাতির পক্ষেও আমরা তাহাই বলিব। তুমি নারী জাতিকে নিজের ইচ্ছায় চালাইতেছে। কোথাও বা ঘৃণা করিতেছ—কোথায়ও বা সেবা করিতেছ। ঘৃণা ও সেবা উভয়ের মধ্যেই তোমার যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কারণ তুমি নারী জাতিকে তাঁহার "অধিকার" দিতেছনা। তোমার "কর্ত্তব্যবোধ" আজ তাঁহার "অধিকার বোধকে" জাগ্রত করিতেছ না। তুমি যে সর্ব্বদাই নারী জাতিকে তোমার নিজের ইচ্ছায় চালিত করিয়া সুপথে হাঁটাইতেছে, তাহা বলিতে পার না। বিপথে কুপথেও যে তাঁহাকে পতিতা দেখিতেছি না এমন নহে। তবে তাঁহার জন্মগত মনুষ্যত্বের অধিকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওনা কেন ? নারী জাতিকে তাঁহার অধিকারে বঞ্চিত রাখিবার তোমার শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তি ত বিবেক ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা নারী জাতির জন্যও সেবার পক্ষপাতী নই তাঁহার অধিকারবোধের জাগরণেরই পক্ষপাতী।

হিন্দু-সমাজকে এখনো এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ে বিশ্বসভ্যতার বাণী শুনিতে হইবে! সমাজবক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষণ চলিতেছে। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইলে কার্য্যে সুবিধা হইত, হাঙ্গামা কম

হইত, নিদ্রা যাইবার সুযোগ বেশী হইত ; কিন্তু তাহা যে হইবার নয়। বিশ্ব-সভ্যতাদ্বারা আমাদের বিশেষ সভ্যতাকে আগে পরিপুষ্ট না করিতে পারিলে বিশেষ নিঃস্ব হইতে হইবে, হিন্দু সমাজ মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ভুলিলে চলিবে না হিন্দু অপেক্ষা বিশ্ব বড়। তাই আমরা বিশ্বসভ্যতায় হিন্দু-সমাজের বাণী লইয়া যাইবার সময় এখনও আসে নাই বলিয়াই আশঙ্কা করি। যাঁহারা সে মহৎ কার্য্যের ভার লইবেন তাঁহারা হয়ত পশ্চাতে আসিতেছেন। এখন হিন্দু সমাজে বিশ্বসভ্যতার বাণীকে আহ্বান করিয়া হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ বাণীবাহকদের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলেই আমরা ধন্য হইব।

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা শুধু এই মাত্র বলিতে চাই যে বন্ধুবর রাধাকমল যে নূতন জাতীয়তার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার গভীর চিন্তাপূর্ণ ঐ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও আদর্শের ছাঁচে আমরা যে একদিন আমাদের ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে ও রাষ্ট্রে ভাঙা গড়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। "এই দাসসুলভ পরানুকরণ ও পরমুখোপেক্ষা" হইতে, আমাদিগকে আজ ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর যাবৎ যাঁহারা সতর্ক করিয়া আসিতেছেন, বন্ধুবর রাধা-কমল সেই সাবধানকারী পংক্তির লোক। সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির বিবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষণের মধ্যে আমরাও এই নূতন জাতীয়তার প্রভাতারুণের মত অপূর্ব্ব আবির্ভাবে পুলকিত ও আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই নূতন জাতীয়তা একটা প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়াই, ইহা প্রয়োজনের অধিক দূর পর্য্যন্তও ছুটিয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা অনেক সময় অসমীচীন বলিয়া মনে হয় নাই।

যখন এই জাতীয় ভাবের প্রবল আন্দোলনে দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল সেই সময় বোধ হয় আমরা শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের নিকট হইতে এই নূতন জাতীয় ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ যেন এই জাতীয় ভাবকে জীবনে সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। জগতের সম্মানিত, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার জয়গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন। আর্য্য অরবিন্দ আজ পণ্ডিচারী হইতে, বেদ উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। বৈষ্ণব বিপিনচন্দ্র আজ রসতত্ত্বের মধুসমুদ্রে অর্দ্ধ-নিমগ্ন। কবি রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনের' পথ হইতেই প্রতিক্রিয়ার ফল

স্বরূপ এই জাতীয়তার মধ্যে আবার আর এক প্রতিক্রিয়ার সুর আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বন্ধুবর রাধাকমল এই "সাহিত্যে আভিজাত্যের" দিনে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কথায় কর্ণপাত করিতে পারেন না, তাহা স্পষ্টই দেখিতেছি।

কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে শ্রদ্ধেয় এ, কে, কুমার স্বামীর কেবল ভাবপ্রবণতামূলক জাতীয়তার (National idealsiin) আদর্শ বা মোহ হইতে আমরা যদি ভাবিতে থাকি যে পাশ্চাত্য হইতে আমাদের কিছু গ্রহণ (assimilate) করিবার নাই, আমরা শুধু পাশ্চাত্যকে দান ('contribute') করিব; তবে ইহা নিতান্ত ভ্রম,—এবং খুব মারাত্মক ভ্রম। বোধ হয় অচলায়তনের ভ্রম হইতেও আত্মঘাতী ভ্রম।

'অধিকার' ছাড়িয়া যে 'সেবার' আদর্শ বন্ধুবর রাধাকমল, স্বামী বিবেকানন্দের নামে চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, ইহা স্বামীজী সম্বন্ধে দেশকে একটা ভ্রান্ত ধারণায় কিছু দিনের জন্য ঘুরাইয়া বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডশ্রম মাত্র। স্বামীজী এ দেশের স্ত্রী জাতি ও 'mass' বা তথা-কথিত নীচ জাতিদের 'অধিকারের' উপর খুব বেশী জোর দিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলসকে তিনি খুব স্পষ্ট রকমেই শাসাইয়া গিয়াছেন। তা-ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী স্কুল করিয়া, হাঁসপাতাল খুলিয়া একদল 'পল্লীসেবক', (ব্রহ্মণ্যের আস্ফালন-মুক্ত ?) জোয়ান যুবক সন্ন্যাসী যে জিনিস তৈয়ার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সেবার আদর্শই আমাদের মনে হয় বিগত শতাব্দীর পাশ্চাত্য খৃষ্টান মানবহিতৈষীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফল। আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে সেবার আদর্শ সম্যক প্রস্ফুট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই 'দানের' ব্যবস্থাই আমাদের শাস্ত্রের অনুমোদিত ও সমাজে আচরিত হইয়া আসিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে-- বঙ্গদেশে এই যে 'পল্লীসেবক'দের আবির্ভাব ইহা বহুল পরিমাণে খৃষ্টান সভ্যতার অনুসরণের ফল। এবং আমরা অন্ততঃ এরূপ পাশ্চাত্যের অনুসরণের, অধুনাতন হিন্দু-সমাজে বিশ্বসভ্যতার বাণী বহন করিয়া আনিবার বিশেষ পক্ষপাতী।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

একাবলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাপমুক্তি।

দেবাদিদেব ত্রিলোচনের আশ্বাসে আশ্বস্তা লক্ষ্মীদেবী অত্যল্পকাল মধ্যেই হয়রূপধারী জনার্দ্দনের ঔরসে এক পরমসুন্দর নবদূর্ব্বাদলবিনিন্দিত শ্যামমূর্ত্তি পুত্র প্রসব করিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণ এই সংবাদে অপার আনন্দমগ্ন হইয়া প্রয়াগতীর্থে আগমন পূর্ব্বক স্বর্গবাসী লক্ষ্মীদেবীকে বেষ্টন করিয়া তালমান সুসঙ্গত ভূষণশিঞ্জনে বাদ্যধ্বনিকরত নৃত্যগীত আরম্ভ করিল—

আমরা স্বরগবাসী
স্বরগের রাজা স্বরগের রাণী
উভয়ে মিলাব আসি।
ঘোটকীরূপেতে প্রসবিলা সুতে
মোদের স্বরগশশী /
হও হে স্বরগবাসী।
শাপ-মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে
ত্যজিয়ে দুঃখের রাশি
হও হে স্বরগ-বাসী
কেশব রমণী কেশব ঘরণী
হও হে স্বরগ-বাসী
(তুমি) স্বরগের ধন স্বরগরতন
হও হে স্বরগবাসী।

লক্ষ্মীদেবী পুত্রস্নেহাতিবিকলা হইয়া ঘোটকীরূপ পরিহারপূর্ব্বক দিব্যমূর্ত্তিতে পুত্রক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তাহাকে স্তন্যপ্রদান করিতেছেন ইত্যবকাশে নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে সিন্ধুজে! তুমি পুত্র প্রসব করিয়া শাপমুক্ত হইয়াছ, রথ প্রস্তুত, অতএব আইস আমরা বৈকুণ্ঠে গমন করি!” অনন্তর লক্ষ্মীদেবীকে পুত্রক্রোড়ে গমনোদ্যতা দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, “না প্রিয়ে! পুত্র লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করা হইবে না, ও পুত্রকে এই স্থানেই রক্ষা করিয়া আগমন কর।”

স্বীয় পতি নারায়ণ মুখবিনির্গতবজ্রসারসম এতাদৃশ কঠিন প্রস্তাব শ্রবণগোচর করিয়া লক্ষ্মীদেবী অতীব ব্যথিতচিত্তা হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "নাথ! পুত্রস্নেহ যে সুদুস্ত্যজ্য; আমি কেমন করিয়া মা হইয়া স্বদেহসম্ভূত নবীননীরদকান্তি এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যাই বলুন ?"

গুণাতীত হরি কমলালয়া প্রিয়ার এতাদৃশ মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াও ব্যথিতচিত্ত হইলেন না। তিনি পুনরপি তাঁহাকে পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথারোহণ করিতে আদেশ দিলেন। ইন্দীবরনীলকান্তি সুতপরিত্যাগরূপ হৃন্মনোদেহতাপন নারায়ণবচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী গলদশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! এই বালক সর্ব্বাংশেই আপনার তুল্য এজন্য আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছে। আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে একান্ত অসমর্থা, বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র বালক এক্ষণে নিতান্ত অসহায়, সকল কার্য্যেই অসমর্থ, অতএব আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করিব, এই নির্জ্জন নদীতটে এই অনাথ বালকের কি গতি হইবে? নিশ্চয় হিংস্রজীবজন্তুগণ ইহাকে উদরসাৎ করিবে। এজন্য আমার বিনীত নিবেদন এই পুত্রটীকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার আদেশ দিন। আমার হৃদয়ে যখন দয়া আছে, ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টকর হইবে।"

প্রিয়তমার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নির্গুণ হরির চিত্তেও করুণার সঞ্চার হইল, তখন তিনি সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, "প্রিয়ে! এই পুত্র এই খানেই থাকুক। ইহাকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবার বিশেষ কারণ আছে! ইহা দ্বারা অতি অদ্ভুত ও মহৎকার্য্য সাধিত হইবে। যযাতিপুত্র তুর্ব্বসু অপুত্রক হইয়া বহুদিনযাবৎ পুত্রকামনায় পবিত্র তীর্থ স্থানে নিয়ত তপস্যা-নিরত আছেন। এই পুত্র আমি তাঁহার জন্যই উৎপাদন করিয়াছি। আমার বরে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমি মধ্যে হিংস্র জন্তুগণও ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।

পতির হৃদ্গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হইলেন। যে কারণে তাঁহাকে এই নিদারুণ কষ্ট দিয়া ঘোটকীরূপে মর্ত্যভূমে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। অনন্তর তিনি পতির করযুগল স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! আপনার অন্তরও যেমন আপনার মনও তাদৃশ। আপনি যেমন চক্রান্ত করিয়া আমাকে এই নিদারুণ কষ্ট

দিয়াছেন আমিও আপনাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে অপানি দ্বাপরে চক্রান্ত করিবার জন্যই শ্রীহরিরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিবেন।

অনন্তর জনার্দ্দন চিরসহচরী প্রিয়তমার হস্তধারণপূর্ব্বক রথাভিমুখে গমন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ত? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, আমি তোমাকে অকারণে অভিসম্পাৎ করি নাই, তুমি দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমাকেও অভিসম্পাত করিলে, যাহা হউক, আমি বলিয়াছি ত মাদৃশ জনের ক্রোধ কখন অকারণে উদ্রিক্ত হয় না। আমি দ্বাপরে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নরগর্ভজাত দৈত্যকুল নিসূদন করিব। প্রিয়ে! এক্ষণে চল আমরা সেই তপস্যানিরত রাজা তুর্ব্বসুকে তদীয় সৌভাগ্যোদয়ের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করি।

দেবদেবেশ্বর কমলাকান্ত কমলাসহ রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে বিদ্যাধর চম্পক ও বিদ্যাধরী মদনালসা ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন মানসে তথায় আগমন করিলেন। উভয়ে সেই অতুল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মনের সুখে বনভূমি ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে অদূরে কোন স্থান হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতে দেখিয়া উভয়ে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন পরমসুন্দর নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-দেহকান্তি হসিতাধর বালক দেহজ্যোতিতে স্থান আলোকিত করিয়া সুকোমল হস্তপদাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। দেখিবামাত্র উভয়েরই স্নেহ-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মদনালসা তৎক্ষণাৎ বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিলেন। অনন্তর পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! এ কার পুত্র? স্থানটী যেন আলোকিত করিয়াছিল। ইহার মাতার কি কঠিন প্রাণ? যাহাকে বক্ষে ধারণ করিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়, যাহার স্পর্শে গাত্রে অমৃতসেচন করে, যাহাকে দেখিলে চক্ষুর চরিতার্থতা লাভ হয় এমন পুত্রকে কি গর্ভধারিণী ফেলিয়া যাইতে পারে? নাথ! ইহার মাতা সর্পিনীর ন্যায় নির্ম্মম, সর্পিনী যেমন অণ্ডবিনিঃসৃত সর্পশিশুকে ধরিয়া গ্রাস করে ইহার মাতাও তদ্রূপ সদ্যোজাত পুত্রকে অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

অজ্ঞাতকুলশীল বালকের প্রতি পত্নীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া চম্পক নিষেধ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! ও কাহার পুত্র, কেনবা কাহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে না জানিয়া উহার প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া অকারণে কষ্টভাগিনী হইতে হইবে।"

প্রিয়তমের বাক্যে মদনালসার হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি বার বার পুত্রমুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "না, প্রিয়তম! এ পুত্র আমিই লইব। ইহার মাতা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি কিন্তু তাহা পারিব না। এমন ছেলে যার গৃহ আলোকিত করে, তাহার আবার কিসের অভাব?"

অতঃপর বালক স্নেহপরায়ণা প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চম্পাক কহিলেন, "প্রিয়তমে! সকল দিক না দেখিয়া কোন কার্য্য করা উচিত হয় না। পুত্রটীকে লইয়া চল আমরা দেবরাজের নিকট গমন করি। এ শিশুটী দেব দানব কি গন্ধর্ব্বকুমার তাহা তিনি নিশ্চয় বলিতে পারিবেন। তাঁহার আদেশ পাইলে আমরা পুত্রটীকে লইব নতুবা যথাস্থানে রাখিয়া যাইব।" এই বলিয়া উভয়ে রথারোহণপূর্ব্বক পুত্রসহ দেবরাজ সন্নিধানে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুত্রলাভ।

পুষ্করতীর্থে অজিনাসনে উপবিষ্ট রাজা তুর্ব্বসু তপস্যানিরত আছেন। নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া মুদ্রিতচক্ষে তিনি দিবানিশি অতিবাহিত করিতেছেন। মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, কেবল সময়ে সময়ে অপুত্রকহেতু যে অন্তর্বৃত্তি প্রসারিত হইতেছে তাহাই প্রবলবেগ ধারণপূর্ব্বক উচ্ছ্বাস সহকারে মুখ দিয়া বিনির্গত হইতেছে। তিনি কহিতেছেন, "হে দেব কমলাকান্ত, দেব নিরঞ্জন! আমি আর কতদিন এই ভাবে তপস্যানিরত থাকিব! সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার তপস্যা করিলেও আমার ভাগ্য ত প্রসন্ন হইল না। অপুত্রক প্রাণবিয়োগ হইলে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইবার কি হইবে? মৃত্যুর পর আর এক গণ্ডূষ জল পাইবার প্রত্যাশা রহিল না। মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ— মদীয় জীবনাবসানে আর এক গণ্ডূষ জল পাইবেন না ভাবিয়া মৎপ্রদত্ত সুশীতল বারি দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে উষ্ণ করিয়া পান করিয়া থাকেন। হে দেব! বিবিধ ঋণের মধ্যে আমি কেবল পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম না।

উচ্ছ্বলিত শোকাবেশসহকারে রাজা তুর্ব্বসু, এইপ্রকারে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন ইতিমধ্যে সহসা দৈববাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দৈববাণী তানলয়সহকৃত সুমধুর ঝঙ্কারে কহিল—

আঁখি মেলি দেখ হে রাজন
কমলার সনে কমললোচন
নীলনীরদ পাশে সোণার বরণ হাসে
তোমার দুঃখের নাশে হেথা আগমন।

সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইবামাত্র নারায়ণের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, "হে তুর্ব্বসো! তোমার ভাগ্য এতদিনে সুপ্রসন্ন। পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় তুমি তীর্থে তীর্থে যাঁহার তপস্যা করিয়া আসিতেছ, তিনিই অদ্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সম্মুখে উপনীত, চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন কর।"

তুর্ব্বসু সসম্ভ্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিতে পাইলেন ত্রিভুবনমোহন জনার্দ্দন কমলবাসিনী সর্ব্বসম্পদ্‌বিধায়িনী লক্ষ্মীদেবীসহ তাঁহার অভীষ্টসাধনের জন্য প্রসন্নমুখে দণ্ডায়মান। প্রণামপুরঃসর নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা তুর্ব্বসু কহিলেন, "দেব নারায়ণ। সত্যসত্যই কি আপনি লক্ষ্মীদেবীসহ এ অধীনের প্রতি সদয় হইয়া দুঃখনাশ করিতে আসিয়াছেন? দেব,আপনাদিগের অনুকম্পার জন্য আমি যে তীর্থে তীর্থে আপনাদের পদে তুলসীচন্দন অর্পণ করিয়া আসিতেছি, নাথ! আর কতকাল অপুত্রক থাকিব। পুত্র বিহনে সংসার আমার নিকট মরুভূমিতুল্য জ্ঞান হয়! দেব আমার প্রতি সদয় না হইলে আমি আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইব না।"

নারায়ণ কহিলেন, "তুর্ব্বসো! তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমি তোমার জন্যই কমলাকে নিদারুণ কষ্ট দিয়া ঘোটকীরূপে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তৎপরে স্বয়ং হয়রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে এক পরম সুন্দর পুত্র উৎপাদন করিয়াছি। হয়রূপধারিণী ঘোটকীগর্ভে সঞ্জাত বলিয়া তিনি অবনীতে হৈহয় নামে খ্যাতিলাভ করিবেন। সেই পুত্র তুমি যত্নসহকারে আপনপুত্রজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে। এই সংবাদ প্রদানের জন্যই অদ্য আমরা উভয়ে তোমার সন্নিকটে উপনীত হইয়াছি।"

তুর্ব্বসু নারায়ণের অনুকম্পা প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হইলেন না। তিনি অধিকতর কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক নারায়ণকে কহিলেন "দেব। আমার মত হতভাগ্যকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য দেবীর কষ্ট! ইহা শুনিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নাথ। আপনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে সমর্থ? অকারণে তবে এই হতভাগ্যের জন্য দেবীকে কষ্ট দিলেন কেন? দেবীকে দুঃখ দিয়া

আমার সুখ! দেব! ইহা অতীব গর্হিত। দেবী যখন সে পুত্র প্রসব করিয়াছেন তখন সে পুত্র দেবীই প্রতিপালন করুন। তাঁহার মনোদুঃখ উৎপাদন করিয়া কখন আমি সুখী হইব না!" তখন জনার্দ্দন তুর্ব্বসুকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন "তুর্ব্বসো! দেবীর কষ্টপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না! দেবী আমার জন্যই কষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার এক মহৎ উদ্দেশ্যসাধনই দেবীর কষ্টপ্রাপ্তির কারণ। যে পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে সে সমগ্র ক্ষত্রকুলোজ্জলকারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ হইবে! অতএব হে তুর্ব্বসো! তুমি গঙ্গাযমুনা সঙ্গম পরম তীর্থস্থানে বনভূমির উপর সেই পুত্রকে পতিত দেখিবে। সেই পুত্র মদীয় বরে, হিংস্রজন্তুগণেরও দুষ্প্রধর্ষ। তুমি সত্বর অষ্টাশ্বযোজিত রথারোহণপূর্ব্বক সেই পুত্র আনয়নপূর্ব্বক প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দন অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তুর্ব্বসু তপস্যা হইতে বিরত হইয়া অষ্টাশ্বযোজিত রথগ্রহণপূর্ব্বক প্রয়াগতীর্থে গমনের অভিপ্রায়ে রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে চম্পক ও মদনালসা লক্ষ্মীপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রপুরী উপনীত হইলেন। ইন্দ্রদেব দেবগণসহ সেই সময়ে অপ্সরাগণের নৃত্যগীত শ্রবণসুখে অনুলিপ্ত ছিলেন। সহসা চম্পক ও মদনালসাকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চম্পক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে শচীপতে! যে স্থলে গঙ্গা ও যমুনা আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে সেই পবিত্রতীর্থে এই কন্দর্পকান্তি বালকরত্নটীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দেবেশ! এই বালকটী কাহার সন্তান, কেনই বা সেই নির্জ্জনপ্রদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে? আপনার অনুমতি পাইলে আমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করি। রমণীয়কান্তি পুত্রটীকে পাইয়া আমার পত্নীরও ইহার প্রতি পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে। চম্পকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ কহিলেন "ও পুত্রটীকে আনয়ন করিয়া তুমি ভাল কর নাই ও পুত্রটী হয়রূপধারী কমলাপতির ঔরষে ও ঘোটকীরূপিণী কমলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জনার্দ্দন উহাকে তুর্ব্বসুর জন্য উৎপাদন করিয়াছেন। পুত্রকন্যা না হওয়ায় রাজা তুর্ব্বসু একান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া তীর্থে তীর্থে নারায়ণের ধ্যান করিতেছিলেন। এই পুত্র তুর্ব্বসুপুত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। স্বয়ং নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীসহ পুষ্করতীর্থে তপস্যানিরত তুর্ব্বসুর নিকট গমন করিয়াছেন। তাঁহারা অচিরেই সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে পুত্রের জন্য প্রেরণ

করিবেন। তুর্ব্বসু প্রয়াগতীর্থস্থানে আগমনপূর্ব্বক পুত্রটীকে না দেখিলে পুনরায় নারায়ণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিবে। তখন পুত্রাপহারকের কি শাস্তি হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। সুতরাং আমার পরামর্শ, তুমি অচিরে প্রয়াগতীর্থে গমনপূর্ব্বক পুত্রটীকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস, তাহা হইলে আর নারায়ণের ক্রোধভাজন হইবে না।” দেবেন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চম্পক পত্নীসহ পুত্রটীকে প্রয়াগবনভূমিতে রক্ষা করিয়া আসিল।

চম্পক প্রস্থান করিবামাত্র রাজা তুর্ব্বসু অষ্টাশ্বযোজিত রথারোহণপূর্ব্বক অতিরমণীয় প্রয়াগতীর্থের বনভূমি প্রদেশে উপনীত হইলেন। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণপূর্ব্বক বালকটীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, “আমার কি অদৃষ্ট! লক্ষ্মীজনার্দ্দন উভয়ে আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও অদৃষ্টদেবী আমার প্রতি বিমুখ। নতুবা লক্ষ্মীদেবী যাহার মাতা, জনার্দ্দন যাহার পিতা সেই সদ্যপ্রসূত বালক আর কোথায় গমন করিবে? জনার্দ্দন-কৃপায় সে পুত্র ত হিংস্রজন্তুগণেরও দুষ্প্রধর্ষ। এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া ব্যাকুলহৃদয় তুর্ব্বসু গমন করিতেছেন এমন সময়ে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষপরিবেষ্টিত শাদ্বলভূমিখণ্ডে আলোক দর্শন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন, দেখিলেন বালকটী নবদূর্ব্বাদলচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে শায়িত আছে, তদীয় অঙ্গজ্যোতিঃ সেই স্থানটীকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তুর্ব্বসু দ্রুত গমনপূর্ব্বক শায়িত বালককে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “হে পুত্র দেবদেব জনার্দ্দনই তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি আমার পুন্নাম নরকত্রাতা হইলে! বৎস! তোমার কি মনোহর মূর্ত্তি। যখন তুমি হাস্য করিতে থাক; তোমা হেন মোহন পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যে রমণীর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয় সেই রমণীই ধন্যা। হে পুত্র! ভগবান মাধব তোমাকে আমার সংসার পারাবারের সেতু করিয়া দিয়াছেন।”

পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রাজা তুর্ব্বসু গৃহাভিমুখে চলিলেন। রাজধানী মধ্যে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে দেখিলেন পুরবাসী, নাগরিক, মন্ত্রী, পুরোহিত পারিষদবর্গ প্রভৃতি সকলে রাজ অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছে। সারথি রথবেগ সংযত করিলে পুরোহিত সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জালিলে যেমন আলোক-

রশ্মিদ্বারা সে গৃহ উদ্ভাসিত হয়, অথবা পূর্ণচন্দ্রদর্শনে যেমন সাগরের জল উদ্বেল হয় তদ্রূপ অদ্য আপনার ক্রোড়ে এই পুত্ররত্ন দেখিয়া সকল নগরময় লোকের মুখ উজ্জ্বল ও হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি যযাতি-তনয় রাজা তুর্ব্বসুর উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছে, এক্ষণে মহারাজের সর্ব্বত্র জয় হউক।" রাজা রথাবতরণপূর্ব্বক পুরোহিতকে প্রণামপুরঃসর কহিলেন, "পুরোহিত মহাশয়! আপনাদের আশীর্ব্বাদের প্রভাবেই আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য বৈভব।" অনন্তর মন্ত্রীমহাশয়কে সম্মুখে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রীমহাশয়! আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? রাজকার্য্য আমার অবর্ত্তমানে উত্তমরূপে পরিচালিত হইতেছে ত?" তখন মন্ত্রীমহাশয় কহিলেন, "হাঁ মহারাজ! আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত রাজকার্য্যই উত্তমরূপ চলিতেছে। স্বয়ং জনার্দ্দন যখন আপনার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করিয়াছেন তখন আপনার রাজ্যের কোনরূপ অকুশল সম্ভবে না।" অনন্তর অদূরে তোরণদ্বারে অন্তঃপুরচারিণী ও পুরমহিলাগণমধ্যে রাজমহিষীকে পুত্র-দর্শনেচ্ছু দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা পুরোহিত, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক মহিষীর ও পুরনারীগণের লালসা নিবৃত্তির জন্য অগ্রসর হইলেন। তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র পুরনারীগণ সৌভাগ্যশালী রাজার মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। মহিষী তৎপর হইয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে পুত্রকে গ্রহণ করিয়াই কহিলেন, "মহারাজ! এমন সুলক্ষণাক্রান্ত পরমসুন্দর পুত্রটী কোথায় পাইলেন? ইহাকে দর্শনমাত্রেই ইনি আমার মন হরণ করিলেন ও স্পর্শমাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল।" তখন মহারাজ তুর্ব্বসু প্রণয়িনীভাষে উত্তর দিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে। ভগবান রমেশ কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ পুত্ররত্নটী আমাকে দিয়াছেন, এক্ষণে অন্তঃপুরে চল, সকল কথা বলিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

পুত্রপ্রাপ্ত হইয়া রাজসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। গণদেবকে ক্রোড়ে করিয়া গণেশজননী যেমন শোভার আধার হইয়াছিলেন, পুত্রক্রোড়ে রাজ-মহিষীকে তদ্রূপ শোভাধার অবলোকন করিয়া রাজার মন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পুত্রকে বারম্বার দর্শন করিয়াও তাঁহার পুত্রদর্শন লালসা নিবৃত্তি

হইত না, এজন্য তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন অন্তঃপুরে আগমন করিতেন। অণ্ড হইতে শাবক নিঃসৃত হইলে যেমন পক্ষীদম্পতি অহরহ তাহার আহারের সংস্থানে ত্বরাপর হয় তদ্রূপ রাজদম্পতীও রাজকুমারের জন্য বিবিধ উপাদেয় আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যথাকালে এই পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার নাম একবীর রাখিলেন। পঞ্চমবর্ষপ্রাপ্ত বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থে রাজা উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। বালকও মনঃসংযোগ সহকারে সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। অধীত-সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্ব-বিদ্যাপারঙ্গম বালক একবীর ষোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা তুর্ব্বসু বিশ্রামলাভকামনায় তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মহিষীর সহিত অন্তঃপুরে বিশ্রামসুখালাপনে সময় অতিবাহিত করিতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাজদম্পতী বার্দ্ধক্যহেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া এবং পুত্র একবীরের সুশাসনে সমগ্র রাজ্যমধ্যে শান্তি বিরাজিত অবলোকন করিয়া পুত্রহস্তেই সমগ্র রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক বনাশ্রয় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। সঙ্কল্প স্থির হইলে একদা রাজদম্পতি বনগমনোন্মুখ হইয়া পুত্র একবীরকে সংবাদ দিলেন। অসময়ে মাতাপিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া একবীর উদ্বিগ্নচিত্তে জনকজননীসকাশে উপনীত হইয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! এমন অসময়ে কি জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন? আমাকে যে অবধি রাজপদে অভিষেক করিয়াছেন, সেই অবধি ত আমি যথাসাধ্য রাজকার্য্য পর্য্যা-লোচনা করিতেছি।" অনন্তর মাতৃদেবীকে বিষণ্ণা ও সর্ব্বাভরণবিরহিতা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে কহিলেন, "মা! আজি আপনার এবেশ দেখিতেছি কেন? কি হেতু আপনি অলঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া পত্রহীন লতি-কার ন্যায় মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন" আপনাকে এ বেশ ত কখনই দেখি নাই। আপনাকে এবেশে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

পুত্রমুখবিনির্গত এতাদৃশ শোকোদ্দীপক বচন শ্রবণপূর্ব্বক রাণী অগ্রসর হইয়া একবীরের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতা তোমাকে রাজকার্য্যে পারদর্শী দেখিয়া ও নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে অনুধাবন করিয়া বনগমনোদ্যোগী হইয়াছেন। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, অতএব হে বৎস! আমি তাঁহার সহিত বনভূমি অবলম্বনে যত্নবতী হইয়াছি।

অকস্মাৎ বজ্রপতনবৎ এই নিদারুণবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একবীর দুঃখ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কহিলেন, "মা! আমাকে কি ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করাইলেন? আমি কি হতভাগ্য! এই সে-দিবসমাত্র পিতা আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না করিতেই আমাকে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আপনারা বন-গমনোদ্যোগী হইলেন? মা! শুনিয়াছিলাম, সদ্যোজাতপুত্র আমাকে বনমধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আমার গর্ভধারিণী লক্ষ্মীদেবী ও জন্মদাতা নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই কৃপায় আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে ছিলাম; কিন্তু যাহার ভাগ্যে সুখ নাই, সে কেন সহায় ও সম্পদের অধিকারী হইবে? সুতরাং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতেই এই দুর্ব্বিসহ শোকশেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি সভাভঙ্গ করিয়া আনন্দসহকারে আপনাদিগেরই চরণদর্শনে আগমন করিতাম। এখন আর আমি কি নিমিত্ত এবং কাহার নিকটে বা অন্তঃপুরে আগমন করিব?"

শোকসন্তপ্তহৃদয়ে করুণবাক্যে পুত্রকে বিলাপ করিতে শ্রবণ করিয়া রাজা তুর্ব্বসু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, "পুত্র একবীর, তুমি দুঃখাভিভূত হইও না। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের বংশধর হইয়া তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারাশ্রমে অবস্থান করিলে লোকে আমাদিগকে কি বলিবে? বৎস তোমাকে পাইয়া অবধি আমি তোমাকে রাজযোগ্য বিধানে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, তোমার শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তুমিও তাহাদিগের শিক্ষা-ক্রমে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, সর্ব্বশেষে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আমরা বনাশ্রয় অবলম্বন করিতেছি।

রাণী কহিলেন, "বৎস! তোমার বিবাহ হয় নাই! আমাদের ইচ্ছা ছিল তোমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। তাহা আমাদের ভাগ্যে নাই। অপুত্রক হইয়া জনার্দ্দনের কৃপায় তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ইহাতেই আমরা ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী।"

মহিষীকে পুত্রের বিবাহ কথা উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়া রাজা তুর্ব্বসু পুনরায় কহিলেন, "বৎসে! রভ্যরাজ তাঁহার পরমসুন্দরী কন্যা একাবলীর সহিত তোমার বিবাহদানে অভিলাষী হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমা-

দের অপেক্ষা করিবার আর সময় নাই, এজন্য তদ্বিষয়ে মনোযোগ দান করিতে পারি নাই ; আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, এই সময়ে বনাশ্রয় অবলম্বন না করিলে কবেই বা বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইব আর কবেই বা ভগবতীর আরাধনায় লিপ্ত হইব?" দুঃখিতচিত্ত বালক একবীর তথাপি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "আপনারা যখন ভগবতীর আরাধনা পরায়ণ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে নিষেধ করা অতীব গর্হিত কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতঃ আমিও এই সংসারার্ণবে কর্ণধারবিহীন হইয়া পড়িলাম।' পুত্রপ্রেমমুগ্ধ রাজা তুর্ব্বসু অতঃপর উচ্ছ্বলিত শোকাবেশ সহকারে কহিলেন, "কেন বৎস! তুমি কর্ণধারবিহীন হইবে? আমার বহুকালের মন্ত্রী রহিলেন, তিনি তোমাকে সকল বিষয়ে সদসৎ উপদেশ দান করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বয়স্য রহিলেন, তিনি মিষ্টকথায় তোমার মনোরঞ্জন করিবেন এবং ইহারাই তোমার কর্ণধার হইবেন। অনন্তর রাজাধিরাজ তুর্ব্বসু মন্ত্রী ও বঙ্কেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর, বঙ্কেশ্বর আমার বহুতপস্যার ধন ও বহুযত্নে প্রতিপালিত একবীরকে তোমাদের করে সমর্পণ করিলাম, ইহাকে তোমরা সংসারসমুদ্রে সাহায্য করিবে ও রত্নরাজ দুহিতা একাবলীর সহিত ইহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিতেছি ইহাও কি তোমাদের গৌরবের বিষয় নয়? সূর্য্যদেব যেমন অস্তগমনকালে পৃথিবীর আলোকদানের ভার চন্দ্রদেবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান, আমিও তদ্রূপ রাজ্যশাসনের ভার মৎপুত্র একবীরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি! তোমরা সরল মনে আমাদিগকে বিদায় দান কর, আমরা হিমালয়াধিরূঢ় হইয়া মহামায়ার পূজায় অবশিষ্ট জীবন-কাল অতিবাহিত করিব।"

মন্ত্রীবর বঙ্কেশ্বর ও রাজপরিষদ সকলে মহারাজ ও মহারাণীর মঙ্গলকামনা করিলে তাঁহারা উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ একবীর রাজকার্য্য গ্রহণপূর্ব্বক সুবিচার ও সুশাসনগুণে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বহুদিবস অতীত হইল তিনি পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, এজন্য তাঁহাদিগের সংবাদ আনিবার জন্য একজন দূত হিমালয়প্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

একদিবস মহারাজ মন্ত্রী ও পারিষদ্‌বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া সভাবিদ্যমানে

আছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া সংবাদ দিল "মহারাজ ও মহারাণী শুষ্কপত্র ভক্ষণ ও ঝরণার জলপান করিয়া তপস্যা-নিরত আছেন। তাঁহাদের দেহযষ্টি অতীব ক্ষীণ।" মহারাজ পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সংবাদ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সভা ভঙ্গ করিবার উদ্যোগী হইলে মন্ত্রী নিবেদন করিলেন, "শুনিলাম রড্যরাজদুহিতা একাবলী পণস্বয়ম্বর করিবেন। যে রাজপুত্র তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত করিবে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। কত রাজকুমার অক্ষক্রীড়ায় আগমন করিলেও সে দিবস রড্যরাজ বয়স্য বিজয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে স্বয়ং রড্যরাজ আপনাকে দ্যুতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছেন। অতএব মহারাজ যুদ্ধ কিম্বা অক্ষক্রীড়াদিতে আহূত হইয়া তদ্বিষয়ে উদাসী থাকা একান্ত অকর্ত্তব্য।

মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা কহিলেন, "কৈ রড্যরাজ ত আমাকে কিছুই বলেন নাই।"

মন্ত্রী। বয়স্য মহারাজের সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়াই আমার নিকট সংবাদ দান করিয়াছেন। আমিই মহারাজকে জ্ঞাপন করিতেছি। মহারাজ, রাজাদিগের সেনাই পরিচ্ছদ, শাস্ত্রই চক্ষু ও মন্ত্রী মুখ।

তখন রাজা কহিলেন, "মন্ত্রিবর যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি ত অক্ষক্রীড়া নিপুণ নহি, আমি কি অক্ষক্রীড়ার্থ আহূত হইয়া একটি যুবতীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবার জন্য গমন করিব? যুবতীর নিকট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে বড়ই লজ্জার কথা হইবে এবং এ সংবাদ কখন গোপন থাকিবে না, সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইবে। সুতরাং এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া আমার যুক্তিযুক্ত নহে।

মন্ত্রী। মহারাজ, ভয়ের ও লজ্জার কোন কারণ নাই। যুদ্ধ ও অক্ষক্রীড়াদিতে এক পক্ষের হার ও অপর পক্ষের জয় হইয়াই থাকে। বিশেষতঃ যুবতী যখন অক্ষক্রীড়াদক্ষ তখন হার জিৎ তাঁহারই হস্তে। এতদ্ভিন্ন ভাবিয়া দেখুন সর্ব্বত্র ঘোষণান্তেও রড্যরাজ কি জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন?

রাজা মন্ত্রিবাক্যের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইলে মন্ত্রীবর পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! আমার বোধ হয় অক্ষক্রীড়াটী সমারোহহীন স্বয়ম্বর। রাজকুমারী পণ করিলে রাজা সেই পণবিবরণ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। এই ঘোষণার অর্থই এই যে যাঁহারা অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ তাঁহারাই ক্রীড়ার্থে আগমন করিবেন। কিন্তু ইহা শুনিয়াও কি জন্য রড্যরাজ আপনাকে

আহ্বান করেন? আপনার গমনোদ্যোগ না দেখিয়া তাঁহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে একবীর অক্ষক্রীড়া-নিপুণ নহেন? মহারাজ! আমার বিবেচনায় রাজকুমারী আপনার প্রতি আসক্তা।”

মন্ত্রীবাক্যে মহারাজের আস্থা হইল না। তিনি কহিলেন, “পণক্রীড়া কখন গোপন হইবার নহে। দশের সম্মুখে রাজকুমারীকে পণ অনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে সুতরাং আমার প্রতি আসক্তা হইলেও তিনি অন্যায় আচরণে সমর্থা হইবেন না।”

তখন মন্ত্রীবর আরও আগ্রহসহকারে কহিলেন, “মহারাজ! আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবেন না। আমি আপনার পিতৃদেবের মন্ত্রী ছিলাম, এক্ষণে আপনার মন্ত্রী হইয়াছি। আপনি শিশু আপনাকে আমি কি বুঝাইব, অক্ষক্রীড়ায় হার জিৎ সমস্তই সেই কুমারীর আয়ত্ত। আপনি নির্ভয় চিত্তে রড্যরাজ সভায় গমন করুন। যুদ্ধ কিম্বা অক্ষাদি ক্রীড়ায় আহূত হইয়া প্রত্যাখ্যান করা রাজধর্ম্ম নয়।”

এমন সময়ে হিমালয় প্রদেশ হইতে জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ জানাইল, মহারাজ, আপনার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই গতকল্য স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রাজা সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে ধারা পতিত হইতেছে এমন সময়ে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, “মহারাজ! স্তম্ভিত হইয়া শোক প্রকাশের এ সময় নয়। আপনার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী যোগে তনুত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে তৎপর হইয়া তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করুন। আমিও রড্যরাজ সকাশে সংবাদ দান করি যে পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধান্তে রাজামহাশয় অক্ষক্রীড়ার্থ রড্যরাজ পুরীতে গমন করিবেন।

রাজা। এই সংবাদ প্রদান কর যে আমি শ্রাদ্ধান্তে রড্যরাজপ্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী নদীতটে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাগবত ধর্ম্ম।

অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থ সত্য। এই তত্ত্বই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল; জানিয়া বা না জানিয়া সকলেই এই তত্ত্ব-বস্তুর অভিমুখী। এই তত্ত্ব-বস্তুই নিখিল চরাচরকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং সকলেই বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাত ও জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া এই তত্ত্বের অভিমুখে ছুটিতেছে। যাহা এই তত্ত্বের যতটুকু অভিমুখী বা নিকটে তাহাই তত সত্য, তত উচ্চ ও তত শ্রেয়স্কর।

এই তত্ত্ব ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। এই তিনটি নাম এই ভাবে বুঝিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানের নিকট একটা জ্ঞেয় জগৎ বা ইদং, সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমূহ ও তাঁহাদের অধিপতি মনই মানুষের সর্ব্বস্ব নহে, ইহা ছাড়া অর্থাৎ এই পরোক্ষজ্ঞান ছাড়া মানুষের আরও কিছু আছে। সেই যে 'আরও কিছু' যাহা পরোক্ষজ্ঞানের বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলেও, জ্ঞানের বা মানবচৈতন্যের বিষয়ীভূত, সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলে। উপস্থিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সূক্ষ্ম-বিচার-ময় যে অনুমান সেই অনুমানের বিষয়ীভূত। কিন্তু সকলের নিকটেই যে তাহা আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহা নহে। এখন প্রশ্ন এই যে এই অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত এই তত্ত্বের সহিত এই যে প্রত্যক্ষ 'ইদং' ইহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন বলিলেন এই 'ইদং' এর সাহায্যে তিনি আছেন এই মাত্র অনুমান হয় আর কিছুই সম্বন্ধ নাই। "ইদং"টা সত্য সত্য নাই, এ একটা ভুল মনে হওয়া, যেমন দড়ি দেখিয়া মনে হয় সাপ দেখিতেছি। মনে করুন, আমি দাঁড়াইয়া আছি, দর্পণে যেমন হউক আমার একটা ছায়া পড়িয়াছে, এ ছায়া তো আমাতে নাই, এ ছায়া যে দর্পণ দেখে তাহারই মনে আছে, সত্য সত্য নাই। তত্ত্বের সহিত 'ইদং' এর এই সম্বন্ধ। আর একজন বলিলেন এই যে ছায়া ইহার সম্ভাবনা বা হেতু আমার মধ্যে সর্ব্বদাই আছে অর্থাৎ এই সম্ভাবনা আমার স্বরূপের একটি লক্ষণ। আমার স্বরূপের অন্যান্য লক্ষণও থাকিতে পারে না থাকিতেও পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু এই যে লক্ষণটি অর্থাৎ ছায়ার হেতু, এই লক্ষণটির দ্বারাই লোকে, যাহারা ছায়া দেখে

তাহারা আমাকে ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে, অন্য কোন প্রকারে পারে না। আর একদল বলিলেন এই যে ছায়াপাত করা এই কার্য্যটিই আমার, নিত্যই আমি দর্পণে আমার মুখ দেখি ও অপরকে দেখাই, ইহাই আমার সময় কাটাইবার উপায়, ইহাই আমার আনন্দের খেলা। তুমি কেবল ছায়া দেখ, ছায়া আর কায়া দুই এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে পার না, কাজেই মিথ্যার পশ্চাতে পশ্চাতে অনাদি বহির্মুখ হইয়া ঘুরিয়া মর। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর, ছায়া ছাড়া কায়া নাই, কায়া ছাড়া ছায়া নাই, তাহা হইলে আমাকে ধরিতে পারিবে, আমিই তত্ত্ব, আমাকে ধরাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত।

এই তিনটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পরমাত্মা, আর তৃতীয় ভগবান। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সেই ভগবানই জগতের সর্ব্বস্ব, 'ইদং' এর প্রাণ।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"।

ভক্তির দ্বারাই সেই ভগবানকে পাইতে হইবে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ। ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনিচাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

এই তত্ত্ব ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য। এই ভক্তি, জ্ঞানও বৈরাগ্যযুক্তা। বেদান্তশ্রবণের দ্বারা ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। শ্রদ্ধা ইহার সাধন। শ্রদ্ধাবান মুনিগণ এই ভক্তির দ্বারা সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন। প্রশ্ন হইতেছে, কোথায় দর্শন করেন? উত্তরে বলিতেছেন, আত্মায় অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞে। সেই তত্ত্ব কেমন? তিনি কি আত্ম-ব্যতিরিক্ত, অনাত্মভাবাপন্ন, কোন জ্ঞেয়শ্রেণীর বস্তু? উত্তরে বলিতেছেন না তিনিই পরমাত্মা।

শ্রীবৃন্দাবন লীলা আলোচনা কালে উদ্ধৃত শ্লোকের প্রতিপাদ্য যে তত্ত্ব-কথা তাহা অনেকে বিস্মৃত হইয়া যান। এইজন্য অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতকার এই তত্ত্বটুকু আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝাইতেছেন।

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব স্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥
দোহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশাবলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥”

প্রথম পাঁচটি শ্লোকে দেখাইতেছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই বা নিজের স্বভাববশতঃ আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। অন্য যাহা কিছু আমরা প্রিয় বলিয়া মনে করি, সেই সমস্তের প্রতি যে প্রীতি তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়া। “হে রাজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয়; পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। এই জন্য নিজ নিজ অহঙ্কারাস্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের যেমন স্নেহ হয়, এই মমতা অর্থাৎ আমার দেহ এই যে মৌলিক অভিমান এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আপনার হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ পুত্র, ধন, গৃহ প্রভৃতিতে সেরূপ হয় না।” আত্মাধ্যাসের তারতম্যে প্রীতিরও তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাকে যতটুকু আপনার বলিয়া মনে করি তাহাকে ঠিক ততটুকুই ভালবাসি। এই টুকু দেখাইবার জন্য পরের দুইটি শ্লোকে মূঢ় ও অমূঢ়ভেদে প্রীতির কিরূপ তারতম্য হয় তাহাই দেখাইতেছেন। “যাহারা দেহাত্মবাদী অর্থাৎ যাহারা এই দেহকেই আমি বলিয়া মনে পরে, দেহাতীত কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে ইহা যাহারা জানে না তাহারা আপনার দেহটিকে যেমন ভালবাসে এই দেহের যাহারা অনুবর্ত্তী অর্থাৎ এই দেহের সম্পর্কে যাহারা সম্পর্কিত হইয়া ‘আমার’ বলিয়া প্রতীত হয় যেমন পুত্র প্রভৃতি তাহারা সেরূপ প্রীতিভাজন নহে। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, এই যে দেহ, ইহার যখন আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী সে সময়েও বাঁচিয়া থাকিবার আশা অত্যন্ত প্রবলভাবেই থাকে। আর

বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, দেহ নিশ্চয়ই যাইবে ইহা যখন স্থির হইল তখনও যখন বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে এই যে প্রীতি ইহা দেহগত বলিয়া এতদিন প্রতীত হইলেও সত্য সত্য তাহা দেহগত নহে, তাহা আত্মগত।" শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটির আর একরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাহা এই। "যখন মানুষের অবিবেকের বা অজ্ঞানের অবস্থা সে সময়ে দেহধ্বংশ হইতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আশা করে। এই জীবতাশা বিবেকী বা জ্ঞানী ব্যক্তির প্রীতির বিষয় যদিই বা হয় তাহা হইলেও আত্মার ন্যায় প্রীতির বিষয় হয় না। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী তাঁহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে দেহ থাকুক, এই যে ইচ্ছা বা দেহপ্রীতি অবিবেকীর ন্যায় তাঁহার ইহা দেহের জন্য নহে, আত্মার জন্য।" "অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে নিজের আত্মাই সর্ব্বদেহীর প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার জন্য প্রিয়।" এইবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে হইবে। সাধারণ মানুষ বলিবে তিনি আমাদেরই ন্যায় দেহী। তিনি একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষমাত্র। ভাগবত বলিতেছেন ইহা ভুল। "কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবেন। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ মায়াযোগে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।" তাহা হইলে দেখা গেল যে দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার বা প্রকৃত জীবের যে সম্পর্ক, এই আত্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পক।

তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার আরও অনেক কথা বলিতেছেন, যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহেন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি তাঁহাদিগকে বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইল যে দেহকে আমরা যে ভালবাসি তাহা আত্মার অধ্যাসের জন্য অর্থাৎ আত্মার জন্যই দেহ প্রিয় অর্থাৎ দেহ যে নাই তাহা নহে কিন্তু দেহের এই যে থাকা বা প্রিয় হওয়া ইহা আত্মার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অনেকে মনে করে আত্মা বলিলে দেহ নহে এমন একটা কিছু বুঝিতে হইবে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, দেহের যারা সত্য তাহা আত্মা। সেইরূপ আত্মার আত্মা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বলিলে এই সমস্ত দেহী ব্যতিরিক্ত একটা কিছু মনে করাও ভুল। এই তত্ত্বটুকু বড়ই কঠিন, বেশ ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥"

কৃষ্ণ সকল জগতের কারণ। (আত্মার আত্মা বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে জড় বস্তু বলিয়া একটা পৃথক জিনিস আছে কৃষ্ণ তাহা নহেন, যেমন অবিবেকগণ বলেন তিনি "চৈতন্য স্বরূপ)" এই তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁহাদিগের সমক্ষে চরাচর সমস্তই ভগবদ্রূপ। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই।" এই তত্ত্বটুকু পরের শ্লোকে আরও ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতেছেন।

"সর্ব্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥"

সকল বস্তুর পরমার্থ (The Real Self) কারণে অবস্থিত। (মূলে আছে ভবতি শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন। ভবৎ=পরিণামং প্রাপ্নুবৎ =কারণং—তস্মিন্। যাহা পরিণাম তাহা পরিণামীতেই আছে। Becoming Beingএর মধ্যে আছে) কৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। He is the unity of all things and beings there is no negation.

এই যে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম হইতেই এই তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন। এই জন্যই আমরা প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে দশমস্কন্ধের শ্লোকের আলোচনা করিলাম। এইবার আলোচ্য শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশদরূপে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা এবং বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে ভক্তি মানবের একটি মৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ইহা অজন্যা, আরও বলা হইয়াছে যে ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি সাধন পথ সমন্বয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ভক্তি যাহা, তাহার আদর্শই মানবের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবত সেই আদর্শই প্রদান করিয়াছেন। বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ভক্তি জন্মায় না, তবে দৃঢ়ীকৃত হয়। এক্ষণে চিন্তা করিতে হইবে এই বেদান্ত শ্রবণ কি? আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচার ও তর্কই বুঝি বেদান্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদের যাহা শিরোভাগ

বা উপসংহার তাহার নাম বেদান্ত The conclusious of the Vedas. বেদ অর্থে অপৌরুষেয় জ্ঞান, যাহার উপর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই বেদবিহিত অনুশীলন করিয়া যাঁহারা উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সমূহই বেদান্ত। এই বেদান্ত শ্রবণ শ্রদ্ধার সহিত সাধুসজ্জনের নিকট করিতে হইবে, ইহাই উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য। "শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে" বলায় শ্রদ্ধাবৃত্তির আবশ্যকতা যে সর্ব্ব প্রথমে এই কথা বলা হইল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই শ্রদ্ধা ভক্তিরই প্রাথমিক অবস্থা। শ্রদ্ধার সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই ধর্ম্ম-হীনতা, ভোগপরায়ণতা, ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার যুগে শ্রদ্ধাবৃত্তির অভাব অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে যাহার চিত্তে শ্রদ্ধাবৃত্তির বিশেষ অনুশীলন না হয়, ভক্তিপথের পথিক হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তি-শাস্ত্রের মহত্ব অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না কারণ শ্রদ্ধার অভাব। আমি বুঝি, আমি পণ্ডিত এই প্রকারের ভাব যাহাদের চিত্তে দৃঢ় তাহারা ভক্তিরাজ্যের কোমল মধুর অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ--,

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় লভে ভক্তি-লতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়,
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথী।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে; তার শুকি যায় পাতা

তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

উদ্ধৃত অংশে শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার বলিলেন যে ভক্তিলতার বীজ শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেচন করিতে হইবে ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রুতগৃহীতয়া" এই পদটীর অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত আর দুইটি কথা বলিলেন জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান হইবে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিলেন "বৈষ্ণব অপরাধ" 'হাতির মাথা' এই মাথা ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া দেয় এবং অনেক সময়ে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলে। 'বৈষ্ণব অপরাধ' হয় কেন? শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাবেই তাহা হইয়া থাকে। একালের লোকের চরিত্র ও মনোভাব আলোচনা করিলে ইহার তাৎপর্য্য বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মসাধনার পথে অহঙ্কার অতি প্রধান অন্তরায় ইহা এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে তাহাকে ধরা ও উৎপাটন করা বড়ই কঠিন। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Tendency to selfreference.

ধর্ম্মজীবনের সামান্য আভাস পাইবার মাত্র আমরা নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করি এবং অন্যান্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ বা ভক্তগণ যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা হয়ত উন্নততর স্তরে অবস্থিত, এমন কি তাঁহাদেরও কোন ভাব বা ক্রিয়া যদি অবোধ্য হয় তাহা হইলে তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া থাকি, এই এক অতি প্রধান বিপদ। শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই তিনটির সাধন সর্ব্বদা অত্যন্ত যত্নশীল হইয়া করিতে হইবে, প্রত্যেক মূহূর্ত্তে অন্তর্মূখী হইয়া অতীব গভীর ভাবে নিজের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিতে হইবে যে এই তিনটির প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছি কিনা। তাহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি উপশাখা সমুহও এই ভক্তিলতার বৃদ্ধির অন্তরায়, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা করিলে এই সমস্ত উপশাখার হস্ত হইতেও আমরা পরিত্রাণ পাইব।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভক্তিসাধনার এই উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া যে কোন ব্যক্তি ধন্য হইতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে কেবল মাত্র উপদেশ দেওয়াই তো যথেষ্ট নহে। সামাজিক ব্যবস্থা যদ্যপি এই অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল না হয় তাহা হইলে সাধারণ একজন মানুষ নিজের চেষ্টায় এই পথে সকল সময়ে অগ্রসর না হইতেও পারে; যেমন একটি শিশুকে যদি কেবল বলা যায় যে তুমি এই কার্য্য এই এই ভাবে করিবে, এইরূপ উপদেশ দিলে শিশু কি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে? শিশু তাহা পারে না। আমরা মানুষ, একালে অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছি, আমরা মনে করি যে আমরা বাহিরের কোনরূপ বাধ্যতা বা বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকেও নিজেদের মঙ্গলসাধন করিতে পারি। এই প্রকারের ধারণা যে প্রায় সবই ভুল ইহা একটু সরলচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। এখন, সে সমাজ কোথায়? যে সমাজের বিধি ব্যবস্থা আচার সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া চিত্তবৃত্তির অনুশীলন হইলে পর জীবনের যে লক্ষ্যের কথা বলা হইল মানব তাহা পাইতে পারে; যে সমাজ মানবকে পঞ্চমপুরুষার্থস্বরূপ এই যে প্রেমভক্তি ইহা লাভ করিবার উপযুক্ত করিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতকার উত্তর দিলেন বর্ণাশ্রমাচারই সেই ব্যবস্থা। যে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রচারিত হইয়াছে সেই সমাজেই এই অনুশীলনের উপযুক্ত ও অনুকূল ক্ষেত্র।

ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন বটে, কিন্তু এমন কথা বলেন নাই যে বর্ণাশ্রমাচার যেখানে নাই সেখানে এই ধর্ম্ম হইবে না। এই মাত্র বলিলেন প্রকৃত বর্ণাশ্রম, যাহা মানব সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহার লক্ষ্য এই প্রেমভক্তি। বর্ণাশ্রমাচারই সুগম ও উৎকৃষ্ট পথ। কেবল তাহাই নহে, সুনিশ্চিত পথ। অন্যান্য পথে হয়ত কাহারও হইতে পারে কিন্তু উপস্থিত তাহা আলোচ্য নহে। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে উপলক্ষে বা উপায়ে এতাদৃশ আত্মহারা হইয়া পড়ে যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য একেবারে ভুলিয়া যায়, সে সময়ে সেই লক্ষ্যটি বিশেষ ভাবে প্রচার করা, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশে ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। একদল লোক বর্ণাশ্রম ভাঙিবেন, আর একদল বর্ণাশ্রমের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া গায়ের জোরে তাহা রাখিবেন। এই দুই-দলই ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত যেন এই উভয় দলের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া মানবকে ও জগৎকে প্রকৃত কল্যাণে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে-ছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকটি এই।

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং ॥"

শ্রবণাদির দ্বারা গৃহীত যে ধর্ম্ম তাহার ফল ভক্তি—অর্থ কামাদি নহে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক সমূহের দ্বারা এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতেছেন—অতএব হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তদ্দ্বারা হরির তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেই তাহা সার্থক।

শ্রীমদ্ভাগবত যেন একটি তুলাদণ্ড দিলেন। আমরা যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, কেবল মাত্র বাহির হইতে তাহা উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে কি না ইহা বুঝিতে পারা যায় না, এই হরিতোষণ বা হরি-ভক্তিলাভ তাহার তুলাদণ্ড; এই তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাহার সংসিদ্ধি নিরূপিত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত সূত্ররূপে সংক্ষেপে যাহা বলিলেন সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে তাহা বিশদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা যদি এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচনা করি তাহা হইলে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বুঝিতে পারিব। সে স্থানে যাহা বলিয়াছেন আমার অতি-সংক্ষেপে তাহার দু একটি কথা এই স্থানে বিবৃত করিতেছি।

প্রথম কথা এই যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। মনুষ্যদিগের স্বাভাবানুসারে এই ধর্ম্ম যুগে যুগে বিহিত হইয়াছে। চিত্ত স্বভাবতঃ কাম-বাসনাময়। এই কাম-বাসনাময় চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া মানবকে নৈগুর্ণ্যে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহাই করে। এই বর্ণাশ্রমাচারে মানব স্বভাব-বিহিত বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক নিজের কর্ম্ম করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও নিগুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্ম, ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবের ক্রমিক উন্নতি এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণাশ্রমবিভাগের ভিত্তিমূলে অবস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণাশ্রমের বিধানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানবকে কেবলমাত্র নিজের সুখ, সুবিধা বা ভোগবাসনার চরিতার্থতার জন্য নহে, পরন্তু সমাজের জন্য এবং জগতের জন্য জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রকৃত মানবত্ব ত্যাগে, ভোগে নহে; আত্ম বিসর্জ্জনে, আত্মপুষ্টিতে নহে। এই বিধান গৃহস্থকে উপদেশ দেন যে, যে পরিমান ধনাদিতে উদর পূর্ত্তি হয়, তাবন্মাত্রেই দেহীদিগের স্বত্ব। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের অভিলাষ করে সে চৌর, সুতরাং দণ্ড পাইবার যোগ্য। সুতরাং জগতের বৈষম্য ও প্রতি-দ্বন্দ্বীতা দূর করিয়া মানব সমাজে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ এই বর্ণাশ্রম।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু এ জন্য আমরা প্রকৃত বর্ণাশ্রমাচারকে যেন পক্ষপাতদুষ্ট বা বর্ণ বিশেষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় গঠিত বলিয়া বিবেচনা না করি। শ্রীমদ্ভাগবত এই-প্রকৃত বর্ণাশ্রমের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সহিত মর্ম্মী ও রসিক ভক্ত রায় রামানন্দের যে কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমাচারকেই অধ্যাত্ম সাধনার প্রথমস্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক বলা হইল তাহার পর ভাগবত বলিতেছেন যে ভক্তি প্রধান ধর্ম্মই যখন প্রয়োজন, ভক্তিহীন যে ধর্ম্ম, তাহা যখন পণ্ডশ্রমমাত্র, তখন সাত্বতপতি যে ভগবান, একাগ্রচিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহার নাম গুণলীলা কীর্ত্তন করা, তাঁহাকে ধ্যান করা ও তাঁহার পূজা করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সপ্তম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই উক্তির বিস্তৃতি মাত্র।

নারদ বলিয়াছেনঃ গৃহস্থব্যক্তি কৃষ্ণার্পণপূর্ব্বক যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, যথাকালে মহর্ষিগণের উপাসনা করিবে এবং সর্ব্বদা অমৃত-স্বরূপ ভগবানের অবতার- কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শান্ত-দান্ত জনগণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ও সত্য বলিয়া মনে হয়, জাগরণে তাহা আপনা আপনি চলিয়া যায়, তদ্রূপ শান্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ করিলে দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে অত্যধিক স্নেহ তাহাও আপনা হইতে চলিয়া যায়। যে পরিমাণ প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বিষয়সেবা করিয়া অন্তরে দেহের ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হইবে এবং বাহিরে আসক্তবৎ আচরণ করিয়া লোকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত নহে। জ্ঞাতিগণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহা বাঞ্ছা করে, তাহাতেই আমোদ করিবে, কিছুতেই মমতা রাখিবে না, এই প্রকারে নারদ যে উপদেশ দিয়াছেন গৃহস্থের পক্ষে তাহাই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক উপদেশে প্রথম কথা বলিলেন ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। পরের শ্লোকে এই শ্রবণের ফল কি তাহাই বলিতেছেন।

"যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম-গ্রন্থি-নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিং ॥"

ভগবানের অনুধ্যানরূপ যে খড়্গ সেই খড়্গযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিবেকীগণ অহঙ্কারের বন্ধন ও কর্ম্ম এতদুভয়কে ছিন্ন করিয়া থাকেন, অতএব কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানের কথায় না রতি করিবেন?

শ্রবণের মধ্যেই অনুধ্যান রহিয়াছে। কেবল শুনিয়া হয় না। শ্রুতবাক্যের অর্থ গ্রহণের জন্য মনকেও ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়, এই যে মানসিক ক্রিয়া ইহার নাম অনুধ্যান। আমরা সর্ব্বদা মূল্যহীন অসার কথা শ্রবণ করিতেছি, ফলে ক্রমে ক্রমে অসার বিষয়ে বদ্ধ হইয়া অবনতির দিকেই ধাবিত হইতেছি! অসার বিষয় শ্রবণ ও আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যদ্যপি সৎশাস্ত্র বিশেষতঃ শ্রীভগবানের লীলা কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করি তাহা হইলে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসিবে, নির্ম্মল চিত্তে সত্যের প্রকাশ হইবে এবং আমরা ধন্য হইব, এই জন্য মঙ্গললাভের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় এবং যাহা আমরা অনায়াসেই আশ্রয় করিতে পারি শ্রীমদ্ভাগবতকার আমাদের জন্য— তাহারই ব্যবস্থা করিলেন।

এখন কথা হইতেছে যে হরি-কথায় রতি কর্ম্মনির্ম্মূলনী তাহা সত্য, কিন্তু কথায় রতি জন্মায় কৈ? এই প্রশ্ন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, চিরদিনই সাধকগণের চিত্তে উদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥
শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

হরি কথায় যদ্যপি রতি না হয় তাহা হইলে পবিত্র তীর্থের সেবা করিতে হয়, মহতের সেবা করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধা জন্মে, শুনিতে ইচ্ছা হয় এবং ক্রমে বাসুদেব-কথায় রুচি হয়। ভাগবতী কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ বিদূরিত হয়, কারণ যাঁহারা হরি কথা শ্রবণ করেন সাধুগণের সুহৃৎ হরি তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাদের কামাদি বাসনারূপ বাহ্য ও আন্তরিক যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করেন। নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা সেই সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হইলে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন রজঃ ও তমোগুণ জন্য কামলোভাদি চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণে অবস্থিত ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তিযোগে মন এইরূপে প্রসন্ন হইলে সংসারপাশ হইতে মনুষ্য মুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার অহঙ্কার নষ্ট হয়, সকল সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্ম-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়।

পাহাড়' পরে।

(Gabriel Dante Rositti)

(১)

ওই যে পাহাড়' পরে
সারাটি পথ কি যেতে হবে ওগো।
এমনি ঘূর্ণাকারে ?
হাঁগো হাঁ পথিক, সীমাশেষ তক্
এমনি ঘূর্ণাকারে।

(২)

দীর্ঘ দিবস ধরে
চলিতে হবে কি বিশ্রাম হীন
কঙ্কর পথ' পরে ?
হাঁগো হাঁ বন্ধু, সন্ধ্যা অবধি
যেতে হবে কঙ্করে।

(৩)

আঁধার আসিলে ঘিরে
বসিবার ঠাঁই নাই কিরে ভাই,
ওই পাহাড়ের শিরে ?
—পাবে, পাবে ভাই, শুভ্র শয্যা
সন্ধ্যা আসিলে ধীরে।

(৪)

দারুণ অন্ধকারে
দেখিতে পাব কি পান্থনিবাস
কোন পথে কোন ধারে ?
—ভয় নাই, ভাই,—সে বিরাম ঠাঁই
কেহই ভুলিতে নারে।

(৫)

স্তব্ধ আঁধার রাতে
সে দূর নিবাসে হবে না কি দেখা
অপর পান্থ সাথে ?
হবে দেখা হবে, আগে গেছে যারা
সে সব পথিক সাথে।

(৬)

আসিলে দুয়ার দেশে
আঘাতি কপাট বলিতে হবে কি
"ওগো খুলে দাও এসে ?"
নানা ভাই তারা রাখিবে না তোমা
বসায়ে দুয়ার দেশে।

(৭)

পথের ভ্রমন-শ্রান্তি
হবে না কি শেষ, দুর্ব্বল দেহ
পাবে নাকি সেথা শান্তি ?
—শ্রম অনুযায়ী পাবে সেথা ভাই
হবে না তাহাতে ভ্রান্তি।

(৮)

সকল প্রার্থী তরে
কেহ কি পাতিয়া রাখিবে সেথায়
শয্যা স্নিগ্ধ করে ?
কোন ভয় নাই আছে সেথা ভাই
শয্যা সবারি তরে॥

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব। (১০)

যথা—
সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে
সদ্ভিরাত্মনি
সা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ মনন৷ রোপনাত্মিকা
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা মাধুরী
শ্রবণে।
পৌগণ্ডাদি বিহার করিল সখাসনে॥
বজলীলা শ্রবণে আনন্দ হয় মনে।
বাসনা যাহার হয় তদ্রূপ সাধনে॥
নন্দগোপাদির ভাব করিয়া স্বীকার।
বাৎসল্যস্নেহে করে সেবা অঙ্গীকার॥
সখাগণের ভাবে যেবা প্রেম হন।
সুদামাদির আনুগত্যে মানসসেবন॥
নন্দগোপাদির ভাব বাৎসল্যাদি রতি।
সেই ভাবে আনুগত্যে করিবেন প্রীতি॥
আমি নন্দ কৃষ্ণ পুত্র এমত ভাবনা।
না করিহ হেন চিত্তে শুন বিজ্ঞজনা॥
গোপগোপী অনগত ভাব দ্বারে হবে।
আমি পিতা, মাতা ভ্রাতা ইহা না
জানিবে॥
অপরাধ লাগি হয় এমত মনন্।
সেবা সেবক কথা ঘুচে শুন বিজ্ঞজন॥
যথা—
লুব্ধৈর্বাৎসল্য সখ্যাদৌভক্তি কার্য্যাত্র
সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্র সুবলাদিনাম্ ভাবচিষ্টিত মুদ্রয়া॥
অস্যার্থঃ— শ্রীজীবগোস্বামী—
পিতৃত্বাদ্যভিমানহি দ্বিধা সম্ভবতি
স্বতন্ত্র তৎপত্রাদিরভেদ ভাবনয়া।
তত্র অন্ত্যং অনুচিতং ভগবৎ অভেদো
পাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্ব
প্রতিপাদয়িষ্যমানেষু তৎ অনৌচিত্যাৎ
তথা তৎপরিবারেষু তদনুচিত ভাবনা
বিশেষেণ অপরাধপাতাৎ। তথা
তত্রৈব অন্যত্র।
গোপালানাঞ্চ গোপীনাং কৃষ্ণস্য
নিত্যসঙ্গিনাং।
বেশাদিকং ভাবনীয়ং বারণীয়ং বৈ
ক্কচিৎ।
কেহ পতি পুত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃজ্ঞানে।
কৃষ্ণসেবে প্রীতে সদা পরম যতনে॥
প্রেম সম্বন্ধে কৃষ্ণ করিঞা সেবন।
বাসনানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তার হন॥
যথা নারায়ণ ব্যুহস্তবে
পতিপুত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্র-
বদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদাদ্যুক্তাস্তেভ্যো-
পীহ নমোনমঃ॥
এই ত কহিল সাধন ভক্তির লক্ষণ।
তাহা মধ্যে বৈধীরাগ হইল সূচন॥
রাগানুগা হৈঞা কৃষ্ণ সেব বৃন্দাবনে।
মানসে প্রকটলীলা গোপগোপী সনে॥
গোপসঙ্গে গোপদেহ করি অঙ্গীকার।
দিনরাত্রি কর সেবা স্ব স্ব অধিকার
প্রকটা প্রকটলীলা কৃষ্ণের বিলসন।
নিত্য প্রকটরূপ সেবহ ভক্তজন॥

বৃন্দাবনে প্রকটা প্রকট সদা স্থিতি।
ব্রজ ছাড়ি একপদ অনত্র নাহি গতি॥
যেখানে ভগবান কৃষ্ণ সেইখানে
বৃন্দাবন।
সেইস্থলে ভদ্রাদেবী শ্রীরাধিকারণ॥
বলরামচন্দ্র নিত্য সখাসখি যত।
নিত্যলীলা কৃষ্ণসঙ্গে ব্রজে অবিরত॥
যথা শ্রীকৃষ্ণ যামলে
যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র বৃন্দাবনং
বনং।
তত্রৈব রাধিকা নিত্যা ভদ্রাদেবী চ
তত্র বৈ॥
তত্রৈব বলরামস্ত গোপ গোপ্যা
বরাঙ্গনাঃ ইতি॥
শ্রীল ভগবতামৃতে এ সব বর্ণন
নানা গ্রন্থের মর্ম্ম গোস্বামীর লিখন॥
স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ নিত্যলীলা করে।
মানুষের প্রায় হৈঞা বাল্যাদি
আচরে॥
স্বকীয় পার্ষদগণ সঙ্গতি করিঞা।
প্রকটে বিহরে নিজরূপ প্রকাশিঞা॥
সেই সেই ব্রজলীলা সখাসখি সনে।
অনুগত হৈঞা তাহা করিবে সেবনে॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয় দ্বিবিধ প্রকার
প্রকটলীলা এক অপ্রকটরূপ আর॥
প্রকটলীলাতে দেখি পুন গতাগতি।
অপ্রকটে সদা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে স্থিতি॥
সিদ্ধভক্ত প্রকট সদা দেখে বৃন্দাবনে।
অন্যের অদৃশ্য হৈতে অপ্রকট মানে॥
তিনধাম মথুরা দ্বারকা বৃন্দাবন।
প্রকটা প্রকটে কৃষ্ণের সদা বিলসন॥
নিত্যলীলা বৃন্দাবনে করেন নন্দসুত।
বৃন্দাবন ছাড়ি তার নাহি গতাগত॥
মথুরাতে বাসুদেব প্রকটে যৈছে রন।
অপ্রকটে মথুরাতে তৈছে বিলসন॥
যেমত দ্বারকানাথ দ্বারাবতী পুরে।
প্রকটা প্রকটে সদা লীলায় বিহরে॥
যথা শ্রীভাগবতামৃতে
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈবস্বৈঃ পরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে
হরিঃ॥
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তি-
রেবসা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং
বিভাবয়েৎ॥
প্রপঞ্চ্যাগোচরত্বেন সালীলা প্রকটা
স্মৃতা।
অন্যাস্বপ্রকটাভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥
তত্র প্রকটলীলায়াং স্যাতামেব গমা-
গমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ
শার্ঙ্গিণঃ।
যাস্তত্রলীলাপ্রকটা স্তত্রতত্রৈব সন্তি
তাঃ। ইতি
গোপগোপী সহকৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে।
ব্রজ ছাড়িএ কদা না যায় অন্য স্থানে।
তবে কহ মাথুর বিরহ কৈছে হন।
তাহাতে সিদ্ধান্ত এই করহ শ্রবণ॥
ভাগবতামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত অপার।
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার।

যতদূর গম্য মোর তাহা নিবেদিয়ে।
শ্রীগুরুগোবিন্দ ভক্ত সাধুজনার পায়ে॥
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যান অন্যস্থান।
প্রাকৃত লোকের মাত্র অগোচর হন॥
নন্দসুত,দ্বিভুজ সদাই বৃন্দাবনে।
কভু চতুর্ভুজ তিনি নাহি হন আপনে॥
যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
সর্ব্বদা দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো ন কদাচি-
চ্চতুর্ভুজঃ॥
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সক্কচিন্নৈব
গচ্ছতি॥ ইতি।
এই কথা ভবিষ্য কহেন স্পষ্ট করি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্লোক দেখহ বিচারি॥
গোলোকের পতি হরি লীলায়
অবতরে।
বৃন্দাবনে নন্দসুত যশোদা উদরে॥
বাসুদেব চতুর্ভুজ দেবকী গর্ভজাত।
তিঁহো কৃষ্ণাংশ প্রাভব বিলাস
রূপ খ্যাত।
যথা তত্রৈব
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যশোদ গর্ভ
সম্ভবঃ;
তস্যাংশো দৈবকীপুত্রো ভবিষ্যতি
চতুর্ভুজঃ॥
বাসুদেব চতুর্ভুজ দশমে লিখন।
বসুদেব সেইরূপ করিলা দর্শন॥
যথা দশমে
চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাদ্যুদায়ুধং
শ্রীবৎস লক্ষ্মং গলশোভী কৌস্তুভং॥
ইত্যাদি।

সেই বাসুদেব সর্ব্ব অবতারে শ্রেষ্ঠ।
সেহ কথা ভাগবতে অতিশয় স্পষ্ট॥
হতারিগতিদায়ী অবতারের কারণ।
সেইভাবে স্তুতি করে দেখ দেবগণ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরহরি।
ত্রিভুবন কর রক্ষা ভুবি অবতরি॥
অতএব তুমি সর্ব্বাবতার কারণ।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কহে দেবগণ॥
শ্রীদশমে দেবগণ স্তুতি।
মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ বরাহ হংস-
রাজন্য বিপ্রবিবিধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নো ত্রিভুবনঞ্চ তথা ধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনন্তে॥
পরব্যোম নারায়ণ বাসুদেব হন।
নন্দসুতের বিলাস রূপেত বর্ণন॥
অতএব নন্দসুত সর্ব্ব অবতারী।
যার অংশাংশ মহাবিষ্ণু আদি করি॥
সেই পূর্ণতম কৃষ্ণানন্দ গোপঘরে।
বামন হইলা জন্ম যশোদা উদরে॥
আদ্যা সনাতনী মায়া সহ জন্মাইল।
কন্যা পুত্র যশোদা লক্ষিতে নারিল॥
আগেত দেবকী রাণি প্রসবে তনয়।
চতুর্ভুজরূপে হৈল ভুমিতে উদয়॥
কৃপা করি পূর্ব্বকথা কহিলা বাসুদেবে।
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ হৈলা আপন প্রভাবে॥
বসুদেব বাসুদেবে আনিলা গোকুলে।
অদৃশ্য আছিলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥
যশোদার কোলেত রাখিলা শিশু
লঞা।
নন্দসুতে সেই শিশু প্রবেশিল যাঞা॥

বসুদেব না জানিল যামন কারণ।
যশোদার কন্যা লঞা করিল গমন ॥
বসুদেব সুত নন্দতনয়ে মিলায়।
মেঘে যেন ততক্ষণে বিজরি লুকায় ॥
গোষ্ঠে নন্দ গৃহে জন্মলীলা পুরুষোত্তম।
বসুদেব সুতআদি ব্যূহ নারায়ণ ॥
যথা শ্রীভাগবতামৃতে পুরুণান্তরং।
ব্যূহপ্রাদুর্ভবেদাদো গৃহেম্বানক-
দুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা-
পুরুষোত্তমঃ ॥
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতি গৃহং
বিশন্।
কন্যামেষ পরাং বীক্ষ্য তামাদায়
ব্রজেৎ পুরং ॥
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্ত শ্রীলীলাপুরুষো-
ত্তমং ॥ ইতি
অপিচ যথা শ্রীকৃষ্ণ যামলে।
যস্যাংশাংশো মহাবিষ্ণুর্লশোকাগর্ভ
সম্ভবঃ।
জাতোনন্দ গৃহে রাজন্ মায়য়া সহ
বামনঃ ॥
বসুদেব সমানীতো বাসুদেবোহখিলা-
ত্মনি।
লীনোনন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদা-
মিনী যথা। ইতি
এই কথা ভাগবতে আছয়ে বর্ণন।
রহস্য হইতে ব্যাস স্ফুট নাহি কন ॥
যথা শ্রীদশমে।
জায়মানেহজনে তস্মিন্নেদুর্দুন্দুভয়োদিবি
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
ইত্যাদি।
তত্রৈব
নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনা-
র্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্ব
গুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দু রিব
পুস্কলঃ ইত্যাদি ॥
অস্যার্থঃ। অজনে জনার্দ্দনে শ্রীকৃষ্ণে জায়মানে সতি অস্মিন্ নন্দগৃহে অর্থাৎ গোকুলে। তদা দিবি স্বর্গে দুন্দুভয়ো বাদ্যাঃ নেদুঃ। কিন্নর গন্ধর্ব্বগণা গানঞ্চ চক্রুঃ। সিদ্ধচারণাস্ত তুষ্টুবুঃ। ততো নিশীথে অর্দ্ধরাত্রৌ তম উদ্ভুতে সতি দেবরূপিন্যাং দেবক্যাং বিষ্ণু-বাসুদেব আবিরাসীৎ ও সর্ব্বগুহাশয়ঃ যথাপূর্ব্বে পূর্ণযন্ত্রস্যোদয়স্তথা।
নন্দাত্মজ ভগবান দ্বিভুজ প্রমাণ।
বাসুদেব চতুর্ভুজ পুরাণে ব্যাখ্যান ॥
বাসুদেব যদি হেতা নন্দের আলয়ে।
আত্মজ বলিঞা নারদ ব্যাস কৈছে
কহে ॥
আত্মা হৈতে জন্মাইলে আত্মজ বলি
তারে।
এই কথা ভাগবতে করহ বিচারে ॥
যথা দশমে।
নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহলাদমহামনা
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচি
রলঙ্কৃতঃ। ইত্যাদি

ব্রহ্ম স্তুতি ভাগবতে দশমে প্রণাম।
পশু পাঙ্গ জায় বলি করিলা প্রমাণ॥
পশূন্ পাতীতি পশুপোনন্দস্তস্য অঙ্গজঃ.
শ্রীকৃষ্ণ তস্মৈ নমঃ ইত্যাদি
যথা নৌমীড্যতে ইত্যাদিঃ॥
অতএব নন্দসুত লীলা অবতারে।
যুগধর্ম্ম পালনাদি বাসুদেব দ্বারে॥
যদুবংশে বাসুদেব কৃষ্ণ নাম খ্যাত।
লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ তিঁহো নন্দসুত॥
ব্রজে দুষ্টবধাদি বাসুদেবের কারণ।
গোপগোপী সহ নন্দসুত বিলসন॥
সর্ব্বদা দ্বিভুজ কৃষ্ণ ব্রজ অধিকারী।
রাধা সহ নিত্য লীলা সতত আচরি॥
বৃন্দাবন ছাড়ি তাঁর কাছু নাহি গতি।
প্রকটা প্রকটে কৃষ্ণ সদা ব্রজে স্থিতি॥
যথা শ্রীকৃষ্ণ যামলে।
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসংভূতো যঃপূর্ণঃ
সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সক্কচ্চিনৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচি-
চ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়াযুত স্তত্র পরিক্রীড়তি
সর্ব্বদা ইতি॥
প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের লীলাভেদ হন।
সকলের দৃশ্য লীলা প্রকট লীলা কন॥
নিত্যাসনে নিত্য লীলা অন্যে অদৃষ্ট
মান।
প্রাকৃতের অদৃশ্য লীলা অপ্রকট নাম॥
প্রকটে ত গতায়াত মথুরাদি দেখি।
কিরূপ গমন তাহা বিবরিয়া লেখি॥

নন্দসুত আপনাকে করেন গোপনা।
আমি বাসুদেব বলি করেন ঘোষণা॥
বসুদেব সুত বলি জগতে জানান।
স্বরূপ লুকাঞা বাসুদেব রূপে যান॥
অপ্রকট হৈঞা কৃষ্ণ রহে বৃন্দাবনে।
সখাসখি সহ কৃষ্ণ সদা রহে স্থানে॥
শ্রীভাগবতামৃতে।
অথ প্রকটরূপেন কৃষ্ণো যদু পুরীং
ব্রজেৎ॥
ব্রজেশ জত্ব মাচ্ছাদ্য সংব্যঞ্জন বাসু-
দেবতাং।
যো বাসুদেব দ্বিভুজ স্তথাভাতি
চতুর্ভুজঃ॥
তাস্তা মধুপুরীলীলা প্রকটাখ্যা
যদুদ্বহঃ। ইতি
পুনর্ব্বার সেই গ্রন্থে বিবরিঞা কন॥
উদ্ধারি ত দুই স্কন্দ পুরাণের বচন।
দ্বারকা বিহার কৃষ্ণ করেন যখন॥
সেই কালের শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
একদিন নারদ মুনি আইলা বৃন্দাবনে॥
দেখিলা কৃষ্ণের লীলা পরিকর সনে।
ধেনু বৎস লঞা কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে॥
শ্রীদামাদি সঙ্গে ক্রীড়া আনন্দ বিধানে।
বলরাম চন্দ্র সঙ্গে গোষ্ঠে গোচারণ॥
পূর্ব্বরাতে গোপীগণ লঞা বিলসন।
স্বানুভাবে গোপীগণ কৃষ্ণ লীলা গায়॥
প্রকট বিহার মুখি দেখিবারে পায়।
তাহা দেখি নারদ মুনি হইলা বিস্ময়॥
দ্বারকায় দেখিলাম কৃষ্ণ ব্রজে কৈছে
হয়।

পুনশ্চ নারদ গেলা দ্বারাবতী পুরে ॥
দ্বারকায় দেখিলা কৃষ্ণ প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রতি মন্দিরে কৃষ্ণ বিহার বৈভব ॥
বিস্ময় হইঞা মুনি কৈল বহু স্তব।
এই কথা মুনি কহে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
স্কন্দে যথা ॥
বৎসৈর্বৎস তরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তর গতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥
বর্ণয়ন্তি চ তং গোপ্যঃ কৃষ্ণ প্রেম পরিপ্লুতাঃ।
তথৈব দ্বারকাং গত্বা দৃষ্টো কৃষ্ণঃ গৃহে গৃহে ॥ ইতি
নিত্য ভক্ত শ্রীনারদ নিত্য লীলা জানে।
প্রাকৃতের অদৃশ্য হইতে অপ্রকট মানে ॥
শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে উদ্ধারি বর্ণিলা।
শ্রীযুতের কারিকায় স্পষ্ট বাখানিলা ॥
যথা—
যদাহনয়োস্তু সম্বাদো দ্বারাবত্যাং তদাহরিঃ।
তথাপি নিত্য ব্যথিত্বে প্রোক্তং তন্নিত্য ব্যথিকং ॥ ইতি
কৃষ্ণ প্রিয় প্রিয়া নিত্য গোপগোপীগণে।
নিত্যানন্দ বিলসন ব্রজে কৃষ্ণ সনে ॥
কোন দুঃখ ক্লেশ নাহি জানে নিত্যাগণ।
নিত্য সুখ পরিপূর্ণ কৃষ্ণার্পিত মন ॥
বিচ্ছেদ হৈলে কৈছে নিত্য সুখ রয়।
অতএব নিত্যার বিরহ নাহি কয় ॥
তত্র নিত্যা লক্ষণং।
অবিজ্ঞাতা খিল ক্লেশা সদা কৃষ্ণার্পিত ক্রিয়াঃ ॥
নিত্যাস্যুঃ সন্তত প্রেমা সৌখ্যাস্পদ পরায়ণা ॥
প্রকটা প্রকট কৃষ্ণের লীলা দুই হয়।
প্রকট মানুষী লীলার বিরহাদি কয় ॥
প্রকটা প্রকট কৃষ্ণের দ্বিধা বিলসন।
পরিকর জনারঐছে দুইরূপ হন ॥
প্রকট লীলানুসারে বিরহাদি দেখি।
নিত্য লীলানুসারে বিরহ নাহি দেখি ॥
যথা ॥
প্রেষ্ঠৈভ্যোতিপ্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুল বাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥
প্রকটে বিরহ সেহ দেখি তিন মাস।
তারপর ব্রজে কৃষ্ণ হইলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ সঙ্গ মিলন হইল সভে জানে।
বিবাহাদি স্বপ্নতুল্য মানিল তখনে ॥
যথা তত্রৈব
ব্রজে প্রকট লীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহো মুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ ॥
ত্রিমাসাৎ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ন সঙ্গতিঃ ॥
কিরূপ সঙ্গতি হৈল কর অবধান।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। (৫)

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃত হয় রশ্মিনি তৃচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপং॥

সাধিয়া অন্যায়-কার্য্য মানব যেমন,
আপন কুটুম্ব-জনে করয়ে রক্ষণ।
সেইরূপ করি তুমি, অর্জ্জুনের রথখানি,
নিয়ত করিলে রক্ষা ভীষণ সমরে,
অন্যায় তোমার কার্য্য, অজ্ঞে মনে করে।
জ্ঞানী দেখে ধর্ম্মময়, তব কার্য্য সমুদয়,
অধর্ম্ম অন্যায় লেশ কভু সেথা নাই
প্রেম ন্যায় পূর্ণরূপে আছে এক ঠাই।
সমরে সারথী মূর্ত্তি, এখনো হতেছে স্ফূর্ত্তি,
আমার হৃদয় মাঝে মরি কি সুন্দর
বাম হস্তে কশা, বল্গা শোভিত অপর।
যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমি, দেখিনু জগতস্বামী,
অর্জ্জুনেরো ঘটে নাই দর্শন তাহার,
সে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হৃদয় আমার।
স্বেচ্ছায় মৃত্যুর ক্রোড়ে, শুতে চাই চিরতরে,
এখন প্রার্থনা মোর চরণে তোমার
ওরূপ দর্শন হোক্ নিয়ত আমার।
যদি বল, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, পরমেশ,
যুদ্ধের সারথী মূর্ত্তি মোর নাই আর,
সব লীলা নিত্য তব ওহে বিশ্বাধার।

মরণে যা'র যা'মতি, ঘটে তার সেই গতি,
প্রসিদ্ধ এ শাস্ত্র বাক্য জানে সর্ব্বজন
তোমার সারথী-রূপ আমার প্রার্থন।
অন্তিমেতে দিতে দেখা, আসিয়াছ পার্থ সখা,
অবশ্য হইবে পূর্ণ অভীষ্ট আমার,
অন্তিমে দর্শন তব প্রমাণ তাহার।
অসুর-স্বভাব-যুত, অজ্ঞানেতে সমাবৃত,
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যত যোদ্ধদল,
মরিল, নেহারি তব শ্রীপদ-কমল।
আমি জ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে, দেখিনু চৌদিকে চেয়ে,
লভিল সাযুজ্য-মুক্তি তাহারা সকলে,
কেবল অন্তিমে তব দর্শনের বলে।
চিরদিন আমি দীন, ওই পাদপদ্মলীন,
অন্তিমে সাক্ষাৎ দৃষ্টি ঘটিল তোমার,
রতি হোক্ দয়াময় চরণে তোমার।
সংসার সমর ঘোরে, ভক্তের রথের পরে,
সারথীর বেশে তুমি নিত্য বিরাজিত
আততায়ী অস্ত্রাঘাতে শ্রীঅঙ্গ বিক্ষত।
তবুও হৃদয়-ভরা, করুণা অমৃত ধারা,
অসুরে সাযুজ্য মুক্তি করিছ প্রদান,
এরূপেতে হোক্ রতি মোর ভগবান্॥

একাবলী। (২)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের প্রস্তাব।

রাজা একবীরের রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে প্রবলপ্রতাপ রভ্যের রাজত্ব। সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও তিনি মহারাজ তুর্ব্বসুর ন্যায় অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে প্রজাবর্গ তাঁহার বশীভূত ছিল, তাঁহার ভাণ্ডার ধান্যপূর্ণ ও ধনাগার ধনপূর্ণ ছিল। তদায় মহিষী যেমন রূপবতী, তেমনি বিদ্যাবতী ছিলেন কিন্তু তিনি জঠরাকাশে পুত্র কন্যা

ধারণ না করিয়া চন্দ্রতারকাশূন্যাম্বরা রজনীর ন্যায় বিষাদমলিনা ছিলেন। সকল সুখ বিদ্যমান থাকিলেও সুতস্পর্শরূপ সুখানুভবে বঞ্চিত হইয়া রাজাও সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন। সুবিস্তৃত সাগরমধ্যে পতিত নর যেমন কাষ্ঠ ও তৃণাদি যাহা সম্মুখে পায় তাহাই অবলম্বন করে, শোকসাগরে পতিত রাজাও তদ্রূপ সাধারণ লোক বর্ণিত প্রক্রিয়া সকল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাহাতে সফল প্রযত্ন হইলেন না দেখিয়া মন্ত্রী ও পরিষদবর্গ তাঁহাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবার পরামর্শ দান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগের পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া প্রিয়তমারাণী সমভিব্যাহারে সমাহিতচিত্তে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী দেবী তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দান করিবামাত্র অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক কন্যা বহির্গত হইল। মহারাজ রভ্যও তাঁহার মহিষী পরমানন্দে সেই কন্যারত্নকে গ্রহণ করিলেন। তাহার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সম্পন্ন করিয়া কন্যার নাম একাবলী রাখিলেন। রাজান্তঃপুর আনন্দপূর্ণ হইল। রাজা ও রাণী মনের আনন্দে তাহার প্রতিপালনে রত হইলেন। ক্রমে যখন রাজকুমারীর বয়ঃক্রম পঞ্চমবর্ষ হইল তিনি নানাবিধ ক্রীড়ণক সাহায্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মন্ত্রীকন্যা যশোবতী তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গিনী হইল। এই অবধি উভয়ের এতাদৃশ প্রণয় সংঘটিত হইল যে যশোবতী আর বাটী গমন না করিয়া সর্ব্বদাই রাজবাটীতে একাবলীর নিকট থাকিতেন। রাজকুমারীর সহিত তাঁহার একত্র আহার, বিহার ও শয়ন হইতে লাগিল। রাজকুমারী একাবলী ও যশোবতী সমবয়স্কা ছিলেন। উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করিলে উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এরূপ সাদৃশ্য হইল যে সহসা দেখিলেন যমজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। একের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবয়ব যেমন অপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অনুরূপ হইল, উভয়ের মনও সেইরূপ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উভয়ের উভয়কে অদেয় কিছুই ছিল না, এমন কি উভয়ের একপতি হইলেও তাঁহারা উভয়কে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মনেরও স্ফূর্ত্তি বিকাশ পাইতে লাগিল। একাবলী, প্রিয়সখী যশোবতী ও অপর দুই একজন সখী সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদের অদূরবর্ত্তী পদ্মবিকসিত নদীজলে ক্রীড়া ও স্নানার্থে গমন করিতেন। সখীসমভিব্যাহারিণী একাবলী ও যশোবতীকে জলক্রীড়া করিতে দর্শন করিলে সকলেই মনে করিত ইহারা দেবকন্যা, জল-

ক্রীড়ার্থ মর্ত্তে আগমন করিয়াছে। বস্তুত একাবলী ও যশোবতীর রূপ অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যশোবতী উভয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না এজন্য তিন চারিজন সখীসমভিব্যাহারে জনসমাগমশূন্য স্থান অতি রমণীয় হইলেও স্নান ও ক্রীড়াদি পক্ষে যুবতীগণের বিপজ্জক মনে করিয়া যশোবতী প্রায়ই সখীকে এতাদৃশ কার্য্য হইতে বিরত হইবার অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বিলাসিনী রাজকুমারী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। একারণ এক দিবস যে সময়ে রাজা ও রাণী একাবলার বিবাহ সম্বন্ধীয় কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, যশোবতী সখীর অজ্ঞাতে সহসা তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "রাণি মা! আমার একটি নিবেদন আছে। একাবলী রাজপ্রাসাদের অদূরবর্ত্তিনী পদ্মপ্রস্ফুটিত নদীতে স্নান ও ক্রীড়ার্থে গমন করেন। একাবলী সন্তরণ পটু নহেন। নদীতে পতিত হইলে অকালমৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। তদ্ব্যতিরেকে কয়েকজন মাত্র অবলা স্ত্রীলোক রাজপ্রাসাদের পরোক্ষ জনসমাগম শূন্য স্থানে ক্রীড়ামান থাকিবে তাহাও অযুক্তিকর। শত্রুপক্ষ ও দুষ্টমতি লোক হইতে বিশেষতঃ আশঙ্কার কারণ আছে। রাজা শ্রবণ করিয়া যশোবতীর ভূরসী বুদ্ধিপ্রশংসা করিলেন এবং মন্ত্রীকে আহ্বানানন্তর আদেশ করিলেন কন্যা একাবলী পদ্মবনে সখীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া ও স্নানাদি করিতে ভাল বাসেন। কয়েকজন মাত্র যুবতী সখী মিলিয়া অদূরবর্ত্তিনী নদীতে গমন করেন ইহাও যুক্তিকর বলিয়া বোধ হয় না। অতএব হে মন্ত্রিবর! আপনি লোক নিযুক্ত করিয়া দিবসত্রয়ের মধ্যে আমার অন্তঃপুরাঙ্গনে সুবিস্তীর্ণ সরোবর খনন করাইয়া নদী হইতে বিকসিত পদ্মসহ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাতে রোপণ করিয়া দিন। রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র মন্ত্রীপ্রবর তৎপ্রতিপালনে যত্নবান হইলেন এবং নির্দ্ধারিত দিবসত্রয় মধ্যেই অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে পদ্মপ্রস্ফুটিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। একাবলী যশোবতী প্রভৃতি সখীগণ মনের আনন্দে সেই সরোবরে স্নানক্রীড়াদিতে নিযুক্ত হইলেন।

স্বীয় কন্যা ও মন্ত্রীকন্যাকে বয়স্থা অবলোকন করিয়া রাজা রভ্য তাহাদিগের বিবাহার্থ পাত্রানুসন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীবরকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে আদেশ দিলেন। রভ্যরাজতুর্ব্বসুপুত্র একবীরকে উপযুক্তপাত্র মনে করিয়া তুর্ব্বসুরাজের নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন রাজা তুর্ব্বসু বনগমনে কৃতসংকল্প হইয়া রাজা রভ্যের নিকট এই বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন, যে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ও বার্দ্ধক্য হেতু আমার শরীর নিস্তেজ

ও অবসন্ন হইতেছে একারণ আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথানুসারে বনাশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তায় অবশিষ্টজীবনকাল অতিবাহিত করিব, সুতরাং আমি আর পুত্রের বিবাহের জন্য সঙ্কল্পিতকার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হইতে অভিলাষ নই। আমি বয়স্য ও মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে আমাদিগের বনপ্রবাসকালে একবীরের সহিত আপনার কন্যার পাণিগ্রহণকার্য্য সম্পন্ন করিবার আদেশ দিলাম। আপনার আগ্রহে ও তাঁহাদিগের যত্নে অচিরেই যেন একার্য্য সমাধা হয় এই বাসনা।"

রাজা তুর্ব্বসু দূতসকাশে রভ্যরাজকে এবংবিধ সন্দেশ প্রদান করিয়া এবং মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে স্বীয়পুত্র একবীরের সহিত রভ্যরাজ-দুহিতা একাবলীর বিবাহদানে আদেশ দান করিয়া পত্নীসমভিব্যহারে বনাশ্রয় অবলম্বন করিলেন। একবীরও মাতাপিতৃবিরহে একান্ত অভিভূত হইলেন দেখিয়া মন্ত্রী কিম্বা পারিষদবর্গের কেহই আর তাঁহার নিকট বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপনে সাহস পাইলেন না।

এদিকে রাজা তুর্ব্বসু অপুত্রক হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনান্তে কে আর পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিবে এই চিন্তায় দেবগণও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজা তুর্ব্বসুর পুণ্যশীলতায় ও দেবগণ নমস্য বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁহাদিগের সে উৎকণ্ঠা নিবারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একবীরের আবার বিবাহ বিষয়ে উদাসীনতা অবলোকন করিয়া দেবগণহৃদয়ে পূর্ব্ব-প্রধূমিত উৎকণ্ঠা এক্ষণে অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতে লাগিল।

একদা বৈজয়ন্তধামে দেবেন্দ্র সিংহাসনাধিষ্ঠিত আছেন এমন সময়ে নারদ তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! মহারাজ তুর্ব্বসু অপুত্রক হইয়া যেমন মর্ত্তে অরাজকতা ভয় উৎপাদন করিয়াছিলেন অধুনা একবীরও তাহাই করিতেছেন। ইনি বিবাহ বিষয়ে একান্ত উদাসীন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন সে অপুত্রক হইয়া যে পুনরায় মর্ত্ত্যভূমে অরাজকতার আশঙ্কা উৎপাদন করিবে তাহা শেষশায়ী হরির অভিপ্রেত নহে। এই একবীরের বংশে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, সুতরাং সাবিত্রীদেবীপ্রদত্তা রভ্যরাজদুহিতা যাহাতে তাঁহার মহিষী হয়েন তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে।

নারদের এই সদর্থযুক্ত বাক্যের উত্তরদানপূর্ব্বক দেবরাজ কহিলেন, "দেবর্ষে! স্বর্গপুরে মদন আমার সাহায্যকারী থাকিতে এ সামান্য কার্য্য

সম্পাদনে আমি কেন কুণ্ঠিত হইব ?" এই বলিয়া দেবরাজ মদন দেবকে স্মরণ করিলেন। নিমেষ মধ্যে পুষ্পধনু সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'দেবরাজ! কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ? পুনরায় কি কেহ আপনার স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তিকামনায় দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইলে বলুন আমি নিমেষ মধ্যে তাহার তপোভঙ্গসাধন করিতেছি।" দেবরাজ তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, "মদন! তুমিই এ স্বর্গপুরে আমার যথার্থ সাহায্যকারী। একদা তুমি ললাটাগ্নিসমন্বিত হরকোপানলে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিয়া যে হরপার্ব্বতীর মিলন সংসাধিত করিয়াছিলে, তদ্দ্বারাই দেবগণ আজও পর্য্যন্ত তারকাসুরের অত্যাচারশূন্য হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বর্গপুরে বসতি করিতেছেন। তোমার সেই উপকার আমি কখন ভুলিতে পারিব না। অধুনা এই দেবর্ষি কর্ত্তৃক তদুপযুক্ত সামান্য কার্য্যসাধনে আদিষ্ট হইয়া তোমাকে স্মরণ করিলাম। ভবতলে লক্ষ্মীদেবীর জঠরাকাশসম্ভূত পুত্র একবীর বিবাহ বিষয়ে একান্ত উদাসীন। তিনি অপুত্রক হইলে মর্ত্ত্যভূমে পুনরায় অরাজকতা বিরাজ করিবে এই আশঙ্কায় সাবিত্রীদেবীপ্রদত্তা রভ্যরাজদুহিতাসহ যাহাতে তাঁহার বিবাহ সংঘটিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। হয়গর্ভসম্ভূত একবীর সহ সাবিত্রীদেবীপ্রদত্তা রভ্যরাজদুহিতাসহ সম্মিলনে যে বংশের সৃষ্টি হইবে তাহারা সকলে হৈহয় নামে খ্যাতিলাভ করিবে ইহাই নারায়ণের ইচ্ছা।

দেবরাজ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পুষ্পধনু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "দেবেন্দ্র! আপনার কার্য্যসম্পাদনে আমার কখনই আলস্য নাই তবে এক্ষণে মহারাজ একবীর মাতাপিতৃবিরহ দুঃখে একান্ত ম্রিয়মান আছেন, এসময়ে তাঁহাকে মদনবাণে জর্জ্জরিত করিলে তিনিই লোকসমাজের হেয় হইবেন। আমার অব্যর্থ সন্ধান তাহাত আপনি বিশেষ অবগত আছেন, এ সময়ে কোথায় তিনি মাতাপিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন তাহা না করিয়া তিনি যদি একাবলীর পাণিগ্রহণে অধীর হয়েন, তাহা হইলে তুর্ব্বসু ও রভ্যরাজ উভয় বংশই জনসমাজের বিদ্রূপভাজন হইবে। অতএব কয়েক দিবস অপেক্ষা করুন, মহারাজ একবীর মাতা পিতৃশ্রাদ্ধাবসানে অপগত বিরহ ক্ষোভ হইলে পুষ্পধন্বার পুষ্পধনুর প্রভাব অবগত হইবেন।"

মন্মথের এবম্প্রকার সুদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ ও স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্র, উভয়ে তাহারই অনুমোদন করিলেন। তখন মন্মথ উভয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

রভ্যরাজাজ্ঞায় মন্ত্রী কর্ত্তৃক খাত অন্তঃপুরাঙ্গনবর্ত্তী বিকশিতপদ্মমণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ সরোবরে সখীগণ সমভিব্যহারিণী একাবলী স্নানক্রীড়াদিরতা হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই স্রোতবিহীন আবদ্ধ জলে ক্রীড়া তাহার অতৃপ্তিদায়িকা হইয়া উঠিল। তখন তিনি যশোমতী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই নদীজলে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যশোবতীর ইহাতে বড়ই ভয়, একারণ তিনি পুনরায় রাজা ও রাণীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে স্থির করিলেন।

একদিবস রভ্যরাজ অন্তঃপুরে মহিষীর সহিত একাবলীর বিবাহসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছেন। তুর্ব্বসু রাজসমীপে দূত প্রেরণের কি ফলোদয় হইল জিজ্ঞাসিত হইয়া রভ্যরাজ কহিলেন, "প্রিয়ে! সেবিষয়ে আমি বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি। রাজা তুর্ব্বসু শরীরক্ষয়বশত আর অপেক্ষা না করিয়া মহিষী সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়াছেন। তবে তিনি বনগমন কালে মন্ত্রী ও পারিষদ বর্গকে একাবলীর সহিত একবীরের বিবাহ দিবার আদেশ দান করিয়াগিয়াছেন। তথাপি মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের কোন প্রকার যত্ন না দেখিয়া আমিও সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

তখন মহিষী কহিলেন, "নাথ! আমার বিবেচনায় ভালই হইয়াছে। বিবাহ যখন একবীরের মতের উপর নির্ভর করিতেছে তখন আমার বিবেচনায় যাহাতে একবলীর সহিত একবীরের সাক্ষাৎ হয় তাহাই করুন। একাবলী ও পরমা রূপসী। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি একবীর তাহার দর্শনলাভ করিলেই পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন।

রাজা কহিলেন প্রিয়ে! মনে যাহা অনুধ্যান করা যায় তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠান করা বড়ই দুরূহ। রাজা তুর্ব্বসুর অবর্ত্তমানে আমি কাহার নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিব?

রাজা ও রাজমহিষীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে যশোবতী সেই প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া কহিলেন, রাণি মা! আমি আবার আপনাদের নিকট উপনীত হইলাম।

রাণী। কি কথা আছে বলিয়া ফেল ?

যশো। রাণী মা! সখী একাবলী আমাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া পুনরায় পদ্মপ্রস্ফুটিত নদীতে গমন আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজা যশোবতীর বাক্য শ্রবণে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কেন, আমি অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনে সুদীর্ঘ পদ্মমণ্ডিত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছি, তবে একাবলী নদীতে গমন করিতেছে কেন ?

যশো। আজ্ঞে, স্রোতজল ব্যতিরেকে স্নান ও ক্রীড়াদি সখীর তৃপ্তিজনক নহে।

এতদূর পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া মহিষী যশোবতীকে মিষ্টকথায় বিদায় দিলেন। অনন্তর রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! ভালই হইয়াছে। ভগবানের কার্য্য সকলই ইষ্টের জন্য হইয়া থাকে। একাবলী যেমন নদীতে স্নান ও ক্রীড়ার্থে গমন করিতেছে তাহাই করুক।" সে ত আর একাকী গমন করিতেছে না, বরং তাহার সঙ্গে তাহাদের রক্ষার্থে জনকয়েক শান্ত্রী-পাহারা প্রত্যহ স্নানবেলায় প্রেরণ করুন। যদি কখন একবার ভ্রমণার্থে এই দিকেই আগমন করেন, তবে একাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে।

রাজা মহিষীর বাক্য অনুমোদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয়ে! একাবলী না দ্যূতক্রীড়া-নিপুণা ? তাহা যদি হয় আমি এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিব যে, যে ব্যক্তি রাজকুমারী একাবলীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিতে পারিবে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন।

রাণী রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিদ্রুপাত্মক স্বরে কহিলেন, তাহাও কি কখন সম্ভব হয়, যে-যেখান হইতে পাশাক্রীড়ার্থ আগমন করিবে, আর একাবলী তাহারই সহিত ক্রীড়া করিবে ? তাহাই যদি তোমার অভিলষিত হয় তবে স্বয়ম্বরপ্রথাবলম্বনই ত উচিত।" রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! স্বয়ম্বর সামান্য আয়োজন-সাপেক্ষ নহে। স্বয়ম্বর ত্রিবিধ, ইচ্ছাস্বয়ম্বর, পণস্বয়ম্বর ও শৌর্য্যস্বয়ম্বর। এই তিনপ্রকার স্বয়ম্বরেই বিপুল আয়োজনের আবশ্যক। প্রথমতঃ সভাগৃহ ও নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগের আহার বিহারোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে হয়। তৎপরে ইচ্ছাস্বয়ম্বরে কন্যাই সমাগত রাজন্যবর্গ মধ্য হইতে মনোমত পুরুষরত্ন মনোনীত করিয়া তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করেন। দ্বিতীয়তঃ পণস্বয়ম্বরে পিতামাতা বা কন্যা কোন পণ নির্দ্দিষ্ট করেন। সমাগত

রাজন্যবর্গের যে কেহ সেই পণসাধনে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনিই কন্যার পতিরূপে নির্দ্ধারিত হয়েন। আর শৌর্য্যস্বয়ম্বরে সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে যিনিই বলশ্রেষ্ঠ গণনীয় হইবেন তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারাই বলশ্রেষ্ঠতা অনুমিত হয়। আমি এই ত্রিবিধ স্বয়ম্বরের কোন প্রথাই অবলম্বনে সমুৎসুক নহি। 'দ্যুতক্রীড়া পণ ঘোষণা করিলে একে একে রাজগণ আগমন করিবেন এবং আমারই এই রাজবাটীর কোন প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে ক্রীড়া সম্পাদিত হইবে। অবশ্য তুমি যাহা বলিলে আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে। রাজকুমারী রাজকুমার ব্যতিরেকে কাহারও সহিত ক্রীড়া করিবে না। প্রিয়ে!' আমি যাহা স্থির করিলাম ইহাও একপ্রকার আড়ম্বরশূন্য স্বয়ম্বর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ যে রাজকুমার একাবলীর সহিত ক্রীড়ার্থে আগমন করিবেন, তাঁহার হাবভাব চরিত্র আচরণ সকলই একাবলী বিলক্ষণ অবগত হইবেন। চরিত্রবান ও প্রিয়দর্শন রাজকুমার দেখিয়া যাহাকে একাবলী মনোনীত করিবেন তাহারই নিকট পরাস্ত হইলেই চলিবে। জয় পরাজয় ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তিরই আয়ত্ত। রাজকুমারী যদি ক্রীড়ানিপুণ হয়েন তবে অমনোনীত রাজকুমারকে পরাস্ত করিয়া দিবেন এবং প্রিয়দর্শন শিষ্টাচারসমন্বিত বিনয়ী রাজকুমারের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

রাজমহিষী রাজার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! এ পণ সর্ব্বাংশে উত্তম হইল না। যে সমস্ত রাজপুঙ্গব দ্যুতক্রীড়ানিপুণ নহেন তাঁহারা কখন কামিনীজনের নিকট পরাজয়ভয়ে অগ্রসর হইবেন না। তাহার উপর তুর্ব্বসুপুত্র একবীর দ্যুতক্রীড়ারত কি না জানা নাই। তিনি না আগমন করিলে ত আপনার ইচ্ছা বলবতী হইবে না।" রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! জগতে কোন পদার্থই সর্ব্বাংশে উত্তম নাই। যাহা একজনের নিকট ভাল তাহা অপরের নিকট অপ্রিয় হইতে পারে। সুতরাং সকলদিক আলোচনা করিলে চলিবে কেন? তুর্ব্বসুপুত্র যদি একান্তই না আইসেন, তাঁহাকে না হয় নিমন্ত্রণ করা যাইবে।

সঙ্কল্প স্থির হইলে রভ্যরাজ মন্ত্রীকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "মন্ত্রিবর এইরূপ একটা ঘোষণা করিয়া দিন যে, যে রাজকুমার রভ্যরাজদুহিতা একাবলীকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করিবেন তিনিই তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। মন্ত্রিবর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলে রভ্যরাজ স্বীয় বয়স্য

বিজয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিজয় রাজসমীপে উপনীত হইলে রাজা সস্নেহে কহিলেন, "বয়স্য আসিয়াছ ? বস, তোমার সহিত একটী গোপনীয় কথা আছে।"

বিজয়। যা থাকে বলুন, আমি গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু মহারাজ মনে রাখিবেন, বিজয় কখন গোপনে থাকে না।

রাজা। না বয়স্য, এ তামাসার কথা নয়, মনোযোগপূর্ব্বক শোন।

বিজয়। তামাসা না হয় আমাশা হবে, গরম গরম লুচির ব্যবস্থা করলেই চল্‌বে এখন।

রাজা। আচ্ছা তা হবে এ'খন।

বিজয়। প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন ?

রাজা। আচ্ছা কর্‌লাম, এখন শোন। একাবলী ত যৌবনস্থা হয়েচে তার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এজন্য আমি ঘোষণা করে দিয়েছি যে, যে রাজকুমার একাবলীকে পাশাক্রীড়ায় পরাস্ত কর্‌তে পার্‌বেন তিনিই রাজকুমারীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজয় মহারাজ ! আপনি যেন কবি কালিদাস, আমি তার মল্লিনাথ। সুতরাং এ কথায় আমার দুইটী টিপ্পনী আছে।"

রাজা। আচ্ছা, যা থাকে বল।

বিজয়। প্রথমটী এই যে সমুদ্রমন্থন করে যত সুধা উঠ্‌ল তা দেবতারা ভাগকরে খেলেন, আর মহাদেবের ভাগ্যে গরলভক্ষণ সার হলো। আপনি দেশবিদেশে যা ঘোষণা কল্লেন, তাই এক্ষণে বিজয়ের ভাগ্যে পড়ে গোপনীয় হয়ে দাঁড়াল ?

রাজা। এই বুঝি তোমার টিপ্পনী ?

বিজয়। কথা কইবেন না, দ্বিতীয়টা শুনুন আগে।

রাজা। আচ্ছা, বল বল।

বিজয়। আপনি ঘোষণা করেছেন যে, যে রাজকুমার একাবলীকে পাশাক্রীড়ায় পরাস্ত করবেন তিনি রাজকুমারীকে পেত্নীরূপে প্রাপ্ত হবেন। এই ত ?

রাজা। পেত্নী কেন হে ? পত্নী, পত্নী।

বিজয়। আজ্ঞা, ওটা আপনার ভুল কারণ রাজকুমারী বিবাহিতা হলেই ত অপর একজনের স্কন্ধে চড়বেন ?

রাজা। আচ্ছা, সে যাক, এখন শোন।

বিজয়। আজ্ঞা, আমি ত আর কাণে ছিপি লাগাইনি!

রাজা। আরে কাণে কি হবে মন চাই।

বিজয়। কান চাই না, মন চাই, তোমরা কেউ মন নেবে গো!

রাজা। ভাল পাগলের পাল্লায় পড়লাম দেখছি? মন দিয়ে শোন।

বিজয়। আমি ত আর রমা নই যে, আমার মন রমণ করে বেড়ায়?

রাজা। তবে শোন। এই পাশা ক্রীড়ার ঘোষণার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, একবীর শুনে যদি পাশাক্রীড়ার জন্য আসেন, তা হলে আমরা কৃতার্থ হই। মহিষীর একান্ত ইচ্ছা একবীরের সহিত একাবলীর বিবাহ দেন। তুমি যদি স্বয়ং কিম্বা তাঁর বয়স্যকে বলে একবীরকে পাশাক্রীড়ায় উৎসাহিত করে দিতে পার, তবেই বড় ভাল হয়।

বিজয়। এই ত কথা? তার আবার ভাবনা কি? তাই করা যাবে এখন, তবে আমি আসি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন।

রম্ভারাজের ঘোষণানুসারে দুই দিবস ধরিয়া রাজকুমারগণ একাবলীর সহিত ক্রীড়ার্থ রম্ভারাজপ্রাসাদে আগমন করিতেছেন। রাজকুমারীর অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশলে তাঁহাদিগের সকলেই পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ক্রীড়া করিতেও সাহসী হন নাই। একমন কখন দুইকার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হয় না। ইহাঁরা অক্ষক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছিলেন রাজকুমারীর সম্মুখে উপনীত হইয়াই তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় আর রাজকুমারীর ভ্রমরাধ্যুষিত-রক্তোদর শতফুলপদ্মনিন্ত কৃষ্ণতার চক্ষুসমন্বিত রক্তগণ্ড মুখকমল হইতে অপসৃত হইয়া কার্য্যান্তরে লিপ্ত হইল না। তাঁহাদিগের মনমক্ষিকা সতৃষ্ণ হইয়া সেই পদ্মমধু আহরণে রত হইল। তাঁহাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় রাজকুমারীর বিভক্তবিম্বাধরপ্রকাশিত বিদ্যুৎপ্রভাস্ফুরিত-স্বচ্ছমুক্তাফল সদৃশ দন্তরাজি বহির্গত বীণাধ্বনি বিনিন্দিত সুমধুর বচনাবলী আগ্রহসহকারে পান করিতেছিল। তাহাদিগের অপরাপর ইন্দ্রিয়শক্তি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়েই প্রকটিত হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের দেহ ও হস্তপদ অবষ্টম্ভতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজকুমারী কর্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহারা অঙ্গচালনে সমর্থ হন

নাই। পরিশেষে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতালাভে অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশহৃদয়ে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। অবসর পাইয়া রাজকুমারী নিজকক্ষে গমনপূর্ব্বক অদ্ভুত খট্টাঙ্গে শয়ন করিলেন। রাজকুমারী নিদ্রিতা হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বপ্নদেবী তাঁহার জ্ঞান ও বৃত্তিকুলকে চালনা করিয়া এক স্বপ্নপ্রপঞ্চ রচনা করিলেন। তাহার বোধ হইল যেন একবীর পাশাক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছেন। রাজকুমারী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আর পাশাক্রীড়া করিবেন কি? রাজকুমারগণ যেমন তাহার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অবষ্টব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনিও তদ্রূপ একবীরের নিষ্কলঙ্ক সহস্রচন্দ্রজ্যোতি-সমন্বিত মুখকমল বন্ধুজী-রাগ-অধরযুগল, রক্তাভসূক্ষ্মশিবাদলশোভিত কৃষ্ণতার লোচনদ্বয় ও রতিপতির কার্ম্মুকসম ভ্রূদর্শন করিয়া অবষ্টব্ধদেহ হইলেন। কিন্তু তিনি রাজকুমার-গণের ন্যায় হতাশহৃদয়া না হইয়া কৃতার্থম্মন্যা হইলেন এবং প্রেমভরে স্বীয় দেহমন সমস্তই তাহার করে অর্পণ করিলেন। অতঃপর মনের আনন্দে তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ পাশাক্রীড়া করিলেন।

স্বপ্নদর্শনান্তে জাগরিতা হইয়া রাজকুমারী স্বপ্নবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম! স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার মন উচাটন হইয়াছে। আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এমন রূপও দেখি নাই, এমন পাশাখেলাও দেখি নাই। কবিরা বলেন, জগতে সম্পূর্ণ ভাল কিছুই নাই। গোলাপফুল উত্তম, কিন্তু তার গাছে কাঁটা আছে। চন্দ্র কেমন উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাতেও কলঙ্ক বিদ্যমান। রাজকুমারের কিন্তু সবই ভাল। যেমন রূপ, তেমনি পাশাখেলা। তাহার উপর তাঁহার সেই মধুর হাসি, দেখিলে প্রাণ কাড়িয়া লয়। কাড়িয়া লয়ই বা বলিতেছি কেন? আমার প্রাণ কি আর আমার দেহপিঞ্জরে আছে? তাহা তাঁহারই সহিত গমন করিয়াছে। বিধাতা এই পাশাক্রীড়ার স্বপ্ন না দেখাইয়া সত্যসত্যই কেন পাশাক্রীড়া করাইলেন না?

রাজকুমারী এইরূপ নিবিষ্টচিত্তা হইয়াছেন যে তদীয় সখী যশোবতী গৃহে আগমন করিলেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি না জানিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "বাবা ত পাশাক্রীড়া করিবার ঘোষণা করিয়া দিয়েছেন, কত রাজপুত্র আসিলেন ও পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অভাগিনীর কপালক্রমে তিনি কি আর আসিবেন? এখন হ'তে অপরে যে

পাশাখেলা করিতে আসিবে তাহা আর আমার ভাল লাগিবে কেন? হা পরমেশ্বর! গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইও না। যাঁহার প্রতিমা আমাকে দেখাইলে তাঁহারই পদসেবায় দাসী করে দেও।

যশোবতী রাজকুমারীর মুখবিনির্গত এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণগোচর করিয়া আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কার প্রিয়সখি! কার দাসী হতে চাচ্চ?

একাবলী চমকিত হইয়া পশ্চাৎভাগে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন তাহার প্রিয়সখী যশোবতী উপস্থিত। তখন তিনি তাঁহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! বোন, আমার দুঃখের কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছ?" যশোবতী কহিলেন, না বোন, আমি এইমাত্র আগমন করিয়া তোমার কথার শেষ অংশ মাত্র শ্রবণ করিলাম। কোন রাজকুমার কি পাশাখেলা করিতে আসিয়াছিলেন?

একাবলী কহিলেন, "না বোন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াই উতলা হইয়া উঠিয়াছি।

যশো। কি স্বপ্ন বল না শুনি।

একা। বোন। দিনের বেলায় একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম "যেন তুর্ব্বসুপুত্র একবীর আগমনপূর্ব্বক আমার সহিত পাশাক্রীড়া করিলেন। বোন! তাঁর রূপের বর্ণনা আর কি করিব, যেন সাক্ষাৎ মদন। আর তাঁহার পাশাক্রীড়াই বা কি? ভাই! তোমার নিকটে আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সকল বিষয়েই পরাজয় মানিয়াছি। আমার সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়া তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে তিনি দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পদে স্থানদান করিলেই রক্ষা পাই।

যশো। সখি! স্বপ্ন অলীক, স্বপ্নদর্শনপূর্ব্বক তোমার ন্যায় শিক্ষিতা রাজকুমারীর উতলা হওয়া বড়ই বিস্ময়জনক। কত রাজকুমার আসিবেন, তাঁহাদিগের সহিত পাশাক্রীড়া করিয়া যাহার নিকট পরাজিত হইবে তাঁহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিবে।

একা। বোন! আমার কি আর পাশাক্রীড়া করিবার ক্ষমতা আছে? আমি নিদ্রিতাবস্থায় যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছি তাঁহারই করে আমার প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন, সমস্তই অর্পণ করিয়াছি।"

প্রিয়সখীদ্বয় এইরূপ অন্তর খুলিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন ইত্যবকাশে

জনৈক পরিচারিকা আগমনপূর্ব্বক সংবাদ দিল যে জনৈক রাজকুমার পাশাক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছেন সুতরাং রাজকুমারীকে বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমনের আদেশ দান করিয়া কহিয়া দিলেন যেন রাজকুমারের সমাদরের ক্রটী না হয়।

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে রাজকুমারী একাবলী রাজাজ্ঞাশ্রবণে একান্ত বিবশা হইয়া পড়িলেন এবং বিনীতভাবে প্রিয়সখীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখি, আমার উপায় কি হইবে ? কি করি বল দেখি ?

যশো। সখি! কি আর করিবে ? রাজকুমারের যথাযোগ্য সমাদর করা আবশ্যক, একারণ একবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক পাশাক্রীড়ায় নিযুক্ত হও। তিনি আগন্তুক, তুমি গমন না করিলে তিনি অবমাননাজ্ঞানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিতে পারেন। বিশেষ পাশাক্রীড়ায় তুমি ইচ্ছা না করিলে কে তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ ?

একা। আর ও কথা বলিও না। সখি! আমি আর অপর কাহারও সমাদর প্রদর্শনে অসমর্থ, পাশাক্রীড়ার ত কথাই নাই। যদি আমার একবীরকে না পাই তাহা হইলে আমি এই অবস্থাতেই তাঁহারই পদধ্যানপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিব। ভাই! যাহাকে আমি মনে মনে একবার বরণ করিয়াছি—এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কি প্রকারে বারাঙ্গনাপ্রায় অপরের সহিত ক্রীড়ানিযুক্তা হইব। সখি! যাহাকে মন দিয়াছি এ দেহ ও তাঁহার ; এক্ষণে এই দেহ কিপ্রকারে অপরের দৃষ্টিপথে আনয়নপূর্ব্বক অধর্ম্মে পতিত হইব ?

যশো। সখি একাবলি! তুমি স্বপ্নদর্শনপূর্ব্বক এত অধীর হইলে ? স্বপ্ন ত অলীক, স্বপ্নে অঘটন ঘটাইয়া থাকে, অসিদ্ধ সিদ্ধ করাইয়া দেয়, স্বপ্নে অসম্ভব কিছুই নাই, সেই স্বপ্নযোগে তুমি একবীরের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মোহিতান্তঃকরণে এতাদৃশ কঠোর ব্রতধারণে উদ্যোগী হইয়াছে ? একবীর হয়ত তোমার পাশাক্রীড়ার কোন সংবাদই পান নাই, তুমি যে আমাদের রাজকন্যা একাবলী, তাহাও হয় ত তিনি জানেন না, তোমার নাম কখন শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ, তবে তুমি কি নিমিত্ত এই অলীক স্বপ্নের উপর বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে চিরঅসুখী করিতে উদ্যোগী হইয়াছ ?

একা। সখি যশোবতি! মরুভূমিতে উপ্তবীজবৎ আমার প্রতি উপদেশ দান বৃথা। আমার মনে যাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, সে কার্য্য আমি কদাপি

করিতে পারিব না। তুমি ভাই দয়া করিয়া যদি পরিচারিকাকে ডাকিয়া দেও তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করিব।

যশোমতী রাজকুমারীর অনুরোধমত প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক পরিচারিকাকে ডাকিয়া দিলেন। পরিচারিকাকে দর্শনমাত্রেই রাজকুমারী কহিলেন, "ঝি! তুমি আমার পিতা মহারাজকে গিয়া বল যে, "রাজকুমারী পীড়িত, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে, অতএব উত্থানশক্তিরহিত, এ অবস্থায় পাশাক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, আগন্তুক রাজকুমারের সম্মানপ্রদর্শনেও একান্ত অসমর্থা।

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে পর রাজকুমারী আত্মসংক্রান্ত ভাবনায় বিভোর হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে যশোবতী আগমনপূর্ব্বক সংবাদ দিলেন, "সখি! বড়ই ভীতিজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। মহারাজও পাশাক্রীড়া ঘোষণা করিলেন, তুমিও স্বপ্নদর্শনপূর্ব্বক উন্মনা হইয়া উঠিলে। সুতরাং আগন্তুক রাজকুমারগণকে তোমার পীড়া ব্যাপদেশে ভগ্নাশ করিতে হইতেছে। সকলে তাহা বিশ্বাস করিতেছে না। এইমাত্র একজন রাজকুমার তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া অবিশ্বাস সহকারে কত কথা বলিয়া গেলেন। তাঁহার বাক্যে আমার এইরূপ প্রতীতি হইল, যেন তিনি তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবেন।

সখিমুখে এতাদৃশ ভয়াবহবাক্য শ্রবণ মাত্রই একাবলীর হৃদয় উদ্বেজিত হইল। তিনি যশোবতীর গ্রীবদেশ বাহুলতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "সখি! আমার কি হইবে? এই অপদার্থ জীবনের জন্য রাজপুঙ্গব মদীয় পিতৃদেব বিষাদপাথারে নিমগ্ন হইবেন? তদপেক্ষা আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ নয় কি? বিশেষ একবীরকে যখন প্রাপ্ত হইবার আশা নাই তখন আমি প্রাণ থাকিতে অন্য হস্তে এ দেহ অর্পণ করিতে সমর্থ হইব না। কল্য প্রাতে যখন নদী জলে ক্রীড়ার্থে গমন করিব তখনই এ এ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ের ক্ষোভ মিটাইব।

সখিমুখে মরণাশঙ্কা শ্রবণ করিয়া যশোমতী উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, "সখি! অমন কথা বলিতে নাই আত্মহত্যা মহাপাপ ও আত্মহত্যাকারীর আর পরলোক নাই।" ইত্যবকাশে একাবলীর মাতা তথায় উপনীত হইয়া কন্যাকে নানা প্রকারে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, "মা, আমি সব শুনিয়াছি। মহারাজকে সংবাদ পাঠাইয়াছি তিনি যেন একবীরের নিকট

দুত প্রেরণ করেন। তোমার যাহাতে একবীরের সঙ্গেই বিবাহ হয়, তজ্জন্য আমি যত্নবতী আছি। এক্ষণে যদি জগদীশ্বরের কৃপা থাকে অচিরে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। তুমি মা, অত উতলা হইও না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন-সুবে বাঙ্গালা।

মহারাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিজয় অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া আগ্রায় ফিরিয়া যান। আকব্বরসাহ তখন দিল্লীর সম্রাট। পরে তাঁহারই আদেশে মহারাজা টোডরমল্ল বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করেন। মহারাজা টোডরমল্ল ও আবুলফজলের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁহারা উভয়েই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিভাগ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত ও বিভাগের মূলে মোগল সাম্রাজ্য ১০৫০ সরকারে বিভক্ত ছিল, তাহার বার্ষিক রাজস্ব ১০ বৎসরের জন্য সিক্কা ৯,০৭,৪৩,৮৮১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পর তাঁহার সুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্য ১২টী সুবাতে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক সুবা এক একজন সুবাদারের (Viceroy) অধীনে থাকিত। আইনি-আকবরি গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে দিন এই সুবা বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয় সেই দিন সম্রাট ১২ লক্ষ পান বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সুবাগুলির নাম, যথাক্রমে এলাহাবাদ, আগ্রা, আউধ, (Oudh), আজমীর আহামেদাবাদ, বিহার, বাঙ্গলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান এবং মালব। রাজত্বজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটী সুবা, বিরার, খান্দেস, ও আহামেদনগর, এই মোট ১৫টী সুবায় মোগলরাজত্ব বিভক্ত ছিল।

মহারাজা মানসিংহের নাম বাংলা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার অমিত বিক্রমের ফলে সম্রাট অধিকাংশ প্রদেশ জয় করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহারাজা টোডরমল্লের নাম যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনীতিক্ষেত্রে সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করিয়া সমগ্র রাজত্বের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া ঐতিহাসিক অমরত্ব লাভ করেন।

১। প্রাচীনসুবে বাঙ্গালা।

যখন উড়িষ্যা সুবেবাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তখন একদিকে চট্টগ্রাম

হইতে কুর্রাত্ত. অপরদিকে উত্তর হিমালয় শৃঙ্গাবলি হইতে সরকার মাদারুন—এই পর্য্যন্ত বঙ্গের সীমা নির্দিষ্ট ছিল। সম্রাটের অধীনে ইসফ আফগান নামক সেনাপতি ভটিরাজ্য (আধুনিক ভুটান) জয় করেন এবং ইহা সুবেবাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রা সেই দেশে তিনিই প্রচলিত করেন। এই দেশের লোকগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায়; আম্রবৃক্ষগুলিও দৈর্ঘ্যে মানুষের সমান ছোট! ভটিরাজ্যের পরেই সুবিস্তৃত টিপার রাজ্য (আধুনিক টিপারা)। এই দেশের রাজার নামের সহিত মাণিক ও নারায়ণ সংযুক্ত থাকিত। এখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তাহার পর কোচরাজ্য (আধুনিক কুচবিহার)। ঐ রাজ্যের রাজার একহাজার অশ্বারোহীসৈন্য ও একলক্ষ-পদাতিক সৈন্য ছিল। কামরূপ তখন কোচরাজ্যের অধীন ছিল। কথিত আছে কামরূপের অধিবাসীরা দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এখনও অনেকের ঐ বিশ্বাস আছে। তাহার পরেই আসাম রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা শৌর্য্যবীর্য্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, এই রাজ্যের অধীশ্বরের মৃত্যুসময়ে তাঁহার অনুচরবর্গ (পুরুষ ও স্ত্রী) স্বইচ্ছায় রাজার মৃতদেহের সহিত জীবন্তে প্রোথিত হইত! এটা ভয় কি ভালবাসা বেশ বুঝা গেল না। তারপর তিব্বৎরাজ্য ও মহাচীন। ইহাই তখনকার সুবে বাঙ্গালার উত্তরসীমা। আধুনিক বাঙ্গলাও প্রায় ঐরূপই আছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আরাকান রাজ্য, চট্টগ্রাম বন্দর (Chittagong) সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে হস্তীর অভাব ছিল না, কিন্তু অশ্ব মোটেই পাওয়া যাইত না, এমন কি উষ্ট্র ও গাধা অনেক দাম দিয়া কিনিতে হইত। গরু ও মহিষ তথায় প্রায় ছিল না বলিলেই চলে, তবে এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী এক রকম নানা বর্ণের বন্য জন্তু বর্ত্তমান ছিল যাহার দুগ্ধ অধিবাসীরা পান করিত। এই প্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দু কি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই দেশে যমক ভাই ও ভগ্নির সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল। গ্রামের পুরোহিতেরাই (ওয়ালী) সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ছিল এবং তাহাদের বাক্য কদাচ অনাদৃত হইত না। আর একটী আশ্চর্য্য প্রথা বর্ত্তমান ছিল—রাজার দরবারে সৈনিকেদের স্ত্রীগণ উপস্থিত থাকিত, পুরুষেরা গৃহে থাকিত। যে রাজ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ দূষণীয় ছিল না, সে রাজ্যে এইরূপ প্রথা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ও লঘুচরিত্র। এই রাজ্যের সন্নিকটেই

পেগু। কেহ কেহ চীন বলিত। পেগু রাজধানীতে শ্বেত হস্তী পাওয়া যাইত। এই সমস্ত রাজ্যের সন্নিকটস্থ স্থানে বহুবিধ ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তরের খনি বর্ত্তমান ছিল। এই সমস্ত খনির দখল লইয়া প্রায়ই রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষ ঘটিত।

আইনী আকবরীতে দেখা যায় বাঙ্গালার নাম পূর্ব্বে বঙ্গ ছিল। উহার সঙ্গে "আল" এই শব্দ সংযোজিত হওয়ার কারণ এই যে বঙ্গের নিম্ন ভূমিতে প্রাচীন রাজাদের আদেশে পাহাড়ের পাদদেশে জলরোধ করিবার জন্য আল দেওয়া হইত বলিয়া বঙ্গ+আল হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে।

তখনকার বাঙ্গালার বায়ু নাতি-শীতোষ্ণ ছিল। বর্ষা বৈশাখের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ৬মাস যাবৎ থাকিত। সেই জন্য বর্ষার শেষে মানুষ ও পশ্বাদি রোগাক্রান্ত হইত। এখন বর্ষার অবস্থিতি মোটের উপর তিন মাসের অধিক নহে, তবে বর্ষার শেষে রোগের আধিক্য, ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

তখন সুবা বাঙ্গালার মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন মিলিত হইয়া ত্রিবেনী নাম ধারণ করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সপ্তগ্রামের নিকট সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। আধুনিক সপ্তগ্রাম অতীতের স্মৃতি মাত্র। তাহার বাণিজ্য বন্দর, শিল্প পণ্য সমস্তই কাল গ্রাস করিয়াছে। এই গঙ্গার আর একটী শাখা বারবকাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত কাজিহাটা সহরের নিকট পদ্মাবতী নাম ধারণ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পদ্মানদী সেই নদী কি না ভৌগলিকেরা বিবেচনা করিবেন। বঙ্গোপসাগরের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত ছিল—সুদূর ইজিপ্টের প্রান্তদেশ হইতে পারস্য পর্য্যন্ত। আধুনিক ভূগোলে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনকার বাঙ্গালার প্রধান শস্য চাউল, এখনও তাই। তবে তখন অধিকাংশ জমির উর্ব্বরাশক্তি এত অধিক ছিল, যে জলাভূমিতে ধানের শীষ রাত্রিশেষে জলবৃদ্ধির সহিত ৫।৬ হাত বৃদ্ধি পাইত। তখন ধান্যের শীষের ফলন ও বেশী হইত। সেই জন্য তখন টাকায় ২মণ চাউল পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল। বঙ্গের সত্যযুগ বোধ হয় সেই সময় শেষ হইয়াছে। এখন অবশ্য লোকের নানাবিধ অভাব ও অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্ব্বরাশক্তি যদিও অনেক হ্রাস হইয়াছে, তথাপি টাকায় আট সের চাল, যাহা মন্বন্তরের অবস্থা, লোকের বেশ সহ্য

হইয়াছে। অবাধ বাণিজ্য ইহার অন্যতম কারণ! প্রজারা রাজশক্তি মানিয়া চলিত, এখনও তাঁহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাহারা বার্ষিক খাজানা মাস কিস্তী আটবারে আদায় দিত, এবং তাহারাই আদায়কারী লোকেদের নিকট প্রাপ্য খাজনা মিটাইয়া দিতে আসিত। যে নিয়মে মাঠের ফসলের ফলন নির্ণয় করা হইত তাহাকে "মুক্তুক" বলিত। সম্রাট এই সমস্ত প্রথা কায়েম রাখিয়াছিলেন। চাউল ও মৎস্য এই দুইটী লোকের প্রধান জীবিকা ছিল। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য ভাবে কার্য্যাদি করিত। আরও বহু পূর্ব্বে এইরূপ নিয়মই ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজাদিগের ভয়ে ও উৎপীড়নে বাঙ্গালায় "জেনানা"র সৃষ্টি হয়। সেই জেনানা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

বাঁশ নির্ম্মিত ঘর সর্ব্বাধিক প্রচলন ছিল। এই ঘর বহু দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। এটা অবশ্য আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের ভাবিবার কথা। অধিবাসীরা জলপথে যাইবার জন্য, বোঝা বহিবার জন্য, এবং যুদ্ধ জন্যও নৌকা প্রস্তুত করিত। "সুখাশেন" নামক যান হাটা পথের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বন্য জন্তুর মধ্যে হস্তীই অধিক পাওয়া যাইত, অশ্ব অত্যন্ত কম পাওয়া যাইত। এখনও তাই। ইহা হইতে অনুমান হয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বন্য জন্তু আপনাপন বাসভূমি ঠিক করিয়া লয়। ইহা অবশ্য ভগবানের কৌশল।

এই সুবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরসমূহে বহুমূল্য প্রস্তরাদির বাণিজ্য চলিত। কাপড়ের জন্য বাঙ্গালার খ্যাতি বহুদিনের। তন্তুবায়দিগের তাঁত হইতে প্রস্তুত সুতা ও পাট মিশ্রিত কার্পেট বর্ণবৈচিত্র্যে ও কোমলতায় রেশমের মত সুন্দর দেখাইত। পরে ঢাকাই মসলিনও সর্ব্বস্থানেই সমাদৃত হইয়াছিল।

তখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে ইহাকে লক্ষ্মণাবতী, আরও পূর্ব্বে জিন্নতাবাদ বলিত। গৌড় সম্রাটপ্রদত্ত নাম। এই স্থানে একটা সুন্দর দুর্গ বিদ্যমান ছিল। সন্নিকটেই একটী হ্রদ ছিল এবং একক্রোশ দূরে "পিয়াজবাড়ী" নামক একটী জলাধার ছিল, তাহার দূষণীয় জল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকদিগকে পান করাইয়া মারিয়া ফেলা হইত। সম্রাট এ জঘন্য প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গের এই কয়েকটী "সরকার" উল্লেখযোগ্য।

(১) মামুদাবাদ। সেরখাঁ এই স্থান জয় করেন।

(২) খালিফতাবাদ। বনজন্তু পরিপূর্ণ ও লঙ্কাচাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

(৩) বকলা। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান। রাজপুত্র পরমানন্দ রায়ের নাম উল্লেখ আছে।

(৪) ঘোড়াঘাট। রেশম, পাট এবং অশ্ব পাওয়া যাইত। দাড়িম্বের মত আস্বাদযুক্ত "লটকন" নামক একরকম ফলও পাওয়া যাইত।

(৫) বাজুয়া। এখানে নৌকা ও গৃহ প্রস্তুতোপযোগী কাষ্ঠ পাওয়া যাইত ও একটী লৌহখনি ছিল।

(৬) বারবকাবাদ। "গঙ্গাজল" নামক সুন্দর কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

(৭) সিলেট—এইস্থান হইতে খোজা ক্রীতদাস সরবরাহ হইত। লেবুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তবে আকারে লেবর ন্যায় গোলাকার নহে, "সুনতারা" নামক ফল পাওয়া যাইত; সিলেট অদ্যাবধি লেবুর জন্য প্রসিদ্ধ।

(৮) মাদারুন। এখানে একটী হীরকখনি ছিল।

(৯) সেরিফাবাদ। অনেক সুন্দর শ্বেতবর্ণের ভারবাহী বলদ ও বড় বড় ছাগলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী হুগলীও প্রসিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রাম ও হুগলীবন্দরে খৃষ্টান বণিকেরা যাতায়াত করিত।

২। আধুনিক বাঙ্গালা।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার নবাবেরা কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠেন। তারপর পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরাজদিগের ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি। সেই সময় ইংরাজ অধিকারের আরম্ভ; ক্রমশঃ "নাজিম" উপাধি অন্তর্হিত হইয়া "নবাব" উপাধিতে পর্য্যবসিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশের "দশশালা বন্দোবস্ত" ও "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" অমরকীর্ত্তি। পূর্ব্বে বাঙ্গালার গভর্ণর হেষ্টিংস্ ইংরাজ অধিকার স্থান সমূহের "গভর্ণর জেনারেল" নামে অভিহিত হন। তারপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিং, Viceroy উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই উপাধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালার আধুনিক অবস্থা। দেশের শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে রেশম, সুতার কাপড়, নীল ও লবণের কারবার প্রধান ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই সমস্ত একচেটীয়া কারবারে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বাঙ্গালার রাজধানী বৃটিশ ভারতের রাজধানী হয়। কিন্তু বাঙ্গালা রাজনৈতিক মানচিত্রে একটু ছোট হইয়া

লেফটেনণ্ট গভর্ণরের অধীন হয়, তাহার পর আবার গভর্ণরের অধীন হইয়াছে। এই সময়ের ইতিহাস সকলেই জানেন, সেইজন্য বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"

সেবা-ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম। নানারূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমবেতভাবে দেশের মঙ্গল সাধনের যে সকল চেষ্টা হইতেছে সমস্তই সেই যুগধর্ম্মের প্রেরণা। কেহ বিদ্যালয় করিতেছেন জন-শিক্ষার জন্য, কেহ সেবাশ্রম করিতেছেন আর্ত্ত, আতুর ও পীড়িতের সেবার জন্য, কেহ সাহিত্য-সভা করিতেছেন দেশের জনমণ্ডলীর চিত্তে উদার ভাব ও মহৎ আদর্শ উদ্বোধনের জন্য, কেহ রাজনীতিক আন্দোলন করিতেছেন দেশবাসীকে নিজের স্বত্ব ও তাহা লাভ করিবার উপায় দেখাইবার জন্য। এ সকলই কর্ম্ম—অবশ্য যদ্যপি ঠিক-ভাবে করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে যাগযজ্ঞ পূজা প্রভৃতিই কেবল কর্ম্ম পদ-বাচ্য। কিন্তু ভগবদ্গীতা সে ধারণা বদলাইয়া দিয়াছেন। এ সকল যে কর্ম্ম নহে, এমন কথা বলেন নাই, কিন্তু গীতা বলিয়াছেন ঠিক ভাবে করিতে পারিলে দেবোদ্দেশে বা ভগবানের উদ্দেশে করিতে পারিলে সমস্তই কর্ম্ম। সমগ্র জীবনই তাঁহার পূজা। এই জন্য বলিতেছিলাম গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শই সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম হইয়াছে।

গীতা বলিয়াছেন কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব, কর্ম্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলিয়া বা একমাত্র আশ্রয় ও লক্ষ্য বলিয়া কর্ম্মকে বরণ করিতে হইবে নতুবা কর্ম্ম বন্ধন হইবে। একালে অনেক লোক অনেক সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, নৈশ-বিদ্যালয়, অনাথ ভাণ্ডার, পুস্তকালয় ছোট বড় আকারে অনেক হইয়াছে. একদল লোক এই সমস্ত কার্য্য লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। ইহা খুব আশা ও আনন্দের কথা। এই সেবাব্রতপরায়ণ যুবক সম্প্রদায়ই দেশের একমাত্র ভরসা স্থল। দেশ ইঁহাদের প্রতিই কাতরনেত্রে চাহিয়া আছেন।

যাঁহারা এই প্রকারের কোন সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন

তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য এই কথাটি মনে রাখা "কর্ম্ম ব্রহ্ম"। সখের জন্য কোন সদনুষ্ঠান যেন করা না হয়, নিজেকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া অবসর কালে করিব এরূপ ভাবে যেন কোন কার্য্যের ভার লওয়া না হয়, এই কার্য্যের দ্বারা নিজের সাংসারিক ব্যাপারের সুবিধা হইবে অর্থাৎ অর্থ বা সম্মান আসিবে এরূপ অভিসন্ধির দ্বারা যেন কোন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা না হয়। যেমন ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মাভাস ও ছল-ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তেমনি কর্ম্মের নামে বা জনসেবা ও দেশ-হিতৈষণার নামে যদি কর্ম্মাভাস বা ছলকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে, সুতরাং যাহারা কোনও সৎকার্য্যের নেতা হইতে চাহেন তাঁহারা প্রত্যহ শান্তচিত্তে অন্তর্ম্মুখী হইয়া নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমি এই কর্ম্ম কেন করিতেছি। সত্যই কি কর্ম্ম আমায় বরণ করিয়াছে, সত্যই কি কর্ম্মকে আমি ভালবাসিয়াছি?

কর্ম্মকে ভালবাসা কেমন তাহা একজন কর্ম্মবীরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। জনসেবা বা দেশ-সেবামূলক কর্ম্মে যাঁহারা পরিশ্রম করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। তিনি দরিদ্র ও অসহায় অবস্থায় গ্রামে বসিয়া একমাত্র ভগবান ও আত্মশক্তি ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রত্যাশা না করিয়া আজীবন মুখ্যরূপে জনসেবাই করিয়াছেন। তিনি যতগুলি সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এতগুলি সৎকার্য্য আমাদের দেশে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

তাঁহার জীবনের একবৎসরের পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা যাইতেছে ইংরাজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। শশিপদবাবু তখন বৃদ্ধ। এই দুই বৎসর সাংসারিক হিসাবে তাঁহার খুবই দুর্ব্বৎসর, যদিও তিনি নিজে ইহাকে দুর্ব্বৎসর বলিয়া বিবেচনা করেন, না। এই বৎসর তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়াছেন তাহা আলোচনা, করিলে, কর্ম্মব্রহ্মের উপাসনা কেমন ধারা জিনিস তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

এই বৎসরের ঘটনা বুঝিতে, হইলে বৎসরের প্রথমের একটি ঘটনা মনে রাখিলে বড়ই ভাল হয়। ১৯০৫ সাল ২রা জানুয়ারী শশিপদবাবু বৈদ্যনাথে আছেন। তাঁহার চতুর্থ কন্যা সোফিয়া পীড়িতা, তাঁহার বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বৈদ্যনাথে আছেন। শশিপদবাবু যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীর

উঠানের বহির্দ্বারের নিকট একটি লতাকুঞ্জ ছিল। সেই লতাকুঞ্জে বসিয়া শশিপদবাবু ধ্যানধারণা করিতেন। ধ্যানধারণার পর শশিপদবাবু বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। শশিপদবাবু সন্ন্যাসীকে কয়েকটী পয়সা দিলেন। সন্ন্যাসী শশিপদবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "রাজা হও, ধনেশ্বর হও।" শশিপদবাবু সন্ন্যাসীকে বলিলেন রাজা হইতে চাই না, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভগবান আমাকে ফকির করেন, আমি ফকির হইতে চাই, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইতে চাই।" ইহাই শশিপদবাবুর মনোভাব।

১৯০৫ সালের প্রথম হইতেই শশিপদবাবুর কন্যা সোফি দেওঘরেই রহিলেন। কখন অবস্থা ভাল কখন মন্দ এইভাবে চলিতে লাগিল। শশিপদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কখন দেওঘর কখন কলিকাতা এইভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। জুনমাসে শশিপদবাবুর ষষ্ঠ কন্যা সুদেবী শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহার একমাত্র বালিকা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ভাগিনেয়ীর বিবাহের আনন্দোৎসবে কলিকাতা আসিলেন। কলিকাতা হইতে জ্যেষ্ঠভগিনী সুখতারাকে লইয়া বরাহনগর গেলেন। সেখানে ৩।৪ দিনের জ্বরে সুদেবীর শিশুকন্যাটির মৃত্যু হইল। এই প্রথম! ২৪ শে জুলাই সুখতারার বড় ছেলে মলয় বিসূচিকা রোগে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিল। ইহার পর ১৩ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার প্রিয়কন্যা সোফিও পরলোক যাত্রা করিলেন। শশিপদবাবুর হৃদয় স্নেহময়, তাঁহার সম্মুখে এই সব ঘটিল, তিনি অবশ্য ধীরভাবে ভগবানের প্রতি চাহিয়া সমস্তই সহ্য করিলেন। কেবল যে সহ্য করিলেন তাহা নহে, এই পারিবারিক অশান্তির মধ্যেই বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটের যে স্থায়ী ব্যবস্থা, যাহার সাহায্যে এখন ইন্‌ষ্টিটিউট চলিতেছে তাহা এই বৎসরেই, এই সমস্ত দুর্ঘটনার ঝড়ের মধ্যেই তিনি সাধন করেন। ইন্‌ষ্টিটিউট তিনিই করিয়াছিলেন, একটা কিছু গড়িয়া তোলাই তো কেবল প্রয়োজন নহে, স্থায়ীত্বের ব্যবস্থাও চাই। তিনি ভাবিতেছিলেন ইন্‌ষ্টিটিউট চালাইবে কে? দেশে তেমন কর্ম্মশীল সংঘ কৈ, যাহার হস্তে ইহার ভার নিশ্চিন্তভাবে অর্পণ করা যায়? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকারী সমিতির সহিত পরামর্শ ও পত্রব্যবহার আরম্ভ হইল, তাঁহারা সম্মত হইলেন না। সকল শাস্ত্রের ও সকল ধর্ম্মের ইন্‌ষ্টিটিউটে যে ভাবে আলোচনা হয় সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণের তাহা মনঃপূত হইল না। তাহার পর বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে ভার দিবার জন্য কথা চলিতে লাগিল। তাঁহারা সম্মত হইলেন ও এই হলের উপর দোতালার ঘর করিয়া সেই ঘরে মিউনিসিপাল আফিস তুলিয়া আনিবার ইচ্ছা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল এই হলের উপর দোতলার ঘর না করাই ভাল। তখন শশিপদ বাবু হলের সম্মুখে কয়েক কাঠা জমি মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে চাহিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। শেষে শশিপদবাবু বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের ট্রাষ্টিগণকে ইনষ্টিটিউটের ট্রাষ্টি করিলেন। এই শোক অশান্তি ও দুর্ঘটনার মধ্যে এই সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে? এই ঘটনাও শশিপদবাবুর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কর্ম্মকেই তিনি ব্রহ্ম বলিয়া, জীবনের একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মের প্রয়োজনই মুখ্য, সাংসারিক শোকদুঃখ গৌণ ও অবশ্যম্ভাবী। ঝড় আসিবে বিপদ আসিবে, অভাব আসিবে, নির্য্যাতন আসিবে এ সকলেও বিচ্যুত হইব না, কেহই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, এই প্রকারে চিত্ত যাঁহার দৃঢ় কেবল তিনি এই সেবা-ধর্ম্মের পুরোহিত বা নেতা হইতে পারেন।

এখনও ১৯০৫ সালে শেষ হয় নাই। শশিপদবাবুর স্ত্রীর স্বাস্থ্য পূর্ব্ব হইতেই খারাপ হইয়াছিল, উপর্য্যুপরি সংঘটিত এতগুলি শোকের ব্যাপার তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উদরে অসহ্য বেদনা। অনেক চিকিৎসা হইল কিছুই হইল না। শেষে অস্ত্রকরা ঠিক হইল কলিকাতায় অস্ত্র হইল। ক্ষত আর শুকায় না; তাহার পর অতিসার আরম্ভ হইল। ১৫ই আগষ্ট হইতে রোগভোগ বিশেষ ভাবে আরম্ভ, ২৫শে ডিসেম্বর অস্ত্র হয় আর ২৮শে জানুয়ারী রাত্রিশেষে তিনিও ভবলীলা সমাপ্ত করিলেন।

মাঘোৎসবের শেষ দিন। শশিপদবাবুর স্ত্রীর মৃতদেহ বাহির করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্তস্থানে রাখা হইয়াছে। কন্যা জামাতা আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি রোদন করিতেছেন, শশিপদবাবু মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার একদিকে ব্যবস্থা করিতেছেন, আর অন্যদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলভাবে আর একটি কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন বরাহনগর ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করিতে যাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। নগেন্দ্র বাবু এই পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য যাইতে চাহিলেন না! শশিপদ বাবু তাঁহাকে বলিলেন ইহা আমার পারিবারিক দুর্ঘটনা, ইহা দ্বারা সাধারণের কার্য্যের ত্রুটি হইবে কেন? শশিপদ বাবু অন্য একজন বক্তার অন্বেষণ করিতেছেন। শশিপদ বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে শোকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন আর শশিপদ বাবু তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন বরাহনগরে বক্তৃতা করিতে পারিবেন কি না? সাধারণ সভায় বক্তৃতা, সামান্য কারণেই মানুষ বন্ধ করিয়া দেয় ইহাই আমাদের দেশের সাধারণ রীতি; কোন বড়লোক বন্ধু দেখা করিতে আসিলেই তো বন্ধ হইয়া যায়। শিকারের সন্ধান পাইলে বড় বড় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিও স্থানত্যাগ করেন, ব্যাঘ্রচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র তো তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু শশিপদ বাবুর ইনষ্টিটিউটের কার্য্য বন্ধ হইল না, প্রেমতোষ বসু মহাশয় যাইতে সম্মত হইলেন, তাঁহার উপর বরাহনগর যাইয়া বক্তৃতা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়া তবে শশিপদ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। কর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া বরণ করা কেমন এই ঘটনাতে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করি। সংসারে মাথা ঠিক রাখা বড় কঠিন কাজ। আমাদের একটা খুব বড় কৈফিয়ৎ যাহা আমরা সচরাচর দিয়া থাকি তাহা এই যে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। যিনি দারুণ দুর্বিপাক ও ভীষণ পরীক্ষার মধ্যেও মাথার ঠিক রাখিতে না পারেন, জীবনযুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে, এই প্রকারে জীবনযুদ্ধে যিনি পরাজিত তাঁহাকে কোন সেবাধর্ম্মমূলক কার্য্যের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিতে নাই এবং সেরূপ লোকের উপর কেহ নির্ভরও করিতে পারে না। শোকে, দুঃখে, রোগে, অভাবে আমরা অপ্রকৃতস্থ হইয়া পড়ি। যিনি অপ্রকৃতস্থ না হন তিনিই যথার্থ বড় মানুষ, ইহাই গীতার ও অন্যান্য যাবতীয় সৎশাস্ত্রের উপদেশ।

১৯০৫ সালে শশিপদ বাবুর উপর দিয়া যে ভীষণ পরীক্ষার ঝড় চলিয়া গেল তাহার মধ্যে তিনি কি প্রকারে অবিচল ভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন তাহা বলা হইল। আর একটি ছোট ঘটনা বলিতেছি, কি প্রকারে মাথা ঠিক রাখিয়া নিজের চরিত্ররক্ষা বা আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা দেখাইতেছি। এ সকল ঘটনা যাঁহারা জানেন এমন অনেক লোক এখনও জীবিত।

প্রকৃত পরীক্ষা।

বরাহনগরে হরিচরণ মাইতি নামক এক ব্যক্তি রেড়ির কলে কাজ করিয়া একটু সম্পন্ন হইয়াছিল, কিছু দিন পরেই তাহার অবস্থার হীনতা হয়, সেই সময়ে সে বরাহনগরের উমেশচন্দ্র ঘোষের নিকটে নিজ বসত বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করে, পরে সে টাকা দিতে না পারায় উমেশচন্দ্র ঘোষ তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন, তখন সেই হরিচরণ মাইতি, শশিপদ বাবুর শরণাগত হইল এবং কয়েকজন তাহার জন্য শশিপদ বাবুকে অনুরোধ করিল যে তিনি সাহায্য না করিলে লোকটী একেবারে মারা যায়। শশিপদ বাবু তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন, তখন সেই হরিচরণ মাইতি তাহার বসৎবাটীর তাহার নিজ অর্দ্ধাংশ শশিপদ বাবুর নিকট বন্ধক রাখিয়া চব্বিশ শত টাকা কর্জ্জ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাজনের টাকা পরিশোধ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও দুইটী নাবালক সন্তান রাখিয়া হরিচরণ মাইতির মৃত্যু হয়, সংবাদ শশিপদ বাবু শুনিলেন এবং কিছুদিন পরে উক্ত মাইতি পরিবারকে বলিলেন, যে আমার এই টাকা পরিশোধ করিবার তোমাদের অন্য উপায় নাই, একটী উপায় আছে শুন, বাটী বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ কর, আমি সুদ লইব না, তাহাতে তোমাদের কিছু সংস্থান থাকিবে। এদিকে দুষ্ট লোকে বিধবা স্ত্রীলোকটীকে পরামর্শ দিল, "বাড়ি বিক্রয় করিও না, তোমার নাবালক পুত্র, শশিপদ বাবু টাকা আদায় করিতে পারিবেন না" স্ত্রীলোকটী তাহাতেই ভুলিল, তখন শশিপদ বাবু আবার তাহাকে ডাকাইলেন এবং স্বামীর দেনার জন্য যে নাবালকের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া বলিলেন এবং জজ সাহেবের সার্টিফিকেট বাহির করিয়া লইবার পরামর্শ দিলেন, তখন স্ত্রীলোকটী অর্থাভাব জানাইলেন, শশিপদ বাবু অর্থ ও লোক সাহায্যে জজ সাহেবের সার্টিফিকেট বাহির করিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী আবার দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে ভুলিয়া বাড়ি বিক্রয় করিল না। তখন শশিপদ বাবু নালিশ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং নালিশ করিয়া ডিক্রি হইল, ডিক্রি জারি ও বাটী ক্রোক দিয়া টাকা না পাওয়াতে শশিপদ বাবু ঐ বাটী নিজে খরিদ করিয়া লইলেন এবং বাটোয়ারার নালিশের দ্বারা দুই অংশ পৃথক করিয়া নিজাংশ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। ঐ বাটীর অপর অর্দ্ধাংশ হরিচরণ

নাইতির জ্যেষ্ঠ সহোদরের, তাহার অবর্ত্তমানে এখন তাহার পুত্র অধিকারী, উক্ত পুত্র সাবালক, দুশ্চরিত্র ও মাদকসেবী, সে শশিপদ বাবুর অধিকৃত বাটী ভাঙ্গিয়া কাঠ কাঠরা চুরি করিতে লাগিল, শশিপদ বাবু তখন কলিকাতা বাসী এবং ১৯০৫ সালের ভয়ঙ্কর কঠোর পরীক্ষায় পতিত। শশিপদ বাবু পূর্ব্বোক্ত সংবাদ শুনিয়া লোক দ্বারা উহাকে বারণ করিলেন, সেই দুষ্টস্বভাব যুবক তাহাতে নিরস্ত হইল না, সে গোপনে, ইটকাঠ চুরি করিতে লাগিল। বরাহ নগরের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অনেক আসিয়া শশিপদ বাবুকে বলিতে লাগিল, "আপনি একবার হুকুম দিন, আমারা উহাকে প্রহারের দ্বারা ঠিক করিয়া দিতেছি" শশিপদ বাবু শুনিয়া সদুপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে ঐ দুষ্ট ক্ষীরোদ নাইতির উপদ্রব হইতে সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, এ দিকে ঐ দুষ্ট বাড়ি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ইঠ কাঠ চুরি করিতে লাগিল, শশিপদ বাবু পুলিশে জানাইলেন, তাহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিল না, বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাইলেন, তিনি ও কিছুই করিতে পারিলেন না, এদিকে ঐ দুষ্ট শশিপদ বাবুর নামে ফৌজদারিতে এক মিথ্যা নালিশ করিল, নালিশের কারণ শশিপদ বাবু লোকজন লইয়া তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই মিথ্যা মকর্দ্দমায় তাহারই হার হইল, কিন্তু সে ইঠ কাঠ চুরি করিতে নিরস্ত হইল না, তখন শশিপদ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চুরি অভিযোগের দরখাস্ত করিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মকর্দ্দমার বিচারের ভার দমদমার বেঞ্চ-কোর্টে অর্পণ করিলেন। বেঞ্চকোর্ট এই মকর্দ্দমার তদারক ও বিচারে অত্যন্ত বিলম্ব করাতে দুষ্ট স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া শশিপদ বাবুর বাটী ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন শশিপদ বাবু বারাকপুরের মাজিষ্ট্রেটকে নিজের পরিচয় দিয়া একখানি চিঠী লিখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি অত্যাচারের বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া লিখিলেন যে "তিনি নিজ বলের দ্বারা সেই সামান্য লোকের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া যে চরিত্রকে গঠন করিয়া বহুবৎসর যাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এই সামান্য ক্ষতি নিবারণের জন্য সেই চরিত্রকে ধ্বংস করিতে পারেন না," ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শশিপদ বাবুর চিঠী পাইয়া মকর্দ্দমার ভার নিজে গ্রহণ করিলেন, বিচারে দুষ্ট নাইতীর অর্থ দণ্ড হইল, শশিপদ বাবু জয়ী হইয়া নিরাপদ হইলেন। উক্ত

ক্ষীরোদ মাইতীর নামে যখন মকর্দ্দমা চলিতেছিল, তখনও ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করিয়া শশিপদ বাবুর বাটী ভাঙ্গিয়া ইঁঠ কাঠ হরণ করিতেছিল, এই অপরাধে তাহার দ্বিতীয় বার অর্থ দণ্ড হয়। এখন ঐ দুষ্ট মাইতির নামে মানহানি ও ক্ষতি পূরণের নালিশ আসিতে পারে এবং নালিশ করিলেই ডিগ্রী হয়, অনেকে শশিপদ বাবুকে উক্ত নালিশ করিতে বলিলেন, শশিপদ বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। নিজের সম্পত্তি অপরে কাড়িয়া লইতেছে এ অবস্থায় যে চোর কখন ক্ষমার পাত্র হইতে পারে না, শক্তি থাকিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত, শশিপদ বাবু অপেক্ষা সেই মাইতি অনেক দুর্ব্বল তথাপি শশিপদ বাবু স্বয়ং শাস্তি দিলেন না, নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন না, এইজন্যই এই বৎসরের এই পরীক্ষাই প্রকৃত পরীক্ষা, এই সময়ে ক্রোধের বশীভূত না হইয়া চিত্তসংযমের দ্বারা চরিত্রকে রক্ষা করা বড় কঠিন। শোকের মোহ অপেক্ষা ক্রোধের আক্রমণ ভয়ঙ্কর, এই সময় যিনি চরিত্রকে রক্ষা করিতে পারেন তিনিই বীর।

জন্মান্তর।

গত ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসের প্রবাসীতে মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত জন্মান্তরবাদ শীর্ষক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে সকল যুক্তিবলে জন্মান্তর-বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন আমি এই প্রবন্ধে সেই সকল যুক্তির সমালোচনা করিব এবং যুক্তিগুলি যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমার এই প্রবন্ধে দুইটী কথা স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইব এবং আশা করি তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না। কথা দুইটী এই (১) এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন এবং (২) তিনি ন্যায়বান, দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান।

অনেক ঘটনার কারণ কি তাহা আমরা জানি না। সেই কারণগুলি কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানকে ইংরেজীতে Theory বলে। কোন মত দ্বারা যদি ঘটনার প্রত্যেক অংশ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে সেইমত সুধীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদেরা বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবী স্থির

এবং সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিৎ কোপরনিকাশ যখন দেখিলেন যে এই মতের সহিত মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের গতির মিল হয় না, তখন তিনি এই নূতন মতে উপনীত হইলেন যে পৃথিবী স্থির নহে কিন্তু তাহা গ্রহগণের সহিত সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে ইহা কেহ দেখিতে না পাইলেও এখন সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন কেন না এই মতের সহিত বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি সমস্ত গ্রহের গতি মিলিয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ঘোষ মহাশয়ের মতের সহিত ঈশ্বরের দয়া, ন্যায় এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার সামঞ্জস্য হয় না।

হিন্দুরা সকলেই জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করেন কিন্তু আমি সে বিষয়ে কোন গ্রন্থ পাঠ করি নাই। দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত "শাঙ্কর দর্শন" পুস্তকের শেষভাগে জন্মান্তরবিষয়ক যে কথাগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলিকে ডাক্তার ৺ মহেন্দ্রনাথ সরকারের ভাষায় transcendental nonsense বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে বিশপ হোআইটহেড ((Bishop White head) বলেন যে হিন্দুরা পুনর্জন্ম বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে যাহা হউক আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্য কাহারও মত উদ্ধৃত না করিয়া কেবল উল্লিখিত স্বীকার্য্যদ্বয় এবং গোচারীভূত দুই একটী তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই প্রদর্শন করিব।

মহেশ বাবু যে ক্রম অবলম্বন করিয়াছেন আমিও সেই ক্রম অবলম্বন করিয়া প্রথমে তাঁহার যুক্তির সমালোচনা করিব এবং অবশেষে জন্মান্তর বাদ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করিব।

(১)

মহেশ বাবু বলেন যে বৈষম্য দেখিয়াই লোকে জন্মান্তর বাদ কল্পনা করে। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সমীচীন নহে। মুকুটধারী রাজা সিংহা-সনে বিরাজ করিয়া এবং পয়োদধিযুক্ত শাল্যন্ন, এণমাংস প্রভৃতি ভোগ করিয়া যত সুখ পান, বিত্তহীন কৃষিজীবী, অনৃণী অপ্রবাসী হইয়া দিনান্তে একবার শাকান্ন ভোজন করিয়াও যদি সেই পরিমাণ সুখ অনুভব করে তাহা হইলে তাহার মনে কখনই এরূপ প্রশ্ন উদিত হয় না যে ঈশ্বর তাহাকে ছোট করিলেন কেন, আর রাজাকে বড় করিলেন কেন? যদি সে কোনরূপ দুঃখ

অনুভব করিত এবং সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া না পাইত তাহা হইলেই তাহার মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হইত যে সে দুঃখ পায় কেন?

পরে সে যখন ভাবিতে ভাবিতে মনে করে যে দয়াময় পরমেশ্বর বিনা অপরাধে কাহাকেও দুঃখ দেন না এবং যখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে সে এই জীবনে তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত কোন অপরাধ করে নাই তখনই তাহার মনে হয়, হয়ত এজন্মের পূর্ব্বে তাহার আর একটা জন্ম হইয়াছিল এবং সেই জন্মেই হয়ত সে সেইরূপ অপরাধ করিয়াছিল যাহার ফলে সে এজন্মে দুঃখ পাইতেছে। এ জগতে যে অনেক দুঃখ আছে তাহা ফ্রান্সিস নিউম্যান (Francis Newman) থিওডর পার্কার (Theodore Parker) চাড্‌উইক (Chadwick), শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষীগণ স্বীকার করিয়াছেন। নিউম্যান বলেন "A difficulty is nevertheless encountered from the fact of human suffering—suffering of the good and of the innocent, of innocent brutes as well as men." Newman's Soul. Chap I. Section VI. পার্কার বলেন "Men smarting all their life and by no fault of theirs" Parker's Immortal Life. চাড্‌উইক বলেন "The hope of immortality fades by the side of human misery." ইত্যাদি। Chadwick's Immortal Hope. শিবনাথ শাস্ত্রীকে মহর্ষি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বপ্রণীত ধর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে জগতে এত দুঃখ আছে "যাহা মানবের আয়ত্তাধীন নহে, মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া ঘটিয়া থাকে।" ইহার অল্পপরেই শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই অপরাধ-নিরপেক্ষ দুঃখ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে "দুঃখ মানবের কর্ম্ম-বিপাকজনিত; তাহা পূর্ব্ব জন্মের ফল।" এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যায় যে নিউম্যান ভিন্ন অপর কেহই মনুষ্যেতর জীবের কেন এত দুঃখ, কেন নিরপরাধ মূষিক বিড়ালের দংষ্ট্রাঘাতে এত কষ্ট পায়, কেন সর্পকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভেক এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, কেন ভারতবর্ষের যানবাহী অশ্ব ও বলদের জীবনব্যাপী কষ্ট, কেন আসাম প্রদেশে বর্ষাকালে নদীস্রোতে সহস্র হরিণ মহিষ, শূকর প্রভৃতি জন্তু ভাসিয়া যায় এবং সেই ঘোরতর বিপন্ন অবস্থায় শীকারীরা তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করে, অথচ যে বিশ্বনিয়ন্তাকে আমরা দয়াময় বলিতে শিখিয়াছি তিনি কেন তাহাদিগকে রক্ষা করেন না। এই

সকল প্রশ্নস্বতঃই চিন্তাশীল মানবের মনে উদিত হয়। যখন গৃহদাহে বা পিতামাতার তাচ্ছিল্যে বা নির্বুদ্ধিতায় নিরপরাধ শিশুর ঘোরতর যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় তখনও মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। এই প্রশ্নের সমাধানে এই মত, উৎপন্ন হয় যে ইহারা সকলেই পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের এই শাস্তি; নতুবা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ শাস্তি বা কষ্ট পাইতে দিতেন না। কেহকেহ বলেন যে স্বভাবের নিয়ম হইতেই এইরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বর সেইরূপ দুঃখ বিধান করেন না। কিন্তু স্বভাব ও স্বভাবের নিয়মের কর্ত্তা কে? কর্ত্তা কি ঈশ্বর নহেন? মিল্ (Mill) বলেন Nature is more cruel than the cruellest Vivesectionist। এই ঘোরতর নিষ্ঠুর স্বভাব যে ঈশ্বরের সৃষ্ট ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং ন্যায়বান্ তাঁহারাই এই সমস্ত দুঃখকে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল স্বরূপ বলিয়া অনুমান করেন। সুতরাং দেখা গেল যে যাঁহাদের কোন দোষ আমরা দেখিতে পাইনা তাহাদের দুঃখ দেখিয়াই জন্মান্তরবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং মহেশ বাবু যে বলেন যে পার্থক্য দেখিয়াই জন্মান্তরবাদ কথিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে।

মহেশ বাবুর আর একটা অনুমান এই যে জন্মান্তর-বাদীগণের আর একটা মত এই যে লোকে ভাল মন্দ যাহা কিছু কার্য্য করে তাহাই পূর্ব্ব জন্মের ফল, কিন্তু তাঁহার এ অনুমানও সমীচীন নহে। জন্মান্তরবাদীদিগের মত সংক্ষেপে এই যে জন্মের সময়ে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বর তাহাকে ভাল মন্দ কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন এবং সৎকার্য্য করিবার বল ও অসৎকার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেন "Enough to stand but free to fall."—MILTON. অতএব মনুষ্য যখন পাপাচরণ করে তখন ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে এবং সে তাহা না করিলেও না করিতে পারিত এরূপ বল তাহার আছে; সে ইচ্ছা করিয়া যে পাপ করে সেই পাপের ফল কতক এজন্মে ভোগ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়; পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ও তাহার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পাপকার্য্য করিতে পারে অথবা পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে, অনেক সময়ে সে সৎকার্য্য করে বা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহার দুঃখ ঘোচে না; এই দুঃখ তাহার পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফল; সেই দুঃখে তাহার পূর্ব্ব

জন্মের পাপের ক্ষয় হয় এবং সদাচরণ বা সদাচরণের চেষ্টার ফলে হয় তাহার মুক্তি হয় নতুবা এমন পুনর্জন্ম হয় যে তাহাতে তাহার দুঃখ থাকে না; সেই জন্মে সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করিলে ও পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে সে সকল বিষয়ে সৌভাগ্যশালী হয়; এইরূপেই আমরা সাধুদিগের দুঃখ এবং অসাধুদিগের সুখ কখন কখন দেখিয়া থাকি। ইহাই যখন জন্মান্তরবাদের সংক্ষিপ্তসার তখন মহেশবাবু যে সকল কথা অতি বাহুল্যভাবে বলিয়াছেন এবং যেরূপে অনবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

তবে তাঁহার একটী তর্ক কিছু কৌতুকাবহ। যাঁহারা বলেন যে পৃথিবী সর্পের উপরে আছে, সর্প হস্তীর উপরে আছে, হস্তী কচ্ছপের উপরে আছে এবং কচ্ছপ শূন্যের উপরে আছে, মহেশ বাবু তাঁহাদিগকে বলেন "তোমরা সোজাসুজি বলনা কেন যে পৃথিবী শূন্যের উপরে আছে?" কিন্তু যাঁহারা সর্প, হস্তী, কূর্ম, জল প্রভৃতির কথা বলিয়া থাকেন তাঁহারা কি সে গুলিকে আনুমানিক বলিয়া মনে করেন, না সেগুলি বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করেন? যদি তাঁহারা সেগুলি প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা হইলে ও কি মহেশ বাবু তাঁহাদিগকে এমন কথা বলিতে পারেন যে, তোমরা সোজাসুজি বলনা কেন যে পৃথিবী শূন্যের উপরে আছে? লব যদি বলে যে তাহার পিতা রাম, রামের পিতা দশরথ, দশরথের পিতা অজ, অজের পিতা দিলীপ, তাহা হইলে কি লবকে কেহ বলিতে পারে যে "তুমি সোজাসুজি বলনা কেন যে দিলীপই তোমার পিতা?" একবার ৺ জয়গোবিন্দ সোমের সহিত একজন ব্রাহ্মের তর্ক হইতেছিল। ব্রাহ্ম বলিলেন "ঈশ্বর এক।" খ্রীষ্টিয়ান সোম মহাশয় বলিলেন "তিন।" ব্রাহ্ম বলিলেন "তবে তেত্রিশ কোটি বলিতে আপত্তি কি?" সোমমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের স্কুলে কত ছাত্র পড়ে?" ব্রাহ্ম উত্তর করিলেন "দুইশত।" সোম মহাশয় "বলুন না কেন আটশত চব্বিশ?" ব্রাহ্ম বলিলেন "যাহা আছে তাহাই ত বলিব।" সোম মহাশয় বলিলেন ঈশ্বর বিষয়েও যাহা সত্য তাহাই ত বলিব।"

বাস্তবকই এই সকল স্থলে Law of Parsimonyর কোন কথাই উঠিতে পারে না।

সে যাহা হউক উপরে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল যে মহেশ বাবুর প্রবন্ধের প্রথম ভাগ দুইটী ভুলের উপর সংস্থাপিত। প্রথম ভুল এই যে জগতে বৈষম্য

দেখিয়া জন্মান্তর-বাদের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় ভুল এই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই লোকে এজন্মে ভাল বা মন্দ কার্য্য করে। প্রকৃত কথা এই যে দুঃখ দেখিয়া জন্মান্তর-বাদের উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে লোকে এজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে।

(২)

এখন আমরা মহেশ বাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগ যাহা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিব।

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের দুই একজন লোক ভিন্ন কোন জন্মান্তর-বাদী কখন এমন কথা বলেন নাই যে কোন ব্যক্তি বিশেষ পূর্ব্বজন্মে অমুক ছিল। জন্মান্তর-বাদীরা কেবল এই মাত্র বলিয়া থাকেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে কিছু ছিল। মহেশ বাবু যে এই কথা জানেন না তাহা বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবেন না। তবে যে কেন তিনি শনি, রবি, সোম প্রভৃতি লোকের এবং নানা, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা প্রভৃতি নদীর কথা এত ad meuseam ফেনায়িতা করিয়া প্রবাসীর পাঁচটা স্তম্ভপূর্ণ করিয়াছেন তাহা বুঝা গেল না।

মহেশ বাবু লিখিয়াছেন আমার যদি পূর্ব্বজন্ম থাকিত তাহা হইলে স্মৃতি তাহা বলিয়া দিত এবং স্মৃতি সেতুস্বরূপ হইয়া পূর্ব্ব জন্মের "আমির" সহিত বর্ত্তমান জন্মের "আমির" সংযোগ করিয়া দিত। কিন্তু সেরূপ স্মৃতি যখন নাই তখন মহেশ বাবুর সিদ্ধান্ত এই যে পূর্ব্বজন্ম মানিতে পারা যায় না।

কিন্তু অনেকেই জানেন এবং মহেশ বাবু অবশ্যই নানা পুস্তক পাঠ করিয়া অবগত আছেন যে, কখন কখন কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে সেই ঘটনার পর তাহাদের জীবনের পূর্ব্ব কথা কিছুমাত্র মনে থাকে না। তাহা বলিয়া কি ঘটনার পূর্ব্বের আত্মা এবং ঘটনার পরের আত্মা দুইটী পৃথক্? সেই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মা যে একই সে কথা কেহই অস্বীকার করেন না। সেইরূপ ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্ব্বের কথা মনে করাইয়া দিলে মনে হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। সুতরাং জন্মরূপ একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তনে যে আমাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি একেবারে লোপ হইবে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। যেমন একজনের বিস্মৃত বিষয় মনে করাইয়া দিলে মনে পড়ে তদ্রূপ কাহারও যদি আমাদিগকে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে করাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে হয়ত আমাদিগের ও পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িত। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরেরই এক অংশ। কিন্তু কয়জন মনুষ্য সহজজ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারে?

বহু শিক্ষার ফলে অথবা কেহ পুনঃপুনঃ মনে করাইয়া দিলে আমরা অল্পে অল্পে উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ। কিন্তু পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত এমন কোন শিক্ষা আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বারা আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম তাহা জানিতে পারি। তবে কিছু যে ছিলাম তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। কোন, রোগ কি কারণে জন্মে চিকিৎসক ভিন্ন 'কয়জন লোক তাহা জানে? কিন্তু প্রায় সকলেই ইহা জানে যে প্রত্যেক রোগেরই একটা না একটা কারণ অছে। মহেশ বাবু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে জন্মান্তর-বাদী বলেন যে রবি পূর্ব্বজন্মে শনি ছিল। কিন্তু জন্মান্তরবাদী কখনই এমন কথা বলেন না। জন্মান্তর-বাদী কেবল বলে যে রবি পূর্ব্ব জন্মে আর কেহ ছিল কিন্তু সেই কেহ যে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি তাহা জন্মান্তর-বাদী বলেন না। গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তির স্মৃতি ভ্রংশ হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম জীবনের সমস্ত কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ এখনও জীবিত আছে সুতরাং তাহার আত্মাও আছে। তাহার এখনকার আত্মা এবং জীবনের প্রথমভাগের আত্মা একই কিনা তাহা মহেশ বাবু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে "পূর্ব্বের গোবিন্দ = পশু গোবিন্দ + বেশী কিছু। এখনকার গোবিন্দ = পশু গোবিন্দ। যদি জিজ্ঞাসা কর পূর্ব্বের গোবিন্দ ও পরের গোবিন্দ এতদুভয়ের মধ্যে একটী আছে কিনা, আমরা বলিব পূর্ব্বের গোবিন্দের পশু গোবিন্দ অংশ এবং পরের গোবিন্দ একই জীব।" আমার বোধ হয় এই কথাগুলি দ্বারা মহেশ বাবুর ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায় যে গোবিন্দের বর্ত্তমান আত্মা অর্থাৎ স্মৃতি লোপের পরের আত্মা এবং স্মৃতি লোপের পূর্ব্বের আত্মা একই আত্মা নহে। এইরূপ বুঝায় যদি আমার ভ্রান্তি না হইয়া থাকে তাহা হইলে মহেশ-বাবুর সিদ্ধান্ত সুধীগণ গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। আর যদি মহেশ বাবু গোবিন্দের বর্ত্তমান আত্মা এবং পূর্ব্বের আত্মা একই বলিয়া মানেন তাহা হইলে জন্মান্তর-বাদী যে বলেন যে পূর্ব্বজন্মে আমার আত্মা অন্য এক শরীরে ছিল এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, এই মতের খণ্ডন হইল কই?

টমাস কারসন হেনা (Thomas Carson Hanna) এবং মেরী রেনল্‌ডস্ (Mary Reynolds) তাহাদের যৌবনকালের ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাল্যকালের ঘটনা তাহাদের মনে ছিল; সুতরাং মহেশ বাবুর মতে স্মৃতি-

লোপের পর তাহাদের আত্মাই ছিল না। কিন্তু যৌবনকালের কথা তাহাদের মনে করাইয়া দিলে তাহাদের সমস্তই মনে পড়িল! সুতরাং বলিতে হয় যে তাহাদের আত্মা তাহাদের শরীরে ফিরিয়া আসিল। মহেশ বাবুর এই কথায় স্পষ্টই দেখা যায় যে তাঁহার মতে আত্মা একবার এক শরীর ছাড়িয়া আবার সেই শরীরে আসিতে পারে কেবল এক শরীর ছাড়িয়া শরীরান্তরে যাইতে পারে না। যদি ইহা মহেশ বাবুর মত না হয় তাহাহইলে তিনি গোবিন্দ, হেনা এবং রেনলড্‌সের কথার কেন অবতারণা করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না।

মহেশ বাবু একস্থানে লিখিয়াছেন "আত্মা অবিভাজ্য" আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "স্মৃতির অভাবে এক আত্মা বহুবিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।"

যিনি জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আত্মিক জগৎও সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং জড় জগতে আমরা যেরূপ ঘটনা দেখিতে পাই আত্মিক জগতেও তৎসদৃশ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নহে। এই সাদৃশ্য দেখিয়াই বটলর (Butler) তাঁহার Analogy এবং হেনরিড্রমণ্ড্ (Henry Drummond) তাহার Natural Law in the Spiritual World লিখিয়াছেন। জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি দীপশিখা একত্র করিলে একটী মাত্র দীপশিখা হয় এবং একটী দীপশিখা হইতে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত হইলেও প্রথম দীপ শিখার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। আত্মিক জগতেও কি সেইরূপ হইতে পারে না? একটী দেবপ্রকৃতি আত্মা, একটী অসুর প্রকৃতি আত্মা এবং একটী সাধারণ প্রকৃতি আত্মা এই তিনের মিশ্রণে কুমারী বোশাম্পের (Beauchamp) আত্মা সঞ্জাত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? অথবা পূর্ব্বজন্মে সেই নারী এমন লোক ছিলেন যিনি কখনও সাধারণ লোকের ন্যায় থাকিতেন কখনও সৎকার্য্য করিতেন, কখনও অসৎকার্য্য করিতেন। যে রূপেই হউক তাঁহার যে একটা পূর্ব্বজন্ম ছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার বাধাজনক কোন কথাই মহেশ বাবু বলিতে পারেন নাই।

মহেশ বাবু বলেন, "এক অজ্ঞাত বিষয়কে অপর এক অজ্ঞাত বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়াস তাহা বিফল প্রয়াস।" কিন্তু আমরা কি সকলেই নানা কার্য্য হইতে ঈশ্বর কল্পনা করি না? ঈশ্বর আমাদের মীমাংসার সিদ্ধান্ত হইলেও তিনি অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি অজ্ঞাত হইলেও একবার তাঁহার সত্তায় বিশ্বাস করিয়া লও, দেখিবে অবুদ্ধ ও অবোধ্য বিষয় সুবিজ্ঞাত ও সুস্পষ্ট হইতে

থাকিবে। তেমনি একবার জন্মান্তর বাদ মানিয়া লইলেও সংসারের ঘটনার কারণ উপলব্ধ হইবে। "ইহা পরে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

মহেশ বাবু বলেন "ঘটী ভাঙ্গিয়া গেল,—সেই ভাঙ্গা ঘটী দিয়া কিম্বা তাহার সহিত নূতন মাল মসলা মিশাইয়া একটা নূতন ঘটী প্রস্তুত হইল। জড়বস্তু বিষয়ে এপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে ইহার বিপরীত কথাই সত্য।" এই দৃষ্টান্ত হইতে, মহেশ বাবুর সিদ্ধান্ত এই যে যেমন ঘটীর নাশ না হইলে তাহার উপাদান দ্বারা অন্য ঘটী প্রস্তুত হইতে পারে না। তেমন এক আত্মার নাশ না হইলে অপর আত্মা সৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু এই জড় জগতে ঘটী ভিন্ন অনেক বস্তু আছে যাহার নাশ না হইলেও তাহা হইতে তৎসদৃশ আর একটী বস্তু, প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক বৃক্ষ জীবিত থাকে অথচ তাহার শাখা ছেদন করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে সেই শাখা সেই বৃক্ষের অনুরূপ বৃক্ষ হইয়া উঠে। একটী দীপ শিখা হইতে আর একটী দীপ প্রজ্বলিত করা যায় অথচ প্রথম দীপ শিখাটী যেমন তেমনি থাকে। মহেশ বাবু বলেন যে আত্মার গুণকর্ম্ম অন্য আত্মায় সংক্রামিত হয়। আমরা বলি যে গুণ কর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার অংশই অন্য আত্মায় এবং জড় শরীরে সংক্রামিত হয়। একটী লৌহসূচিতে চুম্বক ঘসিলে সেই সূচি চুম্বকের কার্য্য করে। আমরা বলি চুম্বকের অংশ পাইয়াই সেই সূচি চুম্বক হইয়া গিয়াছে। মহেশ বাবু হয়ত বলিবেন যে তাহাতে চুম্বকের অংশ নাই, চুম্বকের গুণমাত্র আছে। পুষ্প তাহার গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করে। মহেশ বাবু বলিবেন এই গন্ধ পুষ্পের গুণমাত্র। আমরা বলি উহা পুষ্পের অংশ। অগ্নির উত্তাপে যখন অন্য বস্তু উত্তপ্ত হয় তখন মহেশ বাবুর মতে উত্তপ্ত হইবার কারণ অগ্নির গুণ। আমরা বলি সেই কারণ অগ্নির অংশ। সেইরূপে আমরা বলি যে পিতা মাতা জীবিত থাকিতেই তাঁহাদের আত্মার অংশ একীভূত হইয়া সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। যেমন ঈশ্বরের আত্মা হইতে অন্য সমস্ত আত্মা সৃষ্ট হইলেও সেই পরমাত্মার কিছু মাত্র লাঘব হয় না। মহেশ বাবু বলেন হোমর, সেক্‌স্‌পিয়ার, কালিদাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল্, কাণ্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যিশু, মহাম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃত্যু হইয়াছে কেবল তাঁহাদের গুণকর্ম্মই আছে। আমরা এই গুণকর্ম্ম থাকা অস্বীকার করি না, কিন্তু বলি যে এই গুণ কর্ম্মে উক্ত মহাত্মাগণ জীবিত আছেন। বাস্তবিক গুণকর্ম্ম ভিন্ন কোন বস্তুর অন্যবিধ সত্তা থাকিলেও সে সত্তা কাঁহারও নিকট সত্তাই নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,

ধর্ম্মজ্ঞান, কার্য্যকারণ বোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সত্তা আমাদের গোচর হয় সেই সত্তা ব্যতীত আর যে কিছু আছে তাহার প্রমাণ নাই। তাহা থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

একব্যক্তি সর্ব্বদা পাল্কীগাড়ীতে গমনাগমন করেন। কর্ম্মবশত তাঁহার অবস্থার অবনতি হইল; তখন তিনি একা বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রমণ করেন। কর্ম্মবশতঃ অবস্থার উন্নতি হইলে তিনি পাল্কীতে, মোটর গাড়ীতে এবং অন্যান্য যানে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাইতে পারেন। কেবল আত্মাই কর্ম্মবশতঃ অন্যদেহে যাইতে পারিবে না কেন? একটা কক্ষে যে বায়ু আছে তাহা কক্ষান্তরে যাইতে পারে—কক্ষটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই বায়ু এদিকে ওদিকে প্রসৃত হইবে, অথবা সমস্তটা একত্র থাকিয়া স্থানান্তরে যাইবে। কেবল আত্মাই সেইরূপ দেহান্তরে যাইতে পারিবে না কেন? বাস্তবিক আত্মা যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে যাইতে পারে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন a priori কারণ নাই। বরং জড় বস্তু ও আত্মা একই ঈশ্বরের সৃষ্ট হইলে ইহাই আশা করা উচিত যে জড় বস্তুতে আমরা যে নিয়ম দেখিতে পাই, আত্মাতেও সেই নিয়ম দেখিতে পাইব। আমরা দৃশ্যমান জড় বস্তুতে কি দেখিতে পাই? এই দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বস্তু নিজেকে রাখিয়া আপনাকে প্রতিক্ষণে বিকীর্ণ করিতেছে। এই বিকীর্ণ অংশ যখন ফটগ্রাফের যন্ত্র মধ্যে নিপতিত হয় তখন তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া যায়। সেইরূপে শব্দও ফনগ্রাম যন্ত্র মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে আটকাইয়া পড়ে। ঈশ্বর-সৃষ্ট সমস্ত জড় বস্তু যখন এইরূপ বিকীর্ণ হয় তখন তাঁহার সৃষ্ট আত্মাও সর্ব্বক্ষণই আপনাকে অবশ্যই বিকীর্ণ করিতেছে এবং তাহা উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আট বৎসর বয়স্ক বালক জেরা কালবর্ণ (Zerah Colburn) গণিতে যেমন অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা অবগত নহেন তাহারা প্রকটর (Procter) কৃত Byways of Science নামক পুস্তক দেখিবেন। সেই বালককে সাত আটটা অঙ্ক বিশিষ্ট দুইটী রাশি দিবা মাত্র সে তাহাদের গুণ-ফল ভাগ-ফল বলিতে পারিত এবং আট দশটা অঙ্ক বিশিষ্ট একটী রাশি দিবা মাত্র সে তাহার বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘন মূল ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিত। $২^{৩২}+১$ অর্থাৎ দুইকে বত্রিশ বার দুই দিয়া গুণ করিলে যে রাশি হয় তাহার সহিত এক যোগ করিলে যে রাশি হয় সেই রাশিটার বিভাজক (factor)

নাই বলিয়া বহুকাল ইউরোপের গণিতবেত্তাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু একজন গণিত-বেত্তা দশ বার বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার দুইটী factor বাহির করিয়াছিলেন। জেরা কালবর্ণকে সেই রাশিটী দিয়া তাহার factor বাহির করিতে বলা হইল। সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত দুইটী factor বলিয়া দিল। এই যে প্রতিভা ইহা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ প্রতিভা দেখিয়াই জন্মান্তর-বাদী বলেন যে ইহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফল। মানব-সমাজের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাপাচরণ যে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তাহাও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রকৃত কবি এবং প্রকৃত ঋষি একই প্রকারের মনুষ্য। ইঁহারা উভয়েই সত্যদর্শী। সেই কবি সাক্ষ্য দিতেছেন "শতভাগ মোর শত দিকে যায়"। মহেশ বাবু নিজেই সেই সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না ইহা কিছু বিস্ময়কর।

শনি ও রাহুর জীবন নিরপেক্ষ হইয়া বিধাতা জীবন সৃষ্টি করিতে পারেন। একটী ধান্য হইতে কোটি কোটি ধান্য উৎপন্ন হইলেও এবং নূতন ধান্য সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও বিধাতা ইচ্ছা করিলেই নূতন একটী ধান্য সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে জন্মান্তরের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে a priori or a postereori অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

অতঃপর আমরা জন্মান্তর বাদের পৌষমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশের সমালোচনা করিব।

(৩)

এই অংশের প্রথমেই মহেশবাবু তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট দুই একটি শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে জন্মান্তরবাদীদের মতে (১) আত্মার বিদেহ অবস্থা সম্ভব এবং (২) মৃত্যুর পর আত্মা অবিলম্বে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার বিদেহ অবস্থা হইতে পারে না কোন জন্মান্তরবাদী এমন কথা বলেন না। দ্বিতীয়তঃ আমি কয়েকজন পুনর্জন্মবাদীর কথা হইতে প্রমাণ করিব যে তাঁহারা এই সাক্ষ্য দেন যে কাহারও মৃত্যু হইলে বহুদিন পরে তাহার আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যিশুখ্রীষ্ট, যোহনকে লক্ষ্য করিয়া, স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন "যোহন কে ছিলেন

তাহা কি তোমরা জান ? তিনি পূর্ব্বে ভাববাদী ইলীয় ছিলেন।" ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে ভাববাদী ইলীয় যোহনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। পুরাণের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে কৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মে রাম ছিলেন এবং কৃষ্ণহন্তা ব্যাধ পূর্ব্বজন্মে বালীর পুত্র অঙ্গদ ছিল। সুতরাং মহেশবাবু কাণ্টের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিক উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। কাণ্টের গ্রন্থ শ্রবণ করা মাত্রই বুঝিতে পারে এমন লোক আমরা দেখি নাই বটে কিন্তু এমন লোক হয়ত আছে এবং পরেও হইতে পারে। চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে তিনি অনধীত গ্রন্থের কোন অংশ শুনিবামাত্র তাহা বুঝিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণপরমহংস সম্বন্ধেও এইরূপ শুনিয়াছি যে তিনি প্রায় নিরক্ষর হইলেও যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারিতেন। জেরা কলবর্ণের গণিতে প্রতিভার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই শিশু কি গণিতের প্রশ্নের সমাধান কাহারও নিকটে শিক্ষা করিয়াছিল ?

কাণ্টের সময়ে লোকের মনোবিজ্ঞান যেরূপ ছিল এখনকার লোকের মনোবিজ্ঞান কি তাহা হইতে উন্নততর হয় নাই ? সুতরাং কাণ্টের আত্মার কোন অংশের পুনর্জন্ম যে মোটেই হয় নাই এ কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? বর্গ্‌সন্‌ Bergson যে কাণ্ট এবং আরও কয়েকজন ঋষির আত্মার অংশের সমষ্টি নহেন তাহা কি কেহ বলিতে পারে ?

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট এবং আরও দুই একজন থিওসফিষ্টের মত এই যে সকল লোক জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মার পুনর্জন্ম শতসহস্র বৎসর পরে হইয়া থাকে।

মহেশবাবু যে বলেন যে পূর্ব্বজন্মের আরম্ভ আছে অর্থাৎ অনাদিকাল (মহেশবাবু যাহাকে অনন্তকাল বলেন) সেই অনাদিকাল হইতে মনুষ্যের জন্ম হয় নাই সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ নাই।

মহেশবাবু পুনরায় বলিয়াছেন যে লোকে বৈষম্য দেখিয়াই জন্মান্তরবাদের কল্পনা করিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমার মন্তব্য এই প্রবন্ধের প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মনুষ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, সুতরাং নূতন আত্মার সৃষ্টি হইতেছে। মহেশবাবুর এই মতের সহিত আমার বিশেষ বিরোধ নাই! তবে

এরূপও হইতে পারে যে যেমন একটা ধান্য হইতে শত শত ধান্য উৎপন্ন হয় এবং যে রূপে এই শত শত ধান্যের প্রত্যেকটা হইতে আবার শত শত ধান্য হয়, যেমন একটা প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে পারে, সেইরূপে প্রথম সৃষ্ট আত্মা হইতে বর্ত্তমান সময়ের কোটি কোটি আত্মা সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করিবারও বাধা নাই।

প্রত্যেক বীজাণুর দুইদিক্—জড়াংশ ও অজড়াংশ। মহেশবাবুর এই মতের সহিত আমারও মতের মিল আছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে তিনি বলেন জড়াংশের পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতামাত্র বহন করে। আমি বলি যে অজড়াংশেও পূর্ব্বজন্মের অজড়াংশের অংশ আছে। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই বক্তব্য বলা হইয়াছে। মহেশবাবু পরে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বজন্মে আত্মা কি দুষ্কৃতি করিয়াছিল তাহা যখন আমার মনে নাই তখন সেই দুষ্কৃতির জন্য এখন আমার শাস্তি হওয়া উচিত নহে। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া রেলরাস্তার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে—যখন তাহার একটুও স্মরণ নাই যে সে মদ্যপান করিয়াছিল—তখন তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী চলিয়া যায়, তাহাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইয়া যায় এবং সে অনন্ত যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তখন কি বলিতে পারি যে তাহার উচিত শাস্তি হয় নাই? সে মদ্যপানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া রেলগাড়ীর কি তাহার উপর দিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই? সেইরূপে পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া এ জন্মে শাস্তি পাইব না এরূপ হইতে পারে না।

দুঃখও দুইপ্রকারের আছে—একপ্রকারের দুঃখ অবিমিশ্রিত দুঃখ, যাহা মনুষ্য এড়াইতে চেষ্টা করে, অপর প্রকারের দুঃখ সুখময় দুঃখ, যাহা উপস্থিত হইলে মনুষ্যের আহ্লাদ বই বিষাদ হয় না। প্রথম প্রকারের দুঃখ, দুষ্কৃতির ফল কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দুঃখ, আমাদের ইচ্ছাকৃত সুকৃতির পুরস্কার। জ্বর হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য কত চেষ্টা করি, কত ঔষধ সেবন করি, কত সুপথ্য ভোজন করি, কত ব্যায়াম করি, কত স্বাস্থ্যকর স্থানে যাই, তথাপি জ্বর হয়; ইহা পূর্ব্বের দুষ্কৃতির ফল। কিন্তু যে প্রেম-প্রণোদিত যুবক মেদিনীপুরের জলপ্লাবনে কষ্টপ্রাপ্ত লোকদিগকে সাহায্য করিতে গিয়া আহারের কষ্ট পাইয়া, সময়ে নিদ্রা যাইতে না পারিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রৌদ্রে তাতিয়া, জ্বরগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই জ্বরে কি তাঁহার আনন্দ হয় না? জগতে

ধার্ম্মিকগণ, যুগপ্রবর্ত্তকগণ, এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণগণ প্রভৃতির যে নির্য্যাতন ভোগ ইহা তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত সৎকার্য্যের পুরস্কার—আনন্দময় দুঃখ। যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে আত্মত্যাগ সেই শ্রেণী দুঃখ। ইহা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল নহে।

মহেশবাবু লিখিয়াছেন "আমি যদি সমাজের হই এবং সমাজ যদি আমার হয় তবে আমার জন্য সমাজ দুঃখভোগ করিবে এবং সমাজের জন্য আমি দুঃখভোগ করিব ইহা কি অবিচার?" বোধ হয় সকল সময়ে অবিচার নহে। কিন্তু গত ভূমিকম্পের সময়ে পথ দিয়া যাইতে যাইতে একজন লোকের উপর বড় একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরের নিম্ন অর্দ্ধাংশ চাপা পড়ে—সে তিন চারিদিন এইভাবে থাকিয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দুঃখ কি সামাজিকতার ফল? আর এক স্থানে একটী বাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল। বাড়ীর কোন লোক বা জীবজন্তু নষ্ট হয় নাই। কেবল দুইটী ছাগশিশু পাওয়া গেল না। কিন্তু দেখা গেল যে ছাগীটা একটা ঘরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভূমিকম্পের আটদিন পরে সেই ভগ্নাবশেষ সরাইয়া দেখা গেল যে একখানা খাটের নিচে সেই ছাগশিশু দুইটী মুমূর্ষ অবস্থায় রহিয়াছে। এই আটদিনে সেই নিরপরাধ ছাগশিশুদ্বয় যে অসীম কষ্ট ভোগ করিয়াছিল তাহা কি সমাজের কোন দোষের জন্য? ইয়োরোপে যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে যাহাতে "সহস্র সহস্র পরিবার অনাথ হইতেছে, অযুত অযুত রমণী বিধবা হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিপদাপন্ন হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সুদূর ভারতবর্ষেও কত পরিবারকে হাহাকার করিতে হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেক নরনারী কি পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করিতেছে? ইহা হইলে ত ব্যাপার বড় অদ্ভুত। আর কোন যুগের এত নরনারী এত অপরাধ করিল না আর হঠাৎ এই যুগের নরনারী এতটা অপরাধে অপরাধী হইল?" আমি আর একজন জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে টাইটানিক জাহাজের যে সকল লোক ডুবিয়া মরিয়াছিল তাহারা কি সকলেই একরূপ পাপ করিয়াছিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে কি কোন a priori বাধা আছে? ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে কলিকাতায় আনীত হয়; তথায় তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া এক জাহাজে আণ্ডামানে প্রেরণ করা হয়। সেইরূপে যাহারা কঙ্গোতে এবং অন্যান্য স্থানে অত্যাচার করিয়াছিল তাহারাই কি বর্ত্তমান

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মানি, রুসিয়া প্রভৃতি স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্যের শাস্তি পাইতে পারে না?

মহেশবাবু বলেন "একত্ব স্বীকার করিয়া লও দেখিবে একজনের সুখদুঃখ অপরের সুখদুঃখ হইয়া গেল। তেমনি একের সুখদুঃখ অপরের হইতেছে ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে সকলেই এক, সকলেই একসূত্রে বাঁধা।" যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এক সময়ে দুই প্রতিবেশীর একজন পরমসুখে থাকে আর একজন অনশনে কষ্ট পায় কেন? যখন রোম দগ্ধ হইয়াছিল—যখন রোমের সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করিতেছিল, তখন নীরো বাঁশী বাজাইয়া আমোদ করিতেছিলেন কিরূপে?

মহেশবাবু বলেন যে রাহুর অপরাধের জন্য কেতুকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিচারক যদি জানেন যে রাহুই চন্দ্রকে হত্যা করিয়া এখন কেতু নাম ধারণ করিয়াছে তাহা হইলেও কি কেতুকে শাস্তি দিবেন না? মহেশবাবু বলেন যে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অপরাধে শাস্তি পাইতেছে তাহা জানিতে না পারিলে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। কিন্তু আমরা স্বভাবে কি দেখিতে পাই? একজন লোক গাঁজা খাইয়া পাগল হইয়াছে এবং তাহার পর তাহার আরও অশেষ দুর্গতি হয়। সে কি জানে যে গাঁজা খাওয়াই তাহার দুর্গতির কারণ? যাহারা ম্যালরিয়া দেশে বাস করিয়া জ্বরভোগ করে তাহাদের প্রত্যেকেই কি জানে যে সেই দেশে বাসকরারূপ অপরাধের ফলে তাহাদের সেইরূপ জ্বর হইয়াছে?

একজনকে কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে বাস্তবিক সেই শাস্তি দ্বারা সমাজকেও পাপ হইতে সাবধান করা হয়। ইহা ঠিক কথা। ম্যালেরিয়া দেশে বাস করিলে জ্বরগ্রস্ত হইতে হয় সকল লোকের যদি এই বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে কেহই আর সে দেশে থাকিতে ও যাইতে চাহে না। সেইরূপে সকলেরই যদি এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইত যে একজন্মে পাপ করিলে আর জন্মে তাহার শাস্তি হয় তাহা হইলে সকলেরই পাপাচরণ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইত। হিন্দু ও মুসলমান একদেশে বাস করে অথচ হিন্দু অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান অপরাধীর সংখ্যা নয়গুণ অধিক। ইহার প্রধান কারণ হিন্দু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, মুসলমান তাহা করে না।

পুরস্কার সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাও দেখিবে বালক, বালিকা, গো, মহিষ, বিড়াল, কুকুর সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে।

তাহারা সকলেই কি জানে যে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার পুরস্কার তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ?

মহেশবাবু প্রবন্ধের শেষভাগে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সমর্থন বা খণ্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলাম না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না বলিয়া অতি সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে চাহি যে সেই সকল কথায় জন্মান্তরবাদের খণ্ডনও হয় না মণ্ডনও হয় না।

(৪)

এখন কেন আমি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করি, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস না করিলে সমাজের কি অকল্যাণ হয় এবং বিশ্বাস করিলে কি মঙ্গল সাধিত হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আমি একজন জর্ম্মণ অধ্যাপকের কাছে লজিক পড়িতাম তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে লাইব্‌নিট্‌স (Leibnitz)এর একটী সমস্যা এই ছিল যে ঈশ্বর যদি দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ হন তাহা হইলে জগতে দুঃখ কেন ? এই সমস্যার নাকি উত্তর ইউরোপে কেহ করিতে পারে নাই। জীব কোন অপরাধ না করিয়াও দুঃখ পাইতেছে। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন তাহা হইলে এই দুঃখ অনায়াসেই অপসারিত করিতে পারেন। এই দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা থাকিতেও যখন তিনি ইহা দূর করেন না তখন তাঁহার দয়ার সত্তা কিরূপে স্বীকার করিব ? তাঁহার দয়া আছে স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয় যে তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্ব নাই।

অপরপক্ষে থিওডর পার্কার, চাড্‌উইক, শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই দুঃখ হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে। কেননা মনুষ্য যখন অকারণে একবার কষ্ট পাইয়াছে এবং এ জীবনে যখন তাহার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ হয় নাই এবং ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান্, অবশ্যই এমন সময় আসিবে যখন তাহাদের এই কষ্টের ক্ষতিপূরণ হইবে। এজীবনে যখন সেই ক্ষতি-পূরণের সময় উপস্থিত হইল না—তখন জীবনের পর সেই সময় আসিবে ইহা অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং দেহের নাশের পর ও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

ইহা অতি সরল যুক্তি। কিন্তু যেমন একটা সরল রেখাকে উভয় দিকেই বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় তেমনি এই যুক্তিটীও পশ্চাৎদিকে বর্দ্ধিত করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের, এজন্মের পূর্ব্বেও আমাদের

আত্মা কর্ম্মশীল ছিল। উপরে যে কয়েকজন মনস্বীর নাম করা হইল তাঁহারা জগতের দুঃখ এবং ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায়, এই কয়েকটী স্বীকার করিয়া দুঃখের পরিণাম কি তাহা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে দুঃখের পরিণাম মৃত্যুর পরেও আত্মার সত্তা। আমিও তাঁহাদের স্বীকৃত কয়েকটী কথা লইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে দুঃখের আদি মুল বা কারণ কি? এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান তখন বিনা অপরাধে জীবের এ দুঃখ সম্ভব হইতে পারে না—এবং যখন এজন্মে সে রূপ কোন অপরাধ নাই তখন ইহাও অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত যে এ জন্মের পূর্ব্বে আত্মা ছিল এবং তখন সে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে। এবং যখন আত্মা এজন্মে জড়দেহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, তখন তাহা পূর্ব্বজন্মে এবং পরজন্মেও জড়দেহে থাকিতে পারে ইহার অসম্ভাবনা কোথায়?

পূর্ব্বজন্মে পাপ করিলে এজন্মে শাস্তি হয় ইহা বিশ্বাস করিলে এজন্মে পাপ করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস অটল থাকে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসকর এবং জগতের দুঃখ, মনুষ্যের দুঃখ, পশুপক্ষীর দুঃখ, কীটপতঙ্গের দুঃখ দেখ, তোমার মন ঈশ্বরের প্রেমে, ঈশ্বরের ন্যায়ে সন্দিহান হইয়া উঠিবে। রাজা লিয়ার (Lear) যখন দেখিলেন যে তিনি এমন কোন কাজ করেন নাই যাহার জন্য তাঁহার সেইরূপ কষ্ট হইতে পারে তখন তিনি ঈশ্বরকে গালি দিলেন। কিন্তু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুর যতই কষ্ট হউক না কেন তিনি চিরকালই ঈশ্বর ন্যায়বান্ বলিয়া তাঁহার বিচার অবনত মস্তকে মানিয়া লন।

উপরে কেবল যুক্তির কথাই বলিলাম কিন্তু জন্মান্তরবাদ বিষয়ে কিছু কিছু সাক্ষ্যও আছে। সেই সকল সাক্ষ্য একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

আবির্ভাব আগমন দুইত বিধান ॥
যথা
আবির্ভাবগতিভ্যাং সাদ্বিঃপ্রকারাস্তু
সংভবেৎ ॥
তত্র আবির্ভাবঃ
উদ্ধব আইলা যবে গোকুল মণ্ডলে।
কহিলেন কৃষ্ণ কথা রহস্য সকলে ॥
উদ্ধবের মুখেত শুনিলা কৃষ্ণ কথা।
কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাব ব্রজে মানিলা সর্ব্বথা ॥
যথা।
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণ সন্দেশ শ্রুতিঁযদবধি শ্রুতঃ।
প্রাদুর্ভাব স্তদবধি স্যাদ্ব্রজে বনমালিনঃ ॥
তত্র আগমনং যথা।
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ ব্রজবাসীজনের।
ব্রজে আগমন কৈল সুখে স্বজনের ॥
দ্বারকাদি বিহার সুখ কৃষ্ণ নাহি ভায়।
সতত কৃষ্ণের ক্ষোভ ব্রজের লীলায় ॥
দন্তবক্রবধ পরে কৃষ্ণ রহিল উল্লাস।
গোপগোপী দরশনে মন অভিলাস ॥
রথে চাপি ব্রজপুরে করিলা গমন।
গোপগোপী সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥
নন্দ যশোমতী আদি সব পুরীতে।
কৃষ্ণ কোলে করি স্নেহ করেন পিরীতে
শ্রীদামাদিসহ নানা বিহার প্রকাশ।
গোপীগণ সহ ঐছে লাবণ্য বিলাস ॥
প্রেমানন্দে মগ্ন কৃষ্ণ পূর্ব্বরূপ লীলা।
দুই মাস তাহা রহি বিহার করিলা ॥

তারপর দ্বারকা কৈল আগমন হরি।
ব্রজের সকল লোক প্রেমে বশ করি ॥
স্বপ্নতুল্য ব্রজবাসী বিরহ মানিল।
বিরহে দুঃখ তারা কিছু না জানিল ॥
যথা পদ্ম পুরাণে।
কালিন্দ্যা পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষ
সমাবৃতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস
মাধবঃ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশ ধরঃ
প্রভুঃ।
বহুপ্রেমবশেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ ॥ ইতি
তত্র কারিকা।
ব্রজে বিরহমানস্মিন্ প্রাদুর্ভূ মহরৌ
তদা।
ভবেত্তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্নবৎ ব্রজ-
বাসীনাং ॥
প্রকট লীলা মানুষীরূপে বিরহ কথন।
ব্রজবাসী কৃষ্ণ ছাড়া নহে এক ক্ষণ ॥
নিত্য লীলায় বিরহ নাহিক গোপ-
গণে।
প্রকটের অনুসারে নরলীলাক্রমে।
যথা শ্রীমতঃ
প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা প্রকটস্যানু-
সারতঃ।
হরিণা বিপ্রযোগিত্বং ন জাতুব্রজ
বাসিনাং ॥

বৃন্দাবনে নিত্য লীলাযুক্ত নন্দসুত।
সিদ্ধদেহে মানসে সে বহ অবিরত॥
গোলোক গোকুল দুই ভিন্ন কভু নহে।
এক মূর্ত্তি দুই স্থানে সেই কৃষ্ণ হয়ে॥
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজেন্দ্র নন্দন।
নিজযূথ আনুগত্যে করহ সেবন॥
প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে মনের সাহসে।
লিখিলাম এই তত্ত্ব করিঞা প্রকাশে॥
সাধন ভক্তিতে বৈধী রাগ নিরূপণ।
সংক্ষেপ ত ভাষাছন্দে হইল বর্ণন॥
জয় জয় গৌরকিশোর দীনবন্ধু।
জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীসুন্দর ঠাকুর দয়াল।
জয় মোর কুলনাথ পানুয়া গোপাল॥
শ্রীশ্রীগোপালচরণ অভিলাষ।
নিত্য লীলা বর্ণিল নয়নানন্দ দাস॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি রসকদম্বে
সপ্তম প্রকরণং॥

অষ্টম প্রকরণ।

শ্রীকৃষ্ণঃ।
শ্রীচৈতন্য পদদ্বন্দ্বং ভবতাপ নিবারণং।
শরণং ভবভীতস্য বন্দেহহং কলি-
পাবনং॥

জয় শচীতনয় পরম অবতার।
যার কৃপাবলে প্রেমে পূরিল সংসার॥
জয় জয় অবধোত শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
যাহার করুণায় লোকে হরিগুণ গায়॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বৃন্দ।
অভিরাম সুন্দরানন্দ পরম আনন্দ॥

শ্রীরূপ গোস্বামীপদ করিয়া ভাবন।
সংক্ষেপে লেখিয়ে গ্রন্থে ভাব-ভক্তি-
ক্রম॥

অথ ভাবভক্তি কথনং

কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি শুদ্ধ সত্ব নাম।
শুদ্ধ সত্বাত্মক হয় ভাব অভিধান॥
সামান্য লক্ষিতা ভক্তি তারে ভাব
কহি।
আত্ম চিত্ত বৃত্তি বিশেষণ জানি তঁহি॥
অশ্রু পুলকাদি অল্প সাত্বিক দর্শন।
চিত্তদ্রবরূপ হইলে ভাবভক্তি কন॥
চিত্তদ্রব হৈলে অশ্রুপুলকাদি হয়ে।
সেই বিকাররূপ প্রেমের জানি কহে॥
প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাবভক্তি লেখি।
প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্ দেখি॥
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে যৈছে কিরণ দর্শন।
প্রেমের প্রথম দৃশ্য ভাবাঙ্কুর হন॥
যথা শ্রীমতঃ
শুদ্ধ-সত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু
সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব
উচ্যতে॥
প্রেমের প্রথম ভাব তন্ত্র মতে কহে।
অশ্রুপুলকাদি সাত্বিক যায় উপজয়ে॥
তন্ত্রে যথা।
প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে
সাত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকা-
দয়ঃ॥
নিত্যরূপে ভাব সদা কৃত্রিম কারু নয়।
কৃষ্ণ বিষয় মনোবৃত্তে প্রাদুর্ভাব হয়॥

আস্বাদ স্বরূপ ভাব স্বতঃ সুখময়।
কৃষ্ণাদ্যনুভব সুখ হেতুরূপ হয়॥
কৃষ্ণাদির আদি পদে পরিকর লীলা।
এই অর্থ গ্রন্থকার শ্লেষে সূচাইলা॥
যথা—
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদ স্বরূপেব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদি কর্ম্মকাস্বাদ হেতুতাং প্রতি-
পদ্যতে॥
স ভাব দ্বিধা।
সাধনাভিনিবেশ হয় ভাবোৎপন্ন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত প্রসাদজ-জন্য॥
সাধনাভিনিবেশজ প্রায়িক ভাব নাম।
ভক্ত কৃষ্ণ প্রসাদজ বিরলোদয়াখ্যান॥
যথা।
আদ্যস্ত প্রায়িক স্তত্র দ্বিতীয়ো
বিরলোদয়ঃ।
তত্র সাধনাভিনিবেশজ বৈধী
রাগমার্গভেদেন দ্বিবিধঃ॥
তত্র বৈধির্যথা।
নারদস্য শ্রীকৃষ্ণকথাদি গান শ্রবণ-
স্মরণাদিনা যা রতিঃ॥ যথা
প্রথমে।
তত্রান্বহং কৃষ্ণ কথাঃ প্রগায়তাং
ইত্যাদি।
এবং
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য সম্বিদো ইত্যাদি
তত্র রাগানুগোত্থ ভাবা যথা পাদ্মে
ইত্থং মনোরথং বালাগুর্ব্বতি নৃত্য
উৎসুকা।
হরি প্রীত্যা চ সর্ব্বাং তাং রাত্রিমেবা-
ত্যবাহয়ৎ॥
বালা রাধিকায়াঃ বিকৃতি রূপা॥
অথ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্ত প্রসাদজঃ॥
সাধন ভজন বিনে আকস্মিক দেহে।
যে সব জনার ভাব ভক্তি উপজয়ে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত প্রসাদজ জানি সেই।
তাহার সাধক শ্লোক কহিলা গোসাঞী
যথা—
সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাব কৃষ্ণ তদ্ভক্ত প্রসাদজ ইতীর্য্যতে
তত্র কৃষ্ণপ্রসাদজঃ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদেন শুকদেবে যথা!
অথ তদ্ভক্ত প্রসাদজঃ।
যথা নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভ-
বাসনা ইত্যাদিঃ॥
এবং তস্য প্রসাদেন ধর্ম্মব্যাধ নামা
ব্যাধস্য শ্রীকৃষ্ণ রতির্যথা স্কান্দে॥
নীচোপ্যুৎপুলকোলেভে লুব্ধকো রতি-
মচ্যুতে ইতি॥
অত্র রতিভাবয়োঃ সমান পর্য্যায়ঃ॥
ভক্তভেদে সেই রতি পঞ্চবিধ হয়।
বিবরিঞা পশ্চাতে কহিব নির্ণয়॥
এবে কহি ভাবাঙ্কুর নবধা লক্ষণ।
ক্ষান্তি আদি করি যেবা গোসাঞের
বর্ণন॥
যথা॥
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে
সদা রুচিঃ।

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি-
স্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে
জনে॥
তত্রক্ষান্তিঃ।
ক্ষোভহেতাবপিপ্রাপ্তেক্ষান্তিরক্ষু-
ভিতাত্মতা।
দীর্ঘছন্দ ত্রিপদী।
ক্ষান্তির লক্ষণ লেখি, রাজা পরীক্ষিতে
দেখি,
প্রায়োপবেশন গঙ্গাতীরে।
মনে করি একনিষ্ঠ, বিষ্ণুপদে হৈঞা-
বিষ্ট, জীবন বাসনা করি দূরে॥
নাহিক বিষয়ে ক্ষোভ, নাহিক
জীবনে লোভ,
কৃষ্ণলীলা করয়ে শ্রবণ।
অন্য ক্ষোভ অভিলাষ, নাহি সুখ বিলাস
পরীক্ষিতে ক্ষান্তির লক্ষণ॥১
নাহি ব্যর্থ একক্ষণে, কৃষ্ণনাম
লীলাগুণে,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাধন।
বাক্যে করে সদাস্তুতি, দেহে করে
প্রণতি,
হৃদে করে শ্রীমূর্ত্তি ভাবন॥
হস্তে পরিচর্য্যা কর্ম্ম, শ্রবণের এই ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ নাম লীলাদি শ্রবণে।
নয়ন সফল সেই, কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে যেই,
নাসিকাতে নির্ম্মাল্য গ্রহণে।
তৃপ্তি নাহি হয় কভু, কৃষ্ণ কর্ম্মে মজি
রহু,
আয়ু ব্যয় কৃষ্ণকর্ম্মে সদা।
অব্যর্থ-কালতা এই, কহিলাম তোরে
ভাই,
অনাসক্তি না হবে একদা॥
ভক্তি সুধোদয়ে।
বাগভিঃস্তবন্তো মানসাস্মরন্তস্তন্বা
নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ॥ ইতি
অথ বিরক্তিঃ।
বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা
স্বয়ং॥
দুস্ত্যজ সংসার এই, তেজিঞা বিরাগী
যেই,
রাজ্য সুতদারা ধন জনে।
অশ্ব দোলাগজ গতি, বন্ধু বান্ধবে রতি,
মলবৎ করিঞা তেজনে॥
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অভিলাষে, ফিরে যেবা
দেশে দেশে,
সাধুজনা সঙ্গতি করিঞা।
লোভ মোহ করি ত্যাগ, কৃষ্ণ কর্ম্মে
অনুরাগ,
বিরক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ লাগিঞা॥
শুন তাহে বিবরণ, সকল পুরাণে কন,
ভরত রাজার উপাখ্যান।
রাজ্য ধন দারা সুত, সকল করিয়া
ত্যক্ত,
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঞ্ছা আন।
পঞ্চমে।
যোদুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং
হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩২১।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব। (৬)

ললিত-গতি-বিলাস-বল্গুহাস-
প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মাদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥

নীরব ভাষায় হরি, যেন মৃদু-হাস্য করি,
ভীষ্মদেবে সম্বোধিয়া বলেন বচন,
'হে ভীষ্ম সকল তত্ত্ব জান বিলক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ হইয়া তবে, পার্থ-সারথির ভাবে,
স্তুতি-লাভ তরে কেন পিপাসু অন্তর,
এর চেয়ে আছে মোর ভাব উচ্চতর।"
এ কথার প্রত্যুত্তরে, ভীষ্ম যেন কন তারে,
জানি গো জানি গো আমি দয়াময় হরি,
যেথায় তোমার প্রেম আছে সর্ব্বোপরি।
কিন্তু তারা অত্যুন্নত, মোর শক্তি-বহির্ভূত,
আমি যে কঠোর-চিত্ত সমর-বিহারী,
সে ভাব ধরিতে হৃদে নহি অধিকারী।
সারথীর ভাবে তাই, তোমারে পাইতে চাই,
তবে তুমি সে ভাবটি জাগায়ে হৃদয়ে
কৃতার্থ করিলে মোরে অন্তিম সময়ে।
গোপীগণে যে আদর, করিয়াছ ব্রজেশ্বর,
কোথাও তুলনা তার মিলেনা কখন
সে লীলা ভাবিয়া চিত্ত বিস্ময়ে মগন।

তব গতি সুললিত, রাসে নৃত্যাদিক যত,
দেহের বৈদগ্ধী যত করিলে প্রকাশ
ধীর লালিত্যাদি ভাব মানস-বিলাস
অধরে মধুর হাসি, নয়নে কটাক্ষ-রাশি,
এইরূপে দেহ মন বাক্য চক্ষু দিয়ে
আনন্দ-সম্মান দিলে গোপীকানিচয়ে।
অপূর্ব্ব সদ্‌গুণ মত, তোমার প্রকৃতি-গত,
গোপীদের তুমি তাহা করিলে অর্পণ,
তাহারাও দিল তোমা সরবস্ব-ধন।
অপূর্ব্ব গোপীর প্রেম তুল্য নাই তার
উভয়তঃ সুখময় মহাবশীকার।
গোপীকা-বিলাসে তাই, যাতনার লেশ নাই
অর্জ্জুনের প্রেম-ফলে তব বশীকার
সারথ্য ও দৌত্য কর্ম্মে নিয়োগ তোমার।
গোপী তব প্রেমাধীনা, ব্যবহার-দৃষ্টি-হীনা,
তব প্রেম-রসপানে উন্মত্ত হৃদয়,
স্বভাবতঃ লভিয়াছে তব গুণ-চয়।
তাই তারা তব সঙ্গে, মত্ত রাস-রস-রঙ্গে,
শিক্ষা নাই তবু নৃত্য-গীত বাদ্য-রত
তোমার ভাবেতে আসি হৈল উপস্থিত।
অতিশয় মন্দ যারা, সাযুজ্য লভিল তারা,
অতি উচ্চ যারা তারা লভি প্রেমধন
পাইল তোমায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
আমি মধ্যবর্ত্তী তাই, অন্তিম কালেতে চাই
পার্থ-সারথীর রূপে প্রকাশিত হ'য়ে
নিয়ত বিরাজ কর আমার হৃদয়ে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(মধ্যম অষ্টম পরিচ্ছেদ।)

শ্রীরামানন্দ রায় মিলন৭

"প্রভু কহে এহোবাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥"

প্রভু পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন ইহার অগ্রে যদি কিছু থাকে তাহা বলুন, এই কথা বলিলেন, তখন শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে সাধ্যসার-রূপে নির্দ্দেশ করিলেন, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী শ্লোকের দ্বারা নিজের মতের সমর্থন করিলেন। বাক্যটী যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্ত-বিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং

যৎকরোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয় স্বভাবতঃ শাস্ত্রতোবা যৎ কিঞ্চিৎকর্ম্ম করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি তৎ সর্ব্বং মদর্পণম্ যথাস্যাৎ তথা কুরুষ।

হে অর্জ্জুন, যেরূপ কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম আমাতে অর্পণযোগ্য হয় তুমি সেই রূপে যাহা করিবে যাহা ভোজন করিবে এবং যাহা হোম করিবে ও যাহা দান ও তপস্যা করিবে, সেই সমুদয় আমাতে অর্পণ কর।

শ্রীরামানন্দ রায় প্রবৃত্তিমার্গে ভক্ত যেরূপ উপায়ে উন্নতাবস্থা লাভ করেন সেইটী কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু প্রভু ইহাকে বাহ্য কহিলেন। বাহ্য কহিবার হেতু শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত কর্ম্ম কর্ম্মই, ইহা ভক্তি হইতে পারে না। ভক্তি ভিন্ন অন্তর নির্ম্মল হয় না, নির্ম্মল হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের আসন হয়। কর্ম্ম অর্পণ করিতে হইলে কর্ত্তার অহঙ্কার গত হয় না বরং আরও বদ্ধমূল হয়, ইহাতে ভুক্তি মুক্তি আপনি আসিয়া উদিতা হন, ইহা ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন নয়, তবে অসাক্ষাৎ সাধন বলিতে পারা যায়। যখন শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে কহিয়া-ছিলেন যে নিরূপাধি জ্ঞান যদি ভক্তি-বর্জ্জিত হন, তাহা জীবকে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে না, কর্ম্মের কথা ত স্বতন্ত্র। কারণ "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণমস্ত" ইহা কর্ম্মী বলিতে পারেন, ভক্ত বলিতে পারেন না ; কারণ ভক্ত শ্রীহরিসেবা ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম দেখিতে পান না দেখিলেও তাহাকে মায়িক বা স্বপ্ন-দৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। তবে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিলে সে কর্ম্ম বিফল হয় না। পরম

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-দাস শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন যে, "কৃষিবন্ নিষ্ফলত্বং" যেমন কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিলেন, তাহার পর বীজও রোপণ করিলেন কিন্তু অনাবৃষ্টি কিম্বা বন্যার দ্বারায় যদি শস্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন কৃষকেরা তাহা হইতে ফল পান না, সেইরূপ কর্ম্মের ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ বিশ্বরূপ যখন হত হইলেন, ত্বষ্টা তখন এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন "ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মাচিরম্ জহিবিদ্বিষম্" কিন্তু উচ্চারণ ভেদ হওয়ায় ত' ইন্দ্রের বিনাশ হইল না বরং তাহারই অমঙ্গল হইল। কোথায় বৃত্র, ইন্দ্রকে বিনাশ করিবেন, না তাহার বিপরীত হইল! ইন্দ্রই বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিলেন, ত্বষ্টার মনের ভাব ত তাহা নহে তবেই দেখা গেল কর্ম্মে বিশ্বাস নাই। তবে এই কর্ম্ম যদি ভক্ত্যঙ্গ জড়িত হন। তাহা হইলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হন না। অজামিল 'ত' মৃত্যুকালে শ্রীনারায়ণকে ইষ্টদেব বলিয়া স্মরণ করেন নাই, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে যমযন্ত্রণায় অধীর হইয়া অস্ফুট স্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুদূতের আগমন হইল, যথা—

দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ন্
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈ রাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনম্
ভর্ত্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্॥

ইহাতেই শ্রীশুকদেব গোস্বামী কৈমুত্য-ন্যায়ে বলিতেছেন। যথা—

ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্॥

যদি মৃত্যুকালে পুত্রব্যাজে অস্ফুট হরিনাম করিয়া অজামিল সদ্গতি পাইলেন, তবে যাহারা মৃত্যুকালে প্রকাশ করিয়া, যাহারা শ্রদ্ধা করিয়া কিম্বা যাহারা সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করেন তাহাদের উত্তরোত্তর গতির বিষয় আমি জানি না, তবে এই বলিতে পারি তাঁহারা শ্রীহরির এবং শ্রীহরি তাঁহাদের হন। পাছে জীব এ বিষয় অসম্ভব মনে করেন তাহার জন্য বলিতেছেন।

"ইতিহাস মিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চ্চয়ন্"

এই অজামিলোপাখ্যান্ ভগবান্ অগস্ত্যদেব মলয় পর্ব্বতে শ্রীহরি পূজা

করিতে করিতে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যদিও অজামিল ও শ্রীশুকদেবকে জ্ঞানিগণ কৃপাসিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা হইলে ও সেই কৃপা একটি দ্বার ভিন্ন প্রকাশিত হন না, সূর্য্যদেবকে যেমন পূর্ব্বাকাশকে দ্বার করিয়া উদয় হইতে হয় সেইরূপ।

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল"

যেমন ঝরণার জল নদীর আশ্রয় ব্যতিরেকে স্থিতিলাভ কিম্বা কাহাকেও পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত আপনি পবিত্রতা লাভ করেন না, অন্যকে কোথা হইতে পবিত্র করিবেন। যথা শ্রীধর স্বামি প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মস্তবের টীকায় লিখিয়াছেন।

"সরস ইবনির্ঝরাণাম্"

তবেই দেখা গেল, কর্ম্ম কৃষ্ণার্পিত হইলেও তাহার ভোগ যায় না, বন্ধনের কারণ, তাহাও যায় না কারণ জীবের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহার আশ্রয় বৃন্দাবনবিহারী নটবর মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, তিনি নিজে যদি স্বতন্ত্র মনে করেন, তবে তাহা ভ্রম-বিলসিত মাত্র; তাহা হইলে জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকে কই? তাহার ইচ্ছামত ত কোন কার্য্য হয় না, ক্রীড়াপুত্তলিকার মত মায়ার অধীনে থাকিতে হয়, যদি মায়া আমাদের মত বহির্ম্মুখ মায়িক কর্ম্মপরতন্ত্র জীবকে দণ্ড না দিতেন তাহা হইলে আমাদের সেই নিত্যপ্রভুর দিকেও লক্ষ্য হইত না। আর ও দেখা যায় কৃষ্ণে কর্ম্ম অর্পণ করিলে যদিও কর্ম্মটী কৃষ্ণে সংযোগ করিলাম তাহা হইলে আমি তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া আসিলাম, অর্থাৎ আমি আবার অহং তত্ত্বে ফিরিয়া আসিলাম। তবেই দেখা গেল কর্ম্ম কৃষ্ণেরই। একজনার বস্তুতে একজন যদি কর্তৃত্ব করেন তাহা যেমন মিথ্যা হয় সেইরূপ আমাদেরও কর্ম্মে কর্তৃত্ব ভাবও মিথ্যা। কারক সাধারণতঃ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, বেদে এই পাঁচটী কৃষ্ণেতে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, তবে জীব যদি কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন করিয়া তাহা আপনাতে আরোপ করেন তবে তাহাও বিকারী রোগীর অচৈতন্যাবস্থার সদৃশ। আমরা বিচার করিলে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণই জগতের কর্ত্তা, তাঁহার আশ্রয়ে ও কর্তৃত্বে জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিশ্ব-রাজ্য ও ভক্ত রাজ্যের পুষ্টি করে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে সৃষ্টিস্থিতি লয় হয়, লয়ের পরও বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই এই বিশ্বের ভোগ সিদ্ধ হইয়া আছে তবে শ্রীকৃষ্ণে

কর্ম্মার্পণ করিলেও প্রবৃত্তাবস্থায় ভগবৎ সম্বন্ধ থাকায় সে কর্ম্ম জীবের তত বন্ধনের কারণ হয় না, তাহার দ্বারায় ক্রমে ক্রমে কর্ম্মত্যাগই হইয়া থাকে এইটী শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের গরীয়ান্ মহিমা।

যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥
"এহোত্ত'ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী"

শ্রীভগবান বলিতেছেন অর্জ্জুন আমাতে কর্ম্ম অর্পণ কর।' কিন্তু ক্রিয়াটী "কুরুষ" আত্মনে-পদী হওয়ায় এ কর্ম্মেতে তোমার যতদিন অহংকার থাকিবে, ততদিন আমার সম্প্রদান-যোগ্য নহে, আবার অহংকার যাইলেও অর্পণ-ক্রিয়া থাকে না, এই জন্য অর্জ্জুনকে কৌন্তেয় বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, (কুন্তীর অপত্য পুমান্ অর্থে ষ্ণেয়) অর্থাৎ কুন্তীকে স্মরণ করাইতেছেন, অর্থাৎ কুন্তী দেবী যেমন আমাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, সেইরূপ কর, অর্জ্জুন যখন তুমি কার্য্য কর, ভোজন কর, এবং হোম কর, দান ও তপস্যা কর তখন যেমন আপনার সহিত ভোজনাদি ব্যাপারকে পৃথক্ মনে কর না, অথচ কর্ম্মও কর এবং সেই কর্ম্মে যেন অহং তত্ত্বটী মিশাইয়া থাক, মুখ ভোজন করিলেও তুমি ত মুখের নাম কর না, আপনারই নাম করিয়া থাক, পদে গমন করিলে তুমি বল আমি চলিলাম, কর্ণে শ্রবণ করিলে তুমি বল আমি শুনিলাম, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে আপনাকে যেমন অভিন্ন ভাবে মিশাইয়া দিয়াছ, সেইরূপ তোমার ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার যাহাতে আমাকেও এইরূপে দিতে পার তাহার চেষ্টা কর, তোমার জননী কুন্তী-দেবীর অনুকরণ কর, অর্থাৎ ভক্তাশ্রয় কর, এবং এই নাম কীর্ত্তন ও স্বরূপ ধ্যান কর।

শ্রীকুন্তীদেবীর স্তব।

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী-নন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।
"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার"

অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ (বিষয়ে) সাধ্য যে রাধাপ্রেম তাহা ভজনের সার অর্থাৎ উপাসনার শিরোমণি।

প্রভুও বলিলেন, একবারে প্রকৃত বস্তু না বলিয়া তাহার উপাদেয়টী সাধন দ্বারায় বিশেষ করিয়া বল। দুঃখের বিষয় না বলিয়া সুখের মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না। শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ।

সেবা-ধর্ম্ম।

কাল-চক্রের কুটিল আবর্ত্তনে, ভারত-জননীর দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা যেমন সমস্ত বিষয়েই আমরা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও আমাদের সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও বিলাসিতাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অবশ্য এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই ধার্ম্মিক নহেন, সেবা-ধর্ম্মের মর্ম্ম কেহই অবগত নহেন; তবে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় প্রায়ই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম কিছু মলিন হইয়া উঠে। প্রতীচ্য দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি অনেকাংশে আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের সমাজে সেবা, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গরূপে প্রচলিত আছে। কুললক্ষ্মীরা পতিসেবা, শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা প্রভৃতি গুরুজন-বর্গের সেবা করিয়া আপনাদের জীবন ধন্য মনে করিতেন, পুরুষগণ পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আত্মীয় স্বজনের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এই সেবা-কার্য্য প্রতিনিধির দ্বারা সম্পাদন করা চলে না। স্বয়ং না করিলে কোন কার্য্যই সেবা বলিয়া গণ্য হয় না।

পিতা বা মাতার পীড়ার সময়ে তাঁহাদিগকে ঔষধ পথ্য প্রদান, তাঁহা-দিগের মলমূত্রাদি পরিষ্কার, সন্তানকে স্বহস্তে করিতে হয়; ইহাই পিতা মাতার সেবা; বৃদ্ধ স্থবির পিতা মাতার প্রত্যেক কার্য্য সন্তানের স্বহস্তে সম্পাদন করার নাম পিতা মাতার সেবা। যদি কেহ ঐ সকল কার্য্যের জন্য দাস দাসী নিয়োগ করেন অথবা অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন তাহা হইলে পিতা মাতার সেবা করা হয় না; পিতা মাতাকে পালন করা হয় মাত্র।

স্বামীর সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই পত্নীকে স্বহস্তে করিতে হয়, ইহা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রথা। স্বামীর জন্য আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করা, তাঁহার জন্য শয্যা রচনা করা, পাদপ্রক্ষালনের জন্য সুশীতল জল আনিয়া দেওয়া প্রভৃতি পতির যাবতীয় কার্য্য হৃষ্টচিত্তে সম্পাদন করা পতিব্রতা রমণী-দিগের একান্ত কর্ত্তব্য। এই পতি-সেবায় প্রতিনিধি নিয়োগের রীতি নাই। কেবল পতি-সেবা বলিয়া নহে, দেবতা-সেবা, অতিথি-সেবা, দীন হীন দ্বারস্থ

ভিক্ষুককে 'অন্ন বস্ত্র দান প্রভৃতিও গৃহলক্ষ্মীদিগকে স্বহস্তে করিতে হয়। দুঃখের বিষয় "একে একে নিভিছে দেউটি" পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে একে একে সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতা সমস্ত প্রাচ্য রীতিনীতি লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

গোপালন এবং গো-সেবার মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য আছে। গাভীকে যথা-সময়ে খাদ্য ও জল দিবার জন্য অথবা গোশালা পরিষ্কার করিবার জন্য যাঁহারা দাস দাসী নিয়োগ করেন, তাঁহারা গোপালন করেন কিন্তু যিনি স্বহস্তে আহার্য্য প্রদান করেন, গোশালা পরিমার্জ্জন করেন, তিনি গো-সেবা-ধর্ম্ম পালন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করেন। হিন্দু-নারী গো-সেবা-পরায়ণা হইবেন বলিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ "গো-পাল ব্রত" বা গাভী-পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন! বৈশাখের প্রচণ্ডাতপতাপে যখন তৃণদল শুষ্ক হইয়া যায়—ময়দানে যখন জলাভাব হইয়া উঠে, সেই সময়—মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে বৈশাখী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত অষ্টম, নবমবর্ষীয়া হিন্দু বালিকার "গো-পাল ব্রত" বা গো-সেবা পদ্ধতি দর্শন করিলে স্বতঃই পুলকিত হইতে হয়। স্বহস্তে গাভীর জন্য নবীন তৃণদল সংগ্রহ, গাভীর পদধৌত ও গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিয়া গলবস্ত্রে জোড়-হস্তে যখন প্রার্থনা করে—

"গোপাল গোকুলে বাস, গাভীর মুখে দিয়ে বাস,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস"

তখন মনে হয় ধন্য আর্য্য ঋষিবৃন্দ! কি সুন্দর ভাবে সাংসারিক ক্রিয়া কলাপে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব বিমিশ্রিত করিয়া গিয়াছেন! প্রাচীনকালে ধনবানগণ এমন কি মহারাজচক্রবর্ত্তীরাও গো-সেবা করিতেন। সূর্য্য-বংশীয় নরপতি দিলীপের গো-সেবার বর্ণনা কালিদাসের রঘুবংশে বিবৃত হইয়াছে।

আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং কণ্ডূয়নৈর্দংশনিবারণৈশ্চ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্, সমারাধনতৎপরোঽভূৎ॥
স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রযাতাং নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েবতাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ॥

গাভীর স্বাদু তৃণগ্রাসে, গাত্রকণ্ডূয়নে, দংশনিবারণে ও যথেচ্ছগমনের অনুরোধে, সেই সম্রাট তাহার পরিচর্য্যায় রত থাকিলেন। দাঁড়াইলে দাঁড়াইয়া, চলিলে চলিয়া, বসিলে আসনে স্থির হইয়া, জলপান করিলে স্বয়ং জলপানে ইচ্ছুক হইয়া ভূপতি তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।"

যিনি আদেশ করিলে শত শত পরিচারককে গো-পালনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিতেন, সেই মহারাজা দিলীপ স্বয়ং বনে বনে গো-রক্ষায় গাভীর অনুসরণ করিয়া বেড়াইতেন ; গোশালা স্বহস্তে পরিমার্জ্জন করিতেন। ঐরূপ না করিলে তাঁহার সেবাধর্ম্ম পালন হইত না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ধনবানেরা প্রত্যহ স্বয়ং গো-শালার তত্বাবধারণ করিতেন, ভৃত্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ধনকুবের-গৃহিনীরাও স্বয়ং রন্ধন করিয়া পতি পুত্র অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন করাইতেন। রশুই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতেন না, অতিথি এবং স্বামী পুত্রকে স্বয়ং রন্ধন করিয়া না খাওয়াইলে পাপ হয় এইরূপ ধারণা এখনও পাশ্চাত্যসভ্যতালোক-শূন্য অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। দেবীরূপিণী গৃহলক্ষ্মীগণকে সেবা-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, রন্ধনাদি কার্য্যে পারদর্শিনী করিবার অভিপ্রায়ে মহাভারত পুরাণাদি ভক্তভাবুকগণের রচিত মহাকাব্য-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় জগত-জননী বিশ্বরূপিনী জগতকর্ত্রী স্বয়ং অন্নদারূপিনী, স্বহস্তে বিশ্বমানবকে অন্নব্যঞ্জনদানে ব্যাপৃতা। রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, রাজরাণী হইয়াও সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতি প্রাচীন মহিলাগণ রন্ধন-কার্য্যে দক্ষা ছিলেন। রাজকন্যা সাবিত্রী স্বেচ্ছায় নির্ধন স্বামীর সহিত বনবাসিনী হইয়া গৃহকার্য্যে নিপুনতা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সেবা-ধর্ম্মের অন্তরালে একটি সুন্দর ভাব নিহিত আছে। যাঁহারা আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি আমি যেরূপ দৃষ্টি রাখিব অপরে কখনই সেরূপ পারিবে না। কিসে তাঁহাদের সন্তোষ, কিসে তাঁহাদের বিরাগ তাহা বুঝিয়া আমি যেরূপ কার্য্য করিব অন্যে কখনই সেরূপ পারিবে না। সেবা-ধর্ম্মের ইহাই মূলসূত্র। এই সেবা-ধর্ম্মে যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই সেরূপ পায় না। আপনার সুবিধা অসুবিধা সুখ অসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমার প্রিয়তমের মনস্তুষ্টির জন্য পরিশ্রম করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিব, সে আনন্দ লাভ অন্য অন্য উপায়ে দুর্ল্লভ। সেই অতুলনীয় আনন্দই সেবাকারীর একমাত্র পুরস্কার—সেবা-ধর্ম্মের পুণ্যফল।

কবিরা প্রেমকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "ত্বদীয়তা-ময়" এবং "মদীয়তা-ময়।" ত্বদীয়তা অর্থে—আমার যাহা কিছু আছে সকলি তোমার—আমি স্বয়ং তোমারই। তোমার সন্তোষ-সাধন, প্রীতিবর্দ্ধন

করিতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক, তুমি আমাকে একান্ত আপনার করিয়া লও, ইহাই ত্বদীয়তাময়ের মর্ম্ম। আর মদীয়তা-ময় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—আমি যাহারই হই না কেন—তুমি আমার—তোমার যথা-সর্ব্বস্ব আমার, আমার প্রীতি-সাধনে তুমি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক ইহাই মদীয়তার মূল সূত্র! বলা বাহুল্য যে ত্বদীয়তা স্বার্থ-শূন্য আর মদীয়তা স্বার্থযুক্ত। ত্বদীয়তা-ময় প্রেম নিবৃত্তি-মার্গ আর মদীয়তাময় প্রেম প্রবৃত্তিমার্গ। আমাদের দেশের প্রাচীন মহাত্মারা এই নিবৃত্তিমূলক ত্বদীয়তাময় প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। যাবতীয় সেবাধর্ম্ম এই ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা ঈশ্বরকে এই ত্বদীয়ভাবেই পূজা উপাসনা করিয়া থাকি। সেই জন্যই রোগীর সেবা, আতুরের সেবা, গুরুজনের সেবাকে আমরা পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করি! কেন না ইহা হইতেই আমরা দেবসেবার পথ জানিতে পারি, মুক্তির উপায় দেখিতে পাই।

পাশ্চত্য দেশসমূহে অধুনা ত্বদীয়তা অপেক্ষা মদীয়তারই প্রাধান্য অধিক। সে দেশে পত্নীও সম্পূর্ণরূপে আপনার হইতে পারেন না। সেই জন্য পত্নীর অনেক কার্য্যে পতির হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। পত্নী যদি গোপনে কাহাকেও পত্র লেখেন অথবা পত্নীর নামে যদি কোন স্থান হইতে পত্র আসে সে পত্র পাঠ করা পতির পক্ষে অন্যায়। পাশ্চাত্য-সমাজে পতী ও পত্নী পৃথক দুইজনা, পতি পত্নীর মধ্যে কতকগুলি সর্ত্ত থাকে যতদিন পতি সেই সর্ত্তগুলি পালন করেন, ততদিন পত্নীও তাঁহার সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু পতি যদি সে সর্ত্ত পালন না করেন তাহা হইলে পত্নীও আপনার সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য নহেন, এমন কি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াও পত্নী পতির নিকট হইতে পৃথক হইতে পারেন। যে দেশে সামাজিক বন্ধন এই প্রকার—এত শিথিল, সেই দেশে ত্বদীয়তার প্রভাব নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু-সমাজে যত রকম কুসংস্কার প্রবেশলাভ করুক না কেন, এমন ত্বদীয়তার ভাব জগতের আর কোন দেশে আর কোন সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। এমন পতি পত্নীর সুদৃঢ় বন্ধন জগতের আর কোথাও নাই। এ বন্ধন জন্মজন্মান্তরে ছিন্ন হয় না, ইহাই পতি পত্নীর বিশ্বাস। সেইজন্য এখানে ত্বদীয়তার পূর্ণ রাজত্ব। তুমি আমায় ভালবাস বা না বাস আমি তোমায় ভালবাসিবই, তুমি যাহারই হও, তুমি আমার হও বা না হও আমি

তোমারিই। বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও মহাভারত প্রণেতা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অন্যান্য গ্রন্থে সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াও যেন তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়াই সেবা ধর্ম্মের পূর্ণ মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মকাব্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় প্রতি ছত্রে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি অধ্যায়ে কেবল ত্বদীয়তা-ভাবপূর্ণ উপদেশবাণী। কেবলমাত্র সার্ব্বজনীন নিঃস্বার্থতাপূর্ণ অমূল্য সেবা-ধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সৃষ্টি, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ চরিত্র অন্যান্য সদ্‌-গুণাবলিতে বিভূষিত থাকিলেও সেবা-ধর্ম্মই যেন তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য! বাল্যে গো-সেবা, নন্দ যশোদার প্রতি অলৌকিক ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-সেবা নন্দের বাধা কাষ্ঠপাদুকা মস্তকে বহন, পিতার আজ্ঞায় গোচারণ, যশোদার শৃঙ্খলে বন্দীকৃত, অন্য দিকে গো-সেবা, রাখাল বালকগণের সহিত বন্য সুমিষ্ট ফল আদান প্রদান, স্কন্ধে আরোহণ-আদি বন্ধুবান্ধবের সেবা, গোপীগণের সাহিত্য নিত্য গীত-হাস্য-পরিহাসে তাঁহাদের সেবা, কৈশোরে কংস নিধন করিয়া দেবকী বসুদেবের সেবা, বিদ্যাশিক্ষার ব্যপদেশে শিক্ষক ও ব্রাহ্মণাদির সেবা, দ্বারকায় রাজ্য-স্থাপন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের সেবা, পত্নীগণের সেবা, পাণ্ডবের সহিত সখ্যে তাঁহাদের সেবা, এইরূপে তাঁহার কর্ম্মময় জীবন সেবা-ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। অন্যদিকে নন্দ যশোদার সেই ভগবানকে পুত্রভাবে সেবা, রাখাল বালকগণের দাস্যভাবে সেবা, পাণ্ডবগণের সখা-ভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সেবা আর সর্ব্বোপরি ব্রজ-গোপীগণের ঐকান্তিক ভগবৎ সেবা। রাস-লীলায় ভগবান যখন গোপীগণকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামী, শ্বশ্রূ; শ্বশুর, অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন তখন গোপীগণ জোড় হস্তে গললগ্নীকৃতবাসে বলিতেছেন ভগবন্ আমরা গৃহে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না, গৃহে আমাদের যথার্থ সেবা-ধর্ম্ম প্রতিপাদনের সুযোগ নাই, কারণ স্বামী-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে শ্বশ্রূ শ্বশুরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটে, শ্বশ্রূ শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতিথি অভ্যাগতের সেবা হয় না, মোট কথা এক সঙ্গে সকলের সেবা অসম্ভব বলিয়া সেবাধর্ম্ম আমরা সম্যক প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই না। সেবা-ধর্ম্ম সাধন করিয়া আমাদের মনঃপূত হয় না, সেই জন্য একাধারে যখন তুমি স্বামী, যখন তুমিই পুত্র, তুমিই শ্বশ্রূ শ্বশুর

অভ্যাগত, অতিথি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল স্থাবর জঙ্গম সব, তখন প্রাণপণ যত্নে ও ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তোমার সেবা করিলে আমরা যথার্থ সেবা-ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইব, আমরা যথার্থ নারীজনোচিত সকল গুণের অধিকারী হইতে পারিব। বঙ্গের খ্যাতনামা সংগীত-রচক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ব্রজ-গোপীদের মুখে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিতেছেন—

"আমরা মুক্তি চাইনে হরি
আমরা আসিব যাইব চরণ
সেবিব এই ভিক্ষা করি।"

এমন ত্বদীয়তা-ভাব কি আর অন্যত্র সম্ভব হইতে পারে? ভগবদ্ভক্ত কবি জয়দেব গাহিয়াছেন :—

ত্বমসি মম ভূষণম্, ত্বমসি মম জীবনম্,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

অন্যত্র—

তুমি সে গলার হারা
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়ন তারা।

নিধুবাবু গাহিয়াছেন—

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বিনা আর জানিনে॥

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্রাট কবিকুঞ্জ-কোকিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুমধুর ঝঙ্কার—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও।"

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমাবিনা আর এজগতে মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো॥"

জনৈক কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

ভালবেসেছি ব'লে চাইনে হে তার প্রতিদান
যেথা থাক সুখে থাক শুনে জুড়াইবে প্রাণ।

এইরূপ কবির কাব্যে, গায়কের সঙ্গীতে, গৃহস্থের গৃহে, ঋষি তপস্বীর আশ্রমে, হাটে মাঠে এক কথায় ভারতের সর্ব্বত্র এই "ত্বদীয়তা" ভাব বিরাজমান! আর ত্বদীয়তা নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য দেশে আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিবার ব্যবস্থাও অন্যরূপ। তাঁহাদের সমাজে মদীয়তার ভাব দেখিলে একটি গানের কতক অংশ অনেক সময় স্মরণ পথে উদিত হয়—

"ভালবাসে ভালবাসি জড়িয়ে গিয়ে ধর্‌বো কেন পায়।" পাশ্চাত্য দেশে কোন আত্মীয় স্বজনের পীড়া হইলে বাটীতে তাঁহাদের যথারীতি সেবা হইবে না বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া থাকেন। স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রী অথবা স্ত্রীর পীড়া হইলে স্বামীও হাঁসপাতালে গমন করেন। ইহাতে সে দেশের কাহারও নিন্দা নাই। তবে সে দেশে রোগীকে গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়াই যে সেবা-ধর্ম্মের মহিমা সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত তাহাও নহে। সে দেশে অনেক সম্ভ্রান্ত ললনা স্বেচ্ছায় সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হাঁসপাতালে রোগীর সেবা করিতে যা'ন, সমর-ক্ষেত্রে আহত সৈনিক পুরুষদিগের সেবা করিবার জন্য অনেক রমণীই সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে দেশে প্রত্যহ মুষ্টি-ভিক্ষা দানের বা কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা নাই "হরি বোল, ভিক্ষা দাও মা" বলিয়া ভিক্ষুক দ্বারে দাঁড়াইলেই ভিক্ষা-দানের পদ্ধতি নাই। আছে—আমস্ হাউস, চেরিটেবল সোসাইটী; তথায় অন্ধ, কুষ্ঠ, অসহায় স্থবির, বৃদ্ধেরা আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদের হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অন্যরূপ। যাহা পাশ্চাত্য সমাজের উপযোগী তাহাই যে আমাদের সমাজেরও উপযোগী হইবে এরূপ কোন কথা নাই। গণ্য-মান্য পিতা পীড়িত হইলে পুত্রেরা কাগজ পড়িয়া পিতার সংবাদ প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশের কেহ ইহা পসন্দ করেন কি? আমাদের দেশে যত বড়ই ভোজ হউক না, গৃহলক্ষ্মীরাই স্বহস্তে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন। কিন্তু বিলাতে বা আধুনিক পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে সহর অঞ্চলে ভারতবর্ষেও ঐরূপ ভোজের ভার হোটেলওয়ালাদের উপরেই ন্যস্ত হইয়া থাকে। এদেশের রমণীরা ভোজে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া যে বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, সে আনন্দ

পাশ্চাত্য সমাজে দুর্লভ। এদেশের কুললনারা যতই কেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হউন না তাঁহারা এখনও সেই ভারতের প্রথায়—

পিতারক্ষিত কৌমারে, ভর্ত্তারক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে ভর্ত্তার অধীন, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন—ইহাদের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহাদের পাশ্চাত্য প্রথায় সেবা ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন ঘটিয়া উঠে না। সমর-ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক আহত সৈনিকের সেবা করিবার কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য দেশে সেবা করিবার জন্য নানারকম সভা সমিতি আছে; সেবাকারিণীদিগের স্বতন্ত্র এক একটা দল আছে। এই কলিকাতা সহরেও দুই একটি ইউরোপীয় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, Little Sisters of the poor, St. Mary's Home, Alms House, কয়েকটি অরফ্যানেজ এবং ইউরোপীয় প্রথায় কুষ্ঠাশ্রম, অন্ধাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এদেশে রমণীদিগকে এভাবে সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহাদিগকে গৃহে বসিয়া প্রত্যহই সেই সেবা-ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের "সেবাকারিণী ভগ্নীরা" সংবাদ পাইলে গৃহস্থের বাটীতে অথবা হাঁসপাতালে গিয়া যে কার্য্য করিয়া আসেন অথবা সেবা-গ্রহণকারীকে নিজে সেবা-সভায় আসিয়া যে সেবা গ্রহণ করিতে হয়, এদেশে প্রত্যেক গৃহস্থ রমণীকে কর্ত্তব্যবোধে সেই কার্য্য নিত্যই স্বগৃহে সম্পাদন করিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের সেবাকারিণীরা কেবল রোগী বৃদ্ধ ও আতুরের সেবাই করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচ্য সমাজের পুরস্ত্রীগণকে রোগীর সেবা হইতে আত্মীয় স্বজন এমন কি অতিথি অভ্যাগতের মনস্তুষ্টির জন্য সকল কার্য্যই করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম্মোপদেশ-বিহীন কুশিক্ষায় আমাদের পবিত্র অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে এই সেবা-ধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, একথা বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবিত দেশে লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ এমন কি আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধপল্লীসমূহে এখনও যেরূপ সেবাধর্ম্মের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তাহা আমাদের হিন্দু মুসলমান সমাজে বিরল। এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ

জগতের সেবার জন্য যে কোন একটী পুত্রকে ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করাইয়া কৃতার্থতা বোধ করিয়া থাকেন. ভিক্ষু সম্প্রদায় ভগবান বুদ্ধদেবের এক অভিনব আবিষ্কার। অবশ্য অতি পূর্ব্বে যে ভিক্ষাব্রতধারী ব্রাহ্মণ আমাদের দেশে ছিল না এমন নহে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ও বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতার অম্বলে সুধার আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের বিরাট দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, বুনো রামনাথ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহিণীর অলঙ্কার আছে কি না জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন—

> ন ভালে সিন্দূরং, নয়নযুগলে নাঞ্জনপুটং
> নবক্ষোজে হারা ন চ খদিরসারোহধরপুটে।
> অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মুখাম্ভোরুহদৃশাং
> লুঠন্ বাহোরগ্রে বিগত কলহৌ লৌহ-বলয়ঃ॥

কপালে সিন্দুর নাই, নয়নদ্বয়ে অঞ্জন বিলেপনও নাই, গলায় গজমতি হারও দোদুল্যমান নাই, অথবা অধরে তাম্বুল রাগও নাই, তাই বলিয়া তিনি বিধবা নহেন (বিষাদিতাও নহেন) বামহস্তে একগাছি লৌহ-বলয় মাত্র ধারণ করিয়াই সেই পতিব্রতার মুখখানি অমল কমলের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি প্রফুল্লিত।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিবিধ যাগ যজ্ঞে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক হইতে যেন পাষণ্ডতা ও পাশবিকতা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। চতুর্ব্বর্ণই যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-প্লাবিত দেশে আবার সাত্ত্বিকভাবপ্রধান ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রধান কার্য্য মানবের সেবা! "সাত্ত্বিক ভাবের ভাবুক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হয় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, নচেৎ বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া পড়িতেন সুতরাং তাহাতে একটা স্বার্থপরতা না আসিয়া থাকিতে পারিত না এবং তাহাতেই ক্রমশঃ ভারতের অবনতি ঘটিয়াছিল, এই জন্যই ভগবান বুদ্ধদেব সংসার বিরাগী অবিবাহিত ভিক্ষুসম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বমানবের সেবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বনবাসী হইতে আদেশ না দিয়া বিহার বা দেবালয়ে লোকালয়ে থাকিয়া আপামর সাধারণের সেবা করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। তবে ভিক্ষুগণ লোকালয়ে থাকিতেন বলিয়া কোনরূপ ব্যভিচারের আদেশ ছিল না। তাহাদিগকে ২২৭ টি অতি-

কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত, এবং নিজের সুখদুঃখের প্রতি, সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এক পয়সা সঞ্চয় না করিয়া নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া জগতের সেবা করিতে হইত।'

ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের দেশের সহর অঞ্চলের অনেকেই এই সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতেছেন। অনেক গৃহস্থের বাটীতেই রমণীরা পাচক পাচিকার উপরে স্বামী পুত্র কন্যা শ্বশুর শাশুড়ীর আহার্য্যপ্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করিয়া আপনারা পুস্তক পাঠে বা শিল্পকলার চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা "রান্নাবাড়াকে" অশিক্ষিত নীচ লোকের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া আপনাদের সুশিক্ষার পরিচয় দেন। কিন্তু এই রান্নাবাড়ার ভিতরে যে অতুলনীয় সেবা-ধর্ম্ম নিহিত আছে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহারা দেখেন যে সাহেব-বাড়ীতে বাবুর্চি খানসামারা যে কার্য্য করে তাহাদিগকে নিজের সংসারে সেই কার্য্যই করিতে হয়। অতএব এই ইতর-জনোচিত কার্য্যের ভার বেতনভোগী দাসদাসীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন।

এই সেবা-ধর্ম্ম যে কেবল ভাব-মূলক তাহা নহে, ইহার সহিত স্বাস্থ্যেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বেতনভোগী পাচক পাচিকারা অনেক সময়ে নানাকারণে অখাদ্য দ্রব্যও প্রভুকে খাওয়াইয়া থাকে। দুগ্ধের কটাহে ভেক বা টিকটিকি পতিত হইয়াছে, দেখিয়াও অসাবধানতার জন্য তিরস্কারের ভয়ে অনেক পাচক পাচিকা সেই ভেক, টিকটিকিকে ফেলিয়া দিয়া বাটীর সকলকে সেই দুগ্ধ পান করায়, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু কোন রমণীই এরূপ অবস্থায় সেই দুগ্ধ স্বামী, পুত্র অথবা কোন আত্মীয়কে পান করাইতে পারেন না। সুতরাং যে কার্য্যের সহিত স্বামী, পুত্র বা কন্যার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, জীবনের সম্বন্ধ আছে, সেই কার্য্যকে পরিচারকের কার্য্য ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছিলাম যে এক ধনবানের বাটীতে গৃহিণী পীড়িত সন্তানকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার একজন দাসীর উপর দিয়া স্বয়ং অন্য একটি কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। দাসী রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ে সেই জন্য যথাসময়ে ঔষধ সেবন করাইতে পারে নাই। পরে নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রভুর তিরস্কারের ভয়ে সে রোগীকে একেবারে দুই তিন দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দেওয়ায় রুগ-

শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সেবার ভবানীপুরে জনৈক উকিলের পুত্রের অন্নপ্রাশনে, আহার করিয়া অনেকগুলি ভদ্রসন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, অবশ্য তথায় রন্ধনাদির ভার যে ঠিকা রসুই ব্রাহ্মণগণের উপর অর্পিত ছিল তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। এই সকল দুর্ঘটনা যে কেবল দাস দাসী, রসুই ব্রাহ্মণ বা বাবুর্চির অজ্ঞতার ফল তাহা নহে, ইহা গৃহিনীগণের বিলাসিতা ও ঔদাস্যের কুফল! আপনার হস্তে সেবা করা ও পরের দ্বারা সেই কার্য্য করান যে কত প্রভেদ, তাহা এই সকল ঘটনা হইতে বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কয়েকমাস পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম এলাহাবাদে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পত্নী একদিন নিজের বাবুর্চ্চিকে মুখ হইতে নিষ্ঠিবন লইয়া খাদ্যবিশেষ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া সেই দিন হইতে নিজে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্রকে ভোজন করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সংবাদ পত্রে সন্দর্ভ লিখিয়া তাঁহার অন্যান্য সুশিক্ষিতা ভগ্নিগণকে সেইরূপ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা আমাদের দেখিবার ও শিখিবার বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে সকল প্রতীচ্য ভাবোন্মত্ত গৃহস্থের গৃহে বাবুর্চ্চি রাখা, রন্ধন ও ভোজন কালে খানসামার উপর পরিবেশনের ভার ন্যস্ত আছে তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে যেরূপ অখাদ্য ও ঘৃণিত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয় তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশ্যে গৃহস্থগণকে সাবধান করিবার জন্য দুই একটি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম মাত্র। ব্রাহ্মণ হইতে মেথর পর্য্যন্ত জাতিকে বাবুর্চ্চিগিরি করিতে দেখা যায়। বাবুর্চ্চি মাত্রেই মদ্যপ, লম্পট ও পিশাচের দ্বিতীয় অবতার! আর পিশাচঅবতার না হইলেই বা কি প্রকারে চলিবে? নিজ-প্রভুর সন্তোষ-বিধানার্থ—প্রভুর রসনা-তৃপ্তির জন্য প্রতিদিন যাহাদিগকে যথাপ্রয়োজন পশু পক্ষী হত্যা করিতে হয়, তাহারা কেমন করিয়া সাত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারেন? ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য কায়স্থাদি বাবুর্চ্চির বিষয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহারা মুর্গি মটন রন্ধন করিলেও জাতত্বের গর্ব্ব পরিত্যাগ বা আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের দ্বারা অভক্ষ্য ভোজনের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান বা কেওড়া, ডোম, হাড়ি, মগ প্রভৃতি বাবুর্চিগণ অনার্য্য ও অসভ্য। উহারা মটনের স্থলে বিফ, টমেটোর

পরিবর্ত্তে বিলাতী কুম্মাণ্ড, ঘৃত চুরি করিয়া চর্ব্বি, এরূপ মূল্যাধিক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অল্প মূল্যের দ্রব্য প্রদান করিয়াই থাকে, অধিকন্তু একের ভোজন উচ্ছিষ্ট অন্যকে খাওয়াইয়া তাহার সুস্থ সবলদেহ নানা রোগের আকর করিয়া তুলে। একবার কোন ধনী মহাশয়ের বাড়ীতে মেথর আসিয়া বাবুর নিকট অনুযোগ করিল যে "হুজুর এখন আমি আর পাতের (ভোজন-উচ্ছিষ্ট) কোন দ্রব্য পাই না।" বাবু দয়ালু ছিলেন, তিনি জানিতেন তাঁহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া মেথরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি পালিত হয়, অনেক সময় তিনি ইচ্ছা করিয়া ভোজন পাত্রে খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া রাখিতেন, সুতরাং মেথরের অনুযোগে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা অভ্যাগতগণকে খাওয়াইয়া রন্ধনশালার অবশিষ্ট উত্তম দ্রব্য বাবুর্চি ও খানসামা মহাশয়দের রসনার তৃপ্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে লোকের যেরূপ স্বাস্থ্য তাহাতে ওরূপ ব্যভিচার-ভক্ষণে নানাবিধ সংক্রামক পীড়া হইতে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বামী পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশ্যে গৃহস্থালীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়া, সমর্থ-পক্ষে যতদূর সম্ভব স্বহস্তে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সংসারে তাঁহাদের জন্য অন্য বহুতর কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন, ভারতের প্রধান সমাজ-সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই বলিয়াছেন উদ্যানে আমাদিগের জন্য যে ফুল রহিয়াছে তোমরা তাহা গ্রহণ করিও না; আমাদের প্রত্যেক কার্য্য অনুকরণ করিলে তোমাদিগের ভাল হইবে না।

এই সেবা-ধর্ম্ম প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ উভয় বিমিশ্রিত। ইহলোকের বৈষয়িক সুখের উপযোগী দ্রব্য সকল পাইবার ইচ্ছায় যে সেবা এবং যাহারা পরলোক বা জন্মান্তর মানেন তাঁহাদের পক্ষে পরলোক বা পরজন্মে যাহাতে সুখভোগ হইতে পারে তদুপযোগী যে সেবা বা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ প্রেয় এবং ইহলোকে যাহাতে প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শান্তিলাভ হয় ও পরলোকে বা পরিণামে যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ সেবা বা কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা তাহা দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ শ্রেয়ঃ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগ-বাসনার জন্য সেবা প্রেয়ঃ এবং ভোগের বাসনাবিহীন যে সেবা-ধর্ম্ম তাহা শ্রেয়ঃ। প্রেয় প্রবৃত্তি ও শ্রেয়ঃ নিবৃত্তি। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, তাহা হইলে প্রেয়মার্গমুখী সেবাই প্রকৃত পক্ষে

সেবা এবং শ্রেয়োমার্গমুখী সেবা, সেবাই নহে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অধুনা নিশ্চয়ই বিরল। এ প্রকার সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। কারণ কি মুমুক্ষু, কি ভোগবিলাসী সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্মে রত। তবে সে ইচ্ছা ও তৎপ্রণোদিত কর্ম্ম বা সেবাধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন প্রকার। অনেকে মনে করিতে পারেন প্রেয়মার্গমুখী সেবাই মনুষ্যকে প্রকৃত কর্ম্মী ও জগতের হিতসাধন উদ্দেশ্যে প্রকৃত সেবাধর্ম্ম-পরায়ণ করিয়া তোলে এবং শ্রেয়োমার্গমুখী সেবা মনুষ্যকে নিষ্কর্ম্মা ও জগতের হিতসাধনে বিরত করে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। সত্য বটে প্রবৃত্তিমার্গমুখী সেবা নিবৃত্তি-মার্গমুখী সেবা অপেক্ষা অধিক প্রবল ও অধিকতর প্রবলবেগে আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সে ইচ্ছা যে সুখের অন্বেষণ করে অনিত্য হইলেও অতি নিকট এবং সহজ-ভোগ্য। পক্ষান্তরে, নিবৃত্তিমার্গমুখী সেবা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহা নিত্য হইলেও সুদূরস্থিত এবং সংযত-চিত্ত না হইলে কেহ তদ্‌ভোগে অধিকারী হয়েন না। কিন্তু তাহা হইলেও নিবৃত্তিমার্গমুখী সেবা যদিও আমাদিগকে ধীরে ধীরে কর্ম্মে নিয়োজিত করে তথাপি একবার সেরূপ সেবাকার্য্য আরম্ভ হইলে অবিশ্রান্ত ভাবে তাহা চলে কারণ সে সেবা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহা নিত্য ও সেই সুখভোগশক্তির কখনও হ্রাস হয় না। কঠোপনিষদে যমওনাচিকেতা উপাখ্যানে নাচিকেতা যখন বৈষয়িক সুখ উপেক্ষা করেন তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে "সে সুখের (বৈষয়িক বা প্রবৃত্তি-মার্গমুখী কর্ম্মের) উপকরণগুলি অস্থায়ী এবং সে সুখভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয় ও আমাদের ভোগশক্তির হ্রাস হয়।" প্রবৃত্তিমার্গের সেবা-সুখের এই প্রধান বাধা—সে সুখলাভের জন্য যে ভোগ্যবস্তু সকল অবশ্যক তাহা অস্থায়ী এবং সে সুখভোগের জন্য আমাদের যে শক্তি আছে তাহাও ক্ষয়শীল। পরন্তু প্রবৃত্তিমার্গমুখী সেবা-ধর্ম্ম সংসাধন করিতে গেলে তাহা যথা-যোগ্যরূপে নির্ব্বাহিত হওয়ার পক্ষেও অনেক শঙ্কা থাকে, কারণ সেবাকারী নিজে সুখলাভের জন্যই সে সেবায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যদি কেহ নিবৃত্তিমার্গমুখী সেবাধর্ম্ম সংসাধনে ইচ্ছুক হন তবে তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কা কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সে সেবাকার্য্য যাহাতে যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্যই চেষ্টিত থাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

রোগীর সেবা শুশ্রূষা অতীব সৎকর্ম্ম। প্রবৃত্তিমার্গগামী কোন সেবা-ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি যদি সেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে পর-হিতৈষণা অবশ্যই তাঁহার অন্তরে থাকিবে অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের হিত-কামনা অর্থাৎ যশঃ ও সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই থাকিবে, সুতরাং তাহার ফল কখন কখন এরূপ হইতে পারে যে, যাহাকে কেহই দেখিবার নাই ও যাহাকে, শুশ্রূষা করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না, তাহার সেবা হইবে না। কিন্তু যাঁহাকে সেবা করিলে দশজনে দেখিতে পাইবে বা সংবাদ-পত্র মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে তিনিই অগ্রে সেবা পাইবেন। দুঃখের বিষয় অধুনা এইরূপ সেবা-দানাদিরই বহু প্রচলন! তবে নিবৃত্তি-মার্গের পথিক কেহ যদি এরূপ সেবা-ধর্ম্মে ব্রতী হয়েন তিনি কেবল মাত্র পরহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিবেন, কর্ত্তব্য পালন জনিত সুখ ভিন্ন অন্য কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনই করিবেন না সুতরাং তিনিই যথাবিহিত কার্য্য-করণে সেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রকে সেবা করিতে সমর্থ হইবেন।

যদি কেহ বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গগামী সেবা-পরায়ণেরাই কর্ম্মক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করতঃ নানাবিধ বৈষয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ হিতসাধন করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন; নিবৃত্তি-মার্গগামী সেবা-ধর্ম্ম-পরায়ণেরা সেরূপ কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাক সত্ত্বেও যখন কোন ব্যক্তি অসাধ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, দুঃসহ শোকে আকুল বা দুস্তার নৈরাশ্য-নদে নিমগ্ন হয়, তখন নিবৃত্তিমার্গের সেবা-ধর্ম্ম পরায়ণেরাই তাঁহার ঘনতমসাচ্ছন্ন চিত্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগেরই গভীর সেবা-ধর্ম্ম-প্রসূত মহান উপদেশাবলি তখন তাঁহার শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

মানব সর্ব্বদাই প্রবৃত্তিমার্গগামী কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ আচার সেবাধর্ম্মটিও যাহাতে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে না পারে ও সর্ব্বদাই নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে তদ্বিষয়ের চেষ্টা প্রাণপণ যত্নে করা কর্ত্তব্য। বাল্যকালে আমরা দেখিতাম চিত্রকরগণ দেবীমূর্ত্তি ও মানবীমূর্ত্তি ভিন্নভাবে গড়িতেন কিন্তু এখন চিত্রশিল্পের উন্নতি হওয়ায় দেবী মানবী চিনিবার উপায়ই নাই; সবই এক রকম, হাবভাব-নিপুণা নাচওয়ালীর ছবি। কিন্তু আমাদের মনে হয়

যেমন দৈবী মানবী ভিন্ন থাকাই কর্ত্তব্য সেইরূপ সেবাধর্ম্মটি শ্রেয়ঃমার্গে রাখাই উচিত! নিবৃত্তি বা শ্রেয়ঃসেবায় মনুষ্য নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আমাদের ভারতীয় হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে—তাহা-মূর্ত্তি পূজা!

পূর্ব্বে বলিয়াছি "প্রেয় বা প্রবৃত্তিমার্গমুখী সেবার ফল বা সুখ ক্ষণস্থায়ী' অথচ মানব প্রবৃত্তির দাস। সেই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ প্রবৃত্তির মধ্য দিয়াই সেবাধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য লোককে সেবাধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তি দিবার উদ্দেশ্যে অর্থ-পিপাসু ব্যয়কুণ্ঠ গৃহী পুরুষদিগের জন্য বারমাসে তের পার্ব্বণ ও স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত অসংখ্যব্রত নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার কারণ অন্য সময়ে কেহ দরিদ্র নারায়ণ, ব্রাহ্মণ বা আত্মীয় স্বজনের সেবা করুন বা না করুন, পূজা পার্ব্বণে "পাঁচজন লোক" খাওয়াইতেই হয়, গ্রামের ছোট লোক-(দীনহীন নিম্নশ্রেণীর লোক) দিগকে দুই থালা অন্ন দিতে হয় এ ধারণা হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। পাশ্চাত্য দেশে ধনীভ্রাতা দরিদ্রভ্রাতার সহিত কথা কহেন না, বাটীর ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণ করেন না, ধনী ধনবান লইয়াই ব্যস্ত? কিন্তু ভারতের এই অবনতির দিনেও ভাই ভাইকে খোঁজে. অপর সময় তল্লাস করা হউক বা না হউক নিজের বাড়ীর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে ভ্রাতাভগ্নি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে আহ্বান করিতে হয়! লক্ষপতিকে দীনহীনের পর্ণকুটীরে যাইয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতে হয়, অশৌচান্তের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। দীন দরিদ্র খাওয়াইতে হয়। "প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া-মূর্ত্তি পূজা করিলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়" যদি কেবল এই ধারণাই হিন্দুর থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই দোল দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা উপলক্ষ মাত্র, প্রেয়-মার্গমুখী সেবা-ধর্ম্মের বহু প্রচলন উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রেয়মার্গমুখী সেবায় শ্রেয়ঃ ভাব আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকগণ পূজাপার্ব্বণের প্রচলন করিয়াছেন। মনে করুন যদি কেহ দুর্গোৎসব করেন, তিনি প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য জনৈক সূত্রধর বা কুম্ভকার, প্রতিমা সাজাইবার জন্য জনৈক মালাকার, তারপর বাদ্যকর পশুছেদন জন্য ঘাতক কর্ম্মকার, কাঠুরিয়া, জন মজুর, দুইজন দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ, পরিচারকগণ, চাউল ডাইল বিক্রেতা, তরী তরকারী মৎস্য

বিক্রেতা, দধি দুগ্ধ, মিষ্টান্ন বিক্রেতা প্রভৃতি ইহাদের সেবা প্রকারান্তরে ত করিবেনই অধিকন্তু ব্রাহ্মণ আত্মীয় স্বজন, দীন দরিদ্রেরা পূজার তিন দিন যথোপযুক্ত-ভাবে সেবা প্রাপ্ত হইবেন।০ পূজার পূর্ব্বে ও পরে আরো দুই চারি দিন ধরিয়া লোকজন খাওয়ান দাওয়ান যে না হইয়া থাকে এমন নয়। কয়েকদিন তাঁহার গৃহখানি লোকজনসমাগমে আনন্দ-কোলাহলে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। সপরিবারে সে কয়দিন তিনি ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত এক বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সুযশ, দীনহীন জনের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ এবং জন্মান্তরে তাঁহার "ভাল হইবে" এই আশায় তিনি যাবজ্জীবন মনে আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। স্ত্রীলোকগণের ব্রত নিয়মা-দিতে যে অন্নদান বস্ত্রদান, প্রভৃতির ব্যবস্থা তাহাও ঐ প্রেয়মার্গমুখী সেবা-ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে,হিন্দুর আর এক ধারণা যে প্রেয় হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ প্রেয় বা প্রবৃত্তির পদলেহনে প্রাণে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হইলে যখন হৃদয় অনুশোচনা-বারিতে ধৌত ও নির্ম্মল হইয়া যায় তখন শ্রেয়ঃ স্বতঃই আসিয়া সাধকের হৃদয়-মন্দিরে প্রেমময় শ্রীভগবানের পূত সিংহাসন পাতিয়া বসে এবং ক্রমে পূজার উপকরণাদি যথা-প্রয়োজন সঞ্চিত হইলে হৃদয়-দেবতা আসিয়া সেই নির্ম্মল পূত সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দীন সাধকের মানসপূজা গ্রহণ করিয়া সাধককে ধন্য ও কৃতার্থ করেন। সাধক অমর হয়। সাধকের মনুষ্য জন্মগ্রহণ সার্থক হয়। দুর্গোৎসব, পূজা-পার্ব্বণ বা ব্রত-নিয়মে যে সংযম উপবাস বা অন্যান্য ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার পুনঃ পুনঃ আচরণে হৃদয়ে একটা শ্রেয়ঃ ভাব আসে না কি? পশুবলি সম্বন্ধেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত এইরূপ "প্রবৃত্তি পরতন্ত্র মনুষ্যের মাংস ভোজনের প্রবল প্রবৃত্তিকে কিয়ৎ পরি-মাণে সংযত ও নিবৃত্তি-মুখী করিবার নিমিত্ত পূজায় দেবোদ্দেশ্যে পশুহনন-বিধি সিদ্ধ, অন্যত্র তাহা নিষিদ্ধ। এইরূপ ব্যবস্থা ধর্ম্মপ্রণেতাদিগের কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যে কারণেই পশু-বলিদান-প্রথার সৃষ্টি হউক না কেন তাহার নিবারণ বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে জীব-হিংসা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সাত্ত্বিক পূজায় যে পশু বলি-দানের প্রয়োজন নাই এ কথারি প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে।" পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের ১০৪ অধ্যায়ে পার্ব্বতী বলিতেছেন,—

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্প কোটী নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥

হে শিব! যে সকল তামস প্রকৃতির লোক আমার জন্য (আমার প্রীতার্থে) পশুহত্যা করিয়া থাকে তাঁহাদের কোটী-কল্প কাল নিরয় বাসা হইয়া থাকে।

এরূপ বলিদানের বিরুদ্ধে বহুবিধ শ্লোক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল "বৃথা মাংস খাইব না" এরূপ কাহাকেও বলিতে শুনিলে কোন কোন সম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া বসেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, এরূপ দেবোদ্দেশে বলি-প্রদত্ত মাংস-ভক্ষণের মধ্যেও ধর্ম্মের ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে। পাঁটা বলিদান দিতে হইলেই দেবতার পূজা আবশ্যক সুতরাং পুরোহিত কিছু পাইবেন, ঘাতক কামার কিছু পাইবে অধিকন্তু গৃহস্বামী একটা পাঁটা একক ভক্ষণ কোন ক্রমেই করিতে পারেন না, পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইবে। তদ্ব্যতীত ঐরূপ ঝঞ্চাটের মধ্যে প্রত্যহ গমন করিয়া মাংস ভক্ষণ একরূপ অসম্ভব, কাজেই পশুহত্যাও অল্প হয় প্রবৃত্তি ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। আজকাল সহর অঞ্চলে মাংসাদি দুর্ম্মূল্য হইলেও দুষ্প্রাপ্য নহে। সেইজন্য কুটিরবাসী দীন হীন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাসাদবাসী রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেই মাংসাশী হইয়া পড়িয়াছেন। উষ্ণপ্রধান দেশ আমাদের এখানে অতিরিক্ত মাংস ভোজনের জন্য বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অনেকে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রকারগণ আমাদের পিশাচগণের উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি যদি মাংস খাইতেই উত্তেজিত করে, দেবো-দ্দেশে পশু ছেদন করিয়া ঐরূপ ভাবে মাংস ভোজনই ভাল এবং প্রশস্ত!!

হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে আর একটী মধুর তদীয়তা ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেমন নিজের ও নাবালক পুত্রকন্যাগণ ব্যতীত অন্য কেহ এ সংসারে আমার আছে এ ধারণ করিবার আবশ্যক হয় না হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা, শুধু হিন্দুর কেন ভারতীয় মুসলমান পারসিক বৌদ্ধ প্রভৃতি সমাজের শিক্ষা দীক্ষাও এরূপ স্বার্থাবৃত নহে। হিন্দুর ধারণা আবাল্য শিক্ষা যে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র হইতে সুদূর আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী দেশবাসী পর্য্যন্ত আমার পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অংশভাগী। মনু বলিয়াছেন—

"ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতি সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥

মাতা পিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাতা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিতা দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥
এতৈর্বিবাদান্ সন্তজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জিতৈশ্চ জয়তি সর্ব্বান্ লোকানিমান্‌গৃহী ॥

মনু ৪—১৭৯, ১৮০, ১৮১।

"যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোতা, ঋত্বিক, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কর্ত্তা, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত অনুজীবি, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, স্বজাতি সম্বন্ধী ও কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব, এবং পিতা, মাতা, ভগ্নি, পুত্রবধূ প্রভৃতি পুত্র, স্ত্রী কন্যা ও ভ্রাতৃবর্গ ইহাদের সহিত কখন বিবাদ করিবে না। গৃহী ইহাদের সহিত বিবাদ না করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাদের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ করিলে অথবা ইহাদের প্রসন্নতালাভ করিলে তিনি বক্ষ্যমাণ সকল লোকেই জয়যুক্ত হন।

অন্য সময়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সমাচার লওয়া হউক না হউক বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ বা ক্রিয়াকাণ্ড হইলে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র করা হয় এবং তাঁহাদের বিদায়ের দিবস মিষ্টান্ন বস্ত্রাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়া থাকে। মুসলমান খৃষ্টান বা অন্যান্য সমাজে যে পার্ব্বণ বা উৎসবাদিতে দীয়তাং ভুজ্যতাং অথবা সেবা-ধর্ম্মের ব্যবস্থা নাই, এমন কথা আমরা বলি না। তবে পুজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ করিয়া সেবা-ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে হিন্দুরই বোধ বোধ হয় শ্রেষ্ঠাসন!

পূর্ব্বোক্ত সেবা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ না থাকিলেও অন্যরূপ বেতন-ভুক সেবা-ধর্ম্মে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ধারণা ভিন্ন রকমের ছিল। তাঁহারা ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণকে চারি বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করিয়া সেবা-ধর্ম্মের ভার শূদ্র জাতির উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই শ্রেণী-বিভাগ শ্রবণ করিয়া কেহ মনে না করেন যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত স্বার্থপর একদেশদর্শী কুসংস্কারভাবাপন্ন অনুন্নত ও অনুদারহৃদয় ছিলেন। প্রাচীনকালের আর্য্য ঋষিবৃন্দ টেকনিকেল এজুকেশনের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণের সকল কার্য্যই যুক্তি মূলক এবং ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত বলিয়াই বহু প্রাচীন কাল হইতে সমাজ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দুর পরে কতজাতির অভ্যুদয় হইল, কত জাতি বিলুপ্ত হইল তাহার সংখ্যা করা

যায় না।" ডিউক সাহেব বঙ্গবাসীর তথা হিন্দু-জাতির দুঃখে দুঃখিত হইয়া হিন্দুর শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল নীতিপূর্ণ উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার ও শিখিবার জিনিষ! বঙ্গবাসী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ প্রাপ্তির পরই মনে করেন আমার ছেলের যাবতীয় শিক্ষা দীক্ষা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের শিল্প কলাদি যে ক্রমে লোপ পাইতেছে তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন? শিক্ষিত হইতে বারণ করিনা, বাবু সাজিতেও মানা নাই, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার পর যদি সকলেই নিজ নিজ পিতৃ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে কত সুখের হয়? তাহা হইলে কি দেশের শিল্প-বিদ্যার বিলোপ সাধন হয়! কখনই নহে। আমাদের জাতিভেদ সেই টেকনিকেল এজুকেশনের বাধ্যতা-স্বীকার-মূলক আইন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্দ্বারা কর্ম্মকার, কুম্ভকার-নন্দন বাল্যকাল হইতে পিতার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া তিনি যেমন উন্নতি করিতে পারিবেন বা পারিতেন, এখনকার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কি সেই গুণে গুণবান হইতে পারেন? অসম্ভব। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁতবোনা, ধানভানা, জুতাসেলাই, মোজাবোনাই, কত রকম শিল্প-শিক্ষার ঢেউ যে উঠিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই তাহা প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিকারীভেদে কার্য্যভার বা সাধনাভার না দিলে সে কার্য্যে বা সে সাধনায় সাফল্যলাভের আশা থাকে না তাহার ইহা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! আমাদের জাতিভেদ শিল্প-কলা বিদ্যার প্রসার বৃদ্ধির অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে, শূদ্র-জাতির বিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। তাহা নির্ব্বোধ কালাপাহাড়ের মত মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে তিলি, তাম্বুলী, সদোপ, বারুজীবি, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, মোদক, কাংস্যবণিক; শঙ্খবণিক, নাপিত, তন্তুবায়, উগ্রক্ষত্রিয় এমন কি কায়স্থ প্রভৃতি জাতি সকলকে সৎশূদ্র এবং সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা প্রভৃতি জাতি শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু ধীরভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সমালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজ বল্লালসেনের জাতি-নির্ণয়ের সময় উহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের ব্যবসা, কার্য্যাদি ও আচার ব্যবহার দর্শন করিলে উহাদিগকে কখনই প্রতিলোমজ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বোধ হয় না।

মনুসংহিতায় নাপিত দাস বা শূদ্র এরূপ উল্লেখ থাকিলেও নাপিতের অন্ন-ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না। অধিকন্তু বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য শুদ্ধাচারসম্পন্ন নাপিতগণ যে সেই অনার্য্য সন্তান তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ পুরাকালে কৃষ্ণকায় কাষ্ঠ প্রস্তর, ভূত, প্রেতাদি পূজক অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের সংমিশ্রণে পাছে আর্য্যরক্ত দূষিত হয়, সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদ-ধর্ম্মের বিঘ্ন হয় এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে একটু দূরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন উচ্চ জাতির সহিত বিরুদ্ধধর্ম্ম ও নীচ জাতির সহসা সম্মিলনে ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, গরীয়ান লঘু হইয়া পড়ে ও লঘীয়ানের স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া পড়ে। নীতি-শাস্ত্রকার তারস্বরে বারম্বার বলিয়াছেন—

হীয়তে হিমতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।

"হে তাত! হীনের সহবাসে মতি হীন হইয়া যায়, সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহবাসে সমান ও বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎসহবাসে মতি বিশিষ্ট উচ্চ হইয়া থাকে।" সঙ্কর জাতির সৃষ্টি-বিভ্রাট নিবারণউদ্দেশেই সংহিতকারেরা শূদ্রজাতির অন্ন পানীয় পর্য্যন্ত পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়া গিয়াছেন। কারণ আমাদের স্বভাব এই যে, কাহারও সহিত আমাদের সমস্ত বিষয়ে আদান হইয়া থাকিলেও আমরা সহসা তাহার অনুগ্রহণ করিতে পারি না। দুই এক সম্প্রদায়ের ধারণা আহারসংসর্গই সামাজিক সমতার পরিচায়ক। কিন্তু এই প্রাচ্য সহৃদয়তার বেগ, বিধি নিষেধাদির দ্বারা সুনিয়ত হওয়াতেই আর্য্য জাতির আর্য্যত্ব বা শুদ্ধত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতি ও আমাদের পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শূদ্রের প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া অনেক সহৃদয়ের দল চক্ষে সাঁতার পানি বহাইয়া থাকেন। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম বৈতরণীর জলে ডুবাইবার পরামর্শ দেন, সময়ে সময়ে নিজের পিতৃপিতামহগণকে পর্য্যন্ত গালাগালি করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকট করতালি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। কিন্তু একথা কি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় না যে, হিন্দু বিধিপ্রবর্ত্তক মূশা অনীশ্বরোপাসক ইতর জাতিগণকে যত কঠোর-রূপে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন, ঈশা বা মোহাম্মদ যেরূপ অবিশ্বাসীগণকে কঠোর শাস্তি প্রদান এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতা-কারগণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত্র-প্রচলিত

সভ্য মার্কিন দেশে শ্বেতচর্ম্ম ও কৃষ্ণচর্ম্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান বিদ্যমান আছে, পুরাকালে আর্য্য অনার্য্যে তত প্রভেদ ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে বিশেষ অনুধাবনা করিলে অনুমান হয় যে, এরূপ সামাজিক ব্যবধান সকল ক্ষেত্রে না হউক অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। মিলন-প্রবৃত্তি যদি স্বৈরিণী হয়, আর কোন প্রকার বিধি নিষেধ না মানে তাহা হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। আফ্রিকা দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে যে নবঘন-শ্যাম স্থূলোষ্ঠ কাফ্রি রাজকুমার শ্রীমান লবঙ্গুলকে, পূর্ণচন্দ্রপ্রভা বিম্বোষ্ঠা ইংরাজ-কুলোদ্ভবা সুন্দরী বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে এক মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা কি বিশেষ নিন্দার বিষয়? যদি ইংরাজেরা এইরূপ বিবাহে প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে তাঁহাদের জাতীয়তা হীন ও বিকৃত হইবে না কি? বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির ভয়ে ও পরমার্থহানির ভয়েই এই আর্য্যানার্য্যের মধ্যে আহার পানাদি সম্বন্ধীয় ব্যবহারগত ভেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেননা অনার্য্যেরা সংস্কারহীন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেরূপ আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জ্জিত মতাবলম্বীরা কুসংস্কারবশতাপন্ন অশিক্ষিত পরিবারে কন্যা দান করিতে বা কন্যা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পারলৌকিক ইষ্টহানির ভয়ে অনার্য্যগণের সহিত অর্থাৎ শূদ্রগণের সহিত আদান প্রদান করিতেন না।

কিন্তু এই ভেদ-জন্য কঠোরতা ক্রমশঃ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনার্য্যেরা আর্য্য-সহবাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতাও হইতে লাগিল। সত্যযুগের ব্যবস্থাপক মনু বলিয়াছেন,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥"

"যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপনার বংশের মিত্র, যে যাহার গো-পালন করে, যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাহাদিগের অন্নভোজন করা যায় এবং যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিয়াছ তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।" (মনু সংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২৫৩ শ্লোক)। কলিযুগের রচিত পরাশর সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক—

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোক—

শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণং।
ভোজ্যান্নানাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

প্রভৃতি শ্লোকাবলি মনুরুক্তিরই পোষকতা করিতেছে। সুতরাং ওরূপ বিধি সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য জাতির নিকট কালরংই যখন নেটীভ অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গকে "হিন্দু জাতির হীনতা" অর্থাৎ জাতিভেদ দর্শনে হিন্দু নামে পর্য্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইতে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় বৈ কি? অধিকন্তু যখন সত্য ত্রেতাদিযুগে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের পুত্র হইলেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইতেন না, আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুসারেই বর্ণ নির্ণয় হইত অর্থাৎ যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, যিনি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী অধ্যয়নশীল বেদজ্ঞ তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি শস্ত্র-ব্যবসায়ী যোদ্ধা তিনিই ক্ষত্রিয়, যিনি শিল্প বা কৃষি ব্যবসায়ী তিনিই বৈশ্য, আর যিনি সেবাধর্ম্ম পরায়ণ চাকুরিজীবি তিনিই শূদ্র। দ্বাপরযুগের অন্তিম দশায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। "গুণ কর্ম্ম বিভাগ অনুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।" ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন অধিকন্তু—

"গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্যঃক্ষত্রাদ্ব্রহ্ম ব্যবর্ত্তত।"

ভাগবত—৯—২১—১৩।

"গর্গের পুত্র শিনি শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।—

"অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃস্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।"

ভাগবত—৯—২১—১৬।

"অজমীঢ় স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁহার বংশে উৎপন্ন প্রিয়মেধ প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"

"মুদ্গলাদ্ব্রহ্মনির্ব্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্য সংজ্ঞিতম্।"

মুদ্গল নামক ক্ষত্রিয় হইতে মৌদ্গল্য নামক ব্রহ্মগোত্র নির্বৃত্ত হয় অধিকন্তু ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ

করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়নন্দন হইয়া গুহক চণ্ডালের অন্ন ভোজনেও জাতিচ্যুত হয়েন নাই,' দ্বাপর যুগের অন্তিম অবস্থাতেও এইভাব বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়তনয় শ্রীকৃষ্ণ বৈশ্য গোপের অন্ন ভোজন করিয়া জাতিচ্যুত হয়েন নাই বরং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধীবরকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনার বলে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিবার পর, মহর্ষি বেদব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং বেদবিভাগ অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য মহাভারত প্রণয়ন করিয়া জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে এবম্বিধ বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি সদাচার-সম্পন্ন ও ব্রাহ্মণোচিত গুণ-সম্পন্ন হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ঔদারনীতিক সমাজে ব্রাহ্মণের বরণীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন—ব্রাহ্মণ হইতেন। সুতরাং তখন সেবা-ধর্ম্মের ভার শূদ্র জাতির উপর অর্পিত থাকিলেও ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ ছিল না। অধুনা পাশ্চাত্য দেশে লর্ডের পুত্র মূর্খ বা গরীব হইলে যেমন সে জাহাজের খালাসীগিরি বা জুতা সেলাই পর্য্যন্ত করিয়া বেড়ায়, ভারতের প্রাচীনকালেও সেইরূপ যে ব্যক্তি অনাচারী মূর্খ ব্যসনাচারী সে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও শূদ্র, এবং যে সেবাধর্ম্মপরায়ণ চাকুরীজীবি দাস ব্যবসায়ী সেই শূদ্র।' তবে তখনকার শূদ্রদিগের ধারণা ছিল যে, "আমরা অপর তিন জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা দ্বারা ইহকালে সুখ ও পরকালে মোক্ষলাভ করিব। সেইজন্য তখন দাস দাসীর দ্বারা প্রভুর অনিষ্ট সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির পদাভিষিক্ত বর্ত্তমান সময়ের ধনী সম্প্রদায় বা মনিব সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, সেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সেবাধর্ম্ম-পরায়ণ দাস দাসী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দাস দাসীবৃন্দ এখন অত্যন্ত দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য যে পিতার দোষে পুত্র মন্দ হয়?—না পুত্রের দোষে পিতা মন্দ হয়? আজ কাল দাস দাসী মন্দ হয় নাই, পাশ্চাত্য ভাবোন্মত্ত ধনী সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে অতীব স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্য ত্রুটিতে দাস দাসীগণকে কঠোর-ভাবে বিড়ম্বিত করিয়া থাকেন, ভৃত্য যদি মনিবের নিকট পুত্রবৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেকি মনিব মহাশয়কে পিতৃবৎ না দেখিয়া থাকিতে

পারে ? "ভাল বাস কেমন ? না বাস যেমন !" এই অতি প্রাচীন প্রবাদ বচন ত বিদ্যমান আছেই, তা'ছাড়া সদয় ব্যবহারের প্রতিদা'ন যে নির্দ্দয় ব্যবহার ইহা কাহারও কল্পনাতেও আসিতে পারে না তবে বেআইনি (Violation of the rule) আছেই, কোন চাকরই যে খারাপ হইতে পারে না এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই চাকর, মনিবের কার্য্যে বাহাল থাকা পর্য্যন্ত মনিবের সহিত অসদ্‌ব্যবহার করিতে পারে না— সাহসী হয় না। আর এক কথা মনিব-সম্প্রদায়ের একটু অনুধাবনা করিয়া দেখা উচিত যে, কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে যখন স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন তখন তৃতীয় ব্যক্তি চাকর সে বিচলিত হইবে না কেন ? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কালমাহাত্ম্যে ভদ্র সন্তান চাকুরি করিতে আসিয়া কয়েকটি রজতমুদ্রার প্রলোভনে না হয় রাগ-অভিমান-শূন্য হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার অন্তরে প্রভুর মুখনিঃসৃত সেই কটুবাক্যে বিষ সঞ্চিত থাকে বই কি ? সেই জন্য তাহার সেই বিষদগ্ধ হৃদয়ের নিকট বিষ ব্যতীত সুধার আশা দুরাশা হইয়া উঠে। সেই জন্য মনে হয় অধুনা "চাকর বাকর পাজি" হইয়াছে। পূর্ব্বে বাবুর পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্রগণ পুরাতন কর্ম্মচারী, চাকর, রশুই ব্রাহ্মণগণকে জেঠা খুড়ো কাকা দাদা এবং রাঁধুনী বা চাকরাণীদিগকে খুড়ি, জেঠাই, দিদি, মাসী প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত, আজ তৎপরিবর্ত্তে সরকার 'বয়" খানসামা ঝি দাসী প্রভৃতি শব্দ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরাই দেখিয়াছি গৃহস্বামী স্বয়ং যাহা আহার করিতেন বাটীর রাখাল বাগ্‌দী, পাড়ার হরিশবাগ্‌দীর পুত্র দশম বর্ষীয় গিরিশও তাহাই আহার করিত। কোন্ বিষয়ে কর্ত্তা ও চাকরে মনিবে ও রাখালে ভিন্নভেদ ছিল না। জলযোগের সময় কর্ত্তার পৌত্র দৌহিত্র শ্রীনাথ রমানাথ যে সন্দেস মিঠাই খাইতেন, উক্ত রাখালবালক গিরিশচন্দ্রও মুড়ির উপর গুড় ব্যতীত সেই সকল মিষ্টান্নের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইত। বাড়ীর চাকর চাকরাণী কর্ম্মচারীবৃন্দকে বাটীর পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হইত।

"ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতা সংজ্বরঃ সদা॥"

মনু—৪—১৮৫।

"দাসবর্গকে আপনার ছায়ার ন্যায় বিবেচনা করিবে, কন্যাকে পরম স্নেহপাত্রী বলিয়া জানিবে। একারণ ইহাদের দ্বারায় উৎপীড়িত হইলেও

অক্ষুণ্ণ মনে সদা তাহা সহ্য করিবে, কোনক্রমে ইহাদের সহিত বিবাদ করিবে না। এই নীতি বচন যেমন প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইত সেইরূপ চাকরেরা এক মনিবের অধীনে চাকরী করিয়া "এককলমে" জীবন শেষ করিত। দুঃখের বিষয় অধুনা সেরূপ মনিব বা সেরূপ দাসদাসী দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। মনিবগণ যদি এরূপ প্রভুভক্ত সেবা-পরায়ণ দাস দাসী কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহাদিগকে পৌরুষ বাক্য দ্বারা বশীভূত করিবার বা ব্যাজ আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রাচীন প্রথায় সদয় ব্যবহার করুন, তাহাদিগকে পুত্র কন্যা ভাবিয়া তাহাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন, দেখিবেন আবার সেই প্রাচীন কালের ন্যায় প্রভুভক্ত দাস দাসীবর্গ ফিরিয়া আসিয়াছে।

অধুনা আমরা আর একটি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছি. "সকল প্রাচীন রীতি নীতি যেন পরিত্যাগ করিতেই হইবে।" অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে তন্মধ্যে কোনটাই পরিত্যজ্য নহে,কোন প্রথার পরিবর্ত্তন করিবার সময় আমরা অন্ধের ন্যায় পুরাতন প্রথার দোষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াই উহার পরিবর্ত্তে নূতন প্রথাকে আদরে গ্রহণ করি, ইহা আমাদের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। সকল বিষয়েই দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু কোন্‌টি, পরিত্যাগের উপযুক্ত তাহা ধীরভাবে সমাজ-অভিজ্ঞ সমাজ শিরোমণিগণ নির্ণয় করিবেন।

অধুনা এই সেবা-ধর্ম্মের যথেষ্ট অবনতি সংঘটিত হইলেও প্রাচীনকালে পুরাণ উপনিষদাদিতে সেবা-ধর্ম্মের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব স্ত্রী পুত্র এমন কি আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া প্রাপ্ত অর্থে ব্রাহ্মণাদির সেবা করিয়াছিলেন। অসুররাজ প্রধান ভগবদ্‌-ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র বলি ত্রিভুবন দান করিয়াছিলেন, রাজনন্দিনী রাজকুল-বধু দ্রৌপদী স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভোজন করাইয়া সেবাধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, মহারাজ রঘু ও শিবি অবিচলিত চিত্তে নিজ গাত্র হইতে টুকরা ভাবে মাংস কাটিয়া সেবা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগের অন্তিম সময়ে অঙ্গরাজ কর্ণ নিজ পুত্রকে স্বহস্তে নিধন পূর্ব্বক সেবা ধর্ম্মের বিজয় পাতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। পাণ্ডব-ঘরণী সুভদ্রা বিপন্ন দণ্ডী-রাজকে আশ্রয় দান-পূর্ব্বক সেবা-ধর্ম্ম পালনের জন্য নিজ স্বামী পুত্রকে সহোদরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কলিযুগ আরম্ভের প্রায় সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পরে ও বর্ত্তমান সময়ের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা, সুকুমার শিশুপুত্র স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবজ্যা গ্রহণান্তর সেবা ধর্ম্মের প্রচলন মানসে স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-যুগের পুরুষ-প্রধান মৌর্য্য নরপতি অশোক সেবা-ধর্ম্ম প্রচার মানসে স্বকীয় কন্যা-পুত্রকে ভিক্ষুক ভিক্ষুণী সাজাইয়াছিলেন। অধিকন্তু আমাদের সেই মহদ্বাণী সেবা-ধর্ম্মের প্রচলন জন্যই আমাদের পিতৃপুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

"তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

সুতরাং মানব মাত্রেরই সেই পরম মঙ্গলময় বিশ্বপিতা ভুবনেশ্বরের চরণে ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সকল সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনই ধর্ম্ম, তাঁহার অপ্রিয় সাধনই অধর্ম্ম।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মান্তরবাদ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র।

সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম-মতের যে যে মূল তত্ত্বগুলি লইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মতের বিরোধ দেখা যায় হিন্দুর জন্মান্তরবাদ তাহার মধ্যে একটী।

বর্ত্তমান চিন্তা জগতের গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই শত শত বাধা বিঘ্ন, বিরোধ বিসংবাদ ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও যেন এক নিরাপদ, অবিসংবাদি ও অদ্বয় সত্যের অনুসন্ধানেই সমস্ত জগৎ ব্যস্ত। সমস্ত জগতে এই যে একটা মিলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের ভাববিনিময় ও সংসর্গ লাভের সুযোগ ও সুবিধা এবং প্রধানতঃ বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতিই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন মনীষি ব্যক্তি বহু আয়াস ও সাধনার ফলস্বরূপ যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন অপর প্রান্তের অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিয়া উপকৃত হইতেছেন এবং তাহার ফলে জগতের অনেক আপাতবিরোধী-রূপে প্রতীয়মান রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া নিখিল-মানবের ভ্রাতৃত্বের

পথ সুগম করিয়া দিতেছে। আজ এই বিশ্বজনীন মিলনের প্রয়াসের দিনে আপাতবিরোধী জীব জগতের একটী মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বর্ত্তমান ইউরোপ খণ্ডের এই ক্ষণিক অশান্তিময় যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

জন্মান্তরবাদ কি ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহার কোন সমর্থন বা উল্লেখ আছে কি না, থাকিলেই বা তাহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মানবের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। কারণ মানবের জন্মান্তর গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, "জন্মান্তর গ্রহণ করে কে; অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই দৃশ্যমান জড়দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তদতিরিক্ত কোন্ বস্তু পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে ?"

স্থূল-দৃষ্টিতে আমরা জগতে দুইটী বিরোধী বস্তুর ক্রিয়া দেখিতে পাই; একটীর নাম জড় অপরটীর নাম চেতন। জড়ের শক্তিকে আবরণ শক্তি ও চেতনের শক্তিকে বিকাশ শক্তি বলা যাইতে পারে। প্রতি অণু পরমাণুতেই এই দুইটী শক্তির অহরহঃ পরস্পর সংঘর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে আপাতদৃষ্টিতে যাহা আমাদের নিকট ঘোরতর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহা বস্তুতঃ আদৌ বিরোধী নহে, পরন্তু প্রীতির বা মিলনের অভিনয় মাত্র; এমন কি যাহারা দুইটী পৃথক সত্ত্বারূপে প্রতিভাত হইতেছে মূলতঃ তাহারাও এক ও অদ্বয়। এই বৃহৎ জগৎ ব্যাপারে যাহা, এই ক্ষুদ্র জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। কিরূপে সেই এক অদ্বয় তত্ত্ব দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্ত্বারূপে প্রকাশিত হইলেন; অর্থাৎ কিরূপে সেই এক নিষ্কলঙ্ক সদ্বস্তু—পরমাত্মা—এই পরস্পর বিবদমান শক্তির ভিতর দিয়া বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন তাহা এই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এখন স্থূলতঃ আমার এইটুকু বুঝিতেছি—যে এই ক্ষয়শীল স্থূল-দেহের অন্তরালে একটী চেতন শক্তি আছে যাহার সহায়তা, সফলতা, যাহার প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্তই এই জড় দেহের আবশ্যকতা ছিল এবং বর্ত্তমানে যাহার অভাবে, ইহার (এই স্থূল দেহের) আবশ্যকতা না থাকায় ইহার বিনাশ বা বিলয় প্রাপ্তি ঘটিল। মানব-দেহাশ্রিত এই চৈতন্যই,—যাহা যে কারণেই হউক তাহার স্বরূপ পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং শাস্ত্র যাহাকে জীবাত্মা বলেন—

প্রকৃত পক্ষে তিনিই জন্মান্তর গ্রহণ করেন। স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে এই জীবাত্মাই আবার কামনা বাসনাদি নির্ম্মিত সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করে; প্রতি জন্মের সহিত ইহারও উত্তর উত্তর পরিণতি ঘটিয়া থাকে।

এ যাবত আলোচনা করিলে আমরা তিনটী বিষয়ের সন্ধান পাইলাম—দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা; তন্মধ্যে জীবাত্মাই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী দেহান্তর, যে জন্মান্তর, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। মানবের এই স্থূল দেহাতিরিক্ত যে আরও দুইটী অবস্থা—যাহাকে আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহা স্বীকার করেন। "The dividing assunder of soul and spirit" (Hebrews iv, 12). এই স্থানে আর একটী প্রশ্ন এই উত্থিত হইতেছে যে, "জীবাত্মার এই দেহ ধারণের প্রয়োজন কি?" এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে আমরা বলিব মানবের নিজ নিজ কর্ম্ম ফল ভোগই ইহার মুখ্য প্রয়োজন এবং ক্রমে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার চরম প্রয়োজন। একটু ধীরচিত্তে মানবজীবন পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। ঐ যে পিতামাতার নয়নানন্দকর, নন্দনের প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম-সদৃশ সদ্যোজাত সুকুমার শিশু, সংসারের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য কিছুরই ধার ধারে না, দুই দিন না গত হইতেই অকস্মাৎ পিতামাতাকে দারুণ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া বৃন্তচ্যুত ম্লান-পুষ্পের ন্যায় কালের করাল কবলে পতিত হইল, যে অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সেই অজ্ঞাত দেশেই চলিয়া গেল, পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কোন কাতরোক্তি, ক্রন্দনধ্বনি বা চেষ্টা যত্ন কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। অবার ঐ যে ধনমদে মত্ত, বলদৃপ্ত, উচ্চবংশগৌরবে অভিমানী নবীনযুবক ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া পরপীড়া, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্মকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া ঘোর পাপজীবন যাপন করা সত্ত্বেও জনসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত ধামে চলিয়া গেল, অথচ তাহারই সম্মুখে আবার পরদুঃখকাতর পরহিতব্রত সত্যনিষ্ঠ, নিঃসম্বল, দীনহীন যুবক পরার্থে নিজজীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইতেছে না তথাপি সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও পদদলিত হইতেছে ইহার রহস্য কি? শাস্ত্র বলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবৈচিত্র্যই তাহাদের ইহ জন্মের ঐরূপ ভোগ ও কর্ম্মবৈচিত্র্যের কারণ ও নিয়ামক। বস্তুতঃ আমারা একটু স্থির

চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিব ইহাই ঐ সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা। নিজ নিজ শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশানুযায়ী কর্ম্ম সকলেই করে বটে কিন্তু সকলেই সমান ফলভোগী হয় না। এমন কি অধিক পরিশ্রমী ব্যক্তির অল্পসফলতা এবং অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তির অধিক কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোনও অজ্ঞাত কারণে মানব আত্মা তাহার নির্বিকার সত্যস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় নিজেকে বিকারগ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া সুখদুঃখের অধীন হইয়া, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পুনরায় তাহার স্বরূপাবস্থালাভের নিমিত্ত নব নব জীবনের ভিতর দিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই চরম লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, যে অবস্থায় তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত সূক্ষ্মদেহেরও বিলয় ঘটিবে।

এখন দেখা যাউক খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জন্মান্তরবাদের কোন উল্লেখ আছে কি না এবং থাকিলেই বা কিরূপ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা কালে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক স্থলে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা না করিয়া কেবল তাহার আভাস বা ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া আছে। ইহা অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নহে যে যে সময়ে যে দেশে ঐ সকল শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তৎকালে তাহা ঐ সকল দেশবাসীদিগের উপযোগী করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে কাল-বশে তত্তৎবিষয়ে লক্ষ্যহানতাই বোধ হয় পরবর্ত্তী মানবের ঐ ঐ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণ। আমরা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে একটু অন্তর্মুখীন্ হইয়া ঐ সকল বিষয়ের সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে সত্য স্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে।

মহাত্মা খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "হে অপূর্ণ মানব, তোমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হও। তোমরা পূর্ণ ভগবানের মন্দিরস্বরূপ, তাঁহার আত্মা তোমাদের মধ্যেই বাস করিতেছে।" "Be ye perfect. Ye are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in you." (Cor. iii., 16). দুর্ব্বল অজ্ঞান ও অপূর্ণ মানবের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনই তাহার একমাত্র অভি-ব্যক্তি বলিয়া ধারণা থাকিলে মহাত্মা খৃষ্ট কখনই দীর্ঘকালের কঠিন সাধন-সাপেক্ষ এরূপ মহান আদর্শের দিকে মানুষকে অগ্রসর হইতে কখনই উপদেশ দিতেন না।

বাইবেল গ্রন্থের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট নামক অংশের শেষভাগে মহাত্মা ইলাইজা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে উহা জন্মান্তরবাদের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে "দেখ, প্রভু খৃষ্টের সেই শ্রেষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর দিন আগমনের পূর্ব্বে আমি তত্ত্বদর্শী ইলাইজাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব।" "Behold, I will send you Elija the prophet before the great and terrible day of the Lord come" (Malachi iv. 5)

উক্ত বাইবেল গ্রন্থেরই নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে মহাত্মা মথি লিখিত সুসমাচারের ১৭ শ অধ্যায়েও উক্ত সাধু ইলাইজা সম্বন্ধে লিখিত আছে। তথায় মহাত্মা খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে তাঁহার কোনও অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন "আমি মরিয়া পুনরুত্থিত হইবার পূর্ব্বে এ বিষয় যেন কাহাকেও বলা না হয়।" তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইলাইজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ লিখিত আছে। "যিশুকে তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে ইলিয়স (ইলাইজা) নিশ্চয়ই পূর্ব্বে (অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে) আসিবেন, শাস্ত্রে এরূপ বলে কেন?, তখন যিশু এই বলিয়া উত্তর দিলেন 'ইলিয়স নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আসিবেন এবং সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি' সেই ইলিয়স পূর্ব্বেই আসিয়াছেন কিন্তু লোকে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছে। মানব পুত্রকেও (অর্থাৎ আমাকেও) তাহাদের নিকট ঠিক এরূপে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।' তখন তাঁহার শিষ্যেরা বুঝিলেন যে তিনি জন-দি-ব্যাপ্টিষ্টের কথা বলিতেছেন।" "His disciples asked Him, saying why then say the scribes that Elias must come first?' And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall come and restore all things. But I say unto you that Elias come already and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the son of man suffer of them., Then the disciples understood that He spake unto them of John the Baptist." (Matthew XVII, 10-13).

পুনশ্চ ১১শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কারণ 'জন' সম্বন্ধে সকল মহাত্মা এবং শাস্ত্রই ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া গিয়াছেন। এবং তোমরা যদি ইহা বিশ্বাস কর তবে এই সেই ইলিয়স, যাঁহার আসিবার কথা ছিল।" "For all the prophets and the law prophesied until John And if ye will receive it. *this is* Elias, which was for to come."

উপরি উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে আমরা দেখিতেছি মহাত্মা খৃষ্ট দুইবারই অতি স্পষ্টরূপে জনের পূর্ব্বজীবনের কথাই বলিতেছেন। যিশু খৃষ্টই বলিতেছেন "এই জনই সেই ইলিয়স।"

অপর এক স্থলে এক জন্মান্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গেও এই জন্মান্তরের বিষয়ই বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। খৃষ্টের শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "প্রভু, কাহার—ইহার নিজের, না ইহার পিতামাতার—পাপে এই ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" "Master, who did sin, this man or his parents, that he was boron blind?" উক্ত প্রশ্ন হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে শিষ্যেরা ঐ অন্ধ ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্ম কৃত পাপ কর্ম্মের কথাই বলিতেছে। খৃষ্ট যদি তাহাদের এই ধারণা ভুল বলিয়া মনে করিতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই উহা সংশোধন করিয়া দিতেন, যেমন অন্য অনেক স্থলে তিনি বলিয়াছেন।

এই পূর্ব্ব ও পরজন্মের কথা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরাও পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন এবং উহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞেয়বাদমূলক খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় (Gnosticn) মধ্যে প্রচলিত ছিল। * পরে ৩৪০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে যে এক স্থানীয় ধর্ম্মসভা আহুত হয় তাহাতে এই জন্মান্তর বিষয়ক শিক্ষাদান গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক এই ঘটনা সত্ত্বেও এমন অনেক খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্ম সম্প্রদায় (Mystical sects) আছেন যাঁহাদের মধ্যে জন্মান্তরে বিশ্বাস এখন পর্য্যন্তও অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

"Reincarnation, a study of Forgotten truth" নামক পুস্তক-প্রণেতা E. D. Walker বলেন প্লেটো, সিজার, ভার্জ্জিল প্রভৃতি মনীষিগণও এই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

* "Pistis sophia" নামক গ্রন্থ

অতঃপর আমরা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ অধ্যাপক Professor J Ellis Mc Taggar'এর মত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলেন ঃ—

"The belief in human pre existence is a more probable doctrine than any other form of the belief in immortality. The theory that there is one short life bounded by birth and death, and then one indefinitely long life, not divided by birth and death at all, has no analogy in nature, and such a change from the order of our present experience seems unjustifiable." (Address to the synthetic society in January, 1904).

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া জীবন সফল করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, গতবারে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া তাহার অনুবাদ দিয়াছি তাহাতে উক্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্যস্বরূপে চতুর্দ্দশটি সোপান আচার্য্যগণের উপদেশানুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সোপান কয়টি এই। ১। সাধুদিগের কৃপা ২। মহৎসেবা. ৩। শ্রদ্ধা ৪। গুরুপদাশ্রয় ৫। ভজনে স্পৃহা ৬। ভক্তি ৭। অনর্থাপগম ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি ১০। আসক্তি ১১। রতি ১২। প্রেম ১৩। দর্শন ১৪। মাধুর্য্যানুভব।

পূর্ব্বের ছয়টি শ্লোকের দ্বারা ভাগবতধর্ম্মের সাধন আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইল। হরিকথায় রুচি সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। কথায় রুচি হইলে সাধুসঙ্গ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। লোকে শুনিতে চায় না, কর্ণ ও হৃদয় রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ, অহঙ্কারের দুঃস্বপ্ন লইয়া আমরা বসিয়া আছি। দুঃখ সকলেরই আছে, অভাব সকলেরই

আছে এবং এই দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য আমরা কত লোকের শরণাপন্ন হইতেছি কত প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতেছি, নানা কথায় জগতের বায়ুমণ্ডল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রুচির সহিত ভগবানের কথা কেহ শুনিতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া যে মনুষ্য শুনিতে চাহে না তাঁহাও ঠিক নহে, রুচি নাই অর্থাৎ তাহাকে ভাল লাগে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের কথাই একমাত্র সত্য কথা, অন্য কথায় যে সত্য নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সকল কথায় সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; কেবল তাহাই নহে অন্যান্য কথায় যে সমস্ত সত্য আছে তাহা পারমার্থিক সত্য নহে, ব্যবহারিক সত্য। ভগবানের কথা ব্যতীত অন্য কথায় আমাদের কোন সমস্যারই মীমাংসা হয় না, হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু তবু আমাদের ভগবানের কথায় রুচি নাই। যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট, যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহা খাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না। ইহা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

এখন এই রুচি উৎপাদনের সুগম উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই সুগম উপায় তীর্থগমন। তাহার কারণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি অর্থাৎ তীর্থে গমন করিলে প্রায়ই সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গ হইলেই কোন না কোন রূপে সাধুসেবার সুবিধা ঘটে। যেমন ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন "কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বতএব সংপদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয় স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎকথায়াং কিমেতে সঙ্কথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ রুচির্জায়ত ইতি। তথাচ মহদ্ভ্য এব শ্রুত্বা ঝটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ। তথা শ্রীকপিল দেববাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ নানাকার্য্যব্যপদেশে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কখন কখন বাস করিয়াও থাকেন। সেবা নানারূপ, দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণাদি দ্বারা আপনা হইতেই সাধিত হইয়া থাকে। এই সেবার

প্রভাবে সাধুগণের আচরণে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। সাধুগণ পরস্পর ভগবৎ প্রসঙ্গই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহাদের এই প্রসঙ্গ অল্প শুনিলেই তাঁহারা কি কথা কহিতেছেন একটু শোনা যাউক এইরূপ ইচ্ছা হয়। তাহার পর সেই কথা শুনিলে সেই কথায় রুচি হয়। মহতের নিকট হরিকথা শুনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে, শ্রীকপিলদেবও এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গ হইলে ভগবানের মহিমা ও করুণার কথা হইয়া থাকে। এই কথা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন। সেই কথা শুনিতে শুনিতে সঙ্গে সঙ্গেই অপবর্গবর্ত্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র আরাধ্যরূপে শ্রীভগবান বাসুদেবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে এই কথাটি শুনিলে সাধারণ মনুষ্য বিবেচনা করিবে যে তাহা হইলে ভাগবতকার একটি সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। একে বহু সম্প্রদায়ের কলহ ও প্রতীদ্বন্দ্বীতায় জগৎ অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পর আবার এই এক সাম্প্রদায়িক মত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কোন সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করেন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবল বাক্য লইয়াই বিব্রত থাকি ততক্ষণ বক্তার সহিত মিলন অসম্ভব। বাক্য শুনিয়া যদি বাক্যের অর্থের মধ্যে প্রবেশ করা যায় তাহা হইলে মিলনেরও বিশ্বজনীনতার ভূমি দেখিতে পাইব। পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে যুগে এবং যে আদর্শ লইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব সেই যুগ ও সেই আদর্শ আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি আর একবার তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সঙ্গত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি অতি প্রধান ঘটনা এই মহাযুদ্ধের পর চিন্তাশীল ভারতবাসীগণের চিত্ত এক দারুণ সন্দেহ-দোলায় আলোড়িত হইতেছিল। মানুষকে ভগবানের জন্য জীবনধারণ করিতে হইবে, ভগবান লীলাময় তিনিই একমাত্র কর্ত্তা এই অনুভূতিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার জন্য জীবন ধারণ করিতে হইবে, জীবনের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন। এই সকল কারণে কবিগণ অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা যাঁহারা সত্য প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা, পরম আনন্দ সহকারে ভগবান বাসুদেবে মনঃসংশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুযায়ী শ্লোকটির বিস্তৃত তাৎপর্য্য এই। শাস্ত্রের কথা বলা হইল। তাহাতে দেখা গেল যে সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও সাধুমুখে শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া সেই কথায় রুচিলাভ করাই আমাদের প্রথম কার্য্য। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে অনেক পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে কিন্তু এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম! কেবল শাস্ত্র যে এই কথা বলিয়াছেন তাহা নহে! এই পথ সদাচারসম্মত। চিরদিন কবিগণ এই পথ আশ্রয় করিয়াছেন! যে পথ শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত তাহা নিশ্চয়ই আশ্রয়ণীয়। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। ধর্ম্মজীবনের পথ আমরা সর্ব্বদাই অত্যন্ত কষ্টকর পথ বলিয়া বিবেচনা করি। সাধারণতঃ মানুষ ধর্ম্মের নামে যে টুকু করে সেটুকু হয় যমদূতের বা নরকযাতনার ভয়ে অথবা সহজে স্বার্থসাধন হইবে এই প্রকারের লোভের প্রেরণায়। কিন্তু এই যে ধর্ম্ম ইহা ধর্ম্মপদবাচ্য নহে। ধর্ম্মপথ কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করা অজ্ঞানতার ফল। ধর্ম্মজীবনের পথ আনন্দে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কষ্টকর, তবে শেষফল সুখকর কিন্তু তাহা নহে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও সুখকর, শেষফলও সুখকর। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন "কর্ম্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং। প্রত্যুত সুখরূপম্ এব।" কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় ভক্তির অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকালে দুঃখরূপ নহে পরন্তু সুখরূপ। অবশ্য সাধারণতঃ আমরা যাহাকে সুখ বা আরাম বলি সে প্রকারের সুখ নহে, কারণ সে সুখ তো সংস্পর্শজ এবং তাহা দুঃখের সোপানমাত্র। এ সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও শাশ্বত।

বলা হইল যে মনঃসংশোধিনী ভক্তি ভগবান বাসুদেবে করা হইয়া থাকে। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিজের উপাস্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করিয়াছে। উপাস্য যে কোনও প্রকার হইলেই তাহাকে ভক্তি করা যায় না। হৃদয়ের মধ্যে ভক্তির উদ্রেক করিয়া সেই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে পারেন উপাস্যের মধ্যে সেই সমস্ত কল্যাণ-গুণ আছে উপাসকের অন্তরে এরূপ প্রতীতি থাকা চাই; যেমন 'ভালবাস' বলিলেই অমনি একজনকে ভালবাসা যায় না, ভয়ে বা লোভে ভালবাসা যায় না, সেইরূপ ভক্তি কর বলিলেই ভক্তি করা যায় না। 'বাসুদেব ভগবান' বলিলে সেই পরমার্থ তত্ত্বের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্ম্ম সূচিত হইয়া থাকে যে সেই লক্ষণগুলি দৃঢ়রূপে চিন্তা করিলে বা সত্য করিয়া বুঝিলে মানুষ তাঁহাকে

ভাল না বাসিয়া পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ক্রমে ক্রমে আমাদের সহিত সেই পরমার্থতত্ত্বের পরিচয় সাধন করিয়া দিবেন। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাহারই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করিতেছেন।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ।
যুক্তঃ পরঃপুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোনৃণাং স্যুঃ ॥"

যদিও এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি এবং হর এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ হয়।

শ্রীধরস্বামী বলেন যে ব্রহ্মাদি ত্রিদেব একাত্মা হইলেও বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি সত্ত্বতনু। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ একটু অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে সামান্য প্রভেদ আছে। যাহা হউক এই উভয় ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা ভাগবতধর্ম্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য এই।

বলা হইল যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তিই করণীয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্য যে কিছুই নহে এমন কথা বলা হয় নাই। এইমাত্র বলা হইতেছে যে এজন্য যে যত্ন, যে চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহা না করিয়া যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সুন্দররূপে সিদ্ধ হইবে। প্রেম বা সেবাও এক অর্থে কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু এখানে কর্ম্ম বলিতে দেবতার উপাসনা বুঝিতে হইবে। শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই বলিলেন "দেবতান্তর ভজনমপি ন কর্ত্তব্যম্ ইত্যাহ সপ্তভিঃ।" সপ্ত শ্লোকে বলিলেন অন্য দেবতার পূজা কর্ত্তব্য নহে। * অন্য দেবতার কথা কি, ভগবানের গুণাবতার যে বিষ্ণু

* একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গৌড়ীয় আচার্য্যগণের দেবতান্তর-পূজা নিষেধ ও একালের পৌত্তলিকতা বিনাশ এক জিনিস নহে। সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বোধ হয় এই যে প্রথমটি হিন্দুসাধনার ভিতর হইতে এবং অপরটি বাহিরের অনুকরণ হইতে সঞ্জাত। ফলেও প্রভেদ আছে।

তাহার পূজা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাঁহাতেও পরব্রহ্মের অভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাঁহারা শ্রেয়ঃপ্রার্থী তাঁহারা রজঃ গুণের অবতার ব্রহ্মা ও তমঃগুণের অবতার শিব, ইঁহাদের ভজনা করেন না (পরমতত্ত্ব বুদ্ধিতে)। অবশ্য পুরুষ এক বই দুই নহেন, সেই এক পরম পুরুষই এই বিশ্বের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের জন্য যথাক্রমে সত্ত্ব, ও রজঃ ও তমোগুণে যুক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ তৎসমুদয় গুণের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া হরি বিরিঞ্চি হর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সেইরূপে আবির্ভূত হয়েন। এই ত্রিদেবের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি প্রভৃতি শুভ ফল সমূহ, শ্রীবিষ্ণু হইতেই হয়, কারণ তিনি সত্ত্বতনু সত্ত্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত। (তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই ত্রিদেবের উপাসনা দুই প্রকারে হইতে পারে এক উপাধিদৃষ্টিতে আর এক তত্ত্বদৃষ্টিতে। উপাধিদৃষ্টিতে ভজনা করিলেই দেবতান্তরের ভজনা হয়, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে ভজনা করিলে পরম-পুরুষের ভজনা হয়।) ব্রহ্মা ও শিব, রজঃ ও তমোগুণের এই দুই গুণাবতারের যদ্যপি উপাধি দৃষ্টিতে সেবা করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম তাহা ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব এই উভয় গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অতি-সুখকর হয় না। ধর্ম্ম অর্থ কাম সাধিত হইতে পারে, মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু কামনাপূর্ত্তি হইতে উদ্ভূত যে সুখ তাহা স্থায়ী হইবে না। এই সুখ কখন (অর্থাৎ রজোগুণের স্পর্শ থাকিলে) অহঙ্কারে চিত্তকে উদ্ধত করিয়া দিবে এবং অপরের অনিষ্টসাধন আদি অপকর্ম্ম ও অমঙ্গল জন্মাইবে; আবার এই সুখ কখন (অর্থাৎ তমোগুণের স্পর্শ থাকিলে) মোহ আনয়ন করিবে। উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে সেবা তাহাতে মোক্ষ হয় সত্য কিন্তু এ প্রকার সেবার হঠাৎ সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া ঈষৎ উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত ভজনা হয় না। শ্রীবিষ্ণুর সেবা উপাধিদৃষ্টিতেও যদি করা যায় তাহা হইলে যে ধর্ম্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হয় তাহা সুখদ কারণ সত্ত্বগুণ শান্ত। আর যদি নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করা যায় তাহা হইলে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান হয় বলিয়া সাক্ষাৎ মোক্ষ হইতে পারে এই জন্যই স্কন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন—

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥

উপাধি পরিত্যাগের দ্বারাই পঞ্চমপুরুষার্থ ভক্তি হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণু পর-

মাত্মারূপে প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য বিষ্ণু হইতে শ্রেয়ঃলাভ হইয়া থাকে। শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের টীকার শেষ অংশটুকু ধীরভাবে চিন্তা করিলে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা যায়'। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে গুটিকয়েক কথা বা নাম লইয়া বহির্মুখভাবে বিরোধ করিয়া থাকে। সম্প্রদায়সমূহের গতি ও পরিণতি আলোচনা করিলে হিন্দু সাধনা কেমন করিয়া ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যিনি যে নামে বা যে 'ভাবেই' উপাসনা আরম্ভ করুন না কেন তাঁহাকে উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক তাঁহার উপাস্য দেবতাকে একটি পরিমিত কোন কিছু বলিয়া মনে করিবেন, অন্যের উপাস্য হইতে ও অন্যান্য বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক বলিয়া জানিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যে মন্ত্রই জপ করুন, আর যে কোন অনুষ্ঠানই করুন, তিনি পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রকৃত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে সফলতা তাহা লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা, সত্ত্ব-গুণের উপাসনা, স্থিতিশক্তির উপাসনা। মানুষ না জানিয়াও এই শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করিতেছে। যোদ্ধা যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া তবে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে সেইরূপ আমরা শান্তভাবে জ্ঞানালোকের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। সত্ত্বগুণে চিত্ত অবস্থিত হইলে বিষ্ণু পরমাত্মাকারে প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকাশের নাম বাহ্যান্তর্য্যামীরূপে প্রকাশ। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কিছু আছে সমস্তের গুহাশয়স্থিত যিনি, সকলেরই সত্তা ও চৈতন্যের হেতু যিনি তিনি এক, এই উপলব্ধি, মানবের ক্ষুদ্রতা দূর করিয়া দেয়, তাহার চিত্ত প্রসারিত হয়, সে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমের যে সনাতন পথ সেই পথে পদার্পণ করে। এই পথে চলিতে চলিতে উপাধি পরিত্যাগ অর্থাৎ আমার আমিটিকে অন্য সমস্ত হইতে নিত্য-স্বতন্ত্র বলিয়া যে অভিমান, তাহার বর্জ্জন সহজেই হইয়া থাকে।

রজোগুণের আশ্রয় লইলে বিক্ষেপ আর তমোগুণের আশ্রয় লইলে আবরণ আসিয়া থাকে। অবশ্য এ কথা একেবারে মিথ্যা নহে যে এই উভয়গুণের মধ্য দিয়াও কালে কখনও নিস্ত্রৈগুণ্যে উপস্থিত হইয়া উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চমপুরুষার্থ যে প্রেম, তাহা অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু আবরণ বিক্ষেপের মধ্য দিয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি? শান্তভাবের আশ্রয় গ্রহণই মঙ্গলের সুগম পথ।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য যে বাসুদেব-উপাসনা যাহা প্রারম্ভে বলা হইয়াছে তাহা শুনিয়া কেহ যেন বিচলিত হইয়া এরূপ চিন্তা না করেন যে শ্রীমদ্ভাগবত কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মতের প্রচার করিতেছেন এবং এই গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের, জগতের বা সকল মানবের নহে। প্রাচীন টীকাকারগণের যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখা গেল এই ত্রিগুণের খেলায় সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে জগৎ হয়ত এমন একটা অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহারা সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতাস্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে তমোগুণ ও রজোগুণ মানবপ্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। মানব ধর্ম্মের নামে যাবতীয় জ্ঞানচর্চ্চাকে অবহেলা করিয়া আলস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহে। এক অবস্থায় এরূপ প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতিতে স্বাভাবিকী। এ বড় ভয়ানক অবস্থা। এ অবস্থায় অনেক সময়ে এক বাহ্য শান্তিপ্রিয়তাও আসিয়া থাকে এবং মূঢ়মানব এই শান্তিশীলতাকে মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, মনে করে ইহাই বুঝি সত্ত্বগুণ। মানুষের আর এক অবস্থা আছে সে অবস্থায় মানুষ তীব্রপ্রবৃত্তি ও বিক্ষেপকেই ভালবাসে, চঞ্চলভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অতীত বা ভবিষ্যতের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ না রাখিয়া বর্ত্তমানেই আত্মহারা হইয়া যায়। এই অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে বেশ মোহনীয় বলিয়া মনে হয়। তমোগুণ ও রজোগুণ এতদুভয়ের ধ্বংস বা বিনাশের উপর সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা নহে, এইটুকু বেশ দৃঢ়রূপে মনে রাখিতে হইবে—তমোগুণ ও রজোগুণের শাশ্বত সমন্বয়ের নামই সত্ত্বগুণ। চৈতন্যের দিক হইতে দেখিলে যেমন সৎ ও চিৎ এই উভয়ভাব আনন্দভাবে পরিণতি লাভ করে, জড়ের দিক হইতে বা প্রকৃতির দিক হইতে দেখিলে ঠিক সেই রূপ তমোগুণ ও রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণতি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত যখন বাসুদেব-উপাসনার কথা বলিলেন তখন এই সত্ত্বগুণে সমন্বয়ের কথাই বলিলেন, কোনরূপ বর্জ্জন বা সাম্প্রদায়িকের কথা বলেন নাই। আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ যেমন সৎ ও চিৎ বা সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই উভয়শক্তির সমন্বয়রূপা হলাদিনীশক্তির সহিত নিত্যক্রীড়ারত, বাসুদেবও তেমনি ব্রহ্মা ও রুদ্র এই উভয়ভাবের সমন্বয়, বাসুদেবকে ধরিয়া তুরীয় কুঞ্জে যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী তাহাই করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোক আবার জ্বলিয়া উঠুক, আমাদের হৃদয় আবার সেই

মহামিলনের আনন্দস্বপ্নে বিভোর হইয়া উল্লাসে নৃত্য করুক, অশান্ত ও অজ্ঞান জগতে হে বাসুদেব, তুমি আসিয়া আবার আবির্ভূত হও, আবার নিত্য বৃন্দাবন প্রপঞ্চে প্রকট হউক। বর্ত্তমান জগৎ ঠিক এই ভাগবতধর্ম্মই চাহিতেছে। এই ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত বর্ত্তমান জগতের আর অন্য পথ নাই।

একাবলী। (৪)

নবম পরিচ্ছেদ।

নদীর উপকূলে।

রাজযোগ্য উপচারে রাজা তুর্ব্বসু ও তদীয় মহিষীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে মহারাজ একবীর দীন ও দরিদ্র-গণকে বহু অর্থ ও বস্ত্রাদি এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু গোধন দান করিলেন। ইহাতে শরচ্চন্দ্রের মরীচির ন্যায় তাঁহার যশোবিভা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল।

শ্রাদ্ধাদি অবসানে বিগতক্লম হইয়া মহারাজ একবীর মৃগয়াভিলাষী হইয়া মন্ত্রীবরকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "আমি অচিরেই মৃগয়ার্থে বহির্গত হইব, চতুরঙ্গ সেনা ও কতিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে আপনি উদ্যোগী থাকিবেন।" পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর মৃত্যু-সংবাদে তিনি যে প্রকার বিচলিত হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে রভ্যরাজ-দুহিতা একাবলির সাক্ষাৎলাভের জন্য রভ্য-রাজ প্রাসাদের অদূরবর্ত্তী নদীতটে গমন করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা আর তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল না। রাজার বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রীও আর তাঁহাকে সে বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন না। শ্রাদ্ধাদির আয়োজনে তাঁহাকে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কয়েক দিবস বিশ্রাম সুখলাভ না করিতে করিতেই মৃগয়াগমনে বহির্গত হইতে হইবে, এই রাজাদেশ শ্রবণপূর্ব্বক বিরক্তি সহকারে সেনাপতিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত রাজবর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছেন ইতিমধ্যে রাজ-বয়স্য বক্কেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বয়স্য তাঁহার বিরক্তিব্যঞ্জক বিষণ্ণ-ভাব অবলোকন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে কহিলেন, "শ্রাদ্ধের সামগ্রী-সম্ভার আহরণের জন্য দারুণ পরিশ্রম করিয়া ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক বিশ্রাম সুখলাভ করিব, তাহা

আর অদৃষ্টে ঘটিল না। রাজা মহাশয়ের আদেশ হইয়াছে 'অচিরে মৃগয়ায় গমন করিতে হইবে।"

বক্কেশ্বর তাহার উত্তদানে কহিলেন, "এই সামান্য কারণে আপনার বিষন্ন বদন? এইরূপ উদর পূর্ণ করিয়া যদি প্রত্যহ ভোজন হয় আমিই সামগ্রী আহরণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি।" মন্ত্রী ব্যস্তভাবে কহিলেন, "এখন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর তোমার দ্রব্যাদি আহরণের প্রয়োজন নাই।" উপস্থিত-বুদ্ধি বক্কেশ্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কেন করিতে হইবে না, আপনি না হয় পিতৃ-শ্রাদ্ধটা সম্পাদন করুন আমি দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া দিব।"

মন্ত্রী। আরে ক্ষেপা! অমন কথা বলিতে আছে, আমার পিতা যে বর্ত্তমান?

বক্কে। তা হলেই বা, একদিন ত অবর্ত্তমান হইবে, তা না হয় অগ্রেই শ্রাদ্ধটা হইয়া যাক্। কতদিনে ভোজন জুটিবে সে আশায় থাকা অপেক্ষা অগ্রেই করাই ভাল, তাহার ক্ষতি কি?

মন্ত্রী। পাগল আর কি? ভোজন এইবার বাহির হইবে, রাজা মহাশয়ের আদেশ, মৃগয়ায় গমন করিতে হইবে।

বক্কে। তবেই বিনষ্ট হইলাম।

মন্ত্রী। তুমি আর কি বিনষ্ট হইবে, আমারাই বিনষ্ট হইবে।

বক্কে। আমি হইব না, আমি যে ন্যাংবোট, আমাকে কখনই ছাড়িবে না।

মন্ত্রী। কেন, কি প্রকারে জানিলে?

বক্কে। তাও জানেন না? বড় বড় নদীতে বড় বড় নৌকা যায়। যাইবার সময় একটী ন্যাংবোট সঙ্গে গ্রহণ করে। আমরা সেই ন্যাংবোট। রাজাও যেখানে আমরাও সেখানে।

ইতিমধ্যে দূত আসিয়া সংবাদ জানাইল, "রাজা মহাশয়ের আদেশ, কল্যই মৃগয়ায় গমন করিতে হইবে।" তচ্ছ্রবণে মন্ত্রীবর সত্বরগমনে সেনাপতিকে সংবাদদানে প্রস্থান করিলেন।

রত্নারাজপ্রাসাদের অনতিদূরবর্ত্তী প্রফুল্ল পদ্মবনমণ্ডিত নদীর উপকূলে রক্ষকগণ-পরিবেষ্টিত সখিগণসমভিব্যাহারিণী একাবলী ও যশোবতী আগমন-পূর্ব্বক দেখিলেন সুস্নিগ্ধ মলয়হিল্লোলচালিত বীচিমালা নদীবক্ষে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, প্রাতঃসূর্য্যকিরণ তাহাদের অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া নদীবক্ষ

রমণীয় শোভার আধার হইয়াছে। বিকশিত শতদলপদ্মসকল মারুতহিল্লোলে কম্পান্বিত হইয়া যেন একাবলী যশোবতী ও সখিগণকে জলাবতরণে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে অমৃতগঙ্গা প্রবাহিত সে কেন ইহা লক্ষ্য করিবে? একাবলী মদনবাণ-প্রপীড়িত হইয়া প্রিয়সম্ভাষণে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে নদীতীরে না দেখিতে পাইয়া নৈরাশ্যতরঙ্গে সন্তরণ দিতেছেন। তিনি প্রিয়সখী যশোবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখি! নদীর উপকূলে ত উপস্থিত হইলাম, কিন্তু যাহার দর্শন আশায় এখানে আগমন, তিনি কোথায়?

যশো। সখি! এত অধীর হইলে চলিবে কেন? প্রণয় পরস্পর-সাপেক্ষ, তুমি যেমন তাঁহার জন্য লালায়িত হইয়াছ তিনিও ত' তোমার জন্য তদ্রূপ হইয়াছেন, নতুবা সংবাদ পাঠাইবেন কেন যে নদীর উপকূলে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

একা। সখি! এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা কোন দূতের রচনা। পিতা কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় আহূত হইয়া তিনি যখন আইসেন নাই, তখন তিনি গোপনে দর্শন দিবেন এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে।

যশোবতী বিনীতভাবে একাবলীকে সান্ত্বনাদানপূর্ব্বক কহিলেন, "সখি! এ কথা অবিশ্বাসযোগ্য হইবার ত কোন কারণ নাই। মনে করিয়া দেখ মহারাজ একবীর তোমার মত দ্যূতক্রীড়াকুশল নহেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দশজন সমক্ষে নারীজনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন? এজন্য, আমার বোধ হইতেছে, তিনি অগ্রে তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তোমার মন পরীক্ষা করিবেন, অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে সভাস্থলে আগমন করিবেন।"

একা। না সখি! ও তোমার ভ্রমমাত্র। আমার জন্য তিনি কেন লালায়িত হইবেন, বিশেষ যাহাকে তিনি কখনও না দেখিয়াছেন তাহার জন্য মন কখন উদ্বিগ্ন হইতেই পারে না। কত রাজকন্যা তাঁহাকে পাইবার জন্য কামনা করিতেছে। তবে যে তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিবেন বলিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহারই লালসা তৃপ্তির জন্য। তিনি পারিষদবর্গ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে দর্শন করিয়া যাইবেন, যদি আমার রূপ তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় তবে তিনি এ বিবাহে সম্মত হইতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেবের স্তব।

মুনিগণ নৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির রাজসূয় এষাং।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মমদৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা॥

আজি মোর কি সৌভাগ্য না হয় বর্ণন!
যুধিষ্ঠির রাজসূয় করিলা যখন,
সভামধ্যে সে সময়, মুনি ও রাজন্য-চয়,
ভারতের সকলেই আসি সমবেত
তুমিও সে সভাস্থলে ছিলে উপস্থিত।
তথায় আশ্চর্য্য রূপ প্রকাশিলে বিশ্বভূপ,
নেহারিয়া সে মূরতি সভাস্থ সকলে
করিলা তোমার পূজা অতি কুতূহলে।
সর্ব্ব-পূজ্য সেই তুমি, তুমি অখিলের স্বামী,
অন্তিমে আসিয়া মোরে দিলে দরশন,
বিশ্বাত্মন্! ভাগ্য মোর না হয় বর্ণন॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

ধন্য আমি, ধন্য, আজি কৃতার্থ জীবন!
তুমি সেই, তুমি সেই, চিনিনু এখন।
এই যে সম্মুখে যিনি, জন্মহীন কৃষ্ণ তিনি,
তিনি পরমাত্মারূপে প্রতি হৃদিস্থিত,
ব্যষ্টি অন্তর্য্যামীরূপে বিভিন্ন প্রতীত।

যদিও বিভিন্নরূপে, প্রতি জীব-হৃদি-কূপে
বিভিন্ন প্রতীত কিন্তু অভিন্ন সে জন,
সে অভিন্ন ঐক্য আজি করি দরশন।
ভেদ মোহ দূরগত, সত্য রূপে অবস্থিত,
হইয়াছে এ অস্তিয়ে মোর চিত্ত মন
এক তুমি পরতত্ত্ব বুঝেছি এখন।
এক সূর্য্য যেই মত, ভিন্ন ভিন্ন স্থান-স্থিত
দর্শকের নেত্রে ভিন্নরূপে প্রকাশিত
ভগবদ্বিগ্রহের ঠিক সেই মত।
বহু প্রকাশের মাঝে, এক অদ্বিতীয় রাজে,
পাইয়াছি আজি সেই তত্ত্ব সুমহানে,
মোহ দূরগত, ধন্য, ধন্য মোর প্রাণ।

সমাপ্ত

একাবলী। (৫)

যশোবতী সতৃষ্ণ-নয়নে একাবলীর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া এবং নিজ বাহুলতা দ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "তাহাই না হয় হইল। তোমার রূপ কি মন্দ?" অনন্তর ইন্দুমতী নামে সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই ইন্দু! দেখ ত, জলে ঐ যে বিকসিত কমলটী দেখিতেছ, উহার সহিত আমার সখীর বদনকমল মিলাইয়া দেখ, উহার সহিত সখিবদনের কি কিছু ভেদ নির্ণয় হয়?"

একা। সখি! আলাতন শরীরে আর জ্বালা দিবার প্রয়োজন কি? চল পদ্মবনে অবতরণপূর্ব্বক স্নান করি। স্নানান্তে আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। চল গৃহে গমন করি।

যশো। সখি এত বিরূপ কেন? তুমি বালিকা নহ, যে অবুঝ, পূর্ণযুবতীও নহ, যে যৌবন বৃথা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, তুমি কোরক-মাত্র, ভ্রমর আসিলে স্থান দান করিবে কোথায়?

একা। সূর্য্য উদিত হইলে কি নলিনী কোরক মুদ্রিত হইয়া থাকে? ইত্যবকাশে যশোবতীর দৃষ্টি ভ্রমরাধ্যুষিত একটী বিকসিত কমলের

প্রতি পতিত হইল। তিনি অমনি সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখি, দেখ দেখ, ওই প্রস্ফুটিত পদ্মটীর উপর ভ্রমর উপবেশন করিয়াছে, উহাতে উহার কি শোভা হইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে যেন জলদেবী আরক্ত রুক্ষতায় চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক তোমাকে ঈর্ষাভরে নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

একাবলী কহিলেন, "আমাকেই কেবল ঈর্ষাভরে নিরীক্ষণ করিবে কেন? তোমরা কি কেহই নও, তোমাদের কি রূপ নাই।" তখন যশোবতী প্রত্যুত্তর দান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে ঈর্ষাভরে দেখিবার কারণ আছে। তুমি স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছ। তাহার উপর এক্ষণেই ভ্রমর আসিয়া ঐরূপ তোমার হৃদয় অধিকার করিলে তোমার যে কি শোভা হইবে তাহাই ভাবিয়া জলদেবীর ঈর্ষা।

এই সময়ে একাবলী দেখিলেন নদীর নির্ম্মলজলে যশোবতীর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তিনি কহিলেন, "ভাই তুমি কিসে কম? আমি স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছি, আর তুমি কি মুদ্রনোন্মুখ হইয়াছ? তাই বুঝি জলদেবী তোমার ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন?

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মনে হইল বহুদূরে কি যেন একটী কৃষ্ণ পদার্থ ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে দর্শনমাত্র একবীর আগমন করিতেছেন ভাবিয়া সখীকে কহিলেন, "ভাই! তোমার আশা বোধ হয় ফলবতী হইল। ওই বহুদূরে চলনশীল কৃষ্ণবর্ণ যে পদার্থটী দেখিতেছ, আমার বোধ হয় উনিই তোমার হৃদ্কমলের ভ্রমর।"

উভয়ে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে পর একাবলী সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বা সখি, ও তিনি হইবেন কেন, তিনি কেন ওরূপ ঝড়াকারে আগমন করিবেন? আমার বোধ হয় ও কোন দুষ্টলোক কোন দুরভিসন্ধি করিয়াই এই দিকে আগমন করিতেছে।"

যশো। তাহাই ত সখি। তুমিই যথার্থ অনুমান করিয়াছ। দেখিতেছ না, ও এত দ্রুত আগমন করিতেছে যে আমরা এক্ষণেই উহাকে মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি।

একা। উঃ! যেন তীরবৎ ছুটিয়া আসিতেছে।

যশোবতী একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "সখি, ও কোন শত্রুপক্ষীয় লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। এদিকে আগমন করিলে

আমাদিগের সমূহ বিপদ। অতএব শীঘ্র চল আমরা অগৌণে রক্ষকগণের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

সখিগণ-সমভিব্যাহারিণী একাবলী ও যশোবতী রক্ষকগণপরিবেষ্টিত হইবামাত্র কালান্তক যমোপম কালকেতু নামক দৈত্য তীরবৎ আগমন পূর্ব্বক দৃঢ়মুষ্টি ও চপেটাঘাত প্রহারে রক্ষকগণকে পরাভূত করিয়া একাবলীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নক্ষত্রবেগে প্রস্থান করিল। একাবলীকে আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে শ্রবণ করিয়া সখিগতপ্রাণা যশোবতীও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রক্ষকগণ অকস্মাৎ আক্রান্ত ও ভীমবলে পরাভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অতঃপর আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা রাজসমীপে সংবাদদানার্থে গমন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

ভীষণ কালকেতু-দৈত্য কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ধৃত ও বাহিত হইয়া অবলা একবীরপ্রতিপ্রেমপূর্ণা যুবতী একাবলী তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সখিদুঃখদুঃখিনী যশোবতী সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়াই দৈত্যের অনুসরণ করিলেন। অবলার কাতরতাপূর্ণ ভয়ব্যঞ্জক রোদনধ্বনি স্বর্গপুরে শচীদেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি স্বর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক ভীষণ দৈত্যের ক্রিয়াকলাপ নয়নগোচর করিলেন। অবলা অসহায়া যুবতীর রক্ষা-বিধানে যত্নবতী হইয়া তিনি দেবেন্দ্র সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! পৃথিবীতে বড়ই অরাজক হইতেছে। ভীষণ কালকেতুদৈত্য স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পাতালপুরীতে বাস করিতেছিল। অদ্য সে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একবীরদত্তচিত্তা সাবিত্রীদেবীপ্রদত্ত রম্ভ্যরাজদুহিতা একাবলীকে নদীতীরে প্রাপ্ত হইয়া হরণ করিয়াছে। নাথ! ভয়বিহ্বলা ব্যথিতচিত্তা একাবলীর আর্ত্তনাদ এখনও আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে। আদরপালিতা অবলার হৃদয়াকাশে যে একবীরের বদনচন্দ্র উদিত হইয়াছিল তাহা সহসা করাল কালকেতুরূপ কালমেঘে আবৃত করিল। নাথ! অবলা-হৃদয় হইতে সেই কাল মেঘ অপসারিত করিয়া যাহাতে তাহার উদ্ধার-সাধন হয় তাহাই কর।"

প্রিয়তমা স্বরীশ্বরী কর্ত্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া দেবরাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দেবি! অবলার নিদারুণ কষ্ট আমি অনুধাবন করিতেছি। কিন্তু তাহাকে সাহায্যদানে অসমর্থ! আমি সামান্য মানবীর সাহায্যার্থে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে সেই দুষ্ট পাপাত্মা পুনরায় আমাদিগের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিতে পারে। দেবী ভগবতীর বরে বলীয়ান হইয়াই সেই ভীষণ দৈত্য এতাদৃশ দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমতী জগদম্বা ব্যতিরেকে কেহই তাহাকে দলন করিতে সমর্থ নহে। অতএব তুমি কাহাকেও ভগবতীর নিকট প্রেরণ করিয়া তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর। তিনিই দুষ্টের দলন করিয়া কুমারীর উদ্ধার সাধন করিবেন।"

সহসা দেবর্ষি নারদকে আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রানী দেবেন্দ্রের বাক্যের আর উত্তর দান করিলেন না।

নারদ দেবরাজের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেবেন্দ্র স্বর্গরাজ্যে বিরাজমান থাকিতে দুষ্ট দৈত্যকুল অদ্যাপিও দমন হইল না। কালকেতুর এতদূর স্পর্দ্ধা যে অদ্য সে একবীরে অর্পিত-হৃদয়া রম্ভারাজদুহিতা একাবলীকে অসহায়া প্রাপ্ত হইয়া হরণ করিল? মদনদেব যদি প্রতিশ্রুত কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব না করিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ ঘটিত না।"

কালকেতুর দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে দেবর্ষিকে ক্রোধপরায়ণ অবলোকন করিয়া ইন্দ্রদেব অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "দেবর্ষে! কালকেতু স্বয়ং পার্ব্বতীর বরে গর্ব্বিত হইয়া নরের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমি সহসা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে, সে তৎপ্রতিশোধার্থ পুনরায় স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে পারে। তাহার বধোপায় অবগত না হইয়া, আমার বিবেচনায়, এ বৃথা আয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আমার প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার কৈলাসে গমন করুন। আপনার সর্ব্বত্র অবারিত-দ্বার, কৈলাসে পার্ব্বতীসকাশে সর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক তাহার বধোপায় অবগত হইয়া আমাকে জ্ঞাপন করিলে অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য আমিই সম্পাদন করিব।"

দেবর্ষি কৈলাশধামে প্রস্থান করিলে পর পুষ্পধনু ইন্দ্রদেবসকাশে

উপনীত হইয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহাদের সকল পরামর্শ বিফল হইয়া গেল কারণ কালকেতু দৈত্য সহসা পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইয়া একাবলীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তখন দেবরাজ তাঁহার নিকট দেবর্ষির আগমন ও কালকেতুর বধোপায় নির্ণয়ের জন্য কৈলাসপুরী ভগবতীসকাশে গমনবৃত্তান্ত জানাইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার অনুরোধ করিলেন।

ক্ষণকালমধ্যেই দেবর্ষিকে প্রত্যাগত দেখিয়া দেবরাজ জিজ্ঞাসিলেন "দেবর্ষে। আপনি যে কার্য্যানুরোধে কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সফলমনোরথ হইয়াছেন ত ?" দেবর্ষি কহিলেন, "নারদ স্বয়ং যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে ? নানা প্রকারে সাধ্য-সাধনা করিলে দেবী স্বয়ংই কহিলেন, "প্রাংশুলভ্য ফললোভে উদ্বাহু বামনের ন্যায় কালকেতুর এই দুর্ণয় অসহনীয় হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিফল সে অবশ্যই পাইবে।"

নারদের ঈদৃশবাক্যে উদ্বিগ্নমনা দেবরাজ কহিলেন, "প্রতিফল কি প্রকারে পাইবে তাহা অবগত হইয়াছেন কি ?" তখন দেবর্ষি হাস্যপ্রকটিতবদনে কহিলেন, মদীয় প্রার্থনাবাক্যে ভগবতী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দৈত্যগণ যখন তপস্যারম্ভ করে তখন এতাদৃশ চিত্তৈকাগ্রতা-সহকারে সংযতচিত্তে ধ্যাননিরত হয় যে তাহাদিগের উপর কাজেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। আমি কালকেতুর উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই বরদান করিয়াছিলাম যে দেব-নরে কেহই তাহার সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবে না। যাবৎ না অশ্বিনীগর্ভে নরের উৎপত্তি হয় তাবৎ সে অজর অমর হইয়া জীবনধারণ করিবে।"

ভগবতীর বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ পুনরায় কহিলেন, "একবীরই তো ঘোটকীরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর জঠর হইতে জনার্দ্দনের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?"

নারদ। তাহা ত সকলেই অবগত আছেন। এই কথা বলিয়াই দেবী আমাকে কহিলেন, "নারদ ! তোমাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। কাল-কেতুর দুরাচারে মধুসূদনের ইচ্ছায় একবীরের সৃষ্টি হইয়াছে। একবীরই তাহার বিনাশ সাধন করিবে। এক্ষণে তুমি দেবরাজকে এই বিষয় জ্ঞাপনপূর্ব্বক যাহাতে একবীরের মন একাবলীর প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহারই উপায় বিধান কর। এই কার্য্য যত সত্বর সম্পাদিত হইবে কালকেতুরও তত শীঘ্র জীবন ক্ষয়

হইবে। একাবলী ও যশোবতীর রক্ষাভার আমার উপরই থাকিল। এই বলিয়া মাতা আমাকে বিদায় দিলেন।"

দেবরাজ মদনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মন্মথ! শুনিলে ত? আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?" মদন উত্তর করিলেন, "দেব! এখনও সময় হয় নাই রাজা একবীর পিতৃশ্রাদ্ধান্তে মৃগয়া গমনোদ্যোগী হইয়াছেন। বনমধ্যে তাঁহাকে একাকী প্রাপ্ত হইলেই আমি আপনার কার্য্য সাধন করিব। আপনার কার্য্য সম্পাদনে কি আমার কখন অযত্ন আছে?

দেবরাজ সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "তুমি যখন আমার আদেশক্রমে নির্ভয়-চিত্তে দুর্জ্জয় সংহারক হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার জন্য যত্নবান হইয়া নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলে তখন হইতেই জানি যে, স্বর্গপুরে তোমার ন্যায় সাহায্যকারী আমার আর দ্বিতীয় নাই। যাহা হউক তুমি এই কার্য্যটী সাধনপূর্ব্বক আমার সম্মান রক্ষা করিও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বীর রমণী।

দৈত্যেশ্বর কালকেতু একাবলীকে লইয়া বহুদূর গমনান্তর প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী মহীরুহ-নিম্নে ছায়াতলে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রামলাভে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যশোবতী তথায় উপনীত হইলেন, দৈত্যেশ্বরের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভীতা যশোবতী তখন করজোড়ে কহিলেন, "প্রভো! আমরা আপনাকে চিনি না, আপনি যেই হউন, আপনার বীরোচিত কার্য্য করা হয় নাই। বলুন দেখি, আপনি আমাদের সখীর কি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন? অকস্মাৎ শান্ত্রীগণকে আক্রমণপূর্ব্বক অবলা রমণী সখী একাবলীকে লইয়া পলায়ন কি বীরের কার্য্য হইয়াছে? বীরপুরুষ কখন বীরপুরুষকে ভয় করে না। জন কয়েক শান্ত্রী পাহারা দেখিয়া আপনার এতাদৃশ ভয়োদ্রেক হইল যে আপনি এককালে লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জনসমাগমশূন্য এই ভয়ানক প্রান্তর-মধ্যে আগমন করিলেন?"

স্ত্রীলোকের মুখে এতাদৃশ ব্যঙ্গসূচক বাক্যশ্রবণ করিয়া কালকেতু ধীরতা সহকারে উত্তর দিলেন, "আমি বীরের কার্য্য করিয়াছি কি কাপুরুষের কার্য্য করিয়াছি তাহার পরিচয় তোমার নিকট কি দিব? সুরাসুর যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব

ও নরের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এমন কেহই নাই। যিনি মনুষ্যরূপে ঘোটকীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন সেই মহাত্মা আমার বধ-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।' সখি! এরূপ অঘটন সংঘটনজগতে দুর্ল্লভ, ঘোটকীর উদরে কি কখন মনুষ্যজন্ম সম্ভবে? সুতরাং আমি অজর অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যদি সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে তোমার সখীর শাস্ত্রী পাহারা কেন তোমার সখীর পিতা রত্ন্যরাজ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়াও আমার নিকট পরাজিত হইতেন। সুতরাং সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া কতকগুলি সেনাক্ষয় আমার উদ্দেশ্য নহে, একারণ পলায়ন করিয়াছি। অকারণে কাহারও অনিষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নহে।

যশো। প্রভো! আপনি মুখে বলিতেছেন, কাহারও অনিষ্টসাধন আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ আপনি অনিষ্টসাধন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা কখনই পঞ্চভূতনির্ম্মিত মাংসপিণ্ডের রক্ষাসাধনে আস্থা প্রদর্শন করেন না, তাহারা যশঃশরীর রক্ষার্থেই সতত যত্নবান। আপনি রত্ন্যরাজের আদর-পালিত কন্যাললাম অপহরণ করিয়া তাঁহাকে যে দুরপনেয় কলঙ্কসমুদ্রে নিমজ্জিত করিলেন তাহা অপেক্ষা যুদ্ধস্থলে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হওয়াই শ্রেয়স্কর ছিল। এখন বলুন দেখি আমাদের সখীকে অপহরণ করিয়া কি রত্ন্যরাজের অনিষ্টসাধন করিলেন না?

দৈত্যেশ্বর কালকেতু বুদ্ধিমতী বীররমণী যশোবতীর বাক্যের যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া নিজের কার্য্যপ্রণালী সমর্থন করিয়া যশোবতীকে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি দৈত্যেশ্বর কালকেতু। আমি যদি রত্ন্যরাজের নিকট তাঁহার এই পরমা সুন্দরী কন্যারত্নটী প্রার্থনা করিতাম তাহা হইলে তিনি কখনই আমাকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইতেন না। তাঁহা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর আমার অন্যগতি থাকিত না। সেই যুদ্ধে হয় ত রত্ন্যরাজও বিনষ্ট হইতে পারিতেন। আমি যাঁহার পাণিগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছি তাঁহারই পিতাকে নিহত করিয়া কেমন করিয়া আমি তাঁহাকে স্ব ইচ্ছায় আমার গলে বরমাল্য দিতে অনুরোধ করিতাম? এক্ষণে হয় ত অপহৃত কন্যার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন।

কালকেতুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া যশোবতী পুনরায় কহিলেন, "প্রভো! আমাদিগের সখীকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য যদি আপনি এই কাপুরুষোচিত

কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাটী প্রত্যাগত হইয়া মহারাজকে অনুনয় বিনয় করিয়া একাবলীকে আপনার করে সমর্পণ করাইব, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করুন।"

যশোবতীর এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যেশ্বর ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আমার আস্থা নাই। বিশেষতঃ তুমি রত্নরাজের মন্ত্রী-কন্যা, একাবলীর সখী, তোমার কি এমন বিশিষ্ট গুণ আছে যে রত্নরাজ তোমার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না? তবে যদি তুমি তোমার সখীর মুক্তিকামনা কর তবে তাঁহাকেই অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিতে বল, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া এক্ষণেই পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিব। আর যদি তোমার সখী তাহাতে স্বীকৃত না হন তাহা হইলে তুমি রাজবাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইয়া পাতলপুরীতে আমার নিকট দূত প্রেরণ করিও। রাজা যদি আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন তাহা হইলে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আমি তাহাকে মুক্তিদান করিব। বল প্রকাশ কখনই আমার ইচ্ছা নহে।"

দৈত্যেশ্বরের অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া যশোবতী রোষে ও অভিমানে পরিপূর্ণা হইলেন। তিনি গর্ব্বভরে দৈত্যপতির বাক্যের উত্তর দান করিলেন, "প্রভো! স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আপনার আস্থা নাই, অথচ সেই স্ত্রীলোককে দূতভাবে রত্নরাজসকাশে প্রেরণ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়-রমণীর প্রতিজ্ঞা আপনি অবগত নহেন। প্রাণ বিসর্জ্জন হয় তাহাও স্বীকার তথাপি ক্ষত্রিয়রমণী কখনও প্রতিজ্ঞা স্খলিত হয় না। যাহা হউক আপনার যখন স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আস্থা নাই তখন আমারও আর রত্নরাজ পুরীতে প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা নাই বিশেষতঃ আপনি যখন আমার রোরুদ্যমানা সখীকে লইয়া যাইতেছেন তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার অন্যত্র গমনও যুক্তিযুক্ত নহে।

দৈত্যেশ্বর কালকেতুও যশোবতীর এবংবিধ বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া ভয়ে ম্রিয়মানা হইলেন। প্রথমে যখন কালকেতু রক্ষকগণ মধ্য হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল, তখন একাবলী জীবনে হতাশ্বাস হইয়া একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণতুল্য প্রিয়-তমা সখীকে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বাসিত

হইয়াছেন। এক্ষণে দৈত্যপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পাছে সখী প্রস্থান করেন এই আশঙ্কায় তিনি ব্যগ্রতা সহকারে সখীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখি, আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একাকিনী রাখিয়া প্রস্থান করিও না। ভীষণ পাতালপুরীতে দৈত্যরমণীগণের মধ্যে আমি একাকিনী থাকিতে সাহসী হইব না।"

যশো। সখি! তোমাকে একথা বলিতে হইবে কেন? যখন দৈত্য-পতি রক্ষকগণ মধ্য হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিল তখন তোমার পিতার অর্থদাস রক্ষকগণ নিশ্চিন্ত মনে দণ্ডায়মান রহিল, আমিই কেবল তোমায় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া নিজ বিপদ লক্ষ্য না করিয়া তোমার অনু-বর্ত্তিনী হইয়াছি। ভাই, তোমার দর্শন পাইয়া কি আর আমি একাকিনী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি? তোমার জীবন ও আমার জীবন একই সূত্রে আবদ্ধ। আমি বাল্যাবধি তোমার সুখদুঃখভাগিনী ছিলাম, এখন হইতে আজীবন তোমার অদৃষ্ট ভাগিনী হইলাম।

অতঃপর কালকেতু যশোবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "সখি! তোমার সখীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনে যদি অনিচ্ছুক হইয়াছ, তাহা হইলে আমাদিগের সমভিব্যাহারে চল, তোমার সখীর মনও তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সুস্থ থাকিবে। রত্নারাজ আজ না হউক কল্য অবশ্যই সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন তখন তিনি অনুসন্ধান দ্বারা আমার নিকট দূত প্রেরণ করিবেন।" এই বলিয়া কালকেতু পুনরায় একাবলীকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। যশোবতী তাহার অনুসরণে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ।

(প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

সকল দেশে সমাজ এক-রকম নয়, রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতিক অবস্থাও একরকম নয়। কিন্তু সকল দেশেই মানব সমাজে চারিটি স্বাভাবিক বিভাগ আছে। এই বিভাগ ছাড়া সমাজ চলে না, জাতীয় জীবন বা সমষ্টি জীবন সম্ভব হয় না। এই বিভাগ সর্ব্বত্রই আছে, তবে কোন দেশে বা কোন সমাজে ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়, আর কোন দেশে

বা কোন সমাজে তাহা স্বীকৃত হয় না। এই স্বাভাবিক বিভাগচতুষ্টয় এইরূপ। প্রথমতঃ একদল লোক সমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কায়িক পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করে, এই সমস্ত দ্রব্যের সাহায্যে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়, এই সমুদয় ছাড়া মানুষ, মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেই পারে না। এই সম্প্রদায়ের উপরেই দেশের যাবতীয় মঙ্গল, শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতি, সর্ব্বসাধারণের সুখ সুবিধা প্রভৃতি নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, এই উৎপাদনকারী, শ্রমী সম্প্রদায়ের উপর আর একদল আছেন যাঁহারা এই সমস্ত দ্রব্য বিতরণ করেন। শ্রমী সম্প্রদায় যাহা উৎপাদন করে, ইহারা তাহা সংগ্রহ করে এবং সমাজের সকল বিভাগে তাহা বণ্টন করিয়া দেয়, এই প্রকারে অতি দূরবর্ত্তী স্থানে উৎপাদিত হইলেও মানুষ তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে। এই গেল দ্বিতীয় সম্প্রদায়। ইহার পর তৃতীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়, জাতির রক্ষক বা অভিভাবক। সৈন্যগণ, নাবিকগণ, এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইহারা দেশবাসীগণকে রক্ষা করে। যাঁহারা বিচার করেন, লোকজনকে আইন অনুসরে চলিতে বাধ্য করেন, উকীল, হাকিম, শাসনকর্ত্তা রাজা, যাঁহারা সমগ্র দেশকে সুশৃঙ্খলায় রাখেন, যাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রমী সম্প্রদায় ও বিতরণকারী সম্প্রদায় নিরাপদে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, বাহিরের কেহ, বা নিকটের কিম্বা পরিবারের কেহ কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। ইহারাই তৃতীয় সম্প্রদায়।

এই যে তিনটি বিভাগ, একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সমাজের স্থিতির জন্য, ইহার প্রয়োজন স্বাভাবিক, ইহার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। কায়িক পরিশ্রম করিয়া যে উৎপাদন করে তাহাকেই যদি বিতরণের ভার লইতে হইত, তাহা হইলে উৎপাদন আর ভাল হইত না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া যখন সে বিদেশে যাইবে তখন আর তাহার ভূমি আবাদ হইবে না, তাহার গরু বাছুরের যত্ন হইবে না, সমস্ত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবে; সুতরাং এই কার্য্যের জন্য পৃথক এক সম্প্রদায় লোকের দরকার। তাহার পর গৃহবিবাদ ও বাহিরের বিবাদ হইতে এই সম্প্রদায় দুটিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি একটি তৃতীয় সম্প্রদায় না থাকে তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেককেই কতকটা সৈন্যের কাজ,

কতকটা পুলিশের কাজ নিজে নিজেই করিতে হইবে, তাহার ফল কি হইবে? কোন কাজই ঠিক মত হইবে না। সভ্যতার চিহ্নই এই যে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে পৃথক করিয়া রক্ষা করিতে হইবে, প্রত্যেকেই সকল কাজ না করিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে হইবে, যিনি যাহা করিবেন সকলের হিতের জন্য করিবেন।

পূর্ব্বে যে তিন সম্প্রদায় লোকের কথা বলা হইল এই তিন সম্প্রদায় লোক হইলেই যে সমাজ চলিবে তাহা নহে; এই শ্রমী উৎপাদক, বিতরণকারী, ও রক্ষক সম্প্রদায় ব্যতীত আর এক সম্প্রদায় লোকের দরকার। এই যে চতুর্থ সম্প্রদায় ইহাঁদের কার্য্য বিশেষরূপে প্রয়োজন। ইহারা জনশিক্ষক। দর্শন, বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় ইহাঁরা জন-সমাজকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষাদান করিবার জন্য এই প্রকারের একটি পৃথক সম্প্রদায় না থাকিলে, সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য একটি অতি প্রধান বস্তুর অভাব হইয়া পড়ে, মানব-সমাজ পশুসমাজ হইয়া দাঁড়ায়, কারণ মনের শক্তিই মানবের মানবতা এবং এই শক্তির অনুশীলন, পরিপোষণ, পরিচালন ও প্রয়োগ একান্তভাবে দরকার। মানুষের শরীরের যেমন অন্ন বস্ত্রাদির দ্বারা পুষ্টি তুষ্টি ও রক্ষাসাধন করিতে হয়, আত্মারও তেমনি অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজন।

এই চারিটি স্বাভাবিক বিভাগ প্রত্যেক সমাজেই প্রয়োজন। শরীর রাখিতে হইলে বা প্রাণ ধারণ করিতে হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, চিন্তা করিতে হইবে মস্তিষ্ক চাই, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হৃৎযন্ত্র ও ফুস্ ফুস্ চাই, জীর্ণকরার জন্য পাকাশয় চাই, কাজ করিবার জন্য ও বেড়াইবার জন্য হস্তপদ চাই। এখন এই যন্ত্রসমূহের মধ্যে যদি বিবাদ আরম্ভ হয়—হাত পা যদি মাথার কাজ করিতে চায়, মাথার দ্বারা যদি পায়ের কাজ করাইতে হয়, পেট যদি বুকের কাজ করিতে চায় তাহা হইলে যেমন গোলযোগ আরম্ভ হয়, সমাজও তেমনই। সভ্য, উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন করাইবার ব্যবস্থা থাকা দরকার, তাহা না হইলে দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগীতা ও গোলযোগে সমাজশরীর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়

মানুষের শরীর যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌভ্রাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবসমাজও ঠিক তেমনি। সৌভ্রাত্র বা সাম্য বলিতে সমস্ত প্রভেদ ভাঙ্গিয়া

দিয়া একেবারে এক করিয়া ফেলা বুঝায় না। জ্ঞানী ও মূর্খ কখনও এক হইতে পারে না। অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত নগ্ন বর্ব্বরজাতীয় লোকেরা সভ্য ও উন্নত জাতিসমূহের সঙ্গে একেবারে সকল বিষয়ে সমান হইতে পারে না। শিশু, তাহার পরিবারপালক পিতা ও জ্ঞানী বৃদ্ধ পিতামহ এই তিনজন এক হইতে পারে না। পরিবারে শিশু বৃদ্ধের কার্য্য করে না বৃদ্ধ শিশুর কার্য্যও করে না। সৌভ্রাত্র বা সাম্য বলিতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকল প্রভেদ দূর করিয়া দেওয়া বোঝায় না; ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক, লোক তাহার শক্তি সর্ব্বসাধারণের হিতে প্রয়োগ করে, সমাজের সমষ্টি-কল্যাণে সহায়তা করাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করে। যদি সে সবল হয় তাহা হইলে এই শক্তির দ্বারা কদাচ দুর্ব্বলের অনিষ্ট করিবে না, দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া ও সাহায্য করিয়া শক্তি-শালী ব্যক্তি সমাজের সেবা করিবে। যদি দুর্ব্বল ও সবল দুইজনে সমান অভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বলের অভাব যাহাতে অগ্রে দূর হয় সেজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চেষ্টা করিতে হইবে। পরিবারে বড় হওয়াই কঠিন, অন্নের অভাব হইলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ্যদের অনাহারে থাকিয়া কনিষ্ঠের অন্ন জোগাইতে হয়, সৌভ্রাত্র বলিতে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ সম্মেলন বুঝায়। যাহার শক্তি যত অধিক তাহার কর্ত্তব্যভারও তত গুরু, যাহার অধিকার অধিক তাহার দায়িত্বও অধিক।

সমাজের সংগঠন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জন্মান্তরবাদের সাহায্যে আমরা এই বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিলে হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি কি তাহা বেশ বুঝিতে পারিব। এই প্রত্যক্ষ জীবন, যাহার একদিকে জন্ম আর এক দিকে মৃত্যু, তাহাই যদি মানব জীবনের সমস্তটা হইত, তাহা হইলে আমাদের সংসারে আসা একটা বিধিহীন আকস্মিক ব্যাপার হইত, এবং মৃত্যুতেই আমার বলিতে যাহা কিছু, তৎসমুদয়ের যদি অবসান হইত, তাহা হইলে মানব জীব-নের রহস্য বুঝিতেও পারা যাইত না এবং ন্যায়ের উপর কোনরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইত না। কিন্তু মানব বহু জন্মে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বহু প্রকার অবস্থার মধ্যে পূর্ব্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে। এক দিনে যেমন শিশুকে একেবারে কলেজে, পাঠায় না, আগে পাঠশালায় হাতে খড়ি, তাহার পর ইস্কুল; তাহার পর কলেজ তেমনি যে সমস্ত মানবাত্মা অবিকশিত তাহারা লৌকশিক্ষকের কার্য্য কেন

করিবে না এরূপ আপত্তিও করা চলে না! দেহের যেমন বয়স আছে, বিকাশের স্তরভেদ আছে, আত্মারও তেমনি বয়স আছে বিকাশের স্তরভেদ আছে। যাহাদের আত্মা শিশু তাহাদিগকে এখন অভিভাবকের অধীনে রাখিয়া পালন করিতে হইবে, যাঁহারা অধিক অগ্রসর তাঁহারা তাহাদের সাহায্য করিবেন। শিশু মানবাত্মা-সমুদয় সংসারের বা সমাজের কঠোরতর কর্ত্তব্যপুঞ্জ পালন করিবার উপযুক্ত নহে। জন্মান্তর একটি সত্য ঘটনা বলিয়াই সমাজের এইরূপ ব্যবস্থা যাহা অধিকারভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।

এইবার প্রাচ্যদেশে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদের কথা আলোচনা করা যাউক; প্রথমতঃ দেখা যাউক প্রাচীন কালে জাতিভেদ কি প্রকারের ছিল।

মানবাত্মা বহু-জন্মের মধ্য দিয়া বিকাশলাভ করিতেছে, প্রথমেই যখন মানবরূপ প্রাপ্ত হয় তখন তাহা একেবারে অজ্ঞান ও দুর্ব্বল। সে অবস্থায় ইহার স্কন্ধে অধিক ভার দেওয়া মোটেই সঙ্গত নহে। এই জন্য প্রাচীনকালে সমাজে শূদ্রের স্থান, পরিবারে শিশুর স্থানের তুল্য ছিল। তাহাকে পরাধীন-ভাবে অপরের অনুবর্ত্তন করিয়া শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইত। ব্রাহ্মণ-বালক শৈশবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের জন্য গুরুগৃহে যাইয়া যেমন যজ্ঞের কাষ্ঠ ও কুশাদি আনয়ন, অগ্নি-প্রজ্বালন, পশুচারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইত তেমনি শূদ্রকেও সেকালে সমাজের এই সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। এই অবস্থায় মানবাত্মার শিক্ষার আরম্ভ, এ অবস্থায় অর্থাৎ শূদ্রের পক্ষে বিশেষ কিছু দায়িত্ব ছিল না। খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচনের তেমন কোন কঠোরতা ছিল না, অনেকটা ইচ্ছানুরূপ পান ভোজন করিত, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করারও কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, যেখানে ইচ্ছা যাইত পারিত। জীবন কঠোরতাহীন ও দায়িত্বহীন এবং এক হিসাবে স্বাধীন ছিল। শূদ্র যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

এই প্রকারে কয়েক জন্ম শূদ্র গৃহে জন্মাইয়া, শূদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া মানবাত্মা প্রাথমিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত, তাহার পর সে বৈশ্যকুলে জন্মাইত। বৈশ্যের দায়িত্ব অনেক গুণে অধিক, সকল বিষয়ে ধরাধরি বা বাঁধাবাধিও অধিক। কারণ বৈশ্য দ্বিজ। ধনরক্ষার ভার তাহার উপর, খুব বেশী দায়িত্ব। বৈশ্যকে গুরুগৃহে যাইয়া বেদ পাঠ করিতে হইত

তাহার উপনয়নাদি সংস্কার হইত। সে ধন সঞ্চয় করিত, কিন্তু নিজের ভোগ-সুখের জন্য নহে। বৈশ্য জাতীয় ধনের রক্ষাকর্ত্তা। তাহাকে ধন সঞ্চয় করিতে হইবে, বিশ্বস্ততার সহিত সমগ্র জাতির কল্যাণে ধন বিতরণ করিতে হইবে। এই অর্থের দ্বারা বিদ্যার চর্চ্চা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রমের যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রমের যাহাতে সমবায় ও শৃঙ্খলা বিহিত হয়, কৃষি কার্য্যের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে, জাতির জীবনে ঐহিক প্রয়োজনীয় ভোগ সুখের যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, সঞ্চয় ও ধন-নিয়োগের দ্বারা বৈশ্যকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। মন্দিরনির্ম্মাণ ও মন্দিররক্ষা, দরিদ্রের অন্নসংস্থান, পণ্ডিতদিগের জীবিকা-দান, পথিকদিগের জন্য অন্ন-সত্রাদিস্থাপন, তীর্থযাত্রীগণের সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত বৈশ্যগণ করিতেন। দেশ মাতৃকার সন্তানগণের অন্ন বস্ত্রের ও সুখ সুবিধার যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে বৈশ্যদিগকে তাহা করিতে হইত।

বহুবার বৈশ্য জন্মধারণ করিয়া কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় ও বিকাশলাভ হইলে মানবাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিত। ক্ষত্রিয়ের দায়িত্ব বৈশ্য অপেক্ষা আরও অধিক। সমাজকে শাসন করা, পালন করা, রক্ষা করা, দেশ মধ্যে যাহাতে শান্তি থাকে বাহিরের শত্রু আসিয়া যাহাতে দেশ আক্রমণ না করে এই সমস্তের ব্যবস্থা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। নিজের জীবনকে ভালবাসা, সংসারে সুখে ও নিরাপদে বাঁচিয়া থাকি এইরূপ ইচ্ছা করা মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক; তাহা ছাড়া মানুষ স্বভাবের প্রেরণায় স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের ভালবাসিয়া ও তাহাদের ভালবাসা পাইয়া সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ধর্ম্ম আসিয়া ক্ষত্রিয়কে বলিতেছেন "তোমার জীবন দেশের সেবার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য। দেশে যদি বিপদ উপস্থিত হয় তাহা শূদ্রকে স্পর্শ করিবে না, বৈশ্যকে স্পর্শ করিবে না, ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না। তোমাদের সে সময়ে অগ্রণী হইয়া নিজের জীবনপাত করিয়া ইহাদের সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহারা তোমাকেই শাসন ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানে।"

তখন মানবাত্মা বিকশিত ও উন্নত হইয়াছে, সে তখন এইরূপ আত্ম-ত্যাগের উপযুক্ত হইয়াছে, এইভাবে জীবনপাত করিয়া দেশমাতৃকার সেবা করা তাহার পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। ঐহিকের এই জীবনের প্রতি অতিশয় আসক্তি, যাহা সাধারণ মানবের জীবনে খুব প্রবল, ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে তাহা নাই।

এই কারণেই ক্ষত্রিয় বীরগণ সমাজের অন্যান্য সকলকে রক্ষা করিবার জন্য সানন্দে জলের মত নিজের দেহের রক্ত ব্যয় করিতে পারিতেন।

এইবার জন-শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ। ইঁহারা লোকশিক্ষক। ব্রাহ্মণের জীবনের চারিদিকে অতি কঠিন বন্ধনী, সেই বন্ধনীর বাহিরে তাঁহার একপদও যাইবার উপায় নাই। যাহাকে পার্থিব ভোগ বলে, ব্রাহ্মণের জীবনে তাহা আদৌ নাই। ব্রাহ্মণের ধনের আকাঙ্ক্ষা নাই, ব্রাহ্মণের ধন সঞ্চয় নাই, কারণ ইহা বৈশ্যবৃত্তি স্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্মণের যুদ্ধে অধিকার নাই কারণ তাহা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত পান ভোজন বা দেশ ভ্রমণের অধিকার নাই কারণ তাহাতে শূদ্রের অধিকার। ব্রাহ্মণের জীবন কঠোর আত্মোৎসর্গ ও সংযমের জীবন। জীবনের ভোগ বিলাস হইতে ব্রাহ্মণ বহু দূরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণকে অতীব যত্নের সহিত নিজের দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে হইবে, এই পবিত্রতা সাধন আপনাকে অপর হইতে উচ্চ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নহে, অন্যান্য সকলের হিতসাধন করিবার জন্য। ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ ও পবিত্র মন আশ্রয় করিয়া দেবশক্তির জগতে ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং দেবশক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়।

ইহাই জাতিভেদের ভিত্তি। এই সত্যের উপরেই প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এইবার পাশ্চাত্য জগতে শ্রেণীবিভাগ কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য দেশে শ্রেণীবিভাগও অনেকটা একরূপ ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দেশে রাজা ও আভিজাতবর্গ, (The King and the nobles) জন্মের দ্বারা তাঁহারা এই পদ পাইতেন। এই শ্রেণী হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় জাতির অনুরূপ। ইহারা যোদ্ধা, বিচারক ও শাসনকর্ত্তা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পৈতৃক স্বত্বে স্বত্ববান ও শাসন করিতে, যুদ্ধ করিতে এবং আইন প্রণয়ন করিতে অধিকারী। অতীতকালের ইংলণ্ডের নোবলগণ এই সম্প্রদায়। প্রথমে রাজা, তাহার পর ডিউক, ব্যারণ, আর্ল প্রভৃতি। এ দেশে জাতি যেমন জন্মের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় এই সমস্ত পদবীও ঠিক সেইরূপ জন্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। দেশ রক্ষা করা, রাজ্য-শাসন করা, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দেওয়া এই সম্প্রদায়ের কার্য্য।

তাহার পর বৃহৎ মধ্যশ্রেণী। ব্যবসায় বাণিজ্য করা, কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা এই শ্রেণীর কার্য। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে এই শ্রেণীর ক্রমিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমরকুশল অভিজাতগণের আশ্রয়ে

থাকিয়া এই শ্রেণী একতাবদ্ধ হইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক দেশের ধনবৃদ্ধি করে। এই সম্প্রদায়ের পর শ্রমী উৎপাদনকারীগণ, তাহারা ভূমি রক্ষা করে, যাহাকে 'ফিউড্যাল' টেনিওর' বলে তাহার দ্বারা তাহাদের কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট, এই কর্ত্তব্য পালন করিলে তাহারা রক্ষিত হইবে। নিজের নিজের অংশের জমির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে এখনও কোন লোক ইংলণ্ডে যদি অনাহারে কষ্ট পায় তাহা হইলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় সে কোন পল্লী-সংস্থানের (Parish) লোক। এই পল্লীই তাহার জীবিকার জন্য দায়ী। সে ব্যক্তি পল্লীর নাম করিলে তাহাকে সেই পল্লীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যে পল্লীতে যাহার জন্ম, সেই পল্লীকে তাহার অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালের জমিবন্দোবস্তের যে বিধান (Law of Settlement) হইয়াছিল সেই সময় হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এইবার শিক্ষক সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণ। এই স্থানে কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে যাজকমণ্ডলী, অভিজাতমণ্ডলী বা শাসক সম্প্রদায় হইতে পৃথক নহেন। উভয়ে একত্র সংশ্লিষ্ট। সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের স্থান লইয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রভেদ। প্রাচ্য দেশে ধর্ম্মই প্রধান ও মূল বস্তু, সমাজের সমগ্র জীবন ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত, প্রতীচ্য দেশে ধর্ম্ম ঐহিক জীবন হইতে পৃথক স্থান অধিকার করে।

যে নিয়মের উপর প্রাচীনকালে প্রাচ্যদেশে জাতিবিভাগ ও প্রতীচ্য দেশে শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইল, এইবার বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি ও শ্রেণী কিরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাহা হইলে অতীত ও বর্ত্তমানের সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

প্রতীচ্য দেশের এই শ্রেণীবিভাগের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ব্বকালে ইহার বিশেষ সার্থকতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটি ব্যর্থ আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক ডিউকই সৈন্য চালনা করিতেন, রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যের বাহিরে যখনই যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হইত, প্রত্যেক ব্যারণই সৈন্যদল লইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। নিজ সম্প্রদায়ের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা যথারীতি পালন করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিত, ফলে সমগ্র জাতির কল্যাণও অব্যাহত ছিল। দেশে দারিদ্র্য বা ক্লেশ ছিল না। পার্ব্ব-

কালে মানুষ এত বিলাসী হয় নাই সকলেই সাধসিধে জীবন যাপন করিত বটে কিন্তু শিল্পীগণ সেই সময়ে অতি মহৎ হর্ম্ম্যসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সাহিত্য ক্ষেত্রে অতি মহৎ সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের প্রচুর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান ছিল। এখন ইংলণ্ডে যেমন চারিদিকে অন্নকষ্ট তখন সেরূপ ছিল না। ইংলণ্ডের নাম ছিল "সুখের ইংলণ্ড" (merry England)।

এইবার বর্ত্তমান অবস্থা দেখা যাউক। প্রথমেই প্রতীচ্য দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। এখনও সেই শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। এখন রাজ-পরিবার আছে, অভিজাত পরিবার আছে। জন্মের দ্বারা মানুষ অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। জন্মের দ্বারা যে অধিকার লাভ করে সেই অধিকারের দ্বারা দেশের শাসনকার্য্যে অধিকারী হয় ও ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া আইন প্রণয়ন করে। জন্মের দ্বারা উপাধি লাভ করে। ডিউকের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডিউক হন, আর্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্ল হন। উপাধিলাভের পর যদি তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে হাউস অব লর্ডসএ বসিবার স্থানলাভ করেন ও আইন প্রণয়ন করেন। এই লর্ডস্ সভা, রাজা ও জন সাধারণেরঃসভার সহিত মিলিয়া দেশ শাসন করেন। কিন্তু এই সভার সভ্য নির্ব্বাচন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বয়ঃক্রম বা শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না, জন্মের অধিকারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যিনি এই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার চরিত্রই বা কেমন অথবা তাঁহাদ কি কি গুণ আছে এ সম্বন্ধে আদৌ কোন আলোচনা হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায় একটি প্রাণ-হীন ব্যর্থ আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ পূর্ব্বকালে এই সম্প্রদায়কে যে দায়িত্বের ভার বহন করিতে হইত, যে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইত এখন আর তাহার কিছুই করিতে হয় না। 'ডিউক' শব্দের অর্থ নেতা, কিন্তু এখন আর ডিউক নিজের জীবন বিপদাপন্ন করিয়া যুদ্ধস্থলে যান না, অন্য লোককে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে পাঠান আর নিজে নিরাপদে বাড়ীতে বসিয়া থাকেন. অভিজাতগণের সকলেই এইরূপ। নাম আছে, কিন্তু কার্য্য নাই। এই জন্যই অসন্তোষ, অভিযোগ ও আন্দোলন। এই জন্যই কথা উঠিয়াছে, 'লর্ডসভা' তুলিয়া দাও। কারণ এই, যে যাঁহারা নেতা বলিয়া সম্মান গ্রহণ করেন তাঁহারা নেতৃত্বের দায়িত্বভার বহন করেন না। কর্ত্তব্যপালন না করিয়া কেবল সুবিধা গুলি ভোগ করেন। তাঁহাদের এই উচ্চপদের সুবিধাগুলি সর্ব্ব-সাধারণের সেবায় নিযুক্ত হয় না, তাঁহারা তাহা আত্মসেবায় নিয়োগ

করেন। শুধু তাহাই নহে আজকাল অভিজাতদিগের এই উচ্চপদ লাভ করিবার আর একটি উপায় আছে তাহার নাম কাঞ্চন। এই কাঞ্চন-কৌলিন্য পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইয়াছে, ইহারও স্বরূপ চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। আজকাল কাহারও যদি এত বেশী টাকা থাকে যে লোকে যখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন কাঞ্চনের উজ্জ্বল আবরণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না; তাহা হইলে সে ব্যক্তি যতই মূর্খ হউক, রাজনীতি জানুক বা না জানুক, জাতির বা দেশের হিতের জন্য কিছু করুক না করুক, ব্যাঙ্কে যদি অজস্র অর্থ থাকে আর কোনও একটি রাজনীতিক সম্প্রদায়ের যদি কোনি কার্য্য করে, তাহা হইলেই সে মানুষ একটি "সোণার গৌরাঙ্গ" (Golden Idol) হইয়া গেল, সকলেই মাথা নোয়াইবে, সকলেই বশীভূত হইবে, তাহা হইলে সেব্যক্তি অনায়াসেই একটি উপাধি প্রাপ্ত হইবে। কিছুই না করিয়াও উপাধি পাওয়া যায়। নিজের সদ্‌গুণের দ্বারা নয় কেবল কাঞ্চন দ্বারা লর্ড হওয়া যায়। যদি এক-জনের প্রচুর অর্থ থাকে তাহা হইলে নিজের মনোমত লোককে নির্ব্বাচিত করাইয়া জন সাধারণের সভায় বসাইয়া গবর্ণমেণ্টের সেবা করে। কার্য্যতঃ ভোট কিনিতে পাওয়া যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে ভোট ক্রয় করা অবৈধ। এইরূপ করিয়া লোকে দেশহিতৈষী হয় ইহা সততার বা সুনীতির অভাব বলিয়া জনসমাজে বিবেচিত হয় না। এই প্রকার কার্য্য বহুবার করার পর, বহু অর্থ এই প্রকারে ব্যয় করার পর দলের লোকের বিশেষ তুষ্টি জন্মায়, তখন সকলেই বলে ইনি দেশের রাজ্য শাসনের অনেক কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাকে বংশানুক্রমিক আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হউক—এত টাকা যখন খরচ করিয়াছেন তখন ইহাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক করিয়া দেওয়া হউক। এই যে কাঞ্চনের পূজা ইংলণ্ডে ইহা কতকটা গোপনে চলে। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহা আর গোপন করিতে হয় না, ইহা একটি প্রকাশ্য ব্যাপার। সমাজে সম্মান বা শক্তি পাইতে হইলে অর্থই তাহার একমাত্র সাধন। অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য এই দুই দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় যে সমস্ত পদ্ধতি প্রকাশ্যভাবে অবলম্বিত হয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একজন লোক, তাহার বহু কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, অনেকগুলি ছোট ছোট রেলকোম্পানির বিরুদ্ধে লাগিয়া তাহাদের অচল

করিয়া শেষে সেই রেলগুলিকে কিনিয়া বহু পরিবারের অন্ননাশ করিয়া ধনবান হইয়াছে। ষ্টক্ একস্‌চেঞ্জের উপর জুয়া খেলিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। সে ব্যক্তি ধনী লোক, বড়লোক, আদর্শ চরিত্রের লোক। এই সকল লোকের জীবনী লিখিত হয়, সে দেশের বিদ্যালয়ের বালক বালিকা-গণকে সেই সব সক্ষম লোকের জীবনী পারিতোষিক দিয়া কার্য্যতঃ তাহাদের আদর্শের অনুবর্ত্তন করিতে বলা হয়। ইহারা নিজের পায়ে ভর করিয়া বড় লোক হইয়াছে! মাত্র ছয় পেনি হাতে লইয়া জীবন-পথে প্রবেশ করে তাহার পর পরিশ্রম ও মিতব্যয়ীতার দ্বারা এবং প্রধানতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ মনযোগী না হওয়ার জন্য বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে দু তিনটি গির্জ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, মৃত্যুর পর বাজারের মধ্যে তাহার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এইরূপ জীবনকে আদর্শজীবন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করায় লাভ এই হয় যে সমাজে অসন্তোষ, ও অযথা প্রতিযোগীতা হয়, সহস্র সহস্র শ্রমজীবি অসন্তুষ্ট হইয়া সমাজকে বিপ্লবের ভয় দেখায়। সাধারণ লোক, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহারা এই কথা বলে যে এই সমস্ত লোকের চরিত্র আমাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নয়, ইহারা আমাদের অপেক্ষা ভাল লেখাপড়া জানে না, আমাদের অপেক্ষা বহুদর্শীতা যে অধিক আছে তাহাও নাই, ইহারাই বা কেন এত ধনী আর আমরাই বা কেন এত দারিদ্র্য-পীড়িত। মানুষ বাধ্য হইয়া টাকার সম্মুখে মস্তক নত করে, বশ্যতাও স্বীকার করে, কিন্তু কোন দরিদ্র ব্যক্তিই কেবল টাকা নাই বলিয়া একজন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন বলিয়া বিবেচনা করে না। সুতরাং টাকাই যেখানে সম্মানের একমাত্র হেতু সেখানে দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ, ভীতি ও অবিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ও চরিত্র যদি সমাজে উচ্চতম সম্মানের বস্তু হয় তাহা হইলেই সমাজ দেহ সুস্থ থাকে নতুবা অশেষ প্রকার ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী।

এইবার প্রাচ্যদেশের বা হিন্দুস্থানের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ কিরূপ অবস্থায় আছে তাহা ভাবিয়া দেখা যাউক। প্রাচীন কালের চারিবর্ণ এখন আর নাই। শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্যে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে প্রতীচ্যদেশের শ্রেণীর ন্যায় হিন্দুস্থানের জাতি একটি কৃত্রিম আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। কেন এরূপ

হইল? প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক বর্ণ নিজের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছে, এই জন্যই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বহু শত সহস্র বৎসরের ধীর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতি সমগ্র সমাজের নিকট আপনাদিগের যে দায়িত্ব তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ ব্রাহ্মণ আধিপত্য চাহেন। ক্ষত্রিয় লোকশিক্ষক হইতে চাহেন। বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের অধিকার চাহেন, শূদ্র দ্বিজের অধিকার চাহেন। কোন জাতি নিজের কর্ত্তব্যে সন্তুষ্ট নহেন, প্রত্যেকেই অপরের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। বহুদিন ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে। এই পরিণামের আরম্ভ কোথায়? ব্রাহ্মণের পতন হইতেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। ব্রাহ্মণ বৈশ্যের ধন ও ক্ষত্রিয়ের পার্থিব আধিপত্য অধিকার করিলেন, সেই সময় হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। একজন লোক যেমন নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে, ব্রাহ্মণও ঠিক তদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর ধনরত্নকে বরণ করিলেন। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা যেরূপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই হইয়াছে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু বাহিরের আঁটা আঁটি বাড়িয়া গিয়াছে—অধিকারের দাবী আছে কিন্তু দায়িত্বের জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যের পালন নাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন সম্মানের দাবী করিবে? কেবল বাহিরের কতকগুলি সাজ ঠিক রাখিয়াছে বলিয়া! সে কালে ব্রাহ্মণকে জনশিক্ষকের সম্মান দেওয়া হইতে এখন যে গুরু হইবার শক্তি কৈ? ভিতরে সার নাই কেবল আবরণ, ইহার দ্বারাই সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। প্রবঞ্চনা, ঔদ্ধত্য, ঘৃণা প্রভৃতিতে হৃদয়-পূর্ণ। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যপালন না করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মান দাবী করে বলিয়া সকলের মনে ঈর্ষা, ক্রোধ, অসন্তোষ, ও অনৈক্য জাগিয়াছে, নতুবা সমাজের শান্তি প্রেম, সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি কিছুতেই নষ্ট হইত না। ব্রাহ্মণ অধ্যাত্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া দলাদলিতে যোগদান করিয়াছেন, অর্থসংগ্রহের জন্য দিনরাত্রি ছুটাছুটি করিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জন্মান্তরবাদের সাহায্যে সমাজে মানবাত্মার ক্রমবিকাশের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা আর নাই। কারণ ব্রাহ্মণ আত্মায়, কেবল দেহে নহে, ব্রাহ্মণ সমগ্র জীবনে, কেবল জন্মে নহে। ধর্ম্ম যদ্যপি প্রতিপালিত না হয় তাহা হইলে জাব

যখন জন্মান্তর গ্রহণের জন্য আসিবে তখন কি করিবে? তাহার এমন পরিবার চাই যেখানে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আছে। মনে করুন অত্যুন্নত জীব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুস্থানে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পরিবারে কেহ সংস্কৃত জানে না, বেদের চর্চ্চা নাই, শাস্ত্রার্থের প্রকৃত জ্ঞান নাই, বাহিরে আড়ম্বর আছে ভিতরে ব্রাহ্মণত্বের কিছুই নাই। মনেকরুন সেই জীব দেখিল যে অন্তবর্ণের কোন পরিবারে বা অন্য দেশের বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ব্রাহ্মণের জ্ঞান পবিত্রতা ও পরার্থপরতা রহিয়াছে। এই জীব আত্মার অবনতি অপেক্ষা দেহের অবনতি বরং ভাল এইরূপ বিচারে এক পবিত্রচরিত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ শূদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। দেহ তো ব্রাহ্মণ নহে, আত্মাই ব্রাহ্মণ। আত্মাকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম। ইহাই এ কালের প্রকৃত সমস্যা। ব্রাহ্মণ-আত্মার ব্রাহ্মণ দেহ হওয়া চাই অথবা ব্রাহ্মণ দেহে ব্রাহ্মণ আত্মা থাকা চাই, নতুবা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। মনু বলিয়াছেন চর্ম্মের ব্যাঘ্র যেমন, কাঠের হাতি যেমন, জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও তেমনি। ব্রাহ্মণের দেহে শূদ্রের আত্মা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার হীন কামনা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। একজন ব্রাহ্মণ ধনাকাঙ্ক্ষায় মত্ত। ইহার অর্থ কি? ঐ ব্রাহ্মণের দেহে বৈশ্যের আত্মা বাস করে সুতরাং কোন পবিত্রাত্মা শূদ্রজাতীয় লোক যদি বলেন জাতিটা কিছুই নহে, ইহা নষ্ট হওয়াই উচিত, তাহা হইলে অসন্তোষের কারণ কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ সত্য বস্তু এখনও ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নামে যাহারা পরিচিত তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণত্ব নাই। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে আর একটি কথা ভাবিবার আছে, এখন এই জাতিভেদের গণ্ডী যতটা শক্ত হইয়াছে পূর্ব্বে ইহা ততটা শক্ত ছিল না পূর্ব্বে এক বর্ণের লোক অপরবর্ণে উন্নীত হইতে পারিত। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ সামান্য অপকর্ম্মের জন্য শূদ্র হইয়া জন্মাইলেন অতি অল্পদিনে তাঁহার সেই সামান্য কর্ম্মটুকু ক্ষয় হইয়া গেল, এখন কি তাঁহাকে এই দেহ ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত শূদ্র হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? পূর্ব্বকালে সে রূপ ব্যবস্থা ছিল না পূর্ব্বকালে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইত। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে বিচার প্রচলিত আছে তাহা যে নিয়মের উপর

প্রতিষ্ঠিত, সে নিয়ম সত্য, কিন্তু তাহাও এখন উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। একজনের দেহ শূদ্রের কিন্তু চরিত্র আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা ব্রাহ্মণের, আর একজনের দেহ ব্রাহ্মণের কিন্তু চিত্তবৃত্তি ও আত্মা শূদ্রের অপেক্ষাও অধম, এরূপ দৃশ্য আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি, এরূপ অবস্থার খাদ্যাখাদ্যের বিচার কিরূপ ভাবে হইবে ইহা কম চিন্তার বিষয় নহে। ধ্বংস করা নহে, তবে সংস্কার করা উচিত। কোন্ পথে সংস্কার হইবে তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে সচ্চিন্তা জাগরিত হউক, সর্ব্ববিধ কাপট্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধচেষ্টা দূরীভূত হউক।

তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি।

(অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণ,—

তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি আমার আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় দেবালয় সমিতিতে প্রায় বৎসরাধিক কাল যাবৎ তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছিলাম। তাহারই কিয়দংশ আজ আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তান্ত্রিকদিগের যে অষ্টাঙ্গ বিদ্যা বা অষ্টমাতৃকার সাধনার কথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই চারিটি যন্ত্র লইয়া আজ আমরা আলোচনা করিব।

তন্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে, তপোমগ্ন মহাদেবের তপঃ শক্তির মধ্যে জগৎপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহামায়ার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ দেখা যায়। সৃষ্টির ইচ্ছা উপজাত হওয়ায় সেই আদি মহাদেব তপোমগ্ন হইলেন। মহাদেবের সেই তপঃপ্রভা তাঁহার ললাটদেশ ভেদ করিয়া তৃতীয় নয়ন বা প্রজ্ঞান-নয়ন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই প্রজ্ঞান-নয়ন হইতে, এক অপূর্ব্বজ্যোতি বিনির্গত হইয়া বিশ্বজননী মাতৃকা-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই মাতাই বিশ্বের আদিজননী। মাতা আনন্দময়ের আনন্দলীলায় মত্ত হইয়া বীণাবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বীণার তন্ত্রী হইতেই এই বিশ্ব-তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। জগতের আদিতত্ত্ব শব্দ। হিন্দু শাস্ত্রে শব্দকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি করিয়া ক্রমশঃ পরিদৃশ্য-

মান স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে জগতের আদিতে কেবলমাত্র শব্দই পরমেশ্বরে লীন হইয়া অবস্থিত ছিল। সেই শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের মতে এক অসীম অনন্ত শক্তি সমুদ্রের কতকগুলি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কম্পনের বহির্বিকাশ এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ। এই সূক্ষ্ম কম্পনই তন্ত্রোক্ত বীণাবাদিনীর সেই অনাহত রাগিণী। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বীণাবাদিনীর বীণা বিধূনিত হইতেছে। তাহাতে যে বিচিত্র রাগরাগিণী সকলের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাই একটা বাস্তবের বা সত্যের রূপ ধরিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। উপনিষদে বর্ণিত আছে আনন্দময় ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া তপের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া স্থূল, মূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম অসূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। কেন তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে "রসো-বৈঃ সঃ" সেই পুরুষ রস-স্বরূপ। একটা রসের বা আনন্দের অনুভূতি হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পোষণ, লয় প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। সকলপ্রকার অভিব্যক্তির মূলে ক্রিয়াশক্তি, সকল প্রকার ক্রিয়াশক্তির মূলে আনন্দের অনুভূতি। এই আনন্দের অনুভূতি-রূপ শক্তির সাহায্যব্যতিরেকে জগতের কোন প্রকার ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে না। এই রসক্রীড়া জড়জগতে অব্যক্ত ভাবে এবং জীব-জগতে ব্যক্ত ভাবে কার্য্য করে। জগৎ ঈশ্বরের লীলা বা একটা আনন্দের ক্রীড়া-মাত্র প্রভৃতি বাক্যের ইহাই অর্থ। তান্ত্রিকদিগের রূপকভাষায় জগতের এই অনন্ত বৈচিত্র্য সেই বীণাবাদিনীর হৃদয়োচ্ছ্বসিত অনন্ত বিচিত্র কাব্য-কাহিনী সেই অপরূপ বীণার অপরূপ রাগরাগিণী মাত্র।

"মহা-মায়া মহা বীণাধ্বনি লয়ে মহা মিথ্যা এক
বাস্তবের রূপ ধরি উঠে উদ্ভাসিয়া,
সুধু ক্রীড়ার আনন্দ, সুধু রাগিনী ঝঙ্কার, সুধু কাব্যের কাহিনী"

ইহাই তন্ত্রান্তর্গত শক্তিশাস্ত্রের লীলাবাদ। সকল প্রকার শক্তি সাধনার শিরোদেশে এই লীলাবাদ অবস্থিত। সাধক যখন সাধনার বলে সর্ব্বার্থকতা লাভ করেন বা কৃতকৃত্য হন তখন তিনি এই মহাবিদ্যা বা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপিনীর রাজ্যে উপনীত হন। সাধকের ইচ্ছাশক্তি তখন সেই অপরিসীম ঐশী ইচ্ছাশক্তির সহিত মিলিত হইয়া যায়।

সাধক তখন সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া, পূর্ণকাম হইয়া সেই অপরিসীম আনন্দ-সত্ত্বায় বিলীন হইয়া যান। সাধক তখন ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করেন।

এই বীণাবাদিনী মাতাই আদিদেবী বিশ্বের কারণরূপিণী মহামায়া। প্রজ্ঞানজননী বিশ্বনিয়ন্ত্রী প্রভৃতি নামেও ইনি অভিহিত হইয়াছেন। আনন্দময়ী মা মহাদেবের প্রজ্ঞানকমলদলে বসিয়া মহানন্দে মগ্ন হইয়া, অপরূপ লীলারসে আপ্লুত হইয় বীণাবাদন করিতেছেন। সেই বীণাধ্বনি বিশ্বক্রিয়াশক্তি রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্বের তত্ত্ব-স্বরূপিনী মাতৃকাগণ আবির্ভূতা হইলেন।

২। এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশ্বশক্তিস্বরূপিণী মহাবিদ্যা। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ এক অসীম অনন্ত শক্তিসমুদ্রের কতকগুলি বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। ভারতীয় দর্শনে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে এই শক্তিসমুদ্র প্রাণশক্তি মরুৎ-শক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই শক্তি কালী, তারা, তড়িতা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি নামে ও রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা সকলেই মহাবিদ্যা। এই সকল শক্তির সাধনার দ্বারা সাধক সর্ব্বশক্তিশালী অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া পূর্ব্ব বর্ণিত আদি মহাবিদ্যার পরিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণী প্রজ্ঞানজননীর ক্রোড়লাভের অধিকারী হন। এই তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমরা দুইটী মহাবিদ্যাতত্ত্ব এই স্থানে গ্রহণ করিব। একটি কালী বা তারা তত্ত্ব। আর একটি ছিন্নমস্তাতত্ত্ব।

এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কালশক্তি সম্বন্ধে একটু ধারণা করা আবশ্যক। তন্ত্র মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগত অনন্ত প্রবহমান কাল-প্রবাহের কতকগুলি বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি এই কালের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া অনন্ত বিচিত্র দেশ সকল উৎপাদন করিতেছেন। বস্তুতঃ এই দেশ সমূহের কোনও প্রকার সত্তা নাই। অনন্ত প্রবহমান কাল-শক্তিই পর পর এক একটা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে তাহাই দেশ নামে অভিহিত হয়। এই দেশসকল নিয়ত পরিণামশীল। এই জন্য ইহাকে পরিণতি-প্রদায়িনী নিয়তির লীলা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কালপ্রবাহ অনাদি। সৃষ্টির পর সৃষ্টি প্রলয় পর প্রলয়ের অনন্ত কাল ধরিয়া হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই

কালশক্তির প্রভাবেই নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মে সৃষ্টি-বিষয়ক ইচ্ছার উদ্বোধন হয় এবং এই কালপ্রবাহের মধ্যেই পরমেশ্বর আপনাকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এই জগৎকে একখানি মহাকাব্য স্বরূপ ধরিয়া লউন। এই কাব্যের বিষয় পরিদৃশ্যমান দেশ সমূহ, পাঠক স্বয়ং ভগবান, কাল নামক মহৎ গ্রন্থে আপনার আত্মজীবনী পর পর পাঠ করিয়া যাইতেছেন। আর কাব্যের রচয়িত্রী স্বয়ং মহাবিদ্যা বা মহামায়া। কল্পান্তে আবার এই কাল প্রভাবেই পরমেশ্বর নিদ্রা-মগ্ন হইবেন। তখন জগতের সকল প্রকার বিভিন্ন ক্রিয়া-শক্তি পরমেশ্বরে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরিদৃশ্যমান দেশ-সমূহ এক গভীর তমোমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু তখনও কাল-শক্তি জাগ্রত থাকিবে। পরকল্পের প্রারম্ভে যথা-সময়ে এই কাল-শক্তির প্রভাবেই পরমেশ্বরে সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছার উদ্বোধন হইবে এবং পূর্ব্বকল্পের নিরুদ্ধ শক্তির স্পন্দন সমূহ এই কাল প্রভাবেই পুনর্ব্বার বিধূনিত বা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। তখন পূর্ব্ব কল্পের নিরুদ্ধ দেশসমূহও পুনর্ব্বার বিভিন্ন আকারে এই কাল-প্রবাহের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে এই কাল-সংলগ্ন শক্তিকে কালী, বিশ্বনিয়তি, অদৃষ্টরূপিনী পরিণাম-প্রদায়িনী প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই বিশ্বনিয়তির বিচরণ-ক্ষেত্র যাহা পূর্ব্বে দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এক বিরাট শ্মশান-ক্ষেত্র বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রমতে এই বিশ্ব এক বিরাট ভস্ম-পিণ্ড। সেই আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরে, স্তরে শ্মশান ভস্ম সংপিণ্ডিত হইয়া এক বিরাট ভস্ম-পিণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। তদুপরি বর্ত্তমান জীব-জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এতৎ সমস্তও শীঘ্রই শ্মশান-ভস্মরূপে পরিণত হইবে এবং আর এক স্তর আবির্ভূত হইবে ; যে হেতু পরিণতিতে সমস্তই শ্মশান ; ভস্ম, অতএব বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান দেশসমূহকেও শ্মশানভস্ম বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। যেহেতু শ্মশান অর্থে বিনাশের ক্ষেত্র। জগতের অবস্থা সকল প্রতি মুহূর্ত্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য অবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ইহারই নাম পরিণামবাদ। এই পরিণামক্রিয়াই তান্ত্রিকদিগের রূপক ভাষায় শ্মশানেশ্বরীর শ্মশান-ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিশ্ব-শক্তি কালিকা-মূর্ত্তি এই কালসংলগ্ন মহাশক্তির স্বরূপ।

অতীত-ভবিষ্যৎ-ব্যাপী মহাকাল এবং তৎসন্নিহিত পুরুষ অবশ শবের ন্যায় ইঁহার চরণতলে অবস্থিত। অতীতের অগণিত অবস্থা সকল মুণ্ডমালা রূপে ইহার গলদেশে দোদুল্যমান রহিয়াছে। বাম দিকের এক হস্তে খড়্গ জগতের নিকৃষ্ট অবস্থাগুলিকে বলিদান দিয়া উৎকৃষ্ট পরিণাম বা অভিব্যক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। দক্ষিণের এক হস্তে ভবিষ্যত সার্থকতার দিক নির্দ্দেশ করিতেছেন, অপর হস্তে ভয়াকুল জীববৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। এই মা কল্পতরু। সাধক সাধনবলে এই মাতার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি মাতার নিকট যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে এই শক্তি অবস্থান করিতেছেন। এই স্থানে বলা আবশ্যক তন্ত্রের মধ্যে যে সকল দেবদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের অবস্থান মানবদেহের মধ্যে, বাহিরে এই সকলের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। প্রকৃত তান্ত্রিকদিগের শ্রেষ্ঠতম সাধন প্রণালীগুলির প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ তাহা কথিত হইয়াছে। আর একটি কথা, জীবের স্থূল দেহও দেশ নামে অভিহিত হয় এবং আমাদের এই নশ্বর দেহখানিকেও শ্মশানভস্ম সমষ্টিরূপে ধারণা করিবার জন্য তন্ত্র-শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের মূলাধার পদ্মে প্রসুপ্ত অবস্থায় এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় আমরা ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হইয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সাধক সমস্ত বিশ্ব শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন ও তৎসহ সম্মিলিত হইয়া বা একাত্মতালাভ করিয়া তদনুরূপ শক্তিশালী হইতে সক্ষম হন। এই কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এমন কি এই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বই সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদ্বৈত-তত্ত্ব বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা সমগ্র বিশ্বের সহিত জীবের সংযোগ সম্বন্ধ, মনোবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান, উভয় বিজ্ঞানের একত্ব প্রভৃতি জগতের উচ্চতম তত্ত্ব সকল কেবলমাত্র জীবের মনোবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া এই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবের ঊর্দ্ধাভিমুখী গতির যে সুন্দর পথ কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন সুন্দর ও এমন বিজ্ঞান-সম্মত পথ আর কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় নাই।

"প্রথমেই জীব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ" বেদান্তের এই মহত্তম-বাণী বিঘোষিত করিয়া সেই বাণীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন আমাদের দেহে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়ি আছে। আমাদের সমস্ত শরীর কতকগুলি সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা সকলেই জানেন। এই সূক্ষ্ম শিরা উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি আমাদের সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সমূহ এই প্রাণশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এই শক্তি-প্রবাহকে স্নায়বীয় প্রবাহ বলে। মস্তিষ্ক ইহার কেন্দ্র-স্থান। শারীরিক শক্তি-প্রবাহ প্রধানতঃ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দ্বিবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। যে শক্তি দ্বারা আমরা হস্ত পদ প্রভৃতি সঞ্চালন করি উঠি বসি চলিয়া বেড়াই তাহা দৃষ্ট-শক্তি। আর যে শক্তি-প্রভাবে আমাদের ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা অদৃষ্ট শক্তি। মানসিক শক্তি সমূহও এই দ্বিবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। যদ্দ্বারা আমরা চিন্তা করি, স্মরণ করি, সংকল্পানুরূপ শারীরিক শক্তি পরিচালিত করি, তাহা দৃষ্ট শক্তি। এই দৃষ্ট শক্তির পশ্চাতে অদৃষ্ট শক্তি রহিয়াছে। এই অদৃষ্ট শক্তি অসীম অনন্ত অধিকন্তু, এই অদৃষ্ট শক্তিই সকল প্রকার দৃষ্ট শক্তিসমূহের পরিচালক, সকল প্রকার শক্তি বা ক্রিয়া-প্রবাহের জননী।

স্থূল শিরা উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া স্থূল শক্তি সমূহ প্রবাহিত হয়। সূক্ষ্ম শিরা উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম অদৃষ্ট শক্তি সমূহ প্রবাহিত হয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর করিয়া এই শিরা উপশিরাগুলির অবস্থানের কতকগুলি স্তর-ভেদ আছে। প্রথম স্তরের মধ্য দিয়া শারীরিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দ্বিবিধ শক্তি ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি প্রবাহিত হয়। তদভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তরে মানসিক দৃষ্ট শক্তি-সমূহ চিন্তা, স্মরণ, সংকল্প প্রভৃতি প্রবাহিত হয়। তদভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মতম শিরা উপশিরা দিয়া অদৃষ্ট শক্তি প্রবাহিত হইতেছে। এই তৃতীয় স্তরের শক্তি প্রবাহকে কারণ-শরীর বলে। এই শরীর জীবের জন্ম জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহের সূক্ষ্ম সংস্কার সমষ্টি দ্বারা গঠিত। আমরা প্রতি নিয়ত যে সকল কর্ম্ম করি, সেই কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হওয়া মাত্রই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। সূক্ষ্ম বীজ বা সংস্কাররূপে সে সকল আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়। ভবিষ্যতে আবার এই সংস্কার বা কর্ম্ম-বীজ-সমূহ কাল প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন জীবন বা নূতন দেহ উৎপাদন করিবে। আমাদের বর্ত্তমান জীবন

অতীতের সংস্কার বা কর্ম্ম বীজ সমূহের পরিস্ফুট অবস্থা। বর্ত্তমান জীবন বা বর্ত্তমান কর্ম্ম-প্রবাহ ভবিষ্যৎ জীবনের মূলীভূত উপাদান। ভাল কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতি উত্তম জীবনলাভ হইবে, মন্দ কর্ম্মের দ্বারা অধোগতি হইবে। এই সংস্কার বা কর্ম্ম-বীজ-সমষ্টিতে আচ্ছন্ন যে ঐশীশক্তি যদ্বারা প্রত্যেক জীব-জীবন পরিচালিত হইতেছে তাহারই নাম কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিই অনন্ত প্রবাহমান কালের মধ্য হইতে আপনার উপভোগ্য দেশ-সমূহ বা জীবন রচনা করিয়া লইতেছে। এইজন্য ইহাকে জীবের অদৃষ্ট বা নিয়তি বলা হয়। ইহাই জীব-জীবনের মূলীভূত কারণ বলিয়া জীবের মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনীর অবস্থান বলা হইয়া থাকে। এমন কি এই জগৎ-সৃষ্টির যে মূলীভূত কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাশক্তি ও এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারাই পরমেশ্বরে উদ্বোধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে কাল প্রবাহ অনাদি অতএব এই বিশ্ব প্রবাহও অনাদি সৃষ্টির পর প্রলয় প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনন্তকাল ধরিয়া হইতেছে। প্রলয়কালে যখন সমস্ত জীব পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাদের শরীর বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম-বীজ সকল মূল-প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। এই কর্ম্ম বীজ সমূহকে ভাগবত গ্রন্থে পুরুষাধিষ্ঠিত কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই কর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই পরমেশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা করেন। জীবের উপভোগ্য স্থান বা দেশ সমূহ জীবের কর্ম্মানুসারে প্রকাশ করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের অন্য ইচ্ছা কিছুই নাই। এই কর্ম্ম-সংস্কার সমূহের প্রতিনিধিরূপিনী যে শক্তি, বিশ্বের মূলাধারও তিনি জীবের মূলাধারও তিনি। এই শক্তিরই নাম কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তিই কালী তারা প্রভৃতিরূপে জগতে নিয়ত প্রকটিত রহিয়াছেন। জীবের মূলাধার পদ্ম হইতে একটি সূক্ষ্মতম শিরাপ্রবাহ উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং স্তরে স্তরে বিশ্ব-কোষ সকল অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বাতীত পরম কারণ পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়াছে। মূলাধার পদ্মের এই ধারে আমাদের বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান দৃষ্ট জীবন অন্য ধারে আমাদের পরমার্থ অদৃষ্ট জীবন। এই মূলাধার পদ্ম হইতে সূক্ষ্মতম শিরাপ্রবাহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই সূক্ষ্মতম শিরা প্রবাহের মধ্য দিয়াই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অপরাপর জগতের সহিত আমাদের সংযোগ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চারণ বা অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের শুভাশুভ নির্ণীত

হয় তাহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এইস্থানে। কোন্ গ্রহ কিরূপ ভাবে অবস্থিত থাকিলে কোন্ প্রকার শিরাপ্রবাহে সেই গ্রহের শক্তিসমূহ আমাদের মধ্যে কিরূপে সঞ্চারিত হইয়া কিরূপ ফল উৎপাদন করিবে, ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায়। তন্ত্রের মধ্যে জীবের অদৃষ্ট নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি চক্র রহিয়াছে। যাঁহারা এই চক্রগুলি সম্যক অনুশীলন করিতে সক্ষম হন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ-বাণী অভ্রান্ত।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি-সমুদ্রের প্রতিনিধিরূপে প্রত্যেক জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া জীবজগৎ পরিচালিত করিতেছে। আমরা সকলেই সেই অপরিসীম শক্তি-সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই শক্তি-সমুদ্রের বহিরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই পৃথকরূপ সত্ত্বাবান এইরূপ মনে করায় অর্থাৎ এই বহিরঙ্গ দৃষ্ট-জীবনই আমার সর্ব্বস্ব, এই অহঙ্কাররূপ অবিদ্যাদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় আমরা সেই শক্তি-সমুদ্রের যোগ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অহঙ্কারের এই পৃষ্ঠে এই ক্ষুদ্র আমিও আমার জগৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, অপর পৃষ্ঠে সেই অপরিসীম একত্বের সত্ত্বা চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভ্রান্তি বা অবিদ্যার অন্ধকারে আবৃত কুলকুণ্ডলিনীকেই নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী বলা হইয়া থাকে।

নিজ দেহস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিবার উপায় ছিন্নমস্তা তত্ত্বের সাধনা। এই ছিন্নমস্তারূপিণী মহাবিদ্যাকে প্রথম-বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। তান্ত্রিকদিগের যে সুপ্রসিদ্ধ অষ্টমাতৃকার সাধনার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার আরম্ভ এই ছিন্নমস্তা তত্ত্ব হইতে। আমাদের নানাদিকগামী মনকে একাভিমুখী বা তীব্র একাগ্রশক্তি সম্পন্ন করিয়া জগতের উচ্চতম তত্ত্বসকল ধারণা করিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত ছিন্নমস্তাতত্ত্বের সাধনা। পাতঞ্জল দর্শনের সংযম-নামক যোগটির বিষয় আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। তথায় উক্ত হইয়াছে সংযম যোগের দ্বারা সাধকের হৃদয়ে যে, প্রজ্ঞা নামক সর্ব্বভাসক আলোক বা বুদ্ধি জন্মে তদ্দারা ইচ্ছা করিলে সাধক বিশ্বের সমস্ত শক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন। আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বাহ্যজগতের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্ষণকালও একটি বিষয়ের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখা কঠিন, তাদৃশ বহুদিকগামী চিত্তকে অভ্যাসের দ্বারা একটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ

রাখার নাম ধারণা। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি চিত্তের একতানতা জন্মে অর্থাৎ যে বিষয়টি আমরা চিন্তা করিতেছি মন আর কোনও দিকে না গিয়া যদি কেবল সেই বিষয়টির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহাকে ধ্যান বলে। ক্রমে যখন সেই ধ্যান কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত করিবে, আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাকার জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া গিয়া চিত্ত একেবারে তন্ময় হইয়া যাইবে তখন তাহাকে সমাধি বলে। কোনও এক বস্তু অবলম্বনে এই ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করার নাম সংযম। এই সংযম যোগের দ্বারা সাধকের প্রজ্ঞানামক সর্ব্বভাসক আলোক বা বুদ্ধি জন্মে। তখন এই সংযম যে বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করা যায় সেই বিষয়েরই পূর্ণ-জ্ঞান সাধকের উপজাত হয় এবং সেই বিষয়ে তদাত্মতা লাভ করিয়া সাধক তদনুরূপ শক্তিশালী হইতে সক্ষম হন। সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যরশ্মি সংযোগে বহ্নি আবিষ্কার করে ইহা দেখিয়া পুরাকালে যোগীগণ এই সংযম যোগটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। magnifying glass আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন সেই গ্লাস যদি সূর্য্যের দিকে ধরা যায় তাহা হইলে সেই গ্লাসের উপর যেঃ সূর্য্যরশ্মিগুলি পরে সেইগুলি একটি কেন্দ্রে সমাবেশিত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়। সেই কেন্দ্রে যদি তুলা বা তদনুরূপ কোন দাহ্যবস্তু রাখা যায় তাহা হইলে তাহা জ্বলিয়া উঠে। সেইরূপ আমাদের নানাদিকগামী বিচ্ছিন্ন চিত্তকে যদি একটি কেন্দ্রে সমাবেশিত করা যায় তাহা হইলে তাহা এক মহাশক্তির আধার হইয়া উঠিবে, তদ্দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব এমন কি সত্য সঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণও লাভ করা যাইতে পারিবে, ইহা অনুমান করিয়া যোগীগণ তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন ও সংযম যোগটি আবিষ্কার করেন। সাধারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে সকল মহাত্মাগণ জগতে উচ্চতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতি গভীর একাগ্র শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বালক তাহার পাঠ্য বিষয়ে অত্যন্ত মননশীল ভবিষ্যতের অনন্ত উন্নতি তাহারই করায়ত্ব। যে বৈজ্ঞানিক অন্যান্য সকল বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া একান্তভাবে তাহার লেবরিটারির বিষয়গুলির মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, তিনিই নূতন নূতন তথ্য সকল আবিষ্কৃত করিয়া জগৎকে চমকিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ করিতে সক্ষম। বস্তুতঃ মানসিক শক্তিই শক্তি, দৈহিক শক্তি বা কার্য্যকারিণী শক্তি মনেরই বিভিন্ন

বিকাশ মাত্র। অধিকন্তু দেখা যায় মন যে কেবল আমাদের এই শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে, মন সর্ব্বব্যাপী। দেশ বা কালের দ্বারা মন ব্যবচ্ছিন্ন নহে। যে কোন কালের মধ্যে বা যে কোন দেশের মধ্যে মন কার্য্যকরী হইতে সক্ষম। আমরা কলিকাতায় বসিয়া মনের দ্বারা ইয়রোপিয় যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করিতেছি, মনের দ্বারা অতি দুরান্তরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ সমূহের তথ্য সংগ্রহ করিতেছি, এবং বাহ্য-বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়াও মনের এই সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। মনের দ্বারাই ত্রিকালের বিষয় সকল চিন্তা করিয়া ত্রিকালের তথ্য সংগ্রহ করিতেছি। এই জগতের সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বানুস্যূতা যে শক্তি, যাহা প্রাণশক্তি বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই মানুষের মনের মধ্যে। এই মনই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে সম্মিলিত হইবে। এই মনের স্বরূপ উপলব্ধি করা ও তাহাকে পরিপূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিয়া তোলার নাম সংযমযোগ। এই সংযম যোগেরই নামান্তর কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ।

কিন্তু সাংসারিক ভোগ সুখের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে মনকে পূর্ণ একাগ্র শক্তি সম্পন্ন করা অসম্ভব। মন ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বাহিরের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই বাহ্য বিষয় সকল কামনা-রূপ অজ্ঞানের দ্বারা মনকে অনুরঞ্জিত করিয়া এরূপ অভিভূত করিয়া রাখে যে কেহ এই সকল বিষয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ইচ্ছাও করে না। ইচ্ছা করা দূরে থাকুক আরও উত্তরোত্তর এই সকল বিষয়ের মধ্যে অধিকতর ডুবিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু সাংসারিক এই সকল বিষয় যে ঘোর দুঃখময় অত্যন্ত হেয় অত্যন্ত অপকৃষ্ট ইহা সর্ব্বদর্শন প্রমাণীকৃত সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত সত্য সিদ্ধান্ত। সুখ বলিয়া আমরা যে অবস্থাটা উপলব্ধি করি তাহাও প্রকৃত পক্ষে সুখ নয়, বাহ্য বিষয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত একটা ভাব মাত্র তাহাও আমাদের স্বার্থবুদ্ধিরই শোণিত-পিয়াসী জাগতিক পিশাচেরই মূর্ত্তি। বৈরাগ্য বা ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ব্যতীত এই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। জাগতিক বিষয় সকলের নিকৃষ্টতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব না করিলে বৈরাগ্য জন্মে না। এই বৈরাগ্য রূপ মহোত্তম যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিবার জন্যই তান্ত্রিক দিগের ছিন্নমস্তা-তত্ত্বের সাধনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তান্ত্রিকদিগের

শ্রেষ্ঠতম যোগ যাহাকিছু সমস্তই শ্মশানে বসিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে এমন কি নিজ দেহকে পর্য্যন্ত তাঁহারা কতকগুলি শ্মশানভস্মসমষ্টি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই মনে করেন না। বৈরাগ্য শিক্ষার জন্য শ্মশান যে অত্যুত্তম স্থান তাহা কে অস্বীকার করিবেন? এই শ্মশান-ভস্মে সমাচ্ছন্ন অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত যে নিত্যা শক্তি অবস্থিত, তাহাই ছিন্নমস্তা-রূপিনী মহাবিদ্যার রূপ। পদতলে প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত পুরুষ, প্রকৃতি-পুরুষকে পরাভূত ও অভিভূত করিয়া বিপরীত রতি ক্রিয়ায় মত্ত হইয়াছে। উভয়ের সম্মিলিত শক্তি, সেই উন্মাদ ক্রিয়া ছিন্নমস্তা-রূপে জগতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থকতা-স্বরূপ নিত্যা শক্তি ভ্রান্তি সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বহস্তে নিজের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। পিশাচ পিশাচীরূপা জাগতিক বৃত্তি সকল মহানন্দে নিত্যা শক্তির সেই হৃদ্‌পিণ্ড-ছিন্ন উত্তপ্ত শোণিত ধারা পান করিতেছে। শ্মশানের পূতিগন্ধে, শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকারে ঝঞ্ঝা-সমাকুল অমানিশার বিরাট অন্ধকারে জগৎ এক ভীষণতম বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই স্থলে পুনরায় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তন্ত্রের মধ্যে যে সকল দেব দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এ সকলের অবস্থান মানব-দেহের মধ্যে। মানব দেহ ব্রহ্মপুর। মানব দেহই ব্রহ্ম সাধনার সাধন মন্দির। মানুষ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া ভ্রান্তির খড়্গাদ্বারা নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া স্বার্থবুদ্ধি স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি প্রবাহগুলিকে বাহ্য-বিষয় রূপ পিশাচ পিশাচী সকলকে পান করাইতেছে ইহাই ছিন্নমস্তা-তত্ত্বের অর্থ।

এই প্রথম বিদ্যার সাধনার দ্বারা সাধকের অত্যুত্তম বৈরাগ্য লাভ হয়। বিষয় সকলের নিকৃষ্টতা উত্তমরূপে উপলব্ধি হয়, কাজেই মন আর সেই সকল বিষয়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে না। তখন মন অন্তর্মুখী গতি লাভ করে এবং আমাদের চিন্তাশক্তি, ও ইচ্ছা শক্তি এক কথায় আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে এবং চরমে কুলকুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণ হয়। তখন মন স্বীয় প্রজ্ঞা-লোকে অহঙ্কারের আবরণ ভাঙ্গিয়া দিয়া অদৃষ্টের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া সেই অসীম অনন্ত শক্তি-সমুদ্রে মিলিত হন। সাধক তখন ক্রমে সর্ব্ব শক্তি-শালী হইতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিদ্যার সাধনার দ্বারা সাধকের এই অবস্থা লাভ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক জাগতিক শক্তি-সমূহের মধ্যেই

অবস্থান করেন। তৃতীয় অবস্থায় সাধক এই সকল অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপিনী প্রজ্ঞাম-জননীর ক্রোড়লাভের অধিকারী হন এবং চতুর্থ অবস্থায় সাধক নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত তন্ত্ররত্ন।

দীন।

পুলকিত চিতে র'য়েছে তাহারা,
কে চাহিবে মোর পানে?
ক্ষুধানলে জ্বলে এ পোড়া উদর
কে শুনে সে কথা কাণে!
উৎসবে সবে হয়েছে মত্ত,
কে লইবে এই দীনের তত্ত্ব?
কেমনে আমার মরম বেদনা
বাজিবে তা'দের প্রাণে!
করিয়াছে তাই—বঞ্চিত মোরে
কৃপা-কটাক্ষ দানে।
"প্রতিবেশী তা'রা—বড় আপনার—
তা'রা যে আমার ভাই,"
শুনি' সেই বাণী, বড়ই আশায়
গিয়াছিনু হায় তাই!
হীন আবেদন হ'য়েছে বিফল,
সম্বল মোর আঁখি-ভরা জল;
ঘুরিয়াছি আমি দুয়ারে দুয়ারে,
চেয়েছি সবার ঠাঁই,
কহিতে বিদরে কাতর পরাণ
'কিছুই যে পাই নাই'।
রহুক তাহারা ভোজনানন্দে,
করুক সুপেয় পান,
কিসের দুঃখ? আমি নির্ধন—
তাহারা যে ধনবান;
আহার অভাবে যদি মারা যাই
তা'দের তাহাতে লাভ ক্ষতি নাই;
সুখে থাক তা'রা—তা'দের বদন
যেন নাহি হয় ম্লান,
দীনের রোদনে তাহাদের হাসি
শুকা'ওনা ভগবান!

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধু।

(১)

একে একে বন্ধুগণ সখে ছেড়ে যায়,
কেবা বন্ধু নাহি হারা'য়েছে ?
এ হেন প্রণয়-ডোর নাহি এ ভুবনে
ছিন্ন যাহা হেথা না হ'য়েছে !
এ নশ্বর বসুন্ধরা হইত যদ্যপি
চির তরে বিশ্রাম-আগার,
মোদের মরণ কিংবা জীবন, কিছুই
হত না কো প্রীতির আধার।

(২)

কালের অনন্ত গতি পশ্চাতে ফেলিয়া,
মরণের রাজত্ব-উপরে ;—
বিরাজিছে এক দিব্য পবিত্র প্রদেশ
—জীয়ে যথা প্রাণ—নাহি মরে,
অথবা, ক্ষণিক বহ্নি প্রীতি-প্রণয়ের
থাকে যাহা হৃদয়-ভিতরে,
—যাহার স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র উঠিয়া স্বরগে
প্রজ্জ্বলিত থাকে চিরতরে।

(৩)

এ বিশ্বের 'পরে এক মহা বিশ্ব আছে
নাহি ঘটে বিচ্ছেদ যথায় ;
প্রণয়ের চিরন্তন মাধুরী মহিমা
সাধু তরে র'য়েছে তথায় ;—
এ বিশ্বাস, মৃত্যু-মুখে পতন-উন্মুখ
নরপ্রাণে আশা, শান্তি দ্যায় ।—
পরিবর্ত্তি নরে নিয়ে যায় !

(৪)

এ রূপে নক্ষত্র পর নক্ষত্র লুকায়,—
ক্রমে ক্রমে সব চলে' যায় !

এরূপে প্রভাত ক্রমে ধীরে ধীরে আসি'
সমুজ্জ্বল করেরে দিবায়;
প্রখর রবির করে সেই তারাদল
নাহি যায়—নাহি যায় চলে'
লুকায়িত রাখে তা'রা নিজেদের দেহ
স্বরগের আলোক অঞ্চলে!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

গান।

দেখরে শ্যামামায়ের খেলা।
করেছে ঘর, কি মনোহর, চন্দ্রসূর্য্য তারার মেলা॥
বালীর ভিতর ছবি একে, অশ্বত্থ গাছ রেখেছে ঢেকে,
ডাল গুঁড়ি শিকড় থেকে, ফুলটি ফোটা, ফলটি ফলা—
(আবার) ফলের ভিতর বিচির মিছিল,
এরা খাট্‌চে আপন আপন পালা॥
গড়্‌ছে পুতুল দিচ্ছে ছেড়ে, নাচ্‌ছে এটা ওটায় বেড়ে,
কেউ বা কাকেও ধর্‌ছে তেড়ে, কেউ বা কাকেও মার্‌ছে ঠেলা—
এরা হেসে মরে কান্না পেলে,
যত কান্না হাস্‌বার বেলা॥
কাঠের ছেলে মাটির মেয়ে, ধুমধামেতে দিচ্ছে বিয়ে,
একবার হিরা মাণিক গায়ে একবার কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা।
একবার ভুবন-ভোলান রূপ—
ফিরেই ছাই আর মাটির ঢেলা॥
একদিকেতে মুণ্ড অসি, ভয়ঙ্করী সর্ব্বনাশী,
আর দিকেতে বর অভয়, জননীর মাধুরি লীলা—
দেবা কয় মার করালী রূপ,
(কেবল) ছেলে কোলে নেবার ছলা॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দাস।

কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব। (৭)

অথ মানশূন্যতা।

মানশূন্য এ বিধান, আপনাতে হীন জ্ঞান
কৃষ্ণরতি গৌরব তেজিঞা।
পর্য্যটন ঘরে ঘরে, অকিঞ্চন প্রায় ফিরে,
আত্মগুপ্তি মহৎ হইঞা।
তাহা ভগীরথে সাখি, পুরাণে বেকত দেখি,
মানশূন্য অভীষ্ট লাগিঞা॥
কৃষ্ণে মতি করি নিষ্ঠ, অন্যকর্ম্মে অনাবিষ্ট,
নীচে বন্দে নরাধিপ হৈঞা॥

যথা পাদ্মে।

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রানাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

অথ আশাবন্ধঃ।

অশোবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তি সংভাবনা দৃঢ়া।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি এ বাসনা, আশা বন্ধ ভাবনা,
অন্য কর্ম্ম করিঞা তেজন।
যোগযাগ ক্রিয়া ধর্ম্ম, অন্য শুভাশুভ কর্ম্ম,
বর্ণাশ্রমে যে সব কারণ॥
যতিত্ব দ্বিজত্ব ক্ষোভ, ছাড়ি স্বর্গপদে লোভ
ঐশ্বর্য্য বাসনা করি ত্যাগ।
সেই বৃন্দাবন পতি, কবে হবে মোর গতি,
গোবিন্দ সেবায় অনুরাগ॥

যথা।

ন প্রেমা শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা
যোগোঽথবা বৈষ্ণব ইতি॥

অথ সমুৎকণ্ঠা।

সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্ট লাভায় গুরুলুব্ধতা।

কহ কৃষ্ণ দরশন, কবে পাব বৃন্দাবন,
সমুৎকণ্ঠা ঐছে অভিলাষ।
নন্দের নন্দন হরি, দেখিব নয়ন ভরি,
মুরলিবদন সুবিলাস॥
রসের নাগর কানু, নব জলধর তনু,
পীতবাসা ত্রিভঙ্গী সুন্দর।
যমুনা পুলিন বনে, গোবৎস বালক সনে,
ভুবন-মোহন নটবর॥
অখিল জনের বন্ধু, পূর্ণপ্রেম সুধাসিন্ধু,
রসময় কিশোর মোহন।
কৃষ্ণ অদর্শনে ক্রুটি, মানি কত যুগ কোটি,
সমুৎকণ্ঠা করিতে দর্শন॥

অথ নাম গানে রুচিঃ।

কোনজন আসি কয়, শুন শ্যাম রসময়,
অনুরাগে রসিঞা একলা॥
সদা কৃষ্ণ নাম গানে, আনন্দিত হৈঞা মনে,
অন্য কর্ম্মে নাহি রুচি আর।
নাম গানে সদামতি, নামানন্দে করে রতি,

কৃষ্ণ নাম করয়ে প্রচার ॥
অথ তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিঃ।
মাধুর্য্যে মাধুরী অতি, কিশোর শ্যাম মূরতি,
অনঙ্গ লজ্জিত দেখি কায়।
সেইরূপ দরশনে, আসক্তি বাড়ে রাত্রি দিনে,
কহ জানি কি করি উপায় ॥
মন্মথ-মথন তনু, সেই রসময় বিনু,
অন্য কিছু নাহি ভায় চিতে
কহনা উপায় মোরে, জিজ্ঞাসিয়ে সভা কারে,
পাব কৃষ্ণ কোন্ সমীহিতে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ছান্দ, কপালে চন্দন চাঁন্দ,
অলকা কুন্তল শোভে ভালে।
জলদে বিজুরি ঘটা, পীতবসন ছটা,
বকপাঁতি মুকুতার মালে ॥
কর্ণেতে কুন্তল দোলে, নাসাতে মুকুতা হেলে,
অবতংস শোভে শিখি পাখা।
সিংহ জিনি কটিদেশ, ভুবন মোহন বেশ,
ধ্বজ বজ্র পদ্মাম্বুজ রেখা ॥
কত সুধাময় হাসি, অধরে পূরয়ে বাঁশী,
পাষাণ দ্রবই যার স্বরে।
কি হৈল আশ্চর্য্য চিতে, নারি প্রাণ সংবরিতে,
কি করিল সেই শ্যাম মোরে।
যথা।

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথ তাতস্য কিমপি কৈশোরং ইত্যাদিঃ।

অথ তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ।
কবে দশা হবে এই, পাব বৃন্দাবনে সেই,
বসতি করিব কুঞ্জবনে।
তাহাতে দ্বাদশ বন, করিব সে ভ্রমণ,
বিলসিব যমুনা পুলিনে ॥
হেন দশা হবে জানি, নয়ন গোচর পুনি
মদন গোপাল গোপীনাথ।
গোবিন্দ দর্শন মোর, নয়নের গোচর
কবে হবে ভক্তগণ সাথ ॥
ব্রজেতে বসতি করি, অঞ্জলি অঞ্জলি পূরি,
পিব কবে যমুনার নীর।
হেন দশা মোর হবে, মাধুকরি মাগি কবে,
খাইয়া পালিব এ শরীর।
বনে বনে ভ্রমিঞা, আনন্দিত মন হৈয়া,
বিহার দেখিব স্থানে স্থানে।
ব্রজ ধূলি লঞা গায়, আনন্দিত হৈঞা তায়,
কক্ষ বাদ্য করি ক্ষণে ক্ষণে।
সাধুজন সমাগমে যমুনা পুলিন বনে,
উচ্চগান তাণ্ডব পূরিব।
নন্দীশ্বর গোকুল-পুরি, তথা গোবর্দ্ধন গিরি,
বসতি করিঞা ভরমিব।

বংশীবট তলে বাস, সদা যার
অভিলাষ,
ইহা রহি নাহি ভায় আন,
ভাবাঙ্কুর চিহ্ন তাঁহে, এরূপ দেখিবে
যাহে
এ নয়নানন্দ দাস গান।
এই ভাবাঙ্কুর যার দেহে হয়ে জানি।
তার কাছে ব্রহ্ম সুখ তুচ্ছ করি মানি॥
যোগী সিদ্ধ জ্ঞানী, কর্ম্মী ধর্ম্মী যেই সব।
মুমুক্ষু প্রভৃতি নহে ভাবের উদ্ভব॥
ভুক্তি মুক্তি কামীরং নহে ভক্তি অভি-
লাষ।
কৈছে ভাগবতী রতি হইবে প্রকাশ॥
অতএব তাহা সবে নহে ভাবোদয়।
তাপসাদির চিত্তকাঠিন্য অতিশয়॥
যথা
ব্যক্তং মস্‌ণতিবাস্তর্লক্ষ্যতে রতি-
লক্ষণং।
মুমুক্ষু প্রভৃতি নাক্ষেদ্বপেদেষা রতি নহি॥
তবে যদি কোন জন মুমুক্ষু প্রভৃতি।
কিম্বা ভোগাভিলাষী কিম্বা কোন
যতী॥
ভাগ্যক্রমে মত্তকৃজনের সঙ্গ হয়ে।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-লীলা শ্রবণ করয়ে॥
শ্রবণাদি অনুসারে দেহে উপজয়ে।
ভাবাভাস বলিঞা তাহার নাম কহে॥
সেই ভাবাভাস হয় দ্বিবিধ লক্ষণ।
প্রতিবিম্ব তথা ভাবচ্ছায়া নাম কন॥
প্রতিবিম্ব তথা চ্ছায়া রত্যাভাসো
দ্বিধামতঃ।

অথ তত্র প্রতিবিম্বঃ
চতুর্ব্বর্গ ফলাকাঙ্ক্ষী রাগী যেবা জন।
তাহা সভার কভু যদি ভক্ত সঙ্গ হন॥
ভক্ত হৃদি ভাব চন্দ্র করিঞা উদয়।
সেই চন্দ্রের ছায়া তাহে প্রবেশয়॥
মুমুক্ষু প্রভৃতির দেহে পুলকাদি দর্শন
প্রতিবিম্ব রত্যাভাস তার নাম কন॥
যথা।
কেষাঞ্চিৎ হৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব
উদঞ্চতি।
তদ্ভক্ত হৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গ প্রভাবতঃ
অথচ্ছায়া॥
কোন বা বিষয়ী জন কোন ভাগ্যফলে।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য লীলা শুনে কোন ছলে॥
কৃষ্ণলীলা মধুর রস শুনিতে শুনিতে।
পরম আবেশ হয় তাহা সভার চিতে॥
অশ্রুপুলক হয় বিষয়ীর দেহে।
ভাবচ্ছায়া নাম বলি তাহাকারে কহে॥
এইত কহিল ভাবাভাস দুই নাম।
প্রতিবিম্ব আর ছায়া রতি অভিধান॥
সেই ভাবাভাস হয় দুঃখ বিনাশন।
অতিভাগ্যে পুণ্যবন্ত লভে কোনজন।
কৃষ্ণভক্ত জনের যদি তাঁহে কৃপা হয়।
সেই ভাবাভাস পুন ভাব তুল্য হয়॥
যথা
হরি প্রিয় জনস্যৈব প্রসাদ ভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্ব মুপ-
গচ্ছতি॥
সেই আভাস ভাব অভাব হয় ক্ষণে।
অপরাধ করে যদি বৈষ্ণবের স্থানে॥

কৃষ্ণ-পক্ষের চন্দ্র যেন দিনে দিনে
ক্ষয়।
তৈছে আভাস ক্ষয় দিনে দিনে হয়॥
সাধু-সঙ্গ যদি হয় বৈষ্ণব করুণা।
সেইত আভাস ভাব হয় ভাবোপমা॥
শুক্লপক্ষ চন্দ্র প্রায় বাড়ে দিনে দিনে।
অতএব সাবধান হবে ভক্ত স্থানে
যথা।
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাস্যেপ্যনুত্তমঃ
ক্রমেণ ক্ষয়মায়াতি খস্থঃ পূর্ণ শশী যথা॥
ভাবোপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরা-
ধতঃ।
ইত্যাদি॥
সাধন ভজন বিনু অকস্মাৎ যাঁর।
ভাব উৎপন্ন হয় গাঢ় পরচার।
প্রাক্তন সাধন ফল জানিহ নিশ্চয়।
কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় গাঢ় ভাবোদয়॥
যথা।
সাধনেন বিনা যস্মিন্নকস্মাদ্ভাবলক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিত মত্রৈব প্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনং
ইত্যাদি—
কৃষ্ণভক্তে ভাবযুক্ত যে ভাবকগণ।
তার যদি দৈবে কোন হয় বিঘটন॥
আচার বিচার তার কিছু না দূষিবে।
সর্ব্বদা কৃতার্থ তারা নিশ্চয় জানিবে॥
যে জনা কয়ই ভাই ভাবক নিন্দন।
সেইত পাষণ্ডী হয় প্রভুর বিড়ম্বন॥
যথা
জনে চেজ্জাতে ভাবে হ্পিবৈগুণ্যমিব
দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্ব-
থৈবসঃ॥
যথা নারসিংহে।
ভগবতি চ হরাবনন্য চেতাকৃশ মলিনো
হ্পি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশ কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরা
পরাভবতা মুপৈতি চন্দ্রঃ॥
এইত কহিল ভাবভক্তি নিরূপণ।
এবে কহি প্রেমভক্তি স্বরূপ লক্ষণ॥
অথ প্রেমভক্তি লক্ষণং।
কৃষ্ণে গাঢ় রতি হৈতে উপজে প্রেম-
ধন।
ভক্তিরস আস্বাদনে স্বরূপ লক্ষণ॥
প্রেমের প্রথম ভাব তটস্থ লক্ষণা।
ভাব পরিপূর্ণ হৈলে হয় ভক্তি প্রেমা॥
কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি শুদ্ধ সত্ব নাম।
শুদ্ধ সত্ব বিশেষাত্মা ভাব ভক্ত্যাখ্যান॥
সেই ভাব সান্দ্রাত্মা নিবিড়াত্মা হন।
স্বরূপ লক্ষণা এই প্রেম নাম কন॥
প্রেম রূপ মমতা সদাই কৃষ্ণ সাথে।
অন্য মমতা কভু নাহি দেখি তাথে॥
অহৈতুক মমতা কৃষ্ণেতে সদা যেই।
ভীষ্ম প্রভৃতি কহেন প্রেম ভক্তি সেই।
যথা—
সম্যঙ্মসৃনিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ
প্রেমা নিগদ্যতে।
পঞ্চরাত্রে যথা।
অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম
সঙ্গতা।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩২১।

ভারতীয় দর্শন।

(বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনবিভাগের সভাপতি
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ)

দর্শন শব্দের নিরুক্ত।

শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য স্বকৃত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' চার্ব্বাক দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ১৫টি দর্শনের পরিচয় দিয়া গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন :—

ইতঃ পরং সর্ব্বদর্শন-শিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতম্ ইত্যত্র উপেক্ষিতমিতি।

'শাঙ্কর দর্শন' সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ হইবে। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, মাধবাচার্য্য যে এস্থলে পারিভাষিক অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, ইহার মূল কোথায়?

আর্য্যজাতির আদিম গ্রন্থ বেদ। সংহিতাভাগের পদসূচীর সাহায্যে জানা যায় যে, কেবল একবার মাত্র ঋগ্‌বেদে 'দর্শন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদে দর্শন শব্দের আদৌ প্রয়োগ নাই।

পশুং ন নষ্টম্ ইব দর্শনায় বিষ্ণাপ্‌বং দদথু বিশ্বকায়ং।—ঋগ্‌বেদ, ১।১১৬।২৩।

এখানে "দর্শনায়" পদের অর্থ "দেখিবার নিমিত্ত"। বেদের সংহিতভাগে "দর্শন" শব্দের বহু স্থলে প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ—"দর্শনীয়"।

স দর্শত শ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে।—১০।৯১।২

ঋক্ সংহিতায় 'দর্শন' শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই ইহার মৌলিক অর্থ। এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

দর্শনায় চক্ষুঃ।—৮।১২

গর্ভ-উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিয়াছি :—

দর্শনাম্নী রূপাণাং করোতি। গর্ভ, ৫।

"দৃশ্যতে অনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে যদ্দারা দর্শন করা যায়, সেই চক্ষুকে 'দর্শন' বলা স্বাভাবিক। উপনিষদ্ বলেন ঃ—

মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ।—ছা, ৮।১২।৫

অর্থাৎ 'মন মানবের দৈবচক্ষু।' এই দৈব চক্ষুর দ্বারা যে দর্শন নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেও 'দর্শন' বলা অসঙ্গত নহে। চর্ম্মচক্ষু নয়ন যেমন ভ্রমপ্রমা উভয়ই 'দর্শন' করে, দৈব চক্ষু মনও সেইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি ও সম্যক্ দর্শন উভয়ই করিয়া থাকে। অতএব 'দর্শন' শব্দের এই অর্থসম্প্রসার অবৈধ নহে। পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই ভাবে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

বস্তুসাম্যেঽপি অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ় জ্ঞানং সম্যগ্ দর্শনাপেক্ষং তত এব সাধ্যস্থ্য জ্ঞানম্।

পালী ত্রিপিটকেও ঐ ভাবে সম্যক্ দর্শনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন ঃ—

যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানা শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্ দর্শনমেব বাধন্তে।—১।৪।২২ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

শঙ্করের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চশিখাচার্য্য সূত্র করিয়াছিলেন ঃ—

একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্।

এখানে 'দর্শন' শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। দর্শনশাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝায়, 'দার্শনিক' শব্দের সহিত যে অর্থ জড়িত, 'দর্শন' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ কোথা হইতে আসিল ?

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদে এরূপ পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সূত্রাকারে যে ষড়্দর্শন আমাদের দেশে এখন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্রে (যাহাকে 'বেদান্ত দর্শন' বলে) কয়েক বার 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ "Philosophy" নহে। তবে 'দর্শন' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ কোথা হইতে আসিল ?

মাধবাচার্য্য যখন "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" রচনা করেন, তখন 'দর্শন' শব্দ নিষ্কপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীমৎসায়ন দুগ্ধাব্ধি কৌস্তভেন মহৌজসা
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ॥

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত) 'দর্শন' শব্দের "Philosphy" অর্থ বিস্পষ্ট। ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার লোকায়তিক, আর্হত, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, প্রভাকর, ভট্ট, সাংখ্য, পতঞ্জলি, বেদব্যাস ও বেদান্ত—একাদশ পক্ষ বা দার্শনিক মতের পরিচয় দিয়াছেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরচিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময়ে "দর্শন" শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্য বেদান্তকে ঔপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদং ঔপনিষদং দর্শনম্ ইতি।—২।১।৩৭ ব্রহ্মসূত্রে শঙ্করাচার্য্য।

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

বেদান্তবাক্যানি * ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যক্‌দর্শন প্রতিপক্ষাভূতানি সাংখ্যাদি দর্শনানি নিরাকরণীয়ানি।

খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবি প্রতিমা নাটকে রাবণের মুখে এই কথা বলিয়াছেন :—

ভোঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্মি সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং মেধাতিথেঃ ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

এখানে আমরা মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র ও মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ পাইলাম—কিন্তু দর্শন শব্দের প্রয়োগ পাইলাম না। কৌটিল্য সম্ভবতঃ ভাসের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি প্রায় ২৩০০ বৎসরের লোক। কৌটিল্য চতুর্ব্বিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়া

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ * * চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ।

সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষিকী—আন্বীক্ষিকী ত্রিবিধ, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই ত্রিবিধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানেও দর্শন শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেল না। তথাপি আন্বীক্ষিকীর এই বিভাগ দেখিয়া, বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় ও বৈশেষিক সে সময়ে প্রচলিত ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না। কারণ, বেদান্ত ও মীমাংসা ত্রয়ীর অন্তর্গত এবং ন্যায় বৈশেষিক হয়ত কৌটিল্যের দৃষ্টিতে লোকায়তের অন্তর্ভুক্ত।

রামায়ণ বিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ—

অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব।—২।১০০।৬৮

এই তিন বিদ্যা—ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। কারণ আন্বীক্ষিকী রামায়ণের মতে বিদ্যার উচ্চ নামের অধিকারী নহে।

বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে।—২।১০০।৩৯

রামায়ণে দেখিতে পাই, রাম ভরতকে সতর্ক করিতেছেন ঃ—

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবসে।

অতএব লোকায়ত আলোচনার যোগ্য নহে। কিন্তু বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি ?

বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত! লোকোহয়ং সুখমেধতে।—অযোধ্যা।১০০।৪৭

যাত্রা দণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোণী সন্ধিবিগ্রহৌ।

কচ্চিদ্ এতান্ মহাপ্রাজ্ঞ! যথাবদ্ অনুমন্যসে॥—অযোধ্যা,, ১০০।৭০

ভাস কবি মহাভারতের আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কৌটিল্যও মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন।

এই মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, বেদ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ঃ—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন।
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥
পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।

—শান্তিপর্ব্ব—৩৪৯।৬৪—৬৮

অধিকন্তু দেখা যায় যে, মহাভারতকার 'দর্শন' শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ঃ—

এতদ্ আহু র্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনং।—শান্তিপর্ব্ব—৩০০।৫
যোগদর্শনমেতাবং উক্তং তে তত্ত্বতো ময়া
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান দর্শনম্।—ঐ ৩০৬।২৬

সাংখ্য দর্শনমেতাবদ্ উক্তং তে নৃপসত্তম।—ঐ ৩০৭।১

এই কয়েকটি শ্লোক শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত। মহাভারতের এই অংশের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ; সেই জন্য 'দর্শন' শব্দের এই প্রয়োগ দেখিয়া কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং আমরা 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপসন্ন শিষ্যকে নির্জ্জনে গুরু যে রহস্য উপদেশ দিতেন, তাহাকে প্রাচীনেরা উপনিষদ্ বলিতেন। ঐ সকল রহস্য উপদেশ (গুহ্য আদেশাঃ) সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের সাধারণ নাম ছিল উপনিষদ্। 'তদ্বন' 'তজ্জলান্' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। পরবর্ত্তী-কালে ঐ সমস্ত রহস্য উপদেশ যে-পুস্তকে গ্রথিত হইল, তাহার নাম হইল উপনিষদ্। "উপনিষদ্" শব্দের এই নিরুক্তে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত তমসাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে পথনির্ণয়ের জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অসঙ্গত নহে।

দর্শন সর্ব্বতোমুখ সত্যের এক মুখ দর্শন।

প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, সত্য সর্ব্বতোমুখ। সত্যের সার্ব্বভৌম ভাবের যে ভাবাংশ যে ঋষি অনুভূতি করিয়াছেন, সত্যের সর্ব্বতোমুখ স্বরূপের যে মুখ যাঁহার মানসদৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'। সত্য সূর্য্যের শুভ্র জ্যোতিঃ, তাহা সপ্তবর্ণের সমন্বয়ে গঠিত। যে বর্ণ যাহার চক্ষুতে যে পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিদ্যার যে বিপুল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, কোন এক খাতে তাহার সংকুলান হইতে পারে না। হিমালয়ের জলধারার ন্যায় তাহা নানা নদনদীর মধ্য দিয়া সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ইহারই জন্য প্রস্থান ভেদ; ইহারই জন্য দার্শনিক মতান্তর। শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের নমস্কার শ্লোকে যেন এই তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ—

বাদিভির্দর্শনৈঃ সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে যত্ত্বনেকধা।
বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মেদমেকরূপমুপাস্মহে॥

অর্থাৎ, "বেদান্ত-বেদ্য একরূপ যে ব্রহ্মকে বিবাদকারী দর্শনসমূহ অনেক-রূপ দেখে, তাঁহাকে উপাসনা করি।"

সত্যও একরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞানলব্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসমূহ সেই সত্যকে অনেক রূপে দর্শন করে। কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও যাহা দৃশ্য, যাহা সত্য, তাহা একই।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র যে সত্যের ঐকদেশিক সাক্ষাৎকার, দার্শনিকপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ—

তত্র * * শ্রুত্যবিরোধিনীরুপপত্তীঃ ষড়াধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ উপদিদেশ। নন্বু ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাম্ অপি এতেম্বর্থেষু ন্যায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাভ্যামস্য গতার্থত্বং সগুণনির্গুণত্বাদিবিরুদ্ধরূপৈরাত্ম-সাধকতয়া তদ্‌যুক্তিভিরত্র ত্যযুক্তীনাং বিরোধে নোভয়োরপি দুর্ঘটং চ প্রামাণ্য-মিতি। মৈবম্ ব্যবহারিকপারমার্থিকরূপবিষয়ভেদেন গতার্থত্ববিরোধয়োর ভাবাৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যানুবাদতো দেহাদিমাত্র বিবেকেনাত্মা প্রথম ভূমিকায়ামনুমাপিতঃ। একদা পরমসূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ। তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যাত্মতানিরসনেন ব্যবহারিকং তত্ত্বজ্ঞানং ভবত্যেব। * * তথা তদীয়মপি জ্ঞানমপরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং ভবত্যেবেতি। তৎজ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্য জ্ঞানমেব পারমার্থিকং পরবৈরাগ্য দ্বারা সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। * * ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামত্রাবিরোধো ভবতু। ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং তু বিরোধোহস্ত্যেব। তাভ্যাং নিত্যেশ্বর-সাধনাৎ। অত্র চেশ্বরস্য প্রতিষিধ্যমানত্বাৎ। * * অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যবহারিক স্যৈবেশ্বরপ্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদস্যৌচিত্যাৎ। যদি হি লোকায়তিক মতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্য্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দোষৈশ্বর্য্য-দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্য্যা-ণামাশয়ঃ। * * তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি। ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেহপি। * * কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বর এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধৃতঃ। তত্রাংশে তস্য বাধে শাস্ত্রস্যৈবা-প্রামাণ্যং। * * সাংখ্যশাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকৃতিপুরুষ বিবেকাবেব মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশ বাধেহপি নাপ্রামাণ্যং। * * তস্মাদভ্যুপ-গমবাদ প্রৌঢ়িবাদাদিনৈব সাংখ্যস্য ব্যবহারিকেশ্বরপ্রতিষেধপরতয়া ব্রহ্মমীমাংসা যোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ।

অর্থাৎ "এই সাংখ্যদর্শনে কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ বিবেক জ্ঞানের নিমিত্ত শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ যুক্তির উপদেশ করিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও যখন ঐ সকল যুক্তি সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের পুনর্বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন তাহাদিগের সহিত কপিলপ্রযুক্ত যুক্তির বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কারণ, ন্যায় বৈশেষিকের যুক্তি সগুণ-প্রতিপাদক, কপিলের যুক্তি নির্গুণপর। অতএব উভয় মত কখনই প্রামাণিক হইতে পারে না। এ আপত্তির উত্তর এই যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ভেদ লক্ষ্য করিলে কপিলসূত্রের পুনরুক্তি ও বিরোধ কিছুই থাকে না। প্রথমেই পরম সূক্ষ্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। এই হেতু ন্যায় বৈশেষিক সগুণ ব্যবহারিক আত্মার প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন ও সুখদুঃখের আশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব ন্যায় বৈশেষিকের জ্ঞান পারমার্থিক না হইলেও ব্যবহারিক তত্ত্বজ্ঞানরূপে সত্য। এবং তদ্দ্বারা অপর বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া, তাহা পরম্পরায় মোক্ষ-সাধন। তাহার তুলনায় সাংখ্যজ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান এবং পরবৈরাগ্য দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষসাধন। * * * আপত্তিকারী হয়ত বলিবেন, আচ্ছা, ন্যায় ও বৈশেষিকের সহিত না হয় সাংখ্য মতের অবিরোধ স্বীকার করিলাম কিন্তু বেদান্ত ও যোগের সহিত ইহার বিরোধ ত অপরিহার্য্য। কারণ, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু বেদান্ত ও যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। এ আপত্তির উত্তর এই যে, সংখ্যদর্শনে ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ ব্যবহৃত হইতেছে মাত্র। যদি সাংখ্যদর্শন লোকায়তিদিগের অনুকরণে নিত্য ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধ না করিতেন তাহা হইলে পরিপূর্ণ নিত্য নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারিত। ইহাই ঈশ্বরপ্রতিষেধে সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রায়। * * * বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরই আদ্যোপান্ত মুখ্য বিষয়। সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রই ত' অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। সাংখ্যশাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থ-সাধন প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই মুখ্য প্রতিপাদ্য। অতএব সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশের বাধ হইলেও সাংখ্যমতের অপ্রামাণ্য হয় না। * * অতএব অভ্যুপগমবাদ ও প্রৌঢ়িবাদ অঙ্গীকার করিয়া সাংখ্যদর্শন যে ঈশ্বরের ব্যবহারিক প্রতিষেধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত

ইহার বস্তুতঃ বিরোধ হয় নাই। কারণ বেদান্ত ও যোগ দর্শনে সেশ্বরবাদ পারমার্থিক, কিন্তু সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারিক মাত্র।

তাহাই যদি হয়, তবে দার্শনিকেরা বাদী বিবাদীয় আসন পরিত্যাগ করিয়া সত্যের মিলন-মন্দিরে সমবেত হইবেন না কেন? বস্তুতঃই সত্য সর্ব্বতোমুখ, সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা যায়। সকল বাদীরই একথা স্মরণ রাখা উচিত। এক্ষেত্রে যিনি স্বমতকে প্রবদন করেন যিনি নান্যদস্তি-বাদী— তিনি নিশ্চয়ই অবিপশ্চিৎ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।

প্রাচীন যুগে সমন্বয়ের চেষ্টা।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যেসকল প্রাচীন দর্শনসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা বাদ-বিবাদের পরিখা রচনা করিয়াছি, সেইসকল সূত্রগ্রন্থের মধ্যেও বহুস্থানে এই সমন্বয়ের ভাব বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইসকল সূত্র-গ্রন্থ বর্ত্তমান আকারে নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও এ দেশের দার্শনিক-সমাজে দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্যসকল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র (যাহার সহিত অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা আমার কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে) তাহার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমীপবর্ত্তী দার্শনিকদিগের শুধু মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাহাদিগের সমন্বয়ও করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে যেসকল বেদান্তাচার্য্যের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কাষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, বাদরি,—বাদরায়ণ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগের মতের উপন্যাস করিয়াছেন এবং কয়েক স্থলে তাঁহাদিগের বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন করিতেছি। ব্রহ্মসূত্রের পাঠক অবগত আছেন যে, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বাদরায়ণ মুক্ত জীবের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের বিচার করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট আছে:—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

"সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।"

বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন যে, ঐ শ্রুতিতে মুক্তির অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে :—

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১-২

"(মুক্ত) জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;— তাঁহার যে স্বরূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয়।"

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৪

"সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয়। অর্থাৎ জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না।"

'জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।' এই স্বরূপ কি প্রকার বাদরায়ণ অতঃপর তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৫-৬

স্বম্ অস্য রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে চৈতন্যমেবতু তস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাঽভিনিষ্পদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে।—শঙ্কর-ভাষ্য।

অর্থাৎ, 'আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হন। ব্রহ্ম নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প, সত্যকাম, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। মুক্তও সেইরূপ হন। ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন যে, চৈতন্য আত্মার স্বরূপ। অতএব মুক্তির স্বরূপ চিন্মাত্র হওয়া উচিত। * * অতএব মোক্ষে সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন।'

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন,—

এবমুপন্যাসাৎ পূর্ব্ব-ভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৭

'আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ' হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ—মুক্তের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।'

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয় ; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট হন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ * * তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। * * সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। * * সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

'তিনি স্বরাট্ হন; তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয়। তাঁহার সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন।'

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা সংকল্পমাত্রে উপনীত হয়।

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮

অতএব তিনি অনন্যাধিপতি (স্বরাট্) হন।

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কি না? বাদরি বলেন, থাকে না; জৈমিনি বলেন, থাকে। বাদরায়ণ উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন যে, শরীরের থাকা না-থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবং বাদরিরাহহ্যেবম্। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১০-১৪।

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেইসমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন:—

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা।

'তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।'

ইহা দিগ্দর্শন মাত্র। জীবের উৎক্রান্তি এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীতি এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও ব্রহ্মসূত্রে বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

কিন্তু বিরোধী মতবাদের সমন্বয়সাধনের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ ভগবদ্গীতা। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি,—

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটি বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে

চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ভগবান্ গীতা প্রচার করিয়া ঐসকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী পুণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিতপাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তিরূপ মার্গচতুষ্টয় অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব—শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বল ভাবে উপদেশ দেখা যায় না। অতএব, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ-বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান যথেষ্ট নহে, জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে এ মার্গচতুষ্টয়-কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক বিকাশমাত্র হইবে। সেইজন্য গীতা কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ধ্যানবাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সমন্বয়বাদের উপদেশ দিয়াছেন।"

কেবল সাধনাসম্বন্ধে নহে, দার্শনিক বাদবিবাদ সম্বন্ধেও গীতাতে এই সমন্বয়ের ভাব অত্যুজ্জ্বল। তাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, বিবর্ত্ত ও পরিণাম—সত্য দৃষ্টির মিলনভূমিতে সমন্বিত হইয়া গীতারূপ কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আমরা যদি এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনায়াসে জল্প বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্র পরিহার করিয়া সামঞ্জস্যের উর্দ্ধ চূড়ায় আরূঢ় হইতে পারিব।

বুদ্ধি ও বোধি।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নহে—বোধি। মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ কয়েকটি উপাদেয় কথা বলিয়াছেন—তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য :—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life: intellect in the opposite direction. * * Intellect is characterised

by a natural inability to know life. Instinct is sympathy and turned towards life."

এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া তাঁহার শিষ্য Wildon Carr বলিতেছেনঃ—

"What then is the intellect? It is to the mind what the eye or the ear is to the body. Just as in the course of evolution the body has become endowed with certain special sense-organs which enable it to receive the revelation of the reality without, and at the same time limit the extent and the form of that revelation, so the intellect is a special adaptation of the mind, which enables the being endowed with it to view the reality outside it, but which at the same time limits both the extent and character of the view the mind takes."

তবেই বুঝা গেল—বুদ্ধি তত্ত্ব-সাক্ষাতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেনঃ—

"Cease to identify your intellect and your Self. Become at least aware of the larger truer Self, that free creative self which constitutes your life as distinguished from the scrap of consciousness which is its servant. * * * Smothered in daily life by the fretful activities of our surface-mind, reality emerges in our great moments, and seeing ourselves in its radiance, we know, for good or evil, what we are. We are not pure intellects. * * Around our conceptional and logical thought, there remains a vague, nebulous somewhat, the substance at whose expense the luminous nucleus we call the intellect is formed."

—Underhill's Mysticism pp. 38-9.

অর্থাৎ বুদ্ধি সম্বিতের সর্ব্বস্ব নহে—একটি ভগ্নাংশ মাত্র। বোধি তাহার

উপরে। এই বোধিকে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণ দার্শনিক অয়কেন (Eucken) বলিয়াছেন :—

"There is definite, transcenedntal principle in man."

(ইহাই বোধি।) তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন—Gemuth.

"It is the core of personality. There God and man initially meet."

উপনিষদ্ যাহাকে 'গুহা,' 'হৃদয়,' 'দহর' আখ্যা দিয়াছেন—Gemuth কি তাহারই ছায়া ?

এই বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে বোধির বাণী শ্রুতিগোচর হয় না—সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছিলেন :—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্ত-চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

এই মর্ম্মে Jacob Boehme বলিয়াছেন:—

"When both the intellect and will are quiet and passive * * then the eternal hearing seeing and speaking will be revealed in thee."

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে দুইটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করে; এক বোধির যুগ, অপর বুদ্ধির যুগ। বোধির যুগে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় এবং বুদ্ধির যুগে তত্ত্বের বিচার হয়, সত্যের বিতণ্ডা হয়। বোধির যুগ ঋষির যুগ, বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকারের যুগ। এ সম্বন্ধে পাশ্চত্য পণ্ডিত, কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

'Civilisation, like everything else in the world, is subject to unceasing alternation, and two phases stand out clearly all through its history, ever replacing and succeeding each other. In the one, the positive phase, civilisation creates; in the other, the negative phase, it reproduces and copies. In the first phase it is in touch with rea-

lities which furnish the ever-flowing source of new invention and inspiration ; in the second, it has lost touch with the realities themselves and bases itself on *descriptions* of realities—on tradition, books, ancient authorities ; it copies, explains, comments and follows."—M. M. Van Menon in the Commonweal.

ভারতবর্ষে বোধির যুগ ঋষিদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলে তর্কযুগের আরম্ভ হইয়াছিল ; সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, নিবন্ধ, অনুবন্ধ ইত্যাদি এই যুগের কীর্ত্তি। বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বের যতদূর নিরাকরণ হইতে পারে, তৎপক্ষে ইঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। কাউএল সাহেব বলিতেন যে, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য মাস্তষ্ক বিঘূর্ণিত হয়—makes the European head dizzy। পাশ্চাত্য কেন, এরূপ প্রাচ্যও বিরল যিনি অবাধে এই সকল নিশিত বুদ্ধিভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মস্তিষ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

প্রাচীন দর্শনেও যে পরবাদ আছে, এ কথা অস্বীকার করি না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ইহারই যথেষ্ট উদাহরণ। পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্ঠিতন্ত্র (ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা যাহার আর্য্যাশ্লোক-নিবদ্ধ সংগ্রহ) সেই ষষ্ঠিতন্ত্রও পরবাদ বিবর্জ্জিত ছিল না। ইহাও স্বীকার করি যে,

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

কিন্তু তথাপি মনে হয়—বাদ ও বিতণ্ডা এক বস্তু নহে। আর মনে পড়ে ঃ— নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

এবং মনে পড়ে বাদরায়ণের সূত্র

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ঃ—

'লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায় ?'

শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যদি তৃতীয়ের পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর পঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি বীজগণিতের "n" পর্য্যন্ত, তাহা হইলে তর্ক কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়? আমাদের দেশে তর্কযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল।

কেহ দ্বিতীয় ধাতার ন্যায় "বেদান্ত-মার্ত্তণ্ড" রচনা করিয়া—"রবির পরিধি যেন ধাঁধিল নয়ন।" অমনি প্রতিপক্ষ সেই সূর্য্যের উপর প্রকাণ্ড এক মেঘ নিক্ষেপ করিলেন অর্থাৎ 'হেন কালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে'! অমনি বিপক্ষ পক্ষ প্রচণ্ড তর্ক-'প্রভঞ্জনের' অবতারণা করিলেন। মেঘে ও পবনে তুমুল যুদ্ধ বাধিল; বিমানচারী দেবগণ বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কোথাও বা আমাদের মানস-রসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রচুর 'খণ্ডন-খাদ্য' বিরচিত হইল, কিন্তু মণ্ডনের অভাবে তাহার শর্করা কর্করায় পরিণত হইল। কেহ আমাদের নাসারন্ধ্র পুলকিত করিবার আশয়ে 'বেদান্ত-পারিজাত' বিকশিত করিলেন; কিন্তু তাহা—

'অকাল কুসুমানীব ভয়ং সঞ্জনয়ন্তি নঃ।"

কেহ 'শতদূষণী' রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন। প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ 'শতদূষণী-খণ্ডন' প্রচার করিলেন। কিন্তু দূষণকর্ত্তা নির্ব্বাক হইবার লোক নহেন; কারণ মৌন মুনির অলঙ্কার, তার্কিকের নহে। এইরূপে খণ্ডন মণ্ডনের সন্ধান প্রতিসন্ধানে তর্কস্থল কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন প্রতিপক্ষ 'বেদান্ত—ডিণ্ডিম' নিনাদিত করিয়া বিবাদীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। অমনি বিবাদী রণমুখে অগ্রসর হইয়া বাদীর প্রশস্ত গণ্ডে বিপুল দার্শনিক 'চপেটাঘাত' করিয়া সংকুল যুদ্ধনীতি প্রদর্শন করিলেন। ফলে বিতণ্ডাক্ষেত্র 'ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধন-পিশুনং'এ পরিণত হইল এবং তার্কিকপুঙ্গবদিগের রক্তে রঞ্জিত হইয়া 'রন্তি-দেবস্য কীর্ত্তিং'কে পরাজিত করিল।

আমার ধারণা, যদি আমাদিগকে আর্য্য-সত্যের পুনরাবিষ্কার করিতে হয়, তবে আমাদের গৌতম বুদ্ধের ন্যায় আবার 'বোধি'দ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন হইতে হইবে; যদি আমরা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি, তবে শ্বেতকেতুর ন্যায় আমাদিগকে আবার ন্যগ্রোধ ফল আহরণ করিয়া গুরুর চরণতলে উপসন্ন হইতে হইবে এবং মৌনী হইয়া বলিতে হইবে:—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

কে বিতণ্ডারাজ্যের রাজদণ্ড দেখাইয়া আমাদিগকে প্রলোভিত করিবে, কিন্তু যিশুখৃষ্টের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে :—

Who reads
Incessantly and to his reading brings not
A spirit and judgment equal or superior,
(And what he brings what needs he elsewhere seek ?)
Uncertain and unsettled still remains,
Deep-versed in books and shallow in himself,
Crude or intoxicate, collecting toys
And trifles for choice matters, worth a sponge,
As children gathering pebbles on the shore.
—Paradise Regained, 4th book.

বোধ হয়, এখন দিন আসিয়াছে যখন বিতণ্ডা ছাড়িয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।—অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিতে হইবে। আবার আমাদিগকে বলিতে হইবে, "সত্য এক, তত্ত্ব এক, কেবল বাদীর দর্শনভেদে তাহা অনেক, তাহা ভিন্নরূপ।"

ভেদে অভেদ।

একটি উদাহরণ দিলে একথা একটু বিশদ হইতে পারে। সকলেই জানেন, এ দেশের দার্শনিক-সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ আছে। জীব কি অণু না বিভূ? জীব কি ব্রহ্মের অংশ না ছায়া? জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ইহা দর্শনের এক মূল সমস্যা। ইহার বিচার-বিতণ্ডায় এক মন্বন্তর অতিবাহিত করিতে পারা যায় এবং মৈনাককে লেখনী করতঃ সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করা যায়। তথাপি তর্কে ইহার মীমাংসা হয় না, কিন্তু ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিলে হয়।

যাহাকে বেদের মহাবাক্য বলে, সেই মহাবাক্যচতুষ্টয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশ দিয়াছেন। "তত্ত্বমসি", "সোহহং", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি"—চারিবেদের এই চারি মহাবাক্য ব্রহ্মের ও জীবের অভেদ উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু অন্যত্র আমরা শুনিয়াছি :—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।

—মুণ্ডক, ২।১।১

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃসর্ব্বে লোকাঃ। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি-ব্যুচ্চরন্তি।—বৃ, ২।১।২০।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন —গীতা

ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন —

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদিঃ—২।৩।৪৩

অথচ গীতা বলিতেছেন :—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।

অন্যত্র আবার উপনিষদ্ বলিতেছেন—

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু, ১২।

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে।' এই আভাস বা প্রতিবিম্ববাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—

আভাস এব চ।—২।৩।৫০ সূত্র।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :—

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ সূত্র।

অতএব আমরা উপনিষদে তিনটি বিরোধী মতের উপন্যাস দেখিতে পাইতেছি :—প্রথম জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, দ্বিতীয় জীব ব্রহ্মের অংশ বা স্ফুলিঙ্গ; তৃতীয়, জীব ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব। যে উপনিষদ বলিতেছেন, জীব বিভু,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা।

আকাশবদ্ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।

"এই আত্মা (জীব) মহান্ ও জন্মরহিত। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" তিনিই অন্যত্র বলিতেছেন :—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

অর্থাৎ 'কেশের অগ্রভাগের শতভাগের শতভাগ জীবের পরিমাণ।'

এই সকল বিরোধী শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া দার্শনিক-সমাজে

যে বহু বাদ-বিবাদ উত্থিত হইবে," ইহা বিচি নহে। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব নহে। এই সমন্বয়-ভূমি আমরা গীতাগ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। গীতা উপদেশ দিয়াছেন :—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

গীতা, ১৫।১৬—১৮

'লোকে দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষয় পুরুষ। আর-একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলে; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্য লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।'

এই ত্রিপুরুষ-তত্ত্বের সাহায্যে গীতা আমাদিগকে যে মীমাংসার ধামে উপনীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করা যাক।

উপরিধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিলাম যে, গীতার মতে পুরুষ তিন :—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা; অক্ষর পুরুষ=অধ্যাত্মা; এবং ক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা। উত্তম পুরুষকে শাস্ত্রে চিদাকাশ বলে; অক্ষর পুরুষ=চিন্মাত্র, যাহাকে কূটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ=চিদাভাস। চিদাকাশ সিন্ধু, চিন্মাত্র যেন বিন্দু ইহাই বিস্ফুলিঙ্গবাদ। এই ভাবে জীব ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু সিন্ধু ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। অংশ অংশী তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেইজন্য জীব ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে, "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি"। সেইজন্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে:—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি"। এই অধ্যাত্ম বা চিন্মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ। তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—ছান্দোগ্য ৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকরূপ এক গৃহ আছে; তথায় ক্ষুদ্র অন্তর-আকাশ বিরাজিত। তাঁহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা; তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।'

এই অন্তর-আকাশ কি? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম। বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ যে আত্মা, ইহা উপনিষদই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;—

এষ আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। ছ, ৮।১।৫

ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা তৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প।'

উপাধির সূক্ষ্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকে অণু বলা হয় ঃ—

অণুরেষ আত্মা।

ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ঃ—

অণোরণীয়ান্।

তিনি অণু হইতে অণু'। অথচ 'তিনি মহান অপেক্ষাও মহান্।'

মহতো মহীয়ান্।

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন। সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন ঃ—

যাবান্বা অয়মাকাশ স্তাবানেষোহন্ত হৃদয়কাশঃ। উভে অস্মিন্দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ, বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি। ছা, ৮।১।৩

"সেই অন্তর-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের ন্যায় বৃহৎ। তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ নক্ষত্র—যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।'

ব্রহ্ম যে আত্মারূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্যত্রও উপদেশ দিয়াছেন—

কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।— বৃহদারণ্যক।

'আত্মা কে?' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতি পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন।'

এই চিন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—গীতা, ১০।২০।

"ভগবান্ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত।"

যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে; সেই আভা সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাহিত) আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ।—ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৫০

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র। ৩।২।১৮।

অর্থাৎ—'জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব।'

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—"জল-চন্দ্রবৎ"। এই চিন্মাত্র ও চিদাভাস, এই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন:—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ॥

"দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ করে না, শুধু দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।"

এই চিন্মাত্র ও চিদাভাসের ভেদ লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন:—

অধিকন্তু ভেদ নির্দ্দেশাৎ।—২।১।২২ সূত্র।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ। ৩।৪।৮ সূত্র

'অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোঽসংসারী ঈশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারিধর্ম্ম-রহিতোঽপহত-পাপ্মত্বাদি বিশেষণঃ পরমাত্মা বেদ্যত্বেনাপদিশ্যতে বেদান্তেষু।

তথাহি তমধিকং শারীরাদ্‌ ঈশ্বরম্‌ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ।'—শঙ্কর-ভাষ্য।

'জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক। কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত, অপহতপাপ্‌মা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেদ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন।'

কিন্তু তথাপি দেহস্থ আত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। এই অর্থে গীতা বলিয়াছেন :—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্‌ পুরুষঃ পর॥—গীতা, ১৩।২২

'এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন, তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।'

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ সেইজন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ।' সেইজন্য চিদাভাস বা জীবাত্মার মুখে "সোঽহম্‌", "তত্ত্বমসি" বাক্য অতিশয় অশোভন হইলেও কূটস্থ বা চিন্মাত্রের পক্ষে এ উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ, যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, পুণ্ডরীকাধিষ্ঠিত, তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। সেইজন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।—২।৩।২৫।

দহর উত্তরেভ্যঃ।—১।৩।১৫।

প্রত্যেক লোকেরই এক একটা ব্যসন থাকে, যাহাকে আমরা এখন 'hobby' বলি। আমার ব্যসন 'গীতা'। এই ব্যসনারূঢ় হইলে কোন্‌ ধামে উপনীত হইব তাহার ঠিকানা নাই। অতএব এস্থানেই বল্‌গা সংযত করিয়া দুই চারিটা কাজের কথার অবতারণা করি।

দর্শনালোচনার প্রকার ও প্রণালী।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বঙ্গদেশে সম্প্রতি যেভাবে দর্শনালোচনা হইতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শনের আলোচনা-স্রোত বিশেষ মন্দীভূত হইয়াছে। বাসুদেব রঘুনাথ মথুরানাথ,

জগদীশ গদাধর মধুসূদন সরস্বতীর বংশধরগণ দর্শনের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার পল্লবগ্রাহিতায় সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। গভীরভাবে আন্তরিকভাবে কয়জন পণ্ডিত দর্শনধ্যানে নিমগ্ন আছেন? আমরা বিক্রমপুর ভট্টপল্লী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আবার 'বুনো' রামনাথের আবির্ভাব দেখিতে চাই।

অন্যপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনাও আশানুরূপ হইতেছে না। কদাচিৎ স্বাধীন চিন্তা ও সমীল গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রায় সর্ব্বত্রই চর্ব্বিতচর্ব্বণ ও বান্তনিষেবন। ইহার জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ আমাদিগের ঔদাসীন্য ও অকর্ম্মণ্যতা। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীরও যে কোন দোষ নাই একথা বলিতে পারি না। গাছের ডাল কাটিয়া উষর ভূমিতে প্রোথিত করিলে রাজকীয় জলসেক দ্বারায় কাহাকে সজীব মহীরূহে পরিণত করা দুর্ঘট। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রায় সেই দশাই হইয়াছে। "প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তলেখক স্বনামখ্যাত ভিনসেণ্ট স্মিথ মহোদয় এ সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্যঃ—

"The Indian Universities suffer from the want of root. They are more cuttings struck down in an uncongenial soil and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government."

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ভাবে দর্শনের পঠন পাঠন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও ভিনসেণ্ট স্মিথ মহোদয় কয়েকটি অমূল্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেনঃ—

"when an Indian student is bidden to study Philosphy he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant. The lectures and examinations in Philosophy for the students of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of

contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines."

"It is useless to ask an Indian University to reform itself, because it does not possess the power-some day, perhaps, the man in power will arise why is not hidebound by the University traditions of his youth of who will perceive that an Indian university deserving the name must devote itself to the development of Indian thought and learning and who will care enough for true higher education to establish a real University in India"

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন। যতদিন না সেই শুভদিনের উদয় হয়, ততদিন আমরা যেন সেই মহাপুরুষের ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রকে সুবীজ ধারণের উপযোগী করি।

পরিভাষা সংকলন।

দর্শনক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান কার্য্য দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের সম্ভারে বঙ্গীয় দর্শন-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, দার্শনিক পরিভাষার অভাবে তাহাদিগকেই কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। এসম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দার্শনিক সাহিত্য রচিত না হইলে দর্শনের পরিভাষা নিশ্চিত করা অসম্ভব। যতদিন না বাংলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সংকলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শনচর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক। তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেইসকল শব্দের মধ্যে যাহা যোগ্যতম তাহাই টিকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সংকলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে, সমবেত চেষ্টা এবং

যথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এদেশে বহু যুগ ধরিয়া শিক্ষিত-সমাজে নানা দার্শনিক আলোচনা প্রচলিত ছিল। মুদ্রা ব্যতীত যেমন বাণিজ্য নিষ্পন্ন হওয়া দুষ্কর, পরিভাষা সেইরূপ দর্শনচর্চ্চা অসম্ভব। অতএব এদেশের দার্শনিক সাহিত্য পরিভাষা-ভূয়িষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা। এই সম্পর্কে বিগত রাজসাহী সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে ইংরেজীযুগের সূত্র-পাতের প্রসঙ্গে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ইংরেজি-সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজি নবিস লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই, এবং এইসকল কষ্ট-কল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্য-কতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শন বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষা-লব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি।

ইহা অতি সত্য কথা। বাস্তবিকই সংস্কৃত ভাষা দর্শনপরিভাষা-সম্পদে সাতিশয় সমৃদ্ধ। অথচ আমরা সেই খনির রত্ন-রাজির সন্ধান না করিয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। জার্ম্মান দর্শন হইতে আমরা Subject Object, Noumenon Phenomenon শব্দের প্রয়োগ শিখিয়াছি। কিন্তু জর্ম্মান দর্শনের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে দ্রষ্টা দৃশ্য, বিষয় বিষয়ী, বিবর্ত্ত পরমার্থ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি বার্গসঁর আলোচনায় আমরা intellect ও intuitionএর প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধি ও বোধির প্রভেদ এদেশে সুপ্রাচীন। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগকে motor nerves ও sensory nervesএর ভেদের সূচনা করিতে হয়। কিন্তু আজ্ঞা নাড়ী ও সংজ্ঞা নাড়ীর প্রভেদ অবগত

থাকিলে এজন্য পরিভাষা গঠনের ব্যর্থশ্রম আবশ্যক হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা অবরোহণ-প্রণালীর ব্যাপ্তিগ্রহ সাধনের জন্য তিনটি শব্দের আশ্রয় লইতে বাধ্য হই—observation, experiment ও inference কিন্তু ইহাদিগের প্রতিশব্দ গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন কাল হইতে এদেশের দার্শনিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা ও অন্বীক্ষার সাহায্যে ব্যাপ্তি-গ্রহ করিতে আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ কত না শব্দসম্ভারে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সজ্জিত। বাংলার দর্শন-সাহিত্যের জন্য ঐসকল শব্দের আবিষ্কার অত্যাবশ্যক। এক সময় আমি এইরূপ শব্দসূচী সংকলনের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়া সে কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল। কারণ—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ। এইরূপ শব্দ-সূচী সংকলিত হইলে প্রাচীন শব্দের নবীন অপপ্রয়োগের পথে কতকটা কাঁটা পড়িবে। আমরা সহযোগী সাহিত্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, এদেশে কিছুদিন হইতে নাটকীয় 'প্রতিভার' উদ্ভব হইয়াছে। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, এযুগে বঙ্গদেশে বহু 'প্রতিভা'শালী লেখকের উদয় হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আমরা এসকল স্থলে প্রতিভা শব্দের অপ্রয়োগ করিতেছি। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বাৎসায়ন লিখিয়া-ছেন :—স্মৃত্যনু মানাগম সংশয় প্রতিভা স্বপ্ন জ্ঞানোথ সুখাদি প্রত্যক্ষম্ ইচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি। এখানে প্রতিভা শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ জ্ঞান বিশেষ। বাস্তবিক ইহাই প্রতিভা শব্দের প্রকৃত অর্থ। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আমরা পড়িয়াছি—তারকং স্বপ্রতিভোত্থম্ অনৌপদেশিকং (৩৫৪ সূত্রের ভাষ্য)। প্রশস্তপাদের 'পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে' এবং শ্রীধরের "ন্যায়-কন্দলীতে' এই প্রাতিভ জ্ঞানের ব্যাখ্যা আছে। তথাপি প্রতিভা শব্দের বর্ত্তমান প্রয়োগ বরং কতকটা মার্জ্জনীয়, কারণ দণ্ডীতে প্রয়োগ আছে—ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা। গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্। মহাভারতকার লিখিয়াছেন :—প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।

কিন্তু বাংলায় যে Scienceএর প্রতিশব্দ রূপে আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দ গ্রহণ করিয়াছি তাহার মার্জ্জনা নাই। ঐতরেয় উপনিষদে আমরা সংজ্ঞানং, আজ্ঞানং, বিজ্ঞানং, প্রজ্ঞানং, শুনিতে পাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ ভূয়ঃ। বিজ্ঞানেন বা ঋগ্ বেদং বিজানাতি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে শিখিয়াছি :—

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

বৌদ্ধ দর্শনে বিজ্ঞান স্কন্ধের উল্লেখ দেখিয়াছি এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী মাধ্যমিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের তর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্যাস ভাষ্যে পড়িয়াছি :—

নাস্ত্যর্থঃ বিজ্ঞান বিসহচরঃ।

এসকল প্রয়োগের সহিত Science অর্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগের কোনই যোগ নাই। কিন্তু 'প্রতিভা' এদেশে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে এবং Science অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' যেরূপ শিকড় গাড়িয়াছে তাহাতে এই দুই শব্দের অপপ্রয়োগ নিষেধ করা অসম্ভব।

দার্শনিক শব্দসূচীর সঙ্গে সূত্রাকারে গ্রথিত প্রাচীন মূল দর্শনসমূহে প্রযুক্ত শব্দসকলেরও সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রদর্শন করা বোধ হয় অনাবশ্যক, তথাপি ব্রহ্মসূত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই অবগত আছেন যে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের অর্থাৎ প্রধানতঃ উপনিষদের বিরোধাদি মীমাংসার জন্য রচিত। এই সকল সূত্রের ভিত্তি অধিকাংশ স্থলে উপনিষদ্বাক্য। কোন্ সূত্র কোন্ উপনিষদ্-বচনকে লক্ষ্য করিতেছে, সে সম্বন্ধে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সূত্রকে বিবাদী ভাষ্যকারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে যাঁহার দিকে টানিয়াছেন। অথচ অনেক সূত্রে বাদরায়ণ উপনিষদের ব্যবহৃত শব্দ অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন।

অপীতি অন্ন আরম্ভণ ঈক্ষতি সেতু সন্ধ্যা প্রভৃতি ঐরূপ শব্দ। উপনিষদ্-বাক্যকোষ হইতে আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কোথায় ঐ সকল অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহা হইতে কোন্ সূত্রের সম্বন্ধি কোন্ উপনিষদ্বচন, তাহা নির্ব্বাচন করা সহজ হয়। যখন আমরা "তদ্ অনন্যত্বম্ আরম্ভনশব্দাদিভ্যঃ" এই ব্রহ্মসূত্রের আবৃত্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে "বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"—এই ছান্দোগ্য-শ্রুতির স্মরণ হয়।

যখন "ঈক্ষতে নাশব্দম্"—এই সূত্র পাঠ করি, তখন "সোঽকাময়ত একোঽহং বহুস্যাম্" এই শ্রুতিবাক্য স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। এইরূপ অন্যান্য সূত্রেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ-রচনা।

কিন্তু পরিভাষা রচনা ও শব্দ-সূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ও পালির প্রধান প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ প্রায়ই ইংরেজীতে অনুদিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, জর্ম্মান ভাষায় আরও সমধিক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সাধিত হইয়াছে। এ দেশ হইতে যদি না লজ্জা কাদম্বরীর ভাষায় 'লজ্জিতৈব পলায়িতা' হইয়া থাকে, তবে ইহাতে আমাদের নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করা উচিত। সুখের বিষয়, আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, দরিদ্র বঙ্গভাষায় সংস্কৃত দর্শনের গুরু গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করাই অসম্ভব। কিন্তু স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত শশিভূষণ তর্কবাগীশ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পঞ্চানন তর্করত্ন, হরিহরানন্দ আরণ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভাষ্যসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পন্থা সুগম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ইহাদিগের চেষ্টায় ভাষা-পরিচ্ছেদ এবং বেদান্ত-পরিভাষা নামক দুইখানি কঠোর সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকের আয়ত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর বিরাট গীতাগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের উপনিষদের উপদেশ এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কভূষণের উপনিষদাদিও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আদিম কৃতকর্ম্মা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সভাষ্য উপনিষদ সাংখ্যদর্শন পাতঞ্জল-দর্শন পঞ্চদশী বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রদ্বারা বঙ্গীয় পাঠকের জন্য অপাবৃত করিয়াছিলেন।

পরন্তু কেবল সংস্কৃত ও পালি হইতে দার্শনিক গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট

হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল প্রসিদ্ধ দর্শনগ্রন্থ আছে তাহার দ্বারাও আমাদের দার্শনিক-সম্ভার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিক, লাইবনিট্‌স্, ক্যাণ্ট; ফিক্‌টে, হেগেল প্রভৃতি জর্ম্মান দার্শনিক, বার্গসঁ প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিক; হ্যামিলটন্ স্পেনসার প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিক প্রত্যেকেরই প্রধান প্রধান গ্রন্থের সহিত বাংলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয়ের সুযোগ হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে ইংরেজী-সাহিত্য আমাদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। শুনিয়াছি ইংরেজী-সাহিত্যের অনুবাদ-শাখা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, সেরূপ য়ুরোপীয় কোন সাহিত্যই নহে। অথচ ইংরেজীতে মৌলিক সদ্‌গ্রন্থ আদৌ বিরল নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামীয় দর্শন-সাহিত্য বঙ্গভাষায় অনূদিত হওয়া আবশ্যক। ইস্‌লাম আমাদিগের অতি নিকট প্রতিবেশী; অথচ তাহার দার্শনিক গ্রন্থের সহিত আমাদিগের একেবারেই পরিচয় নাই; অভিজ্ঞ মৌলভী দ্বারা ইস্‌লামের দর্শনভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ভাষার সৌষ্ঠবসাধনের জন্য অনুবাদ পর্য্যাপ্ত নহে। যদি বাংলা সাহিত্যের দার্শনিক শাখাকে সজীব ও সৌষ্ঠবময় করিতে হয়, তবে তাহা মৌলিক গ্রন্থ ভিন্ন হইবে না। এ পর্য্যন্ত বাংলায় কয়খানা মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে? মৌলিক দার্শনিক চিন্তার কথা বলিতেছি না। তাহা উড়ুম্বর-পুষ্পের ন্যায় শতাব্দে একেবারে অধিক প্রস্ফুটিত হয় না। মৌলিক-চিন্তা-চর্চ্চিত দর্শন-কুসুম যদি বাংলার কোন তরুশাখে বিকসিত হয়, তবে তাহার সৌরভে নিশ্চয়ই সমগ্র দেশ আমোদিত হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রথমতঃ দর্শন-চর্চ্চাকে আমাদের দেশে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তজ্জন্য সহজ ভাষায় ও সরল প্রণালীতে দার্শনিক নিবন্ধ-গ্রন্থসকল রচিত হওয়া আবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আমি সাহিত্যসম্মিলনকে আহ্বান করিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষায় নানা প্রকারের philosophical series প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমি বঙ্গভাষায় ঐ ধরণের শ্রেণী-গ্রন্থ-রচনা দেখিতে চাই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান দার্শনিকের দার্শনিক মতের পরিচায়ক নিবন্ধ রচিত হউক। সঙ্গে সঙ্গে সোয়েগলার, ইউবারওয়েগ প্রভৃতির History of Philosophyর ধরণে দার্শনিক মত-

বাদের ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচনা করিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং ভারতীয় ও য়ুরোপীয় Logic, Ethics ও psychologyর সারসংকলন ও সমন্বয় করিয়া এক এক খানি উৎকৃষ্ট তর্কবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্‌যোগ করা হউক।

দর্শন-অনুসন্ধান।

কয়েক বৎসর হইতে এ দেশে ইতিহাস-ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে মৌলিক অনুসন্ধান (original research) আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বিজ্ঞানক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিহাস-ক্ষেত্রে বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি সমিতির এবং স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের সমবেত ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইতিহাসে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু দর্শন-ক্ষেত্রে প্রকৃত research এখন পর্য্যন্ত অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও আলোচনার ফল আমরা এতদিনে আস্বাদন করিতে পাইব, এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল তাঁহারি হস্তে হলচালনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সংস্কৃত দর্শন ক্ষেত্রে এখনও বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের অবসর আছে। আমাদের যে প্রচলিত ষড়দর্শন ইহার অতিরিক্ত কোনও দর্শনশাস্ত্র এদেশে ছিল কি না? অবশ্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" হইতে আমরা কয়েকটি দার্শনিক মতের পরিচয় পাই। কিন্তু ঐ সকল মতের আদি গ্রন্থ কোথায়? বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে দেখা যায় যে, তিনি নানাবিধ দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল মতের ভিত্তিভূমি কি? বাস্তবিক বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে এদেশে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্পই আলোচনা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কে কে সহচর হইবেন? এ সম্বন্ধেও আমাদিগকে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। কতদিন আর আমরা পরপ্রত্যাশী থাকিব?

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামের সহিত সংযুক্ত "সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ" হইতে আমরা জানিতে পারি:—

চতুর্দ্দশস্তু বিদ্যাসু মীমাংসৈব গরীয়সী।

বিংশত্যধ্যায়যুক্তা সা প্রতিপাদ্যার্থতো দ্বিধা
কর্ম্মার্থা পূর্ব্বমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায় বিস্তৃতা ॥
অস্যাং সূত্রং জৈমিনীয়ং শাবরং ভাষ্যমস্য তু
ভবত্যুত্তরমীমাংসা ত্বষ্টাধ্যায়ী দ্বিধা চ সা।
দেবতাজ্ঞানকাণ্ডাভ্যাং ব্যাসসূত্রং দ্বয়োস্সমম্ ॥
পূর্ব্বাধ্যায়চতুষ্কেণ মন্ত্রবাচ্যাত্র দেবতা।
সংকর্ষেণোদিতা তদ্ধি দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভেদে মীমাংসাদর্শন দ্বিবিধ এবং বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক ১২ অধ্যায়-বিস্তৃত পূর্ব্বমীমাংসা—জৈমিনি ইহার সূত্রকার এবং শবর ভাষ্যকার! অন্যপক্ষে উত্তরমীমাংসা অষ্টাধ্যায়ী। উত্তর-মীমাংসার দুই ভাগ। দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উভয় কাণ্ডেরই সূত্রকার ব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মন্ত্রোল্লিখিত দেবতার মীমাংসায় নিয়োজিত। অপর চারি অধ্যায় আমাদিগের সুপরিচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন। কিন্তু উত্তরমীমাংসার পূর্ব্বার্দ্ধ, যাহাকে দেবতাকাণ্ড বলা হইল, তাহা কোথায়? ঐ দেবতাকাণ্ডের নাকি ভগবৎপাদ-নির্ম্মিত ভাষ্য ছিল। ভাষ্যং চতুর্ভিরধ্যায়ৈ ভগবদ্‌পাদনির্ম্মিতম্। সে ভাষ্য কোথায় গেল? ইহার সাবশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল দৈবীমীমাংসা বলিয়া এক সূত্রাকার দর্শনগ্রন্থের সন্ধান পাইয়া 'বিদ্যারত্নাকর' মাসিকপত্রে তাহার রসপাদ উৎপত্তিপাদ ও স্থিতিপাদ—এ তিন পাদ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল যে, এই দৈবী-মীমাংসাই সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহোল্লিখিত দেবতাকাণ্ড। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে সে বিশ্বাস স্থায়ী হইল না। দৈবী মীমাংসার আরম্ভ সূত্র এই—অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা। দৈবীমীমাংসার আর কয়েকটি সূত্র এইরূপ—

রসরূপঃ পরমাত্মা, জড়রূপা মায়া—। সৃষ্টেরতীতো বুদ্ধেশ্চপরঃ স ভক্তিলভ্যঃ। বৈধী রাগাত্মিকা "নাম ভিন্না সাধনলভ্যা গৌণী। তদ্ বিস্মরণাদেব ব্যাকুলতাপ্তৌ ইতি নারদঃ। মহাত্মাজ্ঞানম্ অপেক্ষ্যং। ভদভাবে জারবৎ।

এই সকল ও অন্যান্য সূত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ধারণা হয় যে এ দৈবী-মীমাংসা নারদ-ভক্তি-সূত্রের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ; ইহা প্রাচীন দেবতাকাণ্ড নহে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা দার্শনিকের সুপরিচিত গ্রন্থ। শুনিয়াছি খৃষ্টীয়

ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই গ্রন্থের চীন ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্টিতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার।

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থা কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতা পরবাদ বিবর্জ্জিতাশ্চাপি।—৭২

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য নামে যে ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহার কয়েক স্থলে ষষ্টিতন্ত্রের সূত্র বা বচন উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ষষ্টিতন্ত্র কোথায় কোন্ গ্রন্থাগারে হয়ত এখনও কীটদষ্ট হইতেছে। কে ইহার উদ্ধারসাধন করিবে? বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য শাস্ত্রকে কালার্ক-ভক্ষিত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রচলিত ষড়াধ্যায়ী—যাহাকে আমরা সাংখ্যসূত্র বলিয়া জ্ঞাত আছি, তাহা যে কপিলের মূল সূত্র নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের পরবাদ-প্রসঙ্গে সাংখ্য এবং অন্যান্য দার্শণিক মতের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে শঙ্কর যেরূপ কণাদ-সূত্র, ন্যায়-সূত্র, জৈমিনি-সূত্র এবং যোগসূত্র হইতে সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সেরূপ সাংখ্য-সূত্র হইতে কোন সূত্র উদ্ধার করেন নাই। তাহা না করিয়া তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? শঙ্করাচার্য্যের সময়ে কি সাংখ্যসূত্র প্রচলিত ছিল না? সাংখ্যসূত্রের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বসমাসের কি সম্বন্ধ? কেহ কেহ ইহাকেই কপিলপ্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন:—

নন্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্য সূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায়াঃপৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ। নৈবম্। সংক্ষেপ বিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ।

তত্ত্বসমাসই কি প্রাচীন সাংখ্যসূত্র? তত্ত্বসমাসকে দর্শনের সূচীপত্র বলাই সঙ্গত। তত্ত্বসমাসের কয়েকটি সূত্র এইরূপ:—

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ষোড়শ বিকারাঃ।
পুরুষঃ। ত্রৈগুণ্যং।
সঞ্চরঃ। প্রতিসঞ্চরঃ।

সাংখ্য-মত যে অতি সুপ্রাচীন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে পরবাদ অধ্যায় ভিন্ন অন্যত্রও সাংখ্য-মত নিরাসের প্রযত্ন দৃষ্ট হয়।

এই প্রাচীন সাংখ্য-মত কি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? সাংখ্যসূত্র ও যোগসূত্র এখন আমরা যে আকারে দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটি

সূত্রে অবিকল একরূপ। এক্ষেত্রে কে কাহার সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ষড়্‌দর্শন এখন আমরা যে আকারে পাইতেছি, ইহাই কি তাহাদিগের আদিমরূপ অথবা পরবর্ত্তী সংস্করণ? ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনিসূত্র উদ্ধৃত দেখা যায়। আবার পূর্ব্বমীমাংসায় ব্রহ্মসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে বৈশেষিক দর্শনের প্রতি কটাক্ষ আছে। ইহা হইতে এবং সাধারণতঃ পরবাদ হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীন সূত্রকারদিগের সংক্ষিপ্ত সূত্রগ্রন্থ তাঁহাদিগের শিষ্য অনুশিষ্যদিগের দ্বারা বর্দ্ধিতাকার লাভ করিয়াছে। ষড়্‌দর্শনের আদিম রূপ কি ছিল? ইহার অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুধু সূত্র নহে, ভাষ্য সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান বাকী রহিয়াছে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যকেই অদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক মনে করেন, কিন্তু তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার শারীরকভাষ্যে আত্মমত সমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি আর-একজন বৃত্তিকারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষই কি বৃত্তিকার? এই উপবর্ষ কে এবং তাঁহার গ্রন্থ কোথায় গেল? বিশিষ্টাদ্বৈতার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষ্য প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নের ভাষ্যের অনুসরণ মাত্র। এই বোধায়ন কতদিনের লোক এবং তাঁহার সে ভাষ্য গ্রন্থ কোথায়? রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে বলিয়াছেনঃ—

যথে নিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্ত্যৈকলভ্য এব ভগবদ্ বোধায়ন টঙ্ক দ্রমিড় গুহদেব কপর্দ্দি ভারুচি প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * শ্রুতিনিকরনিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।

এই টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতির গ্রন্থসকল কি কি এবং কোথায় পাওয়া যাইবে? শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী তাঁহার শ্রীভাষ্যের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"There is evidence to show that it (the Visistadwaita School) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times."

একথা যদি সত্য হয়, তবে ঐসকল প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার না হইলে আমরা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রাচীনতা কিরূপে সপ্রমাণ করিব?

এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা যায়। আমি দিক্‌প্রদর্শন করিলাম মাত্র। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, দর্শনক্ষেত্রেও আমাদের কত অনুসন্ধান, কত গবেষণা, কত লুপ্তোদ্ধার অবশিষ্ট আছে।

এই সকল গুরুতর অথচ অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ সম্মিলন কেবল উৎসবক্ষেত্র নহে, ইহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আসুন কর্ম্মের সফলতায় মণ্ডিত করিয়া আমরা এই সম্মিলনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করি। *

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

একাবলী (৫)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাতালপুরী—সখী-সম্ভাষণ।

সুবর্ণ-পাত্র-প্রদত্ত পানভোজনবিশিষ্ট রমণীয় সুবর্ণ পিঞ্জর যেমন তন্মধ্যস্থিত পক্ষীর তৃপ্তিদায়ক হয় না, তথাপি তাহার উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর ভোক্ষ্যভোজ্যাদি স্বাভাবিক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকেতু দৈত্যের পাতালপুরীস্থিত অম্বরথশোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণী একাবলীর প্রীতিদায়িকা হইল না বটে, কিন্তু তিনি দৈত্যপতির উৎকৃষ্ট সূপকার-রচিত উপাদেয় ভোক্ষ্যভোজ্যাদি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি-নিযুক্তা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা দাসদাসীসেবিতা হইয়াও তিনি সুখানুভব করিলেন না। বনজাত হরিদ্বর্ণপত্রশোভিত মহীরুহরাজিও সুস্নিগ্ধ বায়ু-হিল্লোল যেমন পক্ষির নয়নমনোরঞ্জন করে তদ্রূপ রত্ন্যরাজপুরী প্রিয়সখীসহবাস এবং প্রসন্নপদ্মমণ্ডিতা ও নির্ম্মলসলিলা নদীতে স্নান রাজকুমারী একাবলীর মনোরঞ্জন করিত। তিনি এক্ষণে সর্ব্বদাই বিষাদ-জড়িত। দৈত্য-দাসীগণের সন্নিধি তাঁহার বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তাহাদিগের বচন তাঁহার কর্ণের পীড়াদায়ক হইল। প্রণয়প্রপীড়িতা বালিকা প্রণয়ীদর্শনলালসায় নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র যে দৈত্যপতি কর্তৃক হৃতা ও বন্দীভাবে

---

* বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

রক্ষিতা হইয়াছেন এই চিন্তাই অবলা ললনার হৃদয়ে বিষজ্বালা প্রসার করিতেছিল, তদুপরি স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনক জননীর চিন্তা, তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের আদর-মাখা আশ্বাস-বাণী তাহাকে ক্রমশঃ বিবশা করিয়া ফেলিল। প্রাণপ্রিয়তমা সখী যশোবতী তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছে এই আশ্বাসেই তিনি এখনও জীবনধারণ করিতেছেন। যশোবতীও একাবলীর প্রতি একান্ত অনুরাগিনী ছিলেন। এই অনুরাগ বশতঃই তিনি স্বীয় কষ্ট ও তাঁহার অভাবে তদীয় জনক জননীর দুঃখকে হৃদয়ে স্থানদান না করিয়াই পাতালপুরীতে একাবলীর অনুসারিণী হইয়াছেন। সখীর অদৃষ্টে যাহা আছে আমার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে এই ভাবিয়া অকৃত্রিমপ্রণয়া যশোবতী একাবলীর উত্তালতরঙ্গমালা সমাকীর্ণ ঘূর্ণ্যমান জীবনপ্রবাহে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন।

পাতলপুরীর সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে দ্বিরদরদনির্ম্মিত পালঙ্কে একাবলী ও যশোবতী উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছেন।

একা। সখি! কোথায় আসিলাম? আরও কি ভাগ্যে আছে বলা যায় না।

যশো। সখি আমি ত তাহাই বলিয়া থাকি, মনুষ্যের ভাগ্যে কখন কি হয় নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। কোথায় তুমি রত্ন্যরাজ কন্যা, রত্ন্যরাজপুরীতে থাকিয়াও তুর্ব্বসুপুত্র একবীরের জন্য লালায়িত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলে আর এক্ষণে সে সমুদায় বিস্মৃত হইয়া এই ভীষণ কালকেতু দৈত্যের পাতালপুরীতে বন্দীভাবে আবদ্ধ।

একা। তুমি না বুঝিয়াই আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ। আমি যাহার বিরহানলবিদগ্ধা হইয়া জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম এক্ষণে আবার তাঁহারই প্রত্যাশায় জীবনধারণ করিতেছি।

যশো। এ কথা কি প্রকারে সম্ভবে? তখন তুমি তোমার জনক জননীর নিকট ছিলে আর সেই জনক জননী তোমাকে তোমারই হৃদয়-দেবতা একবীরের করে সমর্পণ করিবার উদ্যোগী ছিলেন, তথাপি তুমি বিরহপীড়িত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলে, আর এখন ত তাঁহাকে প্রাপ্তির আশা একান্ত নির্ম্মূল হইল তথাপি তুমি তাঁহার প্রত্যাশা করিতেছ? তুমি কি শঠতা অবলম্বন করিবে?

একা। কি শঠতা? ইহার মধ্যে আবার শঠতা কোথায় পাইলে?

যশো। কেন? কালকেতুর গলদেশে মাল্যদানে প্রতিশ্রুত হইলে সে ত তোমাকে পিতৃগৃহে দিয়া আসিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তুমি কি অবশেষে সেই উপায় অবলম্বন করিবে স্থির করিয়াছ?

একা। বিপদে পতিত হইয়া কি তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? আমার কি শঠতা করা উচিত? ওরূপ প্রতিশ্রুত হইলে পিতাকে ত বিপদ-সাগরে নিমগ্ন করা হয়। উহা কি আমা দ্বারা সম্ভবে? আমার জীবন বহির্গত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ তথাপি পিতৃদেবের কোনরূপ অনিষ্ট আমা দ্বারা সম্ভবে না।

যশো। তবে আবার তোমার আশা কি?

একা। কালকেতুর গলে মাল্যদান করিলে কিম্বা তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে সে আমাকে মুক্তিপূর্ব্বক পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিবে ইহাই শ্রবণ করিয়াছ, আর একটি কথা বলিয়াছিল তাহা বুঝি শ্রবণ কর নাই? কাল-কেতুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি আমার আশার উদ্রেক হইয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে এত দিনে আমার কঙ্কাল পর্য্যন্তও দর্শন করিতে পাইতে না।

যশো। না ভাই, আমি তা শ্রবণ করি নাই। আমি তখন দুর্ব্বৃত্ত অসুরের অনুসরণ করিয়া শ্বাসরুদ্ধপ্রায় হইয়াছিলাম সুতরাং তাহার সমস্ত কথায় আমার মনোনিবেশ হয় নাই।

একা। ভাই, তোমারই কথার উত্তরে কালকেতু বলিয়াছিল "সুরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নরের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এমন কেহই নাই। তবে যিনি মনুষ্যরূপে ঘোটকীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন এমন মহাত্মাই আমার বিনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন।" ভাই, কথাটী শুনিয়া অবধি আমার মনে আশাদীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।"

যশো। তোমার আশানুরূপ ফল ফলিবারও সম্ভাবনা নাই। এমন লোকও জন্মগ্রহণ করিবে না, তুমিও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে না।

একা। সে কি প্রিয়সখি! তুমি কি এতদিন শ্রবণ কর নাই যে একবার ঘোটকীরূপিনী লক্ষ্মী-দেবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

যশো। না ভাই, আমি তাহা পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করি নাই। সে যাহা হউক তোমার কথা সত্য হইলেও তোমার উদ্ধারের উপায় কি? তুমি যে এই অতি দুর্গম পাতালপুরীতে আনীত হইয়াছ তাহা তাঁহারা কি প্রকারে সংবাদ পাইবেন?

একাবলীর সমস্ত আশা সখীকর্ত্তৃক অফলপ্রদা বলিয়া নির্ণীত হইলে রাজকুমারী নিরাশ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং "বিপত্তৌ মধুসূদনঃ" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন।

সখী একাবলীকে মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিতে শ্রবণ করিয়া যশোবতীর স্মরণ হইল তাহার পিতা সর্ব্বদাই সাধু সন্ন্যাসীগণ পরিবৃত থাকেন। সন্ন্যাসীগণ তাঁহার পিতাকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন যে বীজমন্ত্র জপ করিয়া মাতা জগদম্বাকে একমনে ডাকিলে মা কখনই তাঁহার উপর পরাঙ্মুখ হইবেন না। তিনিও পিতৃদেবসহ এই সাধুগণসকাশে ভগবতীর বীজমন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্যক্ বিপদে পতিত হইয়া মা জগদম্বাকে একাগ্রচিত্তে ডাকিবার জন্য তাঁহার বাসনা হইল। এ কারণ তিনি সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখি! আমি পিতৃদেবের সহিত সাধুগণ সকাশে মাতা ভগবতীর বীজমন্ত্র ও তাহার জপ-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলাম। তোমাকে মধুসূদন নাম গ্রহণ করিতে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ সেই আদিকারণা জগদম্বার প্রতি ধাবিত হইয়াছে। আমি সেই বিপদহারিণী মাতার শরণাগত হই, দেখি তিনি প্রসন্না হন কি না?" সখী একাবলীও তাঁহাকে সেই উপায় অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতেছেন, ইত্যবকাশে পরিচারিকা মুখে শ্রবণ করিলেন দৈত্যরাজ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। যশোবতীও শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিজ প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন, এদিকে দৈত্যরাজ একাবলীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে আগমনপূর্ব্বক একাবলী-নিষণ্ণ খট্টাঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "কি সুন্দরি! তোমার সখী কোথায়?" রাজকুমারীকে উত্তরদানে বিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমারি! আমি তোমার প্রেমাধীন, আমি যে দিবস তোমাকে পদ্মবনে কেলি করিতে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই দিবসই আমি তোমাকে পদ্মলক্ষ্মী বলিয়া জানিয়াছি। তুমি আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার তৃষার্ত্ত প্রাণকে সজীব কর।"

দৈত্যেশ্বর কালকেতুর এতাদৃশ স্পর্দ্ধাসূচক প্রণয়সম্ভাষণ শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া একাবলী কহিলেন "আমি আপনার প্রণয়সম্ভাষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহি। মদীয় পিতা রভ্যরাজ আমাকে তুর্ব্বসুপুত্র একবীরের সহিত পরিণয়দানে প্রতিশ্রুত আছেন এবং আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিনী। সুতরাং আপনার এ আশা দুরাশামাত্র, পর-স্ত্রী-গ্রহণ মহাপাপ জানিয়া আমাকে পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দিন।"

রাজকুমারী একাবলীর ক্রোধোদিতা বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া অণুমাত্রও ভীত না হইয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত দৈত্যপতি তাহাকে উত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, "রাজকুমারি! তোমার এ কথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? আমি তোমাকে আনয়নের জন্য যে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করিলাম, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি যদি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হও অথবা তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও তাহা হইলেও আমি তোমাকে পিতৃগৃহে রক্ষা করিয়া আসিতে পারি।" তচ্ছ্রবণে একাবলী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "দৈত্যেশ্বর! আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনা নহে, সততই পরাধীনা, আমি কুমারী, সুতরাং পিতৃদেবের আজ্ঞাধীনা পিতৃদেব পূর্ব্বেই আমাকে হৈহয় নামক রাজকুমারকে দান করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন আমি এক্ষণে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব?

কামমোহিত দৈত্যরাজ কালকেতু একাবলীকথিত বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিল না। সে যে স্থানে উপবিষ্ট ছিল, তথা হইতে অগ্রসর হইয়া একাবলীর অধিকতর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রসারিত হস্তে রাজকুমারীর হস্তধারণোদ্যত হইয়া কহিল; "দেখ প্রিয়তমে! আমি পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি যে আমি অকারণে রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক নহি। তোমার পিতা বল, একবীর বল, কেহই যুদ্ধার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ নহে, আমি অজর অমর।

প্রসারিত-হস্ত দৈত্যপতিকে রাজকুমারীর করকমলধারণোদ্যত দেখিয়া একাবলী পশ্চাৎ অপসরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমাকে কদাপি স্পর্শ করিও না! স্পৃষ্ট হইবামাত্র জানিবে আমি এ কলঙ্কিত দেহ আর রাখিব না।"

রাজকুমারীর এতাদৃশ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণকাল পূর্ণশশধরতুল্য একাবলীর মুখকমল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গর্ব্বিত-স্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি কি তোমার সহিত বাচালতা করিলাম? দেবতারা কখন পূর্ণবর দান করেন না। পূর্ণবর প্রাপ্ত হইলে ত আমি অমর হইতাম, কিছুতেই আমার মৃত্যু ঘটিত না। দেবী আমাকে বরদান পূর্ব্বক, এক অসম্ভাবিত উপায়ে আমার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

ঘোটকীগর্ভজাত মনুষ্যই আমার বিনাশ সাধনে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরি! এ কথা কি কখন সম্ভবে যে ঘোটকীর গর্ভে মনুষ্য উৎপন্ন হয়? সে যাহা হউক আমি তোমাকে বিবেচনা করিবার জন্য দুই দিবস সময় দিলাম। এই দুই দিবসান্তে তৃতীয় দিবসে আমি তোমার সংকল্পিত অবগত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।"

কালকেতু একাবলীর প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গমন করিলে যশোবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। যশোবতীকে দর্শন করিয়াই একাবলী অতীব বিরক্তিসহকারে কালকেতুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন। কহিলেন, "যশোবতি! কালকেতু আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণাদানে উদ্যোগী হইয়াছে। সে এক্ষণে শুদ্ধ বিবাহপ্রস্তাব করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। কখন হস্ত কখন বা পদ ধারণে উদ্যত হয়। আমাকর্ত্তৃক এজন্য কটুভাষে তিরস্কৃত হইয়া সে ক্রোধকম্পিতাঙ্গে আমাকে দুই দিবসের সময় দিয়াছে। তৃতীয় দিবস পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে। এবার আসিয়া যে কি কাণ্ড করিবে তাহা ভাবিয়াই আমি ব্যাকুল হইতেছি। সখি। ইহার পূর্ব্বে যদি কোন উপায় হয় তবেই নিস্তার নতুবা আমার জীবনবিসর্জ্জনই একান্ত শ্রেয়ঃ। জীবন থাকিতে দৈত্যেন্দ্রাণী হইতে পারিব না।"

যশো। ভাই, উপায় অবশ্যই হইবে। আমি মা জগদম্বার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম তিনি যেন দিব্যলাবণ্যময়ী মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক আমাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, যশোবতি! তোমার কোন ভয় নাই। আমার বরে তুমি যদৃচ্ছা অদৃশ্য গমন করিতে পারিবে। দৈত্যরাজপুরী হইতে অলক্ষিতভাবে বহির্গত হইয়া তুমি যদৃচ্ছা গমনপূর্ব্বক যে স্থানে পদ্মবনমণ্ডিতা বেদী দেখিবে সেই স্থানে নদীতটে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে। তোমার করুণ রোদন শ্রবণ করিয়া যে রাজপুত্র তোমার সন্নিহিত হইয়া রোদন-কারণ জিজ্ঞাসিবেন তাঁহারই নিকট তোমার ও তোমার সখীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তিনিই তোমাদিগের উদ্ধারসাধন করিবেন। আমি জগদম্বার রূপ ও জ্যোতিঃ দর্শনে বিমোহিত হইয়া তোমারও অদৃশ্যভাবে আমার সহিত গমনের আদেশ লইতে পারি নাই। যাহা হউক আমি কল্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে বহির্গত হইব। দেবী অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মৃগয়া

মহারাজ একবীর নিরূপিত দিবসে পারিষদবর্গ পরিমণ্ডিত হইয়া চতুরঙ্গ সেনাসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে বহির্গত হইয়া বিবিধ পাদপশ্রেণী ও ফলফুল-সুশোভিত এক বনমধ্যে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বিটপিশ্রেণীর শাখা-প্রশাখায় শিখিকুল আনন্দে পুচ্ছ আনৰ্ত্তিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, কোকিল-গণ মধুর পঞ্চমে কুহুধ্বনি করিতেছে ও অলিকুল গুণ গুণধ্বনি করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে মুনিগণের আশ্রম হইতে বেদনাদ নিনাদিত হইতেছে এবং মৃগশাবকগণ বৃক্ষনিম্নে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত আছে। মুনিজন-মনোলোভা এই রমনীয় স্থানের শোভা দর্শনপূর্ব্বক রাজা এই স্থানেই সেনানিবেশ সংস্থাপন করিবার আজ্ঞা দিলেন। রাজা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে তেজস্বী অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ বহুদূর প্রস্থান করেন এবং রাত্রিকালে পুনরাগমনপূর্ব্বক নিজ পটগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন।

একদা নৃপতি তেজস্বী অশ্ববরারোহণে মৃগয়ার্থ বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে রতিপতি পুষ্পধনু স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফলকরণোদ্দেশে সেই বনভূমিতে উপনীত হইয়া একবীরকে একাকী দর্শনপূর্ব্বক নিজ পুষ্পধনু হইতে একটি পুষ্পবাণ রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মদনবাণাহত রাজা সহসা মনোবৃত্তিকুলের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন কিন্তু এতাদৃশ ভাবের কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। মদন দেব স্বীয় অব্যর্থ ইষুপ্রয়োগ করিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা অতঃপর মৃগয়া-বিচরণ প্রীতিপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তিনি এজন্য প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেনানিবেশে গমন করিতে অদূরে তদীয় বয়স্য বক্রেশ্বরকে অবলোকন করিলেন।

এদিকে বক্রেশ্বর রাজসমভিব্যাহারে বনগমনপূর্ব্বক অতীব কষ্টে পতিত হইয়াছেন। অনবরত পটমণ্ডপে অবস্থান তাঁহার পক্ষে কারাগার-স্থান সদৃশ হইয়াছে। মৃগয়া তাঁহার প্রীতিপ্রদা নহে। তাহার বিহার, শয়ন, উপবেশন সকল বিষয়ই তাঁহার কষ্ট অনুভব হইতে লাগিল। সেনানীগণসহ আলাপ পরিচয়ে তাহার স্পৃহা রহিল না। একদিবস তিনি একাকী পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় একস্থানে উপস্থিত হইলেন, তথা-

কার শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক অতুল আনন্দ সহকারে তাঁহার রাজধানীর বৃত্তান্ত স্মরণপথে পতিত হইল। তখন তিনি রাজা একবীরের নিন্দা করিয়া আপনি আপনি বলিতে লাগিলেন, "রাজপুরুষদিগের এ এক অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদিকা ক্রীড়া। ইহাতে কত যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই প্রকারে অর্থের অপব্যয় না করিয়া যদি ইহা আমাদিগের ন্যায় দরিদ্রকে দান করেন, তবে আমাদিগের কত উপকার হয়। তাহাও না হয়, যাহাতে নিজের চিত্তপ্রসন্ন হয় তাহা নিজেই কর, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আনয়ন করা কেন? যখন আনয়ন করিয়াছেন তখন যাহাতে আমার চিত্তপ্রসন্ন হয় তাহাও ত করা উচিত? কিন্তু কই, আমার উদরপূর্ত্তির কোন উপায়বিধান ত করেন না?"

বক্কেশ্বর সেই জনসমাগমশূন্য অরণ্য-প্রদেশে মনের আবেগে আপনা আপনি ঈদৃশ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন ইত্যবকাশে রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে বয়স্য; এই নির্জ্জন স্থানে একাকী কি করিতেছ?"

সহসা রাজাকর্ত্তৃক এবংবিধভাবে অভিহিত হইয়া বক্কেশ্বর বিস্ময়াভিভূত হইলেন, সহসা কি উত্তরদান করিবেন ইহা ভাবিয়া অবিতস্থমনে কহিলেন, "আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে করিব আর কি? এই ভাবিতেছিলাম যে, আপনি আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় বহির্গমন করিতেছেন কিন্তু আমার পেটগয়ায় পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা ত কিছুই করিতেছেন না?"

রাজা। কেন, তোমার কি ভালরূপ আহার হইতেছে না?

বক্কে। না না, তাহা বলিতেছি না, তাহা বলিতেছি না।

রাজা। তবে কি?

বক্কে। আজ্ঞে, একটু "তবে" আছে বৈ কি।

রাজা। কি আছে? বলিয়া ফেল।

বক্কে। রাজবাটীতে যেরূপ হইত সেরূপ আর হয় না। তাহার পর রাণী হইলে ত আরও না হইবার কথা।

রাজা। রাণী হলে কি?

বক্কে। রাণী হইলে সকল বিষয়েই বজ্র আটন হইবে। তখন কি আর এক্ষণকার মতন হইবে?

(ক্রমশঃ)

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা,
চৈত্র, ১৩২১।

ভাগবত ধর্ম্ম।

প্রকৃতির তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। সত্ত্বগুণের অভিমুখী না হইলে মানব ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। পুণ্য-তীর্থে স্নানাদি করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অমলাত্মা সাধুগণের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ দিলেন। চিত্তকে সত্ত্বগুণের অভিমুখী করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কোনই ফল হয় না, শাস্ত্রে এই উপদেশ পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলিলেন :—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ।"

এই উভয় শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করিলে বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে রজোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য অর্থাৎ যাহারা কাম ও লোভের দ্বারা পরিচালিত, তাহারা ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, এবং পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির আরাধনা করে। আরাধনকারীর প্রকৃতি যেমন আরাধ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু তাঁহারা ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ভৈরবাদিকে পরিহার করিয়া অসূয়াশূন্যচিত্তে শান্ত নারায়ণ-মূর্ত্তিসকলের উপাসনা করেন। "অসূয়াশূন্য-চিত্তে" উপাসনা করেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা উচ্চাধিকারী হইলেও কখন অন্যের উপাস্য দেবতার নিন্দা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই। উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লোকে একনিষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে পারে না। অনেক সময়েই প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। ইহার কারণ জীব নিজ নিজ প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করে। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংস্কার যাহা বর্ত্তমান জীবনে অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম প্রকৃতি। জ্ঞানবান লোকেই এই প্রকৃতির সদৃশ কার্য্য করিতেছে সুতরাং মূর্খের কথা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কেহ নিষেধরূপ নিগ্রহ করিয়া কি করিবেন? কোনও কর্ম্ম মহানরকের সাধন, এরূপ জানিয়াও লোকে দুর্ব্বাসনার প্রবলতানিবন্ধন ভগবানের শাসনাতিক্রমে ভীত না হইয়া তাহা সাধন করিয়া থাকে। ইহাই মানবের প্রকৃতি। এইজন্য যাঁহারা সত্যই রজো ও তমোগুণের শাসন ছাড়াইয়া তত্ত্বগুণের ভূমিতে উঠিয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির পূজা না করিয়া শান্ত নারায়ণমূর্ত্তিসমূহের পূজা করেন সত্য, কিন্তু যাঁহারা নিজের প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে কামলোভ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতির উপাসনা করে ইঁহারা তাহাদের কোনরূপ নিন্দা, উপেক্ষা বা আজ্ঞা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ মানুষ যদি অনুবর্ত্তন করিতে পারিত তাহা হইলে জগতে যাবতীয় বিরোধের অবসান হইত, মানবসমাজে প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না। নিজের যাহা ধর্ম্ম তাহা জীবনে সফল করিবার জন্য বড় একটা চেষ্টা বা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের আচরণ না করিয়া প্রচারের দিকেই আগ্রহ অধিক, আর এই প্রচার, জীবনের দ্বারা নিঃশব্দে নহে, পরের দোষ ও ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া এবং নিজের প্রশংসা করিয়া সমালোচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ। এই জন্যই ধর্ম্ম মানবকে মৈত্রীর সূত্রে একতাবদ্ধ করিতে পারে নাই, মানুষে মানুষে সহস্র প্রকার হিংসা ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ভগবানের পূজার নামে ভগবানকেই অবজ্ঞা করিতেছে! শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমভক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জগতের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বে বলা হইল যাহাদের প্রকৃতিতে তমো ও রজোগুণ অত্যন্ত অধিক তাহারা ঘোররূপ ভৈরবাদির পূজা করে। এরূপ উপাসনা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব ঢাক বাজিতেছে, শত শত মেষ মহিষ বলিদান হইতেছে, সেই রক্ত গায়ে মাখিয়া খুব মদ খাইয়া লোকে হৈ হৈ করিয়া নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে দু একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল লোকে বলিল দেবতার বা ভূতের আবেশ হইয়াছে। এই গেল একরকমের উপাসনা।

তাহার পর একদল লোক আছে তাহারা ধর্ম্মবিষয় উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিলে যদি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি আশ্রয় করিয়া সংযতভাবে ও শান্তভাবে জীবন যাপন করিতে বলা হয় তাহা হইলে তাহারা আদৌ সন্তুষ্ট হয় না। তখন তাহারা আর একজন লোকের নিকট যায় তিনি বলেন যে শ্মশানের ঈশান কোনে শিমুলগাছের উপর যে পেচক বাস করে, অমাবস্যা রাত্রিতে সেই পেচকটিকে মারিয়া যদি তাহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন হইতে পারে। তখন সে ব্যক্তির চিত্ত বেশ প্রসন্ন হইল। সে যাহা হউক ধর্ম্মজীবনলাভের একটা গুপ্ত-সন্ধান পাইল।

মানবের প্রকৃতিই এই। 'অন্যদেশের লোক অন্যভাবে খুন, ডাকাতি, দূরবর্ত্তী কোন দ্বীপে যাইয়া অসভ্য অসহায় লোকদের গুলি করিয়া বধ করিয়া নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল শান্তভাবের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এ সব দিকে আপনার প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের সকল সময়ে প্রকাশ্য সুবিধা হয় না। যুদ্ধ করা, মৃগয়া করা প্রভৃতি বড় একটা নাই, কাজেই শ্মশানে গিয়া মদ্যপানাদি করিয়া অথবা তাণ্ডবনৃত্য করিয়া অজ্ঞান হইয়া অথবা খুব আগুন জ্বালিয়া আগুনের উপর গড়াগড়ি দিয়া, নিজের অঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া, 'যাহা হউক একটা মহৎ কার্য্য করিলাম' এই প্রকারের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এমন ধারা লোক জগতে সকলদেশে এবং সকল যুগেই আছে যাহাদিগকে অল্পসময়ের মধ্যেই শান্তভাবের উপাসনায় দীক্ষিত করা অসম্ভব।

ভগবত-ধর্ম্ম শান্তি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য-অবস্থায় তুরীয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের

প্রতি মনোযোগ করা উচিত। তাহার মধ্যে একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয় এই যে ভগবদুপাসানা একটি বিরাম-বিহীন ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুতিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহঙ্ক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাং॥
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥"

উদ্ধৃত এই দশটি শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে ভাগবতধর্ম্মের সাধনার যাহা প্রাণ তাহা বুঝিতে পারিব।

ফলের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্রভাবে পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে কথিত পূজাপ্রকরণ আশ্রয় করিবে। শ্রীজীব-গোস্বামী "অনতি হিংস্রেণ" ইহার অর্থ করিয়াছেন "অতিহিংসারহিতেন—অতিশব্দঃ প্রাণাদিপীড়া পরিত্যাগ

ফলপত্রাদিজীবাবয়বস্বীকারার্থঃ।" অর্থাৎ প্রাণাদি পীড়া পরিত্যাগ করিয়া ফলপত্রাদি গ্রহণ করিবে।

শ্রীভগবানের প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণিতে ভগবানের ভাব চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগের বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরল আচরণ, সতের সঙ্গকরণ, এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন করিবে। এই সকল সদ্গুণের অনুশীলন করিলে সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইবে এবং ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্র বিনা পরিশ্রমে ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন।

গন্ধ যেমন বায়ুপ্রভাবে আপনি আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে সেইরূপ ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারীচিত্ত বিনাপ্রযত্নে পরমাত্মা শ্রীভগবানকে লাভ করে। এই প্রকারের চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণিতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়। ভগবান বলিতেছেন আমি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণিতেই সতত অবস্থিত আছি, তথাচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতেই পূজারূপ বিড়ম্বন করিয়া থাকে। পরন্তু, আমি সর্ব্বপ্রাণিতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়, সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণির সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না। হে অনঘে যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করে তথায় আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মর্ম্ম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা যাহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, গন্ধ যেমন বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া আপনি নাসিকার মধ্য দিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবান আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। ভগবান হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ কিরূপ হয়, তাঁহার দ্বারা স্পর্শ করিয়া কেমন করিয়া, লক্ষ লক্ষ পতিত জীব ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায় তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই

যে আমাদের দেশের লোক ভগবানের গুণ ও লীলা প্রায়ই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন তবে আমাদের সকলদিকেই এত দুর্গতি কেন? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হৃদয়কে যে ভাবে পূর্ণ করিয়া, জীবনে যে পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া এই গুণ ও লীলা শ্রবণ করিতে হইবে সে ভাব এখনও আমাদিগের মধ্যে আসে নাই, সে ব্রত আমাদের দেশ এবং জাতি এখনও গ্রহণ করে নাই। প্রাচীন সমাজে এই ব্রতের অনুষ্ঠান যেটুকু ছিল এখন যেন সে টুকুও আমরা হারাইতেছি। এই কারণে অর্থাৎ সাধনার যাহা প্রাথমিক কথা তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষের বিষয় লইয়া আমরা কেবল শক্তির অপব্যয় করিতেছি বলিয়াই আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বৃক্ষের মূল কাটিয়া তাহার অগ্রভাগে জলসিঞ্চন যে প্রকার নিস্ফল আমাদের অধ্যাত্মসাধনা ও সেইরূপ নিস্ফল হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-ধর্ম্ম-সাধনের শ্রীকপিল দেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পতিত হইলেই আমাদের মঙ্গল।

আমাদের দেশে এই প্রাথমিক বিষয়গুলির উপদেশ প্রায়ই প্রদত্ত হয় না, এবং সে উপদেশ পাইবার জন্য কেহ যেন ইচ্ছুকও নহে। মানুষ সাধারণতঃ একটা অলৌকিক কিছু বা একটা ইন্দ্রজাল চাহে। আমি যেমন ক্ষুদ্রচিত্ত, মহৎলক্ষ্যহীন, স্বার্থান্ধ ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব আছি ঠিক সেইরূপই থাকিব এক তিলও পরিবর্ত্তিত হইব না, আর একজন গুরু আসিয়া এ সকল বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগী হইবার জন্য আদৌ কোন কথা না বলিয়া এমন এক মন্ত্র দিয়া যাইবেন যে সেই মন্ত্রের সাহায্যে আমি একেবারে রাতারাতি অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চসীমায় আরোহণ করিব। একবার একজন লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেক টাকা দিয়া একজন নামজাদা বড় ডাক্তারকে আনাইয়াছিল, ডাক্তার আসিয়া ঔষধের দিকে তত মনোযোগী না হইয়া পথ্য, ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, রোগী ধনবান লোক, এবং অত্যন্ত লোভী, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ডাক্তার বাবু, যদি পথ্য প্রভৃতিতেই সংযত হইব তবে আর এত টাকা দিয়া আপনাকে ডাকাইব কেন? আপনি বড় ডাক্তার এমন ঔষধ দিবেন যে পথ্যাদি ব্যাপারে আমি যেমন আছি ঠিক তেমনই থাকিব অথচ আপনার ঔষধে ব্যায়রাম সারিয়া যাইবে।" ডাক্তারবাবু বলিলেন "এ প্রকারের ঔষধের ব্যবস্থা করা

আমার পক্ষে অসম্ভব।" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু চতুর লোক ছিলেন না। তিনি যদি চতুর হইতেন তাহা হইলে বলিতেন "আচ্ছা তাহাই হইবে তবে কিছুদিন সময় লাগিবে।" এই বলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিতেন, রোগীর অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইত ডাক্তারবাবু কিছু অর্থলাভ ত হইত। ধর্ম্মরাজ্যে সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই এইরূপ পথ আচার্য্যগণকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এই জন্য শ্রীকপিলদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়গুলির প্রতি সকলের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনার প্রথম কথা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ভগবান সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত ইহার উপলব্ধি। এই দুটি স্থূল কথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তাহা হইলে ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোক দুইটি আলোচনা করিতেছি তাহার একটিতে আছে যে যাঁহারা 'মুমুক্ষু' তাঁহারাই ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের শান্তমূর্ত্তি সমূহের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই 'মুমুক্ষু' কথাটি ভাল করিয়া উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ও এই ভাগবতধর্ম্ম মুমুক্ষুদিগের জন্য। সুতরাং যাঁহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে জীবন কৃতার্থ করিতে চাহেন তাঁহারা সর্ব্বদাই ধীরভাবে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি আমি মুমুক্ষু হইয়াছি কি না? মানুষ যে একেবারেই 'মুমুক্ষু' হইবে এমন কিছু কথা নাই। আর মুমুক্ষু হওয়াও যে খুব সহজ তাহাও নহে, তবে গভীরভাবে হৃদয় পরীক্ষা করা এবং চিন্তা করা দরকার আমি 'মুমুক্ষু' কি না। আমি মুমুক্ষু নহি এবং মুমুক্ষু হইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা আগ্রহও নাই এরূপ অবস্থায় যদি আমি মনে করি যে জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ ছাড়িয়া আমি শুদ্ধাভক্তির পথ বা ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি তাহা হইলে সেই কপটাতায় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। কেবল যে আমারই সর্ব্বনাশ হইবে তাহা নহে আমার দ্বারা অন্য অনেকেরও সর্ব্বনাশ হইবে। এই প্রকারে ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ প্রতিদিন ছোট করিয়া ফেলা হইতেছে, ইহা একটি অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়িয়াছে এই জন্যই এত কথা বলা প্রয়োজন।

"মুমুক্ষু" বলিলে আমরা অনেক সময়ে মনে করি সাংসারিক কর্ত্তব্যের

পরিত্যাগ। লেখা পড়া শিখিলাম না, কাজ কর্ম্ম করিলাম না, পিতামাতার অন্নজলের ব্যবস্থা করিলাম না, কোনরূপ সামাজিক দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করিলাম না সংসার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র বলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সাধু সাজিলাম, সাধুগিরি ব্যবসায় করিতে যে সমস্ত কৌশলের দরকার একজন ভাল সাধুর নিকট শিক্ষানবীশ থাকিয়া সেগুলি বেশ করিয়া শিখিলাম। ব্যবসায় বেশ জমিয়া উঠিল, নাম জাহির হইল, খাদ্য জুটিতে লাগিল, লোকে বলিতে লাগিল আমিও ভাবিতে লাগিলাম এই বুঝি মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্ব সম্বন্ধীয় এই ভ্রান্তধারণা যাহা তামসিকপ্রকৃতির লোকের হইয়া থাকে, ভগবদ্গীতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের ভিত্তি গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ভাগবতধর্ম্মেও গীতার সেই মতের প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেবও বলিলেন ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভাগবতধর্ম্মের ইহাই প্রথম কথা এবং গীতা ও ভাগবতের মতে ইহাই প্রকৃত মুমুক্ষুতা। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা বলিয়াছেন

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ আমি কর্ম্মের ফলভোগ করিব এই প্রকারের অপেক্ষা না করিয়া এই কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি কর্ত্তব্যব্রত পালন করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিরগ্নি হইয়াছেন, এবং পূর্ত্তকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি অক্রিয় হইয়াছেন তিনি নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ভাগবতধর্ম্মই প্রকৃত বেদান্ত ধর্ম্ম বা বেদান্তধর্ম্মের সুবিকশিত ও পরিণত মূর্ত্তি। বেদান্তসাধনায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভের পূর্ব্বে যে সমস্ত গুণে অন্বিত হইতে হয় তাহাকে সাধন চতুষ্টয় বলে। এই সাধনচতুষ্টয়ের চতুর্থ সাধনের নাম মুমুক্ষুত্ব। ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যে এই সাধনচতুষ্টয়ের প্রয়োজন, এই সাধনচতুষ্টয় ব্যতিরেকে অধ্যাত্মরাজ্যে যে প্রবেশ করা যায় না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বলিলেন যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারাই এই শান্ত ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করেন। যাহাদের প্রকৃতিতে রজো ও তমোগুণ অত্যন্ত অধিক তাহারা এই ধর্ম্মে আনন্দ পায় না, ইহা তাহাদের প্রকৃতির অনুকূলও

নহে। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। কার্য্যের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা সর্ব্বভূতেই যে অন্তরাত্মারূপে শ্রীভগবান আছে আমাদিগকে তাঁহা সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই চেষ্টা যিনি আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই এই ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী।

একাবলী।

পূর্ব্বপরিচয়

রাজা। তবে আমার বিবাহ না করাই ভাল, না বয়স্য?

বক্কে। ষাট ষাট, আশীর্ব্বাদ করি এই মৃগয়া যাত্রাতেই যেন সে কাজটা সম্পন্ন হইয়া যায়।

রাজা। তা কি কখন হয়? ব্রাহ্মণের অমন বৃথা বাক্য ব্যয় করা উচিত নহে।

উভয়ের এতাদৃশ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবকাশে বহুদূরে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া বক্কেশ্বর মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ঐ শুন মহারাজ! ভ্রমরগণ গুণ গুণ রব করিয়া আপনার বিবাহের হুলুধ্বনি দিতেছে।" রাজা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "তাইত সখে! সত্য সত্যই যেন বহুদূর হইতে ভ্রমর গুঞ্জনবৎ মধুর স্বর উত্থিত হইতেছে। ইহা শ্রবণ করিবামাত্র আমার চিত্তও যেন বিচলিত হইয়া উঠিল আর আমার মৃগয়ায় অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে পিতৃশ্রাদ্ধের পর রত্ন্যরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণার্থে তাঁহার পুরীতে গমন করিবার কথা ছিল; কিন্তু আমিই উপেক্ষা করিয়া মৃগয়ার্থ বনাগমন করিয়াছিলাম। সে বৃত্তান্ত এক্ষণে স্মরণপথে পতিত হওয়ায় আর আমার মৃগয়ায় অভিলাষ হইতেছে না। বয়স্য, চল পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করি। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ যাহাতে নিষ্ফল না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়াই কর্ত্তব্য।"

বক্কেশ্বর রাজধানী প্রত্যাগমনের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া পরমানন্দসহকারে রাজবাক্যের উত্তরদানে প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময়ে সুললিত তানলয়সহকৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহার ও রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রথমে দূরতা নিবন্ধন

যে গীত স্ফুটভাবে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ শ্রবণগোচর হইতেছিল তাহা এক্ষণে সন্নিধি-বশতঃ সুস্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল।

দেখিলাম একনারী তটিনী তটেতে বসি।
রাহুভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়েছে খসি।
আলুলায়িত কেশা পথশ্রান্ত মলিন বেশা
অবিরত কাদিতেছে আঁখিজলে সদা ভাসি।

উল্লিখিত গানটী গাইতে গাইতে জনৈক তপস্বী তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তপস্বীকে দেখিবামাত্র রাজা সসম্ভ্রমে প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসিলেন, "তপস্বিন্! এতাবধি যে মধুর সুস্বরলহরী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল তাহা কি আপনারই কণ্ঠনিঃসৃত?" তপস্বী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "হাঁ মহারাজ আমি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া আসিলাম মনের আবেগে তাহাই গান করিতেছিলাম। সেই রমণীকে কত প্রবোধ দান-পূর্ব্বক তাঁহার ক্রন্দন-কারণ জিজ্ঞাসিলাম। কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই আমার প্রশ্নের উত্তরদান করিলেন না। এজন্য এই রমণীচরিত্র আপনার নিকট জ্ঞাপন করিলাম। মহারাজ! এরূপ পরমা সুন্দরী রমণী একাকিনী বন-মধ্যে নদীতটে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রন্দন করে, ইহা অতীব বিস্ময়ের কথা। তাদৃশ কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নহুষ, যযাতি, তুর্ব্বসু প্রভৃতি রাজবৃন্দের শাসনকালে দেশে কখন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পৃথিবী শস্যশালিনী ছিলেন, সুতরাং প্রজাবর্গের কখন অর্থ কষ্টাদি ক্লেশ, চৌর তস্করাদির ভয় ছিল না। দেশে কখন অকালমৃত্যু সংঘটিত হইত না, সুতরাং পতিবিয়োগবিধুরা কামিনীর ও প্রাণপ্রতিম পুত্র-বিরহ-দুঃখিতা জননীর রোদনধ্বনি শ্রবণগোচর হইত না। তাঁহাদের বাহুবলে সমগ্র রাজ্য সুশাসিত ছিল, তপস্বিগণ নির্ব্বিঘ্নে তপঃকার্য্য সম্পাদন করিতেন, দৈত্যাদি-ভয়-নিপীড়িত হইয়া কাহাকেও কম্পিতাঙ্গ হইতে হইত না। আর অদ্য কি না আপনকার রাজত্বকালে অবিবাহিতা যুবতী কুমারী দারুণ মনোদুঃখে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীতটে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে? মহারাজ! ইহার আশু প্রতিবিধান করুন নতুবা আপনার অপযশ ধরণীর সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইবে।" এই বলিয়া তপস্বী রাজাকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা বক্কেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বয়স্য! তপস্বী

যথার্থই বলিয়াছেন। আমি অগৌণে সেই নদীতটে গমনপূর্ব্বক কামিনীর মর্ম্মপীড়ার কারণানুসন্ধান করিয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান্ হইব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তপস্বীর নিকট নদীতটবর্ত্তিনী রূপযৌবনশালিনী কুমারীর দুঃখনিরাকরণে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজা একবীর সেই তপস্বীনির্দ্দেশিত পথে বয়স্যসমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর বনভূমি অতিক্রম করিয়া মুনিগণের বেদনাদ-নিনাদিত মৃগশাবকসমাবৃত অপর এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথাকার প্রতি কুটীর হইতে যে সকল হোমধূম উত্থিত হইতেছে তদ্দ্বারা গগনাঙ্গন সমাবৃত হইতেছে। উদ্যাননিচয় প্রফুল্ল পঙ্কজাবলি দ্বারা বিরাজিত ও স্থানে স্থানে নিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে কোন কোন স্থলে ফলপুষ্পশোভিত শাল, তাল, তমাল, জম্বু, চূত প্রভৃতি পাদপসকল মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মুনিমনলোভা স্থানশোভা দর্শন করিতে করিতে রাজা ও বক্কেশ্বর অদূরে পুষ্পমণ্ডিত নদীকূলে রোরুদ্যমানা কামিনীর দর্শন পাইলেন। রাজা সেই প্রফুল্লপঙ্কজনেত্রা, বিশুদ্ধকনকপ্রভশরীরা, আগুল্ফলম্বিতকেশা, কম্বুগ্রীবা, ক্ষীণকটীদেশা, বিম্বোষ্ঠা,তিলফুলনাসা, সখীবিরহবিহ্বলা, কাতরচিত্তা কামিনীকে কুররীর ন্যায় সজলনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। বক্কেশ্বর সেই অনুপম রূপযৌবনসম্পন্না তেজপ্রভা-সমন্বিতা কুমারীকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দসহকারে একবীরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, রাজমহিষী হইবার উপযুক্ত কন্যাই বটে। আপনার ভাগ্যবশতঃ রথদর্শন ও কদলীবিক্রয়, উভয় কার্য্যই সমকালেই সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইবার নহে।” রাজা তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, “বয়স্য! সকল সময়ে ঠাট্টা তামাসা প্রীতি জনক হয় না। যে উদ্দেশ্যে আগমন করিলাম তাহাই সম্পাদনে যত্নবান হও।”

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে সেই রোরুদ্যমানা কামিনীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন একবীর সেই অনবদ্যাঙ্গী কোকিলকলনাদিনী কুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “কল্যাণী! তুমি কে? তুমি কি কোন দেবকন্যা না গন্ধর্ব্বকন্যা? অয়ি সুন্দরি! কি নিমিত্তই বা তুমি এই জনশূন্য

দুর্গম বনমধ্যে একাকিনী নদীতটে বসিয়া কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছ ? তুমি কি পতি কিম্বা মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া এই মনুষ্যসমাগমশূন্য প্রান্তরমধ্যে রোদন করিতেছ ? তোমার যে কোন দুঃখ-কারণই হউক না আমার নিকট তাহা সত্য করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি তুর্ব্বসুপুত্র একবীর। আমার অনুশাসনে আমার রাজ্যমধ্যে কখন কোন দেবউৎপাত, চৌরতস্করাদিভয়, রাক্ষসভয়, হিংস্রপশুভয় কিম্বা অকালমৃত্যুজনিত লোকের দুঃখ কষ্ট হয় না। কামিনীগণের শোককারণ রাজ্যে কখন উদ্ভূত হয় না। আমি পৃথিবীতলস্থিত যাবতীয় প্রাণিরই কি দৈবকৃত, কি মনুষ্যকৃত, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্টের নিরাকরণ করিয়া থাকি। অদ্য সহসা তোমাকে এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতে শ্রবণ করিয়া বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। তোমার যে কোন শোককারণই হউক না, আমার নিকট প্রকাশ কর। একবীর জীবিত থাকিতে রমণীদুঃখের নিরাকরণ হইবে না ইহা অতীব অপযশের কথা। তোমার জন্য যদি কৃতান্তনগরে যমসদনে গমন করিতে হয় আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। অতএব ভামিনি ! ত্বরায় বল, আমি তোমার কষ্টকারণ নিরাকৃত করিব প্রতিশ্রুত হইতেছি।"

নৃপবর এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে মৃদুভাষিনী সেই বালিকা মধুর-বচনে কহিল, "রাজেন্দ্র ! বিপত্তিবিহীন প্রাণী কখন রোদন করে না। আমার এই বিপত্তিও এক কথায় প্রকাশ করিবার নহে, যদি আপনি অনন্য-মনে কথা শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন এবং সেই বিপত্তিনিরাকরণে প্রতিশ্রুত হন তবে বলিতে পারি।"

নরপতি একবীর রোরুদ্যমানা কামিনীমুখবিনির্গত এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভামিনি ! আমি অনন্যমনে তোমার কাহিনী শ্রবণ করিব প্রতিশ্রুত হইতেছি। শুদ্ধ শ্রবণ কেন, তোমার কষ্টের নিরাকরণ করিতে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল আর্ত্তত্রাণের নিমিত্ত, অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে একবীরের নিকট তোমার দুঃখকারণ বর্ণন কর।"

নরপতির এবম্বিধ আশ্বাসবাক্যে সুলোচনা কামিনী বলিতে আরম্ভ করি-লেন, "মহারাজ ! আপনকার রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে পরম ধার্ম্মিক প্রজাপালক রভ্যনামে এক রাজা আছেন। রুক্মরেখা নামে অতি রূপবতী চতুরা সাধ্বী সর্ব্ব-সুলক্ষণান্বিতা রাজকন্যা তাঁহার মহিষী। তাঁহারা বহুদিবস অপুত্রক থাকিয়া

অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। অতঃপর দুঃখিতচিত্তা রাজমহিষী কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের পরামর্শে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ সমাপন করেন। সেই যজ্ঞে সাবিত্রীদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে একটী নিরুপম কন্যারত্ন প্রদান করেন। এই কন্যার নাম একাবলী। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া রাজা ও রাজমহিষী পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।"

রাজা এতদূর শ্রবণ করিয়া কামিনীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তবে তুমি কে? না তুমিই সেই একাবলী, আমার নিকট কোন কারণবশতঃ আত্মগোপন করিতেছ?"

কামিনী। "না মহারাজ! শঠতা অবলম্বন সবলা কামিনীর ব্যবসা নহে। আমি আত্মগোপন করি নাই। আমি সেই একাবলীর সখী, রত্ন্যরাজের মন্ত্রীকন্যা আমার নাম যশোবতী।"

রাজা। তাহার পর, তাহার পর? তোমার সখীর বৃত্তান্ত ত্বরায় বল, তোমার ক্রন্দনের কারণ বর্ণন কর। আমি আর ধীরতা অবলম্বনে অসমর্থ হইতেছি।

তচ্ছ্রবণে যশোবতী আরম্ভকরিলেন, "একাবলী ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার বিবাহার্থে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে একদিবস একাবলী স্বপ্নযোগে আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া আপনার প্রতি আশক্তা হইলেন। অতঃপর রত্ন্যরাজকন্যার দ্যূতক্রীড়ায় পারদর্শিতা বিচার করিয়া তাহার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় বিজেতা তাহার পাণিগ্রহণ করিবে এই পণ রাখিয়া একাবলীর বিবাহ ঘোষণা করিলেন। রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থ কত রাজপুত্র ক্রীড়াভিলাষী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি আসক্তচিত্তা সখী ক্রীড়াবিমুখ হইয়া জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। রত্ন্যরাজ অনন্যোপায় হইয়া আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।"

রাজা শুনিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আহা, মন্ত্রীমহাশয় আমাকে এই দ্যূতক্রীড়ার কথা বলিয়াছিলেন বটে কিন্তু আমি তখন তাঁহার কথায় উপেক্ষা করিয়া কামিনী হৃদয়ে কতই দুঃখ দিয়াছি।"

বয়স্য। হাঁ মহারাজা! মন্ত্রীমহাশয় আপনাকে রত্ন্যরাজ পুরীতে গমনের জন্য কত অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ! যাঁহার হৃদয়ে প্রণয়কলিকা প্রস্ফুটিত হয় নাই; সে কেন অবলা কামিনীর মনঃকষ্ট অনুভব করিবে?

আপনি পিতৃশ্রাদ্ধান্তে মৃগয়াভিলাষী হইয়া এই বনভূমি আশ্রয় করিয়াছেন।

মহারাজ একবীর তখন যশোবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “অয়ি মানিনি! অতঃপর একাবলী কি করিলেন তাহা বিবৃত করিয়া আমার আগ্রহান্বিত মনের তৃপ্তি সম্পাদন কর। আমি যতই তোমার সখীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছি ততই আমার তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিতেছে।” যশোবতী বলিতে লাগিলেন, “পরে এক দিবস শ্রবণ করিলাম রাজা একবীর কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে রভ্যরাজদেশে পদ্মপ্রস্ফুটিত নদীর উপকূলে আমার সখীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সংবাদে উৎসাহিতা সখী নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই নদীতটে আমাদিগের সহিত প্রহরীগণ রক্ষিতা হইয়া আগমন করেন। আপনার অপেক্ষায় আমরা সকলে সেই নদীজলে স্নানক্রীড়াদিতে নিযুক্ত আছি এমন সময়ে বহুদূরে পূর্ব্বদিক হইতে কে যেন আগমন করিতেছে দেখিয়া আপনারই আগমনবোধে সানন্দহৃদয়ে সেই দিকেই মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করিতেছি ইত্যবসরে কালকেতু দৈত্য ঝড়াকারে আগমনপূর্ব্বক রক্ষকগণকে পরাস্ত করিয়া আমার সখীকে লইয়া প্রস্থান করিল। আহত রক্ষকগণ রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিল, আমি অনন্যোপায় ও সখীপ্রেমে অভীভূত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছি।”

যশোবতী মুখে কালকেতু কর্ত্তৃক একাবলী হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা যেন অনুভবে অসহায়া কামিনীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি একান্ত অধীর হইয়া প্রিয় বয়স্য বকেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সরলা কামিনী আমার প্রতি আসক্তি বশত ও আমারই কথার বশবর্ত্তী হইয়া এই নিদারুণ কষ্ট উপভোগ করিল। আমি যদি এই আসক্তির বিষয় বিন্দু বিসর্গও শুনিতাম তাঁহা হইলে আর একাবলীর এ বিপত্তি ঘটিত না। আহা! অসহায়া কামিনী না জানি সেই দৈত্যপুরে একাকিনী কত কষ্টই উপভোগ করিতেছেন। আমার এ জীবনে আর আস্থা নাই। আমি প্রাণ দিয়াও তাঁহার উদ্ধার সাধন করিব। যদি দৈত্য যুদ্ধে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় তাহা হইলে জানিব প্রিয়তমার প্রতি হতাদরের উচিত প্রায়শ্চিত্ত করা হইল।”

রাজাকে এই প্রকারে বিলাপ করিতে ও প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে

শ্রবণ করিয়া যশোবতী কহিলেন, "মহারাজ! এ বিলাপ করিবার সময় নয়। এক্ষণে সর্ব্বপ্রযত্নে রাজনন্দিনীর মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করুন।"

রাজা। হাঁ সখি! তুমি যথার্থ কথাই বলিতেছ। রাজনন্দিনীর ও তোমার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উপায় উদ্ভাবনের সহায়তা কর। তাহার পর বুঝি তুমি পথ ভ্রষ্টা হইয়া একাকিনী এই বিজন প্রান্তরে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছ?

যশো। না মহারাজ! আমি সখীর অনুগমন পূর্ব্বক সেই কালকেতুর পাতালপুরীতে গমন করিয়াছিলাম। কালকেতু অমার সখীকে উত্তম প্রকোষ্ঠে স্থান দান করিয়া পরমসুখে রাখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু মহাশয় দুগ্ধের পিপাসা যেমন ঘোলে নিবৃত্তি হয় না তদ্রূপ আপনার প্রণয়-কাঙ্ক্ষিনী সখীর মনে কালকেতুর প্রণয়সম্ভাষণ স্থান পাইবে কেন, বরং তাহাতে তাঁহার মনে বিষজ্বালা প্রসারিত করিয়াছে। তিনি আত্মদেহ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন দেখিয়া আমি জগন্মাতা ভগবতীর বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। সেই সর্ব্বশক্তিমতী জগন্মাতার অনুকম্পায় ও আদেশে আমি এই স্থানে উপনীত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছি।

রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার সখী জীবিতা আছেন ত?"

যশো। হাঁ আছেন, মা ভগবতীর অনুকম্পায় তিনি আপনার আগমন প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন!

রাজা। তুমি আমাদিগকে পথপ্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দৈত্যের আবাসে লইয়া যাইতে পারিবে?

যশো। হাঁ পারিব।

রাজা তখন বয়স্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বয়স্য! আমি পাতাল-পুরীতে গমন করিয়া প্রিয়তমাকে জীবিতা দেখি তবেই মঙ্গল, নতুবা সেই পরদারাপহারক কালকেতুর বিনাশ সাধন করিয়া প্রিয়তমার অনুগমন করিব। বয়স্য! আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি অবিলম্বে স্কন্ধাবার তুলিয়া আমার অনুগমন কর। আমি কামিনীর সহিত অগ্রসর হইলাম।"

বয়স্য। মহারাজ! দুর্জ্জয় দৈত্যদলনে একাকী সম্মুখীন হওয়া উচিত নহে। সৈন্যসহ গমনই বিধেয়।

রাজা। বয়স্য ! তুমি কি বলিতেছ ? নহুষ যযাতি প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ নরপতির বংশধর হইয়া, ক্ষত্রিয় রক্ত ধমনীতে ধারণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবীর গর্ভসম্ভূত পুত্র হইয়া, নৃশংস, দুরাচার, বালিকাপহারক সেই পাপিষ্ঠ দৈত্যের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইব ? অবলা রমনী ,আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হইয়া এই বিপত্তি-সাগরে পতিতা হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে কি আর ভয়ের সঞ্চার হয় ? দুরাচার দৈত্যের দুরভিসন্ধি শ্রবণে আমার হৃদয়ে যে প্রতিহিংসা বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার প্রখর জ্বালায় ভয় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রিয়ার রক্ষাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবই। স্বয়ং যমরাজ আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইবেন না। আমি চলিলাম।

রাজা প্রস্থান করিলে পর বয়স্য কিয়ৎক্ষণ হতস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে কহিলেন, "এইবার দেখিতেছি রাজা মহাশয়ের হৃদয়ে প্রণয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

অদ্য তৃতীয় দিবস, কালকেতু মৎসন্নিধানে বিবাহের প্রস্তাব করিতে আগমন করিবে ; আমি তাহাকে কি উত্তর দিব ? সখী যশোবতীও তিন দিবস হইল এ স্থান হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তাঁহারও ত কোন সংবাদ পাইলাম না এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিকল চিত্তা একাবলী কালকেতু নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবিষ্টা আছেন এমন সময়ে কালকেতু হসিতাধরে প্রকোষ্ঠ মধ্যে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি ! আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ ?"

একাবলী কহিলেন "আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমার পিতা রত্নরাজ ও তুর্ব্বসুপুত্র একবীরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া আমি কোন সঙ্কল্পই স্থির করিতে অক্ষম।"

কাল। রাজকুমারি ! তুমি বড়ই অবোধ, তুমি জরা মৃত্যুর অধীন সামান্য এক রাজকুমারের প্রত্যাশায় তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ। আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তুমি চিরায়ুষ্মতী হইয়া এই পাতালপুরীর অধীশ্বরী হইতে। পাঁচ হাজার সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা দাসী তোমার সেবায়

নিযুক্ত হইত, আর জরামরণবিবর্জ্জিত ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম আমি দাস ভাবে তোমার সেবা করিতাম।

কালকেতুর এবংবিধ বাক্যে রোষপরায়ণা হইয়া একাবলী তাহাকে উত্তর করিলেন, "আমি তোমার তোষামোদ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর।"

কালকেতু একাবলীর দিকে অগ্রসর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "না সখি, এমন কথা বলিতে নাই। আমি তোমার প্রেমাধীন। তুমি আমার প্রতি কৃপাপূর্ণ কটাক্ষপাত না করিলে আমি তোমার পদে আত্মহত্যা ব...।" এই বলিয়া কালকেতু প্রসারিতহস্তে একাবলীর চরণযুগল ধারণোদ্যত হইল। একাবলী একান্ত ক্রোধ পরিপূর্ণ হইয়া পদ সরাইয়া কহিলেন, "দূর হও, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

ইতিমধ্যে কালকেতুর দূতগণ সেই নৃপসত্তম একবীরকে সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া যশোবতীর সহিত পন্নগগণ পরিব্যাপ্ত পাতালপুরীর ন্যায় অসংখ্য ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণ পরিরক্ষিত অতি দুর্গম কালকেতুপুরী প্রবেশ করিতে দর্শন করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে চীৎকার শব্দে কালকেতু সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, "রাজন্! যশোবতীর সহিত এক নৃপবর বিপুল সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ও তাহাদিগের শাণিত অস্ত্র শস্ত্র হইতে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে ইনি ইন্দ্রকুমার জয়ন্ত কিম্বা দেবাদিদেব তনয় কার্ত্তিকেয় হইবেন। যিনিই হউন তিনি নিজভুজবলে উন্মত্ত প্রায়, অতএব হে রাজেন্দ্র, এক্ষণে দেবকুমারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তিনি এখনও যোজনত্রয় দূরে আছেন সুতরাং যুদ্ধসজ্জা করিয়া সমর দুন্দুভি নিনাদিত করুন।

দূত মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কালকেতু তাহাদিগের দ্বারা সৈন্যগণকে সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হইবার আদেশ প্রদান করিয়া একাবলীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ সহকারে কহিল, "একাবলি! আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। তুমি সদয়া হইয়া আমাকে আশ্বাস দান কর। তোমার আশ্বাসবানী প্রাপ্ত হইলে আমাকে আর কেহই পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। শত্রু নিকটবর্ত্তী আর বিলম্ব বিধেয় নয়। তোমার মুখের বাক্যে আমার জীবন নির্ভর।

একা। আসন্ন মৃত্যু জীবের সর্ব্বলক্ষণই তাতো প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি জান না, যে রাজা তুর্ব্বসুপুত্র একবীর ঘোটকীরূপিনী লক্ষ্মীদেবীর ঔরষজাত ?

কাল। তুর্ব্বসুপুত্র যেই হউক না কেন, আমি তাহাকে ভয় করি না। তুমি যদি আমাকে পদে স্থানদান কর তাহা হইলে আমি বিশ্বজয়ী হইব। ইন্দ্রপুরী জয় করিয়া তোমাকে শচীর স্থানে অধিরোহণ করাইব। অতএব প্রিয়ে ! আশ্বাস দাও, আর বিলম্ব সহ্য হয় না।

ইত্যাবকাশে দুইজন দূত পুনরায় কালকেতু সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ ! আর উপায় নাই, আমরা অবরুদ্ধ।"

কালকেতু সরোষে কহিয়া উঠিল, "কি অবরুদ্ধ ?"

দূত। আজ্ঞা হাঁ, অবরুদ্ধ। শত্রুরনিকট দুর্গদ্বারে আগমন করিয়া ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, আমাদিগের অস্ত্রধারী যোদ্ধগণ তাহাদিগকে দূরীকরণে একান্ত অসমর্থ।

কাল। সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া আর ক্ষণকাল দুর্গদ্বার রক্ষা কর। আমি অস্ত্রাগারে চলিলাম। সশস্ত্র আমার দর্শনমাত্র শত্রুগণ বাততাড়িত তুলারাশিপ্রায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।

দূতগণ প্রস্থান করিলে কামোন্মত্ত কালকেতু পুনরায় একাবলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রিয়ে শুনিলে ত ? আমার পুরী অবরুদ্ধ। আর এস্থলে অপেক্ষা করা আমার কদাচ উচিত নহে। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, এস তোমাকে হৃদয়ে স্থানদান করি।" এই বলিয়া প্রসারিত হস্তে তিনি একাবলীকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন।

একাবলী অনন্যোপায়া হইয়া সরোষে কহিলেন, "পরস্ত্রী অপহারক ! আমার গাত্র স্পর্শ করিস না, আমার নিকট হইতে দূর হ।" কিন্তু মদনবানাহত কালকেতু সে কথা কর্ণেও শ্রবণ না করিয়া একাবলীর গাত্র স্পর্শনে উদ্যুক্ত দেখিয়া অসহায়া, বিবশা শোকসন্তপ্তা একাবলী আত্মরক্ষার জন্য বিপদভঞ্জন মধুসূদন ও সর্ব্বসন্তাপহারিণী জগদম্বিকাকে স্মরণপূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। "ওমা ! কোথায় যাইব, কে আমাকে এই নৃশংস দুরাচারের ভীষণ হস্ত হইতে রক্ষা করিবে ? মা জগদম্বিকে ! তোমাকে সকলেই বিপদুদ্ধারিণী অসুরদলনী বলিয়া জানে। মা ! অবলার প্রতি করুণ কটাক্ষ বিতরণ পূর্ব্বক এই ভীষণ কালকেতুর হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

হে মধুসূদন তুমি কোথায়? তোমারই পুত্রবধূকে দৈত্য অপহরণ করিতেছে, তাঁহাকে আসিয়া উদ্ধার কর; হে বিপদভয়ভঞ্জন!" আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। সংজ্ঞাহীনা রত্নরাজতনয়া কালকেতুর পদতলে নিপতিতা হইলেন।

এদিকে মহাবলশালী কমলাত্মজ একবীর বিপুলবিক্রমে দুর্গদ্বাররোধী সৈন্যগণকে নিহত করিলে যশোবতী চালিত হইয়া একবারে রত্নরাজনন্দিনীর প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। ভীষণ দানবকে তথাবিধ অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিতকলেবর একবীর ভীষণ গর্জ্জন সহকারে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, "কোথা রে পাষণ্ড দৈত্যকুলাধম! নিশ্চয়ই তোর মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোর সৈন্য সেনাপতি সকলকেই নিহত করিয়াছি, কেবল তুই কুলের তিলকস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছিস্। অদ্য তোকে সংহার করিলে যজ্ঞের আহুতিদান সম্পাদন হইবে।"

কালকেতু মূর্চ্ছাগতাবালিকাকে বিস্ময়সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমত সময়ে একবীরের সগর্ব্ববচন পরম্পরা শ্রবণগোচর ও সচকিত তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "অবোধ বালক! কি সাহসে তুমি এখানে পদার্পণ করিয়াছিস্। তোর জননী অতীব নিষ্ঠুর, নহিলে দুর্জ্জয় দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে তোকে কি সাহসে ছাড়িয়া দিল? যদি তুই কান্তা অন্বেষণে অবোধের মত এখানে আগমন করিয়া থাকিস্। নাকে খত দিয়া চলিয়া যা, এবার তোকে ক্ষমা করিলাম।

একা আমি বালক নহি, তোকে সংহার করিবার জন্যই আমার আগমন। যে চক্ষে তুই আমাকে বালক দেখিলি যে চক্ষুদ্বারা পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিস্, এই অস্ত্রাঘাতে তোর সেই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিব। পাপিষ্ঠ যমসন্নিধানেও তোর ভয় নাই। আমি তোর শমন, বালকবেশে অবতীর্ণ হইয়াছি।

বালকের গর্ব্বোত্থিত বাক্য কালকেতুর অসহনীয় হইল; তখন সে ক্রোধসহকারে কহিল, "রে দুর্ম্মতি, কে তোকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে? কেমন করিয়াই বা আমার এ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলি? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি সজ্জিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

একা পাষণ্ড দানব। পরম শত্রুকে সম্মুখে পাইলে কে ছাড়িয়া দেয়? রাজকন্যা অপহরণ করিয়া তুই নিস্তার পাইবি ভাবিয়াছিলি! রাজকন্যা প্রাপ্তি আশা তোর এখনই নির্ম্মূল করিব।

কালকেতু বালকের সাহসিকতা ও পরাক্রমে একান্ত বিস্মিত হইয়া সাম্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কহিল, "তুই বালক বালকের মুখে এতাদৃশী প্রগল-ভতা শোভা পায় না। মূঢ় নর! তুমি কি জান না যে আমি অজর ও অমর! মহাদেবী কর্তৃক আমার একমাত্র বধোপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। যে জন ঘোটকীর গর্ভে হইতে সমুৎপন্ন হইবে সেই আমার বিনাশসাধনে সমর্থ, নতুবা যক্ষ, রক্ষ, নর কিম্বা দেবমণ্ডলী মধ্যে এরূপ কেহই নাই যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। অতএব বালক! অনলকুণ্ডে পতঙ্গপ্রায় আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছ? এখনও প্রত্যাগমন কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

একা। পাষণ্ড! কে তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে? একবীর কখন কাহারও নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না। পামর আমার হস্তে এই যে তরবারি দেখিতেছিস্, এই তরবারির আঘাতে আমি তোর মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিব।

শত্রুর তীব্র বাক্যজ্বালা আর সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া "তবে রে তস্কর নর। দৈত্যের ক্ষমতা এইবার দেখ্" এই বলিয়া অতুল-বিক্রমে একবীরকে আক্রমণ করিয়া তদীয় হস্তস্থিত তরবারি ছিন্ন করার প্রয়াস পাইল কিন্তু একবীরের বজ্রমুষ্টিনিবদ্ধ তরবারি একবীরের হস্তেই রহিল। দানবকে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া একবীর বিপুলবিক্রমে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দানব পুনরায় যেমন আক্রমণ করিবার জন্য একবীর সন্নিহিত হইল অমনি ভীষণ তরবারি আঘাতে রক্তাক্তদেহ কালকেতু ভূপতিত হইয়া কহিল—

সত্যই ঘোটকীগর্ভে জনম তোমার
নহিলে আমার মৃত্যু কখন সম্ভবে?
দেব বল, দৈত্যবল অথবা মানব—
অছেদ্য এ চর্ম্ম মম সবার আঘাতে।
জানিলাম তুমি মম অভীষ্ট দেবতা।
অন্তিমে ডাকিছি তোমা বিষ্ণুর ঔরষে
জন্ম তব একবীর বুঝিনু এক্ষণে।
পাপিষ্ঠ এ দৈত্য, নাথ! চরণে ঠেল না
স্থান দিও এ কিঙ্করে রাঙাপদ কোনে।

বলিতে বলিতে কালকেতু জীবলীলা পরিত্যাগ করিল। তখন একবীর

ভূপতিতা সংজ্ঞাহীন একাবলীকে নিরীক্ষণ করিয়া সুকোমল কর দ্বারা তাহার গাত্র পরামৃশনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রত্নরাজ হৃদয়রতন! উঠ, উঠিয়া দেখ তোমার পরমশত্রু নিপতিত হইয়াছে, কালকেতু গতজীব হইয়া ভূপতিত রহিয়াছে। তোমারি উদ্ধার সাধনকল্পে যে আয়াস প্রাপ্ত হইলাম তাহা, তুমি না উঠিলে সকলি বৃথা হইবে।"

একবীরের সুকোমল অভয়প্রদকরস্পর্শে মূর্চ্ছাপগতা সুন্দরী একাবলী মেঘাপগমে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক মনোহরমূর্ত্তিধর পূর্ণযৌবন রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া বিস্মিতা হইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল দুরাত্মা দৈত্য কালকেতু পীড়িত হইয়া তিনি মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে করিতে মূর্চ্ছাগতা হইয়া ছিলেন এজন্য স্বয়ং মধুসূদন এই মনোহরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধারকল্পে উপস্থিত হইয়াছেন অথবা মাতা জগদম্বিকা অবলার সতীত্ব রক্ষার্থে যত্নবতী হইয়া স্বীয় তনয় কার্ত্তিকেয়কে প্রেরণ করিয়াছেন অথবা ইনিই স্বয়ং একবীর যশোবতী কর্ত্তৃক আনীত হইয়া তাঁহার বিপদুদ্ধার করিয়াছেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি নতজানু ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে বীর! আপনি যেই হউন, আপনাকে নমস্কার। আপনি কি অখিল-বিশ্বনিয়ন্ত্রী মা জগদম্বাপুত্র কার্ত্তিকেয়, মাতৃ আজ্ঞায় তাঁহার ভক্ত অবলাজনের উদ্ধারকল্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? না আপনি স্বয়ং ইন্দ্রদেব, অসুরবীর্য্য খর্ব্ব করিবার মানসে আগমন করিয়া ভীষণ দৈত্য কালকেতুর বধসাধন করিয়াছেন? না আপনি তুর্ব্বসুপুত্র একবীর দাসীর উদ্ধারসাধনার্থে এই ভীষণ সমরে নিজ বহুমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? আপনি যেই হউন, আপনাকে নমস্কার।

বিস্মিতচিত্তা একাবলীকে আত্মপরিচয় দান করিয়া একবীর তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমারি! আমিই তুর্ব্বসুপুত্র একবীর। তুমি আমার জন্য লালায়িত হইয়াছিলে, আমার জন্যই তোমার এই বন্দী অবস্থা; তোমার সখী মুখে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই দেখ, কালকেতুর বধসাধন পূর্ব্বক আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে তুমি আমার।

একবীরের এতাদৃশ পরিচয় শ্রবণ করিয়া একাবলী কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'তুমিই কি সেই ঘোটকীরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত তুর্ব্বসুপুত্র, তুমিই কি আমার হৃদয়-

রঞ্জন, তুমিই কি আমার জীবনাকাশের শুকতারা? তোমার এই কমনীয় কায় ও দুর্লভজীবন মৎসদৃশী সামান্যা নারীর জন্য বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলে? নাথ! আমি কি বলিয়া আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? তোমাকে দর্শন করিবার জন্যই এতাবৎ জীবন ধারণ করিয়া আছি, নতুবা যে দিবস দুর্জ্জয় কালকেতু আমাকে হরণ করিয়া আনিল সেই দিবসই জীবন বিসর্জ্জন করিতাম। নাথ! তোমার জন্যই এ দেহ রাখিয়াছি, এক্ষণে তোমার পদে ইহা উৎসর্গ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।' এই বলিয়া একাবলী তাঁহার চরণে নিপতিতা হইলেন।

যশোবতী একবীরকে সমিব্যবহারে লইয়া একাবলীর গৃহদ্বারে উপনীত হইয়াই, কালকেতুর ভীষণ মুর্ত্তি দর্শন করিলেন অনন্তর একবীরকে নিষ্কোষিত অসিহস্তে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে কালকেতু নিহত হইয়াছে ও সখি একাবলী হতজ্ঞানা সংবাদ পাইয়া দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক উভয়কে একত্র দেখিয়া কহিলেন "এই যে রাজা মহাশয় এইখানেই। পরশমণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রুপ আমার সখি দেখিতেছি আপনাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে আনিয়াছে।"

একবীর। যশোবতী তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি বোধ হয় আমাকে দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। দুরাচার দৈত্য তোমার সখিকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া তোমার সংজ্ঞাহীনা সখির চেতনা সম্পাদন করিলাম, এক্ষণে তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিয়া মণিকাঞ্চনে জড়িত হইলে যে কি শোভা হয় তদ্দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পন্ন করি।

যশো। মহারাজ! আর ভণিতায় প্রয়োজন নাই। আপনি আমাদের সখিকে উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়ানুসারে সখি আপনার। তাহার উপর সখি আপনাকে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এক্ষণে চলুন রভ্যরাজপুরীতে গমন পূর্ব্বক আপনার সহিত বিবাহ দিয়া মণিকাঞ্চনের সংযোগ করিয়া দিবে।

একবীর। যশোবতি! একপ্রকার মণিতে কাঞ্চনের তাদৃশ শোভা হয় না। বিভিন্ন মণি সংযোগেই তাহার শোভার অধিকতর বিকাশ পাইয়া থাকে।

রাজার ইদৃশ তোষামোদজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া যশোবতী লজ্জাবনত-মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে একাবলী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সখি। একযাত্রায় কখন পৃথক ফল সম্ভবে না। রাজামহাশয় যে কেবল আমাকেই উদ্ধার করিলেন তাহা নহে, তোমারও উদ্ধার উঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমাদের উভয়ের উপরে সমান অধিকার।

একাবলীর ইদৃশ মহানুভবতার প্রকাশ পাইয়া যশোবতী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি একবীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রাজা মহাশয়, চলুন আমরা রত্নরাজপুরীতে গমন করি। পিতামাতা সকলেই আমাদের জন্য দুঃখে শোকে ও উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মাণ হইয়া আছে। আমাদের দর্শন পাইলে তবে তাঁহাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইবে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রত্নরাজপুরীতে সর্ব্বত্রই হাহাকার। রাণী ও অন্তঃপুরচারিবর্গ রাজকুমারীর শোকে অনবরত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। প্রজাবর্গ সকলেই রাজার শোকে অভিভূত। রাজ্যমধ্যে কোথাও আর আনন্দধ্বনি অথবা উৎসব নাই। মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্নীও প্রাণপ্রিয়তমা কন্যা যশোবতীর শোকে আকুল। পারিষদবর্গ ও কর্ম্মচারিগণ দ্বারা তাঁহারা যথাসাধ্য রাজকুমারী যশোবতী ও কালকেতুর অনুসন্ধান লইতেছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পর্ব্বতের অঙ্গ বাহিয়া যেমন অনবরত সূর্য্যকিরণদ্রব তুহিনপাত হইতে থাকে তদ্রূপ রাজকুমারী শোকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার দুনয়ন দিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। সভ্যমণ্ডলী সকলেই শোকে নির্ব্বাক। মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ রাজশোকে ম্রিয়মাণ।

কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরবে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রন্দনহেতু চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া রাজা কহিলেন, "মন্ত্রিবর। কি হইল বল দেখি? একাবলীর কি কোন সংবাদ পাইলে না? রাণী ত কাঁদিয়া আকুল। কতকষ্টে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক একটী মাত্র কন্যা পাইয়াছিলাম, বিধাতা তাহাতেও প্রতিকূলাচরণ করিলেন। রাণীর হাহাকার শব্দে আর আমার অন্তঃপুর অভিমুখে যাইবার ইচ্ছা নাই।

রত্নরাজমুখে কাতরবচন শ্রবণগোচর করিয়া দুঃখিত মন্ত্রিপ্রবর উত্তর

করিলেন, "মহারাজ! আমরা চতুর্দ্দিকে লোকপ্রেরণ করিয়া বন, নগর, গিরি, দরী সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও একাবলী বা কালকেতুর সন্ধান পাইলাম না। আমার কন্যা যশোবতী বা কোথায় গমন করিল তাহারও কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। মহারাজ! আপনার যেমন একমাত্র কন্যাশোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, আমাদের অবস্থাও তদনুরূপ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন কিছু করিতে পারিলাম-না, তখন এবিষয়ের নির্ণয় মনুষ্যের অসাধ্য।

রাজা। মন্ত্রিবর! কথায় বলে 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ।' আমার এ দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজা একবীরকে অবগত করান উচিত ছিল।

মন্ত্রিবর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমরা রাজা একবীরের অনুসন্ধান লইয়াছিলাম। তিনি পুরীতে নাই। কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন। মনে ভাবিলাম বনমধ্য দিয়া পলায়নকালে কালকেতুকে তিনি দেখিয়া থাকিতে. পারেন এজন্য সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে নাই।

সভামধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক রাজা মন্ত্রী ও পারিষদসহ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে অদূরে রথস্থাপনপূর্ব্বক তিনজনকে অবতরণ করিতে দেখিয়া রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিবর! পরমেশ্বর বোধ হয় আমার প্রতি কৃপা বিতরণপূর্ব্বক আমাদিগকে সংবাদদানার্থ এই তিন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা রথাবতরণপূর্ব্বক এই দিকেই আগমন করিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

মন্ত্রিবর সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই একবীর, রাজকুমারী ও যশোবতীকে চিনিতে পারিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কহিয়া উঠিলেন, "মহারাজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। যে তিন ব্যক্তি রথাবতরণপূর্ব্বক এই দিকে আগমন করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুই জন নারী। পুরুষটি আর কেহ নয়, স্বয়ং রাজা একবীর ও নারী দুই জনের মধ্যে একজন রাজকুমারী ও অপরটী আমারই কন্যা যশোবতী। একবীর দক্ষিণ হস্তে রাজকুমারীর ও বামহস্তে যশোবতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন।

রাজা মন্ত্রিমুখে অমৃতবিন্দুনিষ্যন্দিনী বচনলহরী শ্রবণগোচর করিয়া আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়া কহিতে লাগিলেন "আজি কি আনন্দের দিন! আমার পক্ষে

আনন্দের দিন, রাণীর পক্ষে আনন্দের দিন, একাবলী ও যশোবতীর পক্ষে আনন্দের দিন। আমার একাবলী যাহার জন্য লালায়িত হইয়াছিল সেই রাজশার্দ্দুল একবীরকে প্রাপ্ত হইয়া কেমন মনের আনন্দে আগমন করিতেছে। কেহ শীঘ্র অন্তঃপুরে গমন করিয়া ধরাশায়িনী রাণীকে এই শুভসংবাদ প্রদান কর। আর মন্ত্রিবর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে অদ্য হইতে এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে সপ্তদিবানিশি সমস্ত কার্য্য বন্ধ থাকিবে। নাগরিকগণকে বলিয়া দিবেন যেন তাহারা প্রতি গৃহচূড়ে পতাকা উড্ডীন করে এবং রাত্রিপ্রারম্ভে দীপালোক দান করে। মন্ত্রিবর! চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে যেমন সাগরের জল উদ্বেল হইয়া উঠে একবীর ও একাবলীদর্শনে আমার হৃদয়ের আনন্দও তদ্রূপ হইয়াছে। পর্ব্বতদুহিতা নদী যেমন সাগরসম্মিলনআশে গমনকালে গিরিকর্ত্তৃক রুদ্ধগতি হইলেও তাহাকে পরিক্রমণপূর্ব্বক সাগরে সঙ্গতা হয়, রাজদুহিতা একাবলীও তদ্রূপ কালকেতু দ্বারা অপহৃতা হইলেও একবীরে সঙ্গতা হইয়াছে। আমি একবীরের সহিত একাবলী ও যশোবতীর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব।

মন্ত্রী। মহারাজ! ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। একাবলী ও যশোবতী যেন একবৃন্তে দুই ফুল, আহা! উভয়কেই একবীরের করে সমর্পণ করিলে উহারা চিরকালই তাহাই থাকিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে রভ্যরাজপ্রেরিত পারিষদকর্ত্তৃক প্রত্যুৎগত হইয়া একাবলী ও যশোবতী সমভিব্যাহারে একবীর সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "এস বাবা এস" বলিয়া একবীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং একাবলী ও যশোবতীর মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "যাও মা, তোমরা অন্তঃপুরে যাও, সেখানে তোমাদের মাতা বৎসহারা গাভীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।"

একাবলী ও যশোবতী অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলে রভ্যরাজ একবীরকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "আমার অদ্য জীবন সার্থক হইল। পারিষদগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া মহারাজ একবীরের জয় ঘোষণা কর।"

পারিষদবর্গ রাজাজ্ঞা মত "জয় মহারাজ একবীরের জয়!" রবে বিজয় ঘোষণা করিলে, সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক সভাবহির্ভাগে সমবেত জনমণ্ডলী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ একবীরের জয়।"

অনন্তর মহারাজ রভ্য শুভদিনে একবীরের সহিত একাবলী ও যশোবতীর

পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। একবীর অশ্বিনীগর্ভসম্ভূত বলিয়া তাঁহার বংশাবলী অতঃপর হৈহয় নামে খ্যাতি লাভ করে। এই হৈহয় বংশে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি মহাতেজা বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

রুশসাম্রাজ্যে যুগান্তর।

যুদ্ধকোলাহলের মধ্যেই ভগবদ্গীতার অমৃতময়ীবাণী মানবজাতি শুনিতে পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যদি বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র হয় তাহা হইলে মহত্তর ভগবদ্গীতা শুনিবার আশা করা অন্যায় হইবে না। সমরকোলাহলের বিভীষিকার মধ্যে ইউরোপে যে সমস্ত ভাল কথা উঠিয়াছে ও ভাল চেষ্টা হইতেছে তাহার সংবাদ রাখা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; যাঁহারা সাহিত্যের দ্বারা দেশের সেবা করিতেছেন তাঁহারা এই পথটি বিস্মৃত হইবেন না।

এই মহাযুদ্ধের ফলে রুশিয়া দেশে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা রুষিয়াদেশে ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না। এই চেষ্টা প্রতীচ্যজগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত—এক সম্পূর্ণরূপে সুরাপান নিবারণ করা আর অপরিমিত সুরাপান নিবারণ করা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পরে এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম যখন আরম্ভ হয় তখন সম্পূর্ণরূপে সুরাপান নিবারণ করার চেষ্টা হয় নাই। অপরিমিত সুরাপান যাহাতে নিবারিত হয় সে জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সুরাপান নিবারণের যে চেষ্টা রুশিয়াদেশে বিশেষ উদ্যমের সহিত আরম্ভ হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য মদ্যের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিবার জন্য। মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য, এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে রুশিয়া দেশে বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

সুরাপান-নিবারণের চেষ্টা রুশিয়াদেশে প্রথম যখন আরম্ভ হয় তখন গবর্ণমেণ্ট এই চেষ্টায় কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাও ঠিক বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের মধ্যে অপরিমিত সুরাপান নিবারণের জন্য মদ্যের ব্যবসায়ের একচেটিয়া লইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে কোনরূপ সুফল ফলে নাই। অপরিমিত সুরাপান নিবারণের জন্য মদ্য-ব্যবসায়ের এক-চেটিয়া গ্রহণ ছাড়া গবর্ণমেণ্ট যে অন্যরূপ চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্য উপায়েও এই হিতকরী চেষ্টা সাহায্য পাইয়াছিল। সুরাপানের অনিষ্টকারীতা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানকল্পে চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণকে গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুরাপান নিবারণ চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ছিল এবং এই সহানুভূতির ফলে বাল্‌টিক সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর, শ্বেতসাগর হইতে ককাসস্‌ পর্য্যন্ত সমগ্র রুশ-সাম্রাজ্যে অনেকগুলি সুরাপাননিবারণী সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সামাজিক দোষ ও পাপ দূর করিবার জন্য পৃথিবীর যেখানেই যে চেষ্টা হয় তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকদিগের চেষ্টার উপরেই তাহার সাফল্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। রুশিয়া দেশেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা প্রাণপণে প্রথম হইতে এই হিতকরী চেষ্টায় যোগদান করিয়াছেন। কার্য্যটি যে কত কঠিন, রুশিয়াদেশে সুরাপান নিবারণ যে কত দুরূহ কার্য্য তাহা আমাদের দেশের লোক ধারণাই করিতে পারিবে না। টেলিসব্‌ (M. D. Tchelyshov) নামক এই চেষ্টার একজন নেতা অপরিমিত সুরাপান রুশিয়াদেশে কত প্রবল এবং সুরাপানের দ্বারা দেশের কি পরিমাণ সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে রুশিয়াদেশে পাঁচবৎসরের অপেক্ষা কম-বয়স, এ প্রকারের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শিশু প্রতিবৎসর মাতৃস্তন্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশলক্ষের অধিক শ্রমজীবি প্রতিবৎসর অপরিণত বয়সে মদ খাইয়া সাধারণ মদের আড্‌ডায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ রোগী প্রতিবৎসর হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হয়। প্রায় সাতাশ হাজার পাঁচশত লোক যাহারা মদ খাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহারা পাগলাগারদে স্থানাভাবের জন্য দেশের মধ্যে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। বহুলক্ষ স্ত্রীলোক সুরাপানের জন্য হয় বেশ্যাবৃত্তি করে

নতুবা নিত্য নিগৃহীত হয়। মদ খাইয়া অন্যায় করিয়াছে, এ প্রকারের আটলক্ষ লোক বৎসর বৎসর কারাগারে আবদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া কত লক্ষ মাতাল দেশের মধ্যে নিজেদের উদাহরণ ও সংসর্গের দ্বারা অন্যান্য লোকের দৈহিক ও নৈতিক সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা গণিয়া বলা যায় না। হাজার হাজার লোক মদের আড্ডায় ব্যবসায় করে, ইহাদের কুহকে পড়িয়া বহু লক্ষ নিরীহ কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিণামে পথের ভিখারী হয়, রুশিয়াদেশের অতিভীষণ শীত কিছুদিন ভোগ করিয়া-অকালে অশেষ যাতনা পাইয়া যম-রাজ্যে প্রস্থান করে। এই গেল রুশিয়াদেশের মোটামুটি অবস্থা, সুতরাং যাঁহারা সুরাপান নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা যে কি প্রকার কঠিন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কার্য্য যে কি প্রকারে সফল হইত তাহা ধারণা করাই যায় না। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে কার্য্য অসম্ভব বলিয়া মনে হইত এই মহাযুদ্ধের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দেশের প্রায় অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই সুরাপান-নিবারণী চেষ্টার এতদূর বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় সে জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইলেন যে গবর্ণমেণ্ট আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, গভর্ণমেণ্ট এমন সব বিধিব্যবস্থা করিলেন যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেরূপ প্রস্তাব কেহ উত্থাপন করিলে অসম্ভ বলিয়া লোকে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। গুড্ ফ্রাইডের পরের সপ্ত' রুশিয়া ও অন্যান্য খ্রীষ্টানের দেশে উৎসব হইয়া থাকে। এই সপ্তাহের প্রথম তিন দিন রুশিয়াদেশের শ্রমজীবি খৃষ্টানগণের যে সুরাপান-নিবারণী সভা তাহার সমগ্র দেশব্যাপী এক মহোৎসব হয়। রুশরাজ্যের রাজধানী পেট্রোগাড নগরে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করা হয়, সেই দরখাস্তের প্রার্থনা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট ৬ই, ৭ই ও ৮ই এপ্রিল এই তিনদিন যাবতীয় সরকারী মদের দোকান বন্ধ রাখেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মদ খাইবার হোটেলগুলি (Restaurants) এবং যাবতীয় সাধারণ মদের আড্ডা (Public Houses) এই তিন দিন বন্ধ ছিল। পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান কেবল একদিন মাত্র বন্ধ থাকিত। এই তিনদিনের মহোৎসবে অনেক স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা, শোভাযাত্রা, ও যাহারা আদৌ সুরাপান করে না এই প্রকারের গায়ক ও বাদকগণের সাহায্যে নানারূপ গীতবাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পাঁচদিন কাল এই

মহোৎসব চলিয়াছিল, এই পাঁচদিনের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার লোক সুরাপান-নিবারণী চেষ্টার সেবক হইবার জন্য সেবকদিগের চিহ্ন (Badge) গ্রহণ করেন। এই পাঁচদিন রাজধানী পেট্রোগাড ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল এবং মফঃস্বলে আরও দশলক্ষ লোক অত্যন্ত উল্লাসের সহিত এই চেষ্টার সেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিহ্নগ্রহণ করে। মস্কোনগরে অনেক পুস্তিকা বিতরণ হয়। লিবো-রম্‌নি নামক রুশ-সাম্রাজ্যে এক রেল-কোম্পানি আছে এই কোম্পানি এই কয়দিন সুরাপান-নিবারণী চেষ্টার সেবকগণকে তাঁহাদের রেলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথক গাড়ীতে করিয়া লইয়া যান এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের বক্তৃতা ম্যাজিক্‌-লণ্ঠন আদির সাহায্যে যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

এই গেল এপ্রিল মাসের কথা। কয়েকদিনের উৎসব ও উত্তেজনার দ্বারাই যে কাজ শেষ হইয়া গেল তাহা নহে, মে মাসে নানাস্থানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই মে মাসে একদল পদাতিক সৈন্য একবাক্যে তাহাদের সেনাপতির উপদেশে একেবারে মদ্যপান পরিত্যাগ করে।

সেলিজার হ্রদের উপর অস্তাস্কর নামক একটি নগর আছে। এই স্থানে সুরাপান-নিবারণী এক ষ্টীমার সজ্জিত হয়। সেই ষ্টীমারে একটি মিউজিয়াম্ বা প্রদর্শনী করা হয়। সুরাপানের কি কুফল এবং সুরাপান পরিত্যাগের কি সুফল ইহা দেখাইবার জন্যই এই প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। গতবৎসর গ্রীষ্মকালে এই জাহাজ সেবকগণকে লইয়া সমগ্র হ্রদ ও সেলিজার-ভ্‌কা, বয়া, আস্ত্রাকান, কামা প্রভৃতি নদনদী পর্য্যটনের জন্য বাহির হয়। আটাশটি বড় সহর, ছেয়াত্তটি ছোট সহর এবং দু-হাজার গ্রামে এই ষ্টীমার উপস্থিত হইয়াছিল। ষ্টীমারে ডাক্তার ছিল, বক্তা ছিল ও অন্যান্য অনেক লোক ছিল। ষ্টীমারের উপরে বক্তৃতা হইত এই বক্তৃতায় দুইশত লোক বসিয়া শুনিতে পাইত। সহরে ষ্টীমার লাগিলে হ্রদের বা নদীর তটে এক সামিয়ানা টাঙ্গানো হইত এবং প্রায় আটশত লোক বক্তৃতা শুনিত। ষ্টীমারের আগে একখানি ছোট মোটার-নৌকা চলিত। ষ্টীমার পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কোন্ সময়ে ষ্টীমার আসিবে তাহার সংবাদ দিত।

রুশদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ভায়াট্‌কা নামক এক প্রদেশ আছে। সেই

প্রদেশের ককুম্বোংকা নামক একগ্রামে দুইশত কৃষক-ভূম্যাধিকারী ২৩ শে ও ২৪ শে জুন তারিখে সম্মিলিত হইয়া এক সভা করেন। এই সভায় সুরা-পান-নিবারণের জন্য অনেক আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলে সভা কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনটি মন্তব্য গৃহীত হয়। (১.) মদ প্রস্তত করা ও বিক্রয় করা একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত। (২) বেআইনি করিয়া যাহারা মদ বেচিবে তাহাদের ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হউক। (৩) টাকা ধার দিবার জন্য যত কোম্পানি আছে তাহাদের অনুরোধ করা হউক যে যাহারা মদের ব্যবসায় করে তাহাদের ও তাহাদের পরিবারবর্গকে তাঁহারা যেন টাকা ধার না দেন। বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার ও সম্মিলিত বিশ্রামভবন প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

আগষ্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ এই উদ্যম আরও জোরের সহিত চলিতে থাকে। ডন্ নদীর উপর অবস্থিত রস্তভ্ নগরে একেবারে মদের কেনাবেচা বন্ধ হইয়া যায়। ওয়ার্স নগরে পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে সমস্ত মদ পোড়াইয়া দেওয়া হয়। অগ্নিদাহ নিবারণের জন্য ফায়ার-ব্রাইগেডের পর্য্যন্ত সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। ভল্নানগরের নাগরিক মন্ত্রণাসভার অধিকাংশ সভ্য স্থায়ীরূপে মদের দোকান বন্ধ করিয়া দিবার জন্য মেয়রের নিকট দরখাস্ত করেন। কিয়েভ্ ও ব্ল্যাডিমির এই দুই নগরে প্রাদেশিক ও মিউনিসিপ্যাল সমিতি-সমূহ ভোজনাগারে যুদ্ধের সময় একেবারে মদ্যপান বন্ধ করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন। ইভানভো-ভজ্নিসেনেস্ক নগরে মদ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় সহরের অবস্থা একেবারে বদ্লাইয়া গেল। মাতাল এবং ভিক্ষুক আর পথে দেখিতে পাওয়া যায় না। জেলে কয়েদী নাই. মিউনিসিপ্যাল বিচারকদের একরূপ কাজ নাই বলিলেই হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যহ ওয়ার্স নগরে দিনে অসংখ্য চুরি ও রাত্রিতে অনেক মারামারি হইত। এখন এক একদিন আদৌ চুরি বা মারামারি হয় না। পেট্রোগ্রাডে দৈনিক অপরাধ শতকরা ৭০ কমিয়া গিয়াছে।

রুশিয়াসাম্রাজ্যে সুরাপান-নিবারণী চেষ্টার দ্বারা কার্য্যতঃ যাহা হইয়াছে তাহা খুবই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ভাবিবার আছে।

প্রথমতঃ এই যে আন্দোলন ইহা কেবল পদস্থ বা ধনীলোকের আন্দোলন নহে। সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল-সাধন ইহার উদ্দেশ্য নহে। পশ্চিম হইতে

পূর্ব্ব, উত্তর হইতে দক্ষিণ, সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের সকল দলের, সকল অবস্থার ও সকল ধর্ম্মের লোক একযোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের সহিত স্বেচ্ছায় এই সাধুচেষ্টায় সম্মিলিত হইয়াছে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট বেশ সফলতার সহিত এই লোকহিতকর কার্য্যসাধন করিতেছেন। দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেন্টের নহে সমস্ত জাতিই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জনশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এইটুকু বুঝিয়াছে যে সুরাপান-নিবারণ করিতে পারিলে যে বীরত্ব প্রকাশ করা হইবে ও দেশের যে মঙ্গলসাধন করা হইবে, তুরস্ক, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্ম্মানীর সমবেত সৈন্যদলকে পরাস্ত করা অপেক্ষাও তাহা বেশী। রুশরাজ্যের বহিঃশত্রু একেবারে নির্ম্মূল করিতে হইলে দেশে সুরাপান নিবারণই প্রথম সোপান। তৃতীয়তঃ জাতীয় জীবনে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতীতের দুরবস্থার শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাবে দিন কাটিয়াছে এখন সে ভাবে দিন যাপন পাপ। রুশদেশের কৃষকগণ বড় বিশ্বাসী ও ভক্ত লোক। খ্রীষ্টান সমাজে যে প্রবাদ আছে যে যীশুখ্রীষ্ট আসিয়া একবার পৃথিবীতে স্বয়ং একহাজার বৎসর রাজত্ব করিবেন, রুশদেশের কৃষকগণ তাহাতে বিশ্বাস করে। এখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে সুরাপান-নিবারণের এই চেষ্টা ইহাই যীশুখৃষ্টকে জগতে আনিবার একটি প্রধান উপায়।

(The National Temperance quarterly of England হইতে আমেরিকার The Christian Register নামক পত্রিকার ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত অংশের ভাবানুবাদ)।

"গোপালচন্দ্র গোখলে।"*

জন্ম ১৮৬৬ খৃঃ—মৃত্যু ১৯১৫—১৯ শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০—২৫ মিঃ।

"সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহিলা ও বন্ধুগণ—

আপনারা শুনিয়াছেন যে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যু হইয়াছে। গত শুক্রবার রাত্রি ১০।২৫ মিনিটের সময়, ভারতবর্ষ তাহার এই কৃতীসন্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কোন ক্রমেই রক্ষা করিতে পারিলেন না।

---

* গিরিডিতে এই প্রবন্ধটি লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে।

ব্রিটীশভারতে রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগের দোষগুণ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য ও গোখলে মহোদয়ের তদ্বিষয়ে গভীর গবেষণার জন্য যখন আগামী মার্চ্চ মাসে আমরা দিল্লীর লাট-কাউন্সিলের দিকে উৎকণ্ঠার সহিত তাকাইয়া ছিলাম—হঠাৎ সেই সময় তাহার মৃত্যু আমাদের একটী বিশাল বিপন্নজাতির সোৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে—এক মহা বিভীষিকা ও অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করিয়াছে দেশের জনশিক্ষা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ও রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের দোষগুণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে তিনি যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতেছিলেন,—তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। ইউরোপের ভিচি (Vichy) সহরের আবহাওয়া তাহাকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করিয়া দিয়াছিল আমরা এমন আশ্বাস পাইয়াছিলাম মার্চ্চ মাসে তিনি দিল্লী কাউন্সিলে যোগ দিবেন এমন কথাও সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল। কাজেই তাহার মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এই আঘাত আমাদের পক্ষে রোমরাজ্যের ভূমিকম্পেরই মত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক এবং ভয়াবহ। ইটালির ভূমিকম্প অপেক্ষা ভারতে গোখলের মৃত্যু জাতীয়জীবনে অধিকতর সমস্যা ও জটিলতায় পূর্ণ আমি ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি মনে করি না। সেই প্রাচীনযুগের রোম ভারত আজ দুইটী ভিন্নপ্রকৃতির ভূমিকম্পদ্বারা, বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হইয়া কলরব করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই শোকসভা, ভীত সন্ত্রস্ত এই সমগ্র জাতির তুমুল কোলাহলের মধ্যেই স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে—স্পর্দ্ধা করিতেছে। গোখলের মৃত্যু বজ্রের তীক্ষ্ণতাদ্বারা সহসা আমাদের জাতীয় চিত্তকে আঘাত করিয়াছে ইহা কে না স্বীকার করিবে?

ইটালীর রাজপথ, দোকান, হাট, বাজার আজ সৌধশ্রেণীর স্তুপীকৃত ভগ্নাবশেষ দ্বারা সমাকীর্ণ। রাজা অমাত্যগণসহ ভীত ও বিষণ্ণ চিত্তে তাহা দেখিয়া বেড়াইতেছেন—আমরা প্রথম কথা সংবাদপত্রে জানিতেছি ও ছবিতে দেখিতেছি। পক্ষান্তরে বিশাল ভারতবর্ষেও ভীতি, চঞ্চলতা, ক্ষোভ ও নৈরাশ্য জাতির চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা লাটভবনের সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে দেশের রাজশক্তি তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে তাহার নিশানটিকে অর্দ্ধেক গুটাইয়া লইলেন। দিল্লীতে বড়লাটের মন্ত্রীসভা মন্ত্রণা-গৃহে একত্রিত হইয়াই বলিলেন—থাক্ কাজ নাই, গোখলের মৃত্যু হইয়াছে।

দিল্লী, লাহোর, কলিকাতা, এলাহাবাদ, মান্দ্রাজ, বোম্বে, রেঙ্গুণ- দক্ষিণ আফ্রিকা, লণ্ডন একসঙ্গে যুগপৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। গোখলে এমনই একজন মানুষ ছিলেন, যার আমরা আজ এমন একজন মানুষকে মৃত্যুর অন্ধকারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলিলাম। কেননা মৃত্যু একবার গ্রাস করিলে তাহাকে কখনই ফিরাইয়া দেয় না।

মৃত্যুর দুদিন পূর্ব্বেও—অর্থাৎ বৃধবার প্রাতঃকালে তিনি প্রায় তিনঘণ্টা কাল দেশের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহের সহিত ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং এই বিপুল কর্ম্মীর জন্য অবকাশহস্তে মৃত্যু যখন ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ক্লান্ত মারাঠী বীর—তাহা বুঝিতে পারিলেন—তিনি লাটকাউন্সিলে তাহার আরব্ধ-কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না—ভাবিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতের জন্য সেবা-মন্দিরে যুবকদিগের নিকট শেষ কথা কি বলিবেন মনে করিয়া শয্যার চারিপাশে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দুর্ভাগ্য তাহারা কেহই তখন ছিল না,—তিনি দুঃখ করিলেন। মৃত্যুর আসন্ন অবকাশ তখন তাঁহার চারিদিকে শীতল শ্যামল ছায়া বিস্তার করিয়াছে। জীবনের তাপ নিভিয়া আসিতেছে। তিনি শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ১৫ মিনিট পরেই মৃত্যু তাঁহাকে টানিয়া লইল।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা দেড়টার সময় গোখলের মৃতদেহকে শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন হইল।

বাল গঙ্গাধর তিলক সিংহাগাদ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। মোস্‌লেম্ গৌরব মহামান্য সার্ আগা খাঁ—মারাঠী ব্রাহ্মণের মৃতদেহকে সম্মানের জন্য পুষ্পের মালা অর্ঘ্য পাঠাইলেন। পরক্ষণে আসিলেন—ভাণ্ডারকার আসিলেন, ফার্গুসন্ কলেজ ও অন্যান্য কলেজের সমস্ত অধ্যাপকগণ সম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেবাসদনের মহিলারা আসিলেন। স্কুলকলেজের ছাত্রেরা দলে দলে আসিয়া ভীড় করিল। স্কুল, কলেজ, গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল্ আফিস দোকান হাট ও বাজার সকলেই সম্ভ্রমে কাজ বন্ধ করিলেন। কেননা গোখলের মৃতদেহ শ্মশানে যাইতেছে। বিশসহস্র নরনারী ভারতের এই মহাকর্ম্মীর পবিত্র মৃতদেহকে মাথায় করিয়া রাস্তার জনতায় সংহত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া দুইঘণ্টা পর ধীরে শ্মশানে উপস্থিত হইল—

ফ্রান্সে ও ভারতে দেশকালের ব্যবধান ও জাতীয় জীবনের গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও যেন মনে হয় ১৭৯১ খ্রীঃ মার্চ্চের শেষদিনে ফরাসীজাতি মিরাবোকে কবর দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। অগ্নিতে গোখলের দেহ ভস্মীভূত হইতে চলিল। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারকার—সংক্ষুব্ধজনতাকে গোখলের ত্যাগ, ও স্বদেশপ্রেম ও জীবনের ঘটনাবলী শোকার্দ্রস্বরে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। মারাঠীর দীপ্ত-প্রতিভা, মূর্ত্তিমান তেজ তিলক মহোদয়—গোখলের মৃতদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বজ্ররবে ঘোষণা করিলেন "ভারতবর্ষে এর মত কে?"

এমনি করিয়া গোখলের দেহ পুনাসহরের প্রান্তদেশে চিতার আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বিশ সহস্র নরনারী চোখের জলে সেই চিতাগ্নি নিভাইয়া দিয়া ধীরে গৃহে ফিরিল। পুনা হইতে সেই স্মরণীয় শ্মশানের একমুষ্টি ভস্মাবশেষ আজ হিন্দুর প্রয়াগতীর্থে পবিত্র ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাসমারোহের সহিত বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে। ইহাও আমরা জানি।

ত্রিবেণীসঙ্গমে সেই পবিত্র ভস্ম বিসর্জ্জন দিয়া, রিক্ত ও নিঃস্ব হইয়া সত্যই কি আমরা গৃহে ফিরিয়াছি? ভারতবাসীর চিত্তসমুদ্রে গোখলের চিতার অনল কি মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল? ত্রিবেণীর গঙ্গা যমুনা কি নিঃশেষে সেই ভস্মকে তাহার স্রোতে ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।—

না, তাহা কি করিয়া সম্ভব! জাতীয়জীবনে কোনদেশে কখনই তাহার নেতা ও গুরুকে এমনি করিয়া পুড়াইয়া, ডুবাইয়া, ভাসাইয়া দিতে পারে না। গোখলের মধ্যে নশ্বর যাহা তাহা অবশ্যই পুড়িয়া গিয়াছে বা যাইবে—কিন্তু অবিনশ্বর যাহা তাহাকে বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস অক্ষয় গৌরবে অমরত্ব দান করিবে। এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

লর্ড হার্ডিং গত মঙ্গলবার কাউন্সিল সভায় গোখলে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুধু তারি উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি—যে ব্রিটীশ ভারতের অন্ততঃ রাজনীতিক্ষেত্রে গোখলে নিঃসন্দেহে সেই ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ও অমরত্ব দাবী করিতে পারেন, যাহা মোগলভারতে আকবরের মন্ত্রীসভার টোডরমল লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার গোখলের চিতায় দাঁড়াইয়াই, তাঁহার কর্ম্মময়